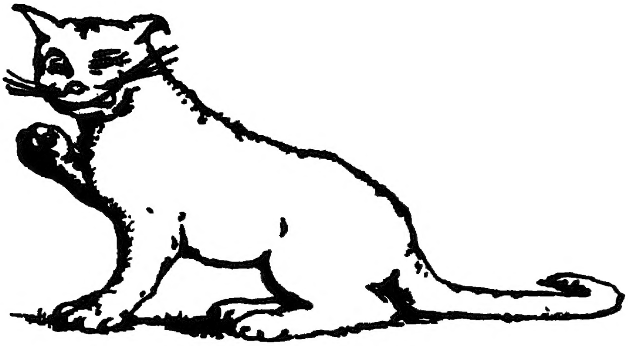

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক । সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

সুকুমার রায় অঙ্কিত চিত্র অবলম্বনে
প্রচ্ছদ : শ্রীসত্যজিৎ রায়
সহায়তা : শ্রীবিদ্যুৎ চক্রবর্তী

কপিরাইট : শ্রীসত্যজিৎ রায়

প্রথম সংস্করণ : ১৯৫৯

সূচীপত্র

ভূমিকা

নাটক

ঝালাপালা/১
লক্ষ্মণের শক্তিশেল/২০
অবাক জলপান/৩৪
হিংসুটি/৩৯
চলচিত্তচঞ্চরি/৪৩
ভাবুক সভা/৬৪
শব্দকল্পদ্রুম/৬৮
মামা গো/৮২

জীবনী

অজানা দেশ/৮৭
ডেভিড লিভিংস্টোন/৯০
কলম্বস/৯৩
জোয়ান/৯৪
পিপাসার জল/৯৮
ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল/৯৯
খোঁড়া মুচির পাঠশালা/১০২
সক্রেটিস/১০৪
দানবীর কার্নেগী/১০৭
নোবেলের দান/১০৯
আর্কিমিডিস/১১১
গ্যালিলিও/১১৩
ডারুইন/১১৫
পাস্তুর/১১৮
পণ্ডিতের খেলা/১২০
'সামান্য' ঘটনা/১২৩

জীবজন্তু

গরিলা/১২৭
গরিলার লড়াই/১২৮
বেবুন/১২৯
আলিপুরের বাগানে/১৩০
মানুষমুখো/১৩২
পেকারি/১৩৩
জানোয়ার এঞ্জিনিয়ার/১৩৪
প্লাটন/১৩৭
ঘোড়ার জন্ম/১৩৯
সেকালের বাঘ/১৪১
সেকালের বাদুড়/১৪২
তিমির খেয়াল/১৪৩
তিমির ব্যবসা/১৪৪
রাক্ষুসে মাছ/১৪৬
অদ্ভুত মাছ/১৪৭
বিদ্যুৎ মৎস্য/১৫০
সমুদ্রের ঘোড়া/১৫১
কুমিরের জাতভাই/১৫২
অদ্ভুত কাঁকড়া/১৫৪
শামুক ঝিনুক/১৫৫
সিন্ধু ঈগল/১৫৭
ধনঞ্জয়/১৫৯
পাখির বাসা/১৬১
মাছি/১৬২
ফড়িং/১৬৪
বর্মধারী জীব/১৬৫
লড়াইবাজ জানোয়ার/১৬৭
নিশাচর/১৬৯
নাকের বাহার/১৭০
জানোয়ারের প্রবাসযাত্রা/১৭২
জানোয়ারের ঘুম/১৭৪
গোখুরা শিকার/১৭৬
সিংহ শিকার/১৭৮
সেকালের লড়াই/১৭৯
খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু/১৮১
জানোয়ারওয়ালা/১৮২
প্রাচীনকালের শিকার/১৮৫

বিবিধ

সূক্ষ্ম হিসাব/১৮৯
শিকারী গাছ/১৯০
কাগজ/১৯২

লুপ্ত সহর/১৯৪
ডুবুরি জাহাজ/১৯৬
পাতালপুরী/১৯৮
উঁচু বাড়ি/২০০
রাবণের চিতা/২০১
ডুবুরী/২০২
পার্লামেণ্টের ঘড়ি/২০৪
রেলগাড়ির কথা/২০৫
সূর্যের কথা/২০৭
ডাকঘরের কথা/২০৯
অসুরের দেশ/২১১
নীহারিকা/২১৪
মাটির বাসন/২১৬
ঘুড়ি ও ফানুষ/২১৯
ক্লোরোফর্ম/২২১
মরুর দেশে/২২৩
যুদ্ধের আলো/২২৫
প্রলয়ের ভয়/২২৬
ধুলার কথা/২২৮
আকাশ আলেয়া/২৩০
আষাঢ়ে জ্যোতিষ/২৩২
অলংকারের কথা/২৩৩
গাছের ডাকাতি/২৩৬
কয়লার কথা/২৩৯
জাহাজ ডুবি/২৪০
আশ্চর্য আলো/২৪১
পিরামিড/২৪৪
দক্ষিণ দেশ/২৪৬
ভূমিকম্প/২৫০
মানুষের কথা/২৫৪
মেঘবৃষ্টি/২৫৬
বেগের কথা/২৫৮
আগুন/২৬০
লাইব্রেরি/২৬৩
নৌকা/২৬৫
ব্যস্ত মানুষ/২৬৬
সমুদ্র বন্ধন/২৬৮
শনির দেশে/২৭২
লোহা/২৭৫
পৃথিবীর শেষ দশা/২৭৭
কাঁচ/২৮০
শরীরের মালমশলা/২৮৩
অতিকায় জাহাজ/২৮৪
আকাশপথের বিপদ/২৮৫
সেকালের কীর্তি/২৮৬
চীনের পাঁচিল/২৮৭
চাঁদমারি/২৯০
বায়োস্কোপ/২৯১
ভুঁইফোঁড়/২৯৩
মামার খেলা/২৯৫
ডাকের কথা/২৯৭
কাঠের কথা/২৯৮
হাওয়ার ডাক/৩০০
হেঁয়ালি নাট্য/৩০২
আহ্লাদী মিনার/৩০৩
আদ্যিকালের গাড়ি/৩০৫
নকল আওয়াজ/৩০৭
আশ্চর্য প্রহরী/৩০৮
আকাশবাণীর কল/৩১০
যদি অন্যরকম হত/৩১৩
জলস্তম্ভ/৩১৫
বুমেরাং/৩১৬
ছাপাখানার কথা/৩১৭
কাপড়ের কথা/৩১৯
মজার খেলা/৩২০
আজব জীব/৩২২

বাল্য রচনা ও অন্যান্য

নদী/৩২৭
টিক্-টিক্-টিক্/৩২৭
শ্রীগোবিন্দ-কথা/৩২৮
মহাভারত/৩২৯
সূর্যের রাজ্য/৩৩১
একটি বর/৩৩৩
ব্যাঙের সমুদ্র দেখা/৩৩৪

স্বরলিপি

গ্রন্থপরিচয়

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র

ভূমিকা

'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র'র দ্বিতীয় খণ্ডে রাখা হয়েছে নাটক এবং কিশোরপাঠ্য গদ্যরচনা। নাটকগুলির মধ্যে শেষ একাঙ্কটি কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি; এর মধ্যে সবগুলিই কিশোর মনের উপভোগ্য নয়, তবে সুকুমার রায়ের নাটকের আবেদন সর্বজনীন বলেই অন্তত তার বহিরঙ্গের রসোপভোগে বাধা ঘটে না। সেজন্য নাটকগুলিকে একত্র করা হল।

'সন্দেশ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং যাবতীয় ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক সংবাদকে সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থিত করা। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক উপেন্দ্রকিশোর এ ধরনের রচনা লিখেছেন, তার মধ্যে সেকালের জীবজন্তু-বিষয়ক লেখাগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরবর্তী সম্পাদক সুকুমার রায় 'সন্দেশ' পত্রে শুধু ব্যঙ্গ গল্প বা কবিতা লেখেননি—তৎকালে এবং তার আগে যে-সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক আবিষ্কার হয়েছে, আধুনিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে, মানুষের সভ্যতার উপকরণে যেসব প্রয়োজনীয় উপাদান সংগৃহীত হয়েছে—সেসব তথ্যবহুল সংবাদ 'সন্দেশ' পত্রিকায় সুকুমার নিয়মিতরূপে, অত্যন্ত সরসভাবে পরিবেষণ করতেন। বিজ্ঞানের তথ্য নিয়ে লেখার মুশকিল এই যে, এককালের প্রতিপাদ্য পরবর্তী কালে বদলে যায়; এই খণ্ডে মুদ্রিত একাধিক রচনায় সতর্ক পাঠক হয়ত সেই বিষয়টি লক্ষ করবেন। বিভিন্ন ইওরোপীয় গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা থেকেও এসব তথ্য আহৃত হয়েছে। কিন্তু এই রচনার মূল্য অন্যত্রঃ সেটি হচ্ছে লেখকের বলবার ভঙ্গী এবং এই ভঙ্গী সুকুমারের সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাছাড়া, উনিশ শতাব্দের মধ্যভাগে আর বিশ শতাব্দের প্রথমাংশে পাশ্চাত্ত্য জগতে বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতি নিয়ে যে বিস্ময় ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল—এ দেশে শিক্ষিতজনের মধ্যেও তার আলোড়ন লেগেছিল। এই লেখাগুলিতে অন্তর্নিহিত রয়েছে সেই একই আগ্রহ ও উদ্দীপনাঃ সুকুমার কিশোর মনে তাকে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। একই জিজ্ঞাসা আর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুকুমার উপস্থিত করেছেন প্রতীচ্যের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক দেশব্রতী শিক্ষাব্রতীদের; লক্ষ করলে দেখা যাবে যে বহুযুগের দেশ কাল জাতি ধর্মের অন্ধতা এবং সংস্কারকে যাঁরা অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন প্রধানত সেইসব মনস্বীর প্রতি সুকুমারের বিশেষ পক্ষপাত ছিল। এ ছাড়া চেনা-অচেনা জীব-জন্তু বিষয়েও লিখেছেন। এই সমস্ত গদ্যরচনা কবি এবং কথাকোবিদ্ সুকুমার রায়ের অন্য পরিচয় উদঘাটন করবে; বাংলা ভাষায় সেক্ষেত্রে হয়ত জগদানন্দ রায় ছাড়া তাঁর প্রতিস্পর্ধী কেউ নেই।

'সন্দেশ' পত্রে মুদ্রণকালে অধিকাংশ রচনা সচিত্র ছিল· বিবিধ কারণে সেসব ছবি বর্জিত হয়েছে। সেই কারণে সেইসব রচনাও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সম্পাদিত হয়েছে, তাতে প্রসঙ্গচ্যুতির আশঙ্কা নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত 'জীব-জন্তু' ছাড়া এই রচনাগুলি ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয়নি। সেই হিসেবে এই সব লেখাকে অপ্রকাশিত বলা চলে।

সুকুমার রায়ের প্রথম মুদ্রিত পদ্য ও গদ্য রচনা এবং অন্যান্য অসমাপ্ত লেখাও এ-খণ্ডে সংযোজিত হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর যেমন একসময়ে রামায়ণের শিশুপাঠ্য পদ্যানুবাদ করেছিলেন, সুকুমারও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করার কথা ভেবেছিলেন; তাঁর সেই অসমাপ্ত রচনাটিও এখানে দেওয়া গেল।

পূর্ব পরিকল্পনামত আমরা ভেবেছিলাম দুটি খণ্ডেই সুকুমার রায়ের যাবতীয় রচনা

সংগৃহীত হবে। কিন্তু মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের আয়ুষ্কালের সীমায়, যার মধ্যে শেষ কয়েক বছর তাঁর কঠিন রোগশয্যায় কেটেছে, তাঁর রচনার পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না—এ কথা স্বীকার করি। এই খণ্ডে তাঁর কিশোরপাঠ্য রচনা সংগ্রহ সম্পূর্ণ হল বলা যায়। শিল্প ভাষা ধর্ম আলোকচিত্র ইত্যাদি বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি রচনা, গান, চিঠিপত্র, মানডে ক্লাব-সম্পর্কীয় রচনাদি, রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক পত্রাবলী, স্মৃতিচর্যা—এ-সমস্তই তৃতীয় বা শেষ খণ্ডে সমাহৃত হবে।

সত্যজিৎ রায়
পার্থ বসু

ঝালাপালা

জুড়ির গান

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ   ছাত্র দুটি করেন পাঠ—
পড়ায় নাইরে মন   (সবাই) হচ্ছে জ্বালাতন!
অতি ডেঁপো দুকান কাটা   ছাত্র দুটি বেজায় জ্যাঠা,
কাউকে নাহি মানে   (সবাই) ধর ওদের কানে!
গুরুমশাই টিকিওয়ালা   নিত্যি যাবেন ঝিঙেটোলা
জমিদারের বাড়ি—   (সেথা) আড্ডা জমে ভারি!

প্রথম দৃশ্য

পণ্ডিত। (স্বগত) রোজ ভাবি জমিদারমশাইকে বলে কয়ে তার বাড়িতেই একটা টোল বসাব। তা, একটু নিরিবিলি যে কথাটা পাড়ব, সে আর হয়ে উঠল না। যেসব বাঁদর জুটেছে, দুটো বাজে কথা বলবার কি আর যো আছে, এইজন্যেই বলি ন্যায়শাস্ত্র যে পড়েনি সে মানুষই নয়—সে গরু, মর্কট!

[নেপথ্যে সংগীত]

এই!—আবার চলল! এ এখন সারাদিন চলতে থাকবে! গলা ত নয়, যেন ফাটা বাঁশ! গানের তাড়ায় পাড়াসুদ্ধ লোক ত্রাহি ত্রাহি কচ্ছে—কাগটা পর্যন্ত ছাতে বসতে ভরসা পায় না, অথচ ভাবখানা দেখায় এমনি, যেন গান শুনিয়ে আমাদের সাতচোদ্দং তিপান্ন পুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছে! আ মোলো যা—

[ঘটিরামের প্রবেশ]

এত দেরি হল কেন? এতক্ষণ কী কচ্ছিলি?

ঘটিরাম। আজকে শিগগির শিগগির ছুটি দিতে হবে!

পণ্ডিত। বটে! অনেকদিন পিঠে কিছু পড়েনি বুঝি! ছুটি কিসের?

ঘটিরাম। তাও জানেন না! ও পাড়ায় গানের মজলিস হবে যে! বড় বড় ওস্তাদ—

পণ্ডিত। না, না, ছুটি পাবিনে—যা! পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এসেই ছুটির খোঁজ—

ঘটিরাম। বাঃ! ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু আসবেন!

পণ্ডিত। লাটসাহেব এলেও যেতে পাবিনে। কেষ্টা কোথায়?

ঘটিরাম। জানিনে। ডেকে আনব? ওরে কেষ্ট। [প্রস্থানোদ্যম]

পণ্ডিত। থাক্ থাক্, ডাকতে হবে না। ওখেনে বসে পড়।

ঘটিরাম। 'অল্ ওয়ার্ক্ অ্যান্ড্ নো প্লে মেকস জ্যাক এ ডাল বয়'—বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেননা, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেননা, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—ফুর্তিটুর্তি সব মাটি। কেননা, কেবলই

লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—এই আমাদের যেমন হয়েছে। কেননা—

পণ্ডিত। ও জায়গাটা পাঁচশোবার করে পড়তে হবে না। তোর অন্য পড়া নেই? —ঐ যে পুলিসটা যাচ্ছে, ওকে একটু ডাকা যাক্। এই পাহারাওয়ালা—ইঁদিকে আও।

[পুলিসের প্রবেশ]

দেখো, হামারা পাশের বাড়িমে দিনরাত ভর এইসা ক্যাঁচক্যাঁচ করতা, নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হায়—ইস্‌কো কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা?

পুলিস। কেয়া বোল্‌তা বাবু?

পণ্ডিত। আহা, এইটা দেখি একেবারে নিরক্ষর মূর্খ! আরে, পাশের বাড়িমে একঠো গানের ওস্তাদ হায় নেই? উস্‌কো একদম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেহি হায়—দিনরাত ভর্ কেবল সারে গামা ভাঁজতা হায়।

পুলিস। কেয়া হোতা?

পণ্ডিত। আরে, খেলে যা! (সুর করিয়া) সারে গাগা মাপা ধানি ধানি এইসা করতা হায়—

পুলিস। হাম কেয়া করেগা বাবু—উ হামারা কাম নেহি।

পণ্ডিত। নাঃ তোমার কাজ না! মাইনে খাবে তুমি কাজ করবে বেচারাম তেলি!

পুলিস। হাঁ বাবু।

পণ্ডিত। চেঁচাস কাঁহে? ফের পূজার বকশিশ চায়গা ত এইসা উত্তম মধ্যম দেগা—থোঁতামুখ ভোঁতা কর দেগা।

পুলিস। আরে, পাগলা হায়রে—পাগলা হায়! [প্রস্থান]

পণ্ডিত। দেখ! ছোঁড়াটার আর সাড়াশব্দ নেই! ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যাঁ—

পণ্ডিত। 'অ্যাঁ' কিরে বেয়াদব? 'আজ্ঞে' বলতে পারিসনে? আধঘণ্টা ধরে 'অ্যাঁ' করতে লেগেছে! বলি, পড়ছিস না কেন?

ঘটিরাম। হ্যাঁ, পড়ছিলাম ত!

পণ্ডিত। শুনতে পাই না কেন? চেঁচিয়ে পড়!

ঘটিরাম। (চিৎকার) অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—

পণ্ডিত। থাক্, থাক্—অত চেঁচাসনে—একেবারে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে।

[কেষ্টার প্রবেশ]

কেষ্টা। লেখাপড়া করে যেই গাড়িচাপা পড়ে সেই। শুনলুম আজকে ও পাড়ায় গানের মজলিস হবে।

পণ্ডিত। এতক্ষণে পড়তে এসেছিস?

কেষ্টা। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্'—সেই কখন এসেছি—এতক্ষণ কত পড়ে ফেললাম! 'আই গো আপ, ইউ গো ডাউন,'—

পণ্ডিত। যা, যা, আমি যেন আর দেখিনি, কাল আসিস্‌নি কেন?

কেষ্টা। কালকে, কাল কি করে আসব? ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত—

পণ্ডিত। ঝড় বৃষ্টি কিরে? কাল ত দিব্যি পরিষ্কার ছিল!

কেষ্টা। আজ্ঞে, শুক্কুরবারের আকাশ, কিচ্ছু বিশ্বেস নেই কখন কি হয়ে পড়ে!

পণ্ডিত। বটে! তোর বাড়ি কদ্দুর?

কেষ্টা। আজ্ঞে, ঐ তালতলায়—'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন্—' মানে কি?

পণ্ডিত। 'আই'—'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'—গয়ে ওকারে গো—গৌ গাবৌ গাবঃ,ইত্যমরঃ 'আপ্' কিনা আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল—গরুর চক্ষে জল—অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে—কেন কাঁদিতেছে—না 'উই গো ডাউন', কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা—'গো ডাউন', অর্থাৎ গুদোমখানা—গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না—তাই না দেখে, 'আই গো আপ্'—গরু কেবলি কান্দিতেছে—

[ঘটির বিকট হাস্য]

পণ্ডিত। ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যাঁ—না, আজ্ঞে—

পণ্ডিত। ফের ওরকম বিটকেল শব্দ করবি ত পিটিয়ে সিধে করে দেব।

[নিদ্রাচেষ্টা]

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই!

ঘটিরাম। ঘুমুচ্ছে? (ঠেলিয়া) ও পণ্ডিতমশাই! কেষ্টা ডাকছে, কেষ্টা ডাকছে—

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না।

পণ্ডিত। হুঁঃ, দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা—সব বলে দিতে হবে! তোদের আর কিচ্ছু হবে না! 'ওয়ান্স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান ইন এ স্ট্রিট নিয়ার মাই হাউস।' 'ওয়ান্স্ আই মেট্ এ লেম্ ম্যান্'—কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। 'ইন্ এ স্ট্রিট'—সে বিস্তর চেষ্টা করিল 'নিয়ার মাই হাউস্' —কিন্তু হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইয়েটা বুঝতে পাল্‌লি না? (ঘটিরামের প্রতি) কিরে? পালাচ্ছিস যে!

ঘটিরাম। নাঃ, পালাচ্ছি না ত! কেষ্টা এমনি গোলমাল কচ্ছে—কিচ্ছু আঁক কষতে পাচ্ছি না।

পণ্ডিত। কি আঁক দেখি নিয়ে আয়।

ঘটিরাম। আজ্ঞে এই যে! এই চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে আদ্ মোন পটলের দাম কত?

পণ্ডিত। দেখি, চার সের আলু দশ আনা ত! তবে আদ্ মোন পটল—আহা, আবার পটল এল কোত্থেকে?

ঘটিরাম। তা তো জানি না, বোধ হয় পটলডাঙা থেকে?

পণ্ডিত। দুৎ! একি একটা আঁক হতে পারে? গাধা কোথাকার!

ঘটিরাম। তাই বলুন! আমি কত যোগ করলাম, ভাগ করলাম, শেষটায় জি-সি-এম্ পর্যন্ত করলাম, কিছুতেই হচ্ছিল না। বড্ড শক্ত—না?

পণ্ডিত। মেলা বকিস নে, যাঃ!

ঘটিরাম। যাব? ছুটি?

কেষ্টা। ছুটি—ছুটি—ছুটি—

পণ্ডিত। না, না, ছুটি টুটি হবে না।

ঘটিরাম। হ্যাঁ ভাই, তুই সাক্ষী আছিস, বলেছে যা!

কেষ্টা। হ্যাঁরে, আমাদের কিন্তু কোনো দোষ নেই। [প্রস্থান]

পণ্ডিত। দেখলে কাণ্ডটা! এই সব হুজুকেই ত ছেলেগুলোকে মাটি করলে! আর

জমিদারমশাইয়ের আক্কেলটা দেখ—এখানে এসে অবধি দশভূতে তাকে পেয়ে বসেছে—দেখ দেখি, টাকা ওড়াবার জন্য শেষটায় কিনা গানের মজলিস! ছ্যা ছ্যা! [প্রস্থান]

জুড়ির গান

সাবধান হয়ে সবে অবধান কর রে।
ওহে শিষ্য গুণধর কোলাহল ছাড় রে॥
(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার।
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার॥
(ওসে) বিক্রমে বিক্রমাদিত্য সর্বশাস্ত্রে ধুরন্ধর।
(আহা) সাক্ষাৎ যেন দাতাকর্ণ দানব্রতে ভয়ংকর॥
(এরা) খাচ্ছে দাচ্ছে ফুর্তি কচ্ছে নিত্য তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘণ্টা মারছে আড্ডা বখশিশাদি সন্ধানে॥
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হল্লা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যের ঘটা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক॥
(আহা) একজন বড্ড সাধাসিধে ভেদ করে না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা স্বার্থপর॥
(ওরে) পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত বড্ড চণ্ডীবাবুর হিতার্থ।
(দেখ) অন্নলুচি ধ্বংস করি কচ্ছেন সবায় কৃতার্থ॥
(আহা) বিদ্যে জাহির কচ্ছে সবাই পোলাও কোর্মা ভোজনে।
(দেখ) যত রাজ্যের নিষ্কম্মার দল বাড়ছে সবাই ওজনে॥
(ওরে) অবিশ্রান্ত হুজুক নিত্য মুহূর্তেকো শান্তি নেই।
(আজ) পঞ্চ বর্ষ অন্ত হৈল ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই॥
(ওরে) কস্মিনকালে শুনি নাই রে এমন কাণ্ডকারখানা।
(ওই) খোসামুদে ভণ্ডগুলো আহ্লাদেতে আটখানা॥
(আহা) পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হবে চণ্ডীবাবুর মস্তকে।
(দেখ) অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে চিত্রগুপ্তের পুস্তকে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ি

[দুলিরাম ও খেঁটুরাম]

দুলিরাম। এত কাণ্ডকারখানা করা গেল, এখন ভালো রকম দু-একটা ওস্তাদ আসে তবে মজলিসটা জমে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ। বেশ তালে আছি দাদা! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, খাও দাও আর ফুর্তি কর।

দুলিরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম ঘি দুধ চর্ব চোষ্য চলছে, আর কটা দিন যেতে দাও না—আর চিনবার যো থাকবে না!

[কেবলচাঁদের প্রবেশ]

কেবল। আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজলিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটুরাম ও দুলিরাম। (পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল। সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁটুরাম। কোনো জন্মে নামও শুনিনি—

দুলিরাম। চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না—

কেবল। হ্যাঁ, তা আপনারা গোপীকেষ্টবাবুকে চেনেন ত?

দুলিরাম ও খেঁটুরাম। গোপীকেষ্ট; হ্যাঁ—নাম শুনেছি—বোধ হচ্ছে।

কেবল। আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়িওয়ালার খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিসতুতো ভাই।

দুলিরাম। তাই নাকি!!

খেঁটুরাম। সে কথা বলতে হয়—আসতে আজ্ঞে হোক মশাই।

দুলিরাম। বসতে আজ্ঞে হোক মশাই—

খেঁটুরাম। কি নামটা বললেন আপনার?

কেবল। কেবলচাঁদ।

দুলিরাম। কি বললে? বক্কেশ্বর? তা বেশ, বকদাদা, আজ তোমার গান শোনা যাবে!

কেবল। তা বেশ, কি বলেন? গানটা আরম্ভ করলে হয় না?

খেঁটুরাম। না, না! এখনই কি দরকার? সবাই আসুক আগে—

কেবল। এই সুরটুরগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

দুলিরাম। আরে মশাই! আমাদের কাছে 'গা'-ও যা, 'ধা'-ও তাই—সবই সমান।

কেবল। হ্যাঁ—গানগুলোর কি মুশকিল জানেন? ওগুলো আমার স্বরচিত কিনা—তাই, গাইতে একটু সংকোচ বোধ কচ্ছি।

খেঁটুরাম। তা নাই বা গাইলে—অন্য কিছু গাও না—

কেবল। আ মোলো যা! এরা আমায় গাইতে দেবে না দেখছি, আমার ভালো ভালো গানগুলো—

[কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রবেশ]

ঘটিরাম। আমরা গান শুনতে এলুম।

কেষ্টা। কই রে, লোকজন সব কই? গাইবে কে? আপনি বুঝি?

কেবল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এঁরা যখন নেহাত পেড়াপীড়ি কচ্ছেন তখন না গাইলে সেটা ভয়ংকর খারাপ দেখাবে।

[গুন গুন করিতে করিতে সহসা সপ্তমে চিৎকার]

খেঁটুরাম। রক্ষে কর দাদা, এ অত্যাচার কেন?

দুলিরাম। মশাই, এটা 'ডেফ অ্যান্ড ডাম্‌ব্‌' ইস্কুল নয়—আমাদের কানগুলো বেশ তাজা আছে।

কেবল। আজ্ঞে, সুরটো ঠিক আন্দাজ পাইনি—একটু চড়ে গিয়েছিল—না?

দুলিরাম। একটু বলে একটু?

খেঁটুরাম। রীতিমতো তেড়ে এসেছিল।

কেবল। আচ্ছা, একটু নামিয়ে ধরি—

[সংগীত] আহা, পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে?
কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ কোথা কর্ণ ভীমার্জুন
কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় বা সে মনু রে?
মাটির সঙ্গে মিশছে সবি কেঁচোর মতো খাচ্ছে খাবি।
কেবল আপিস খাটি কচ্ছে মাটি নধরপুষ্ট তনু রে—
ব্রাহ্মণের সে তেজ নেই হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণের সে— [মাথা চুলকানো]

দুলিরাম। শিং নাই আর লেজ নাই—

কেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ—

ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাই
মনের দুঃখ বলি কারে মোরা কি হনু রে—
আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে।

খেঁটুরাম। দাঁড়ান একটু সামলে নি—অত করুণ রস করবেন না।

[খেঁটু ও দুলি ক্রন্দনোন্মুখ। কেষ্ট ও ঘটিরামের উচ্চহাস্য]

খেঁটুরাম। তবে রে ছোকরা! তোরা হাসছিস কেন?

ঘটিরাম। বাঃ! হাসি পেলে হাসব না?

দুলিরাম। হাসি পাবে কেন? এখানে হাসবার কি হল?

খেঁটুরাম। ছ্যাবলামি পেয়েছিস? কথা নেই বার্তা নেই—হ্যাঃ হ্যাঃ!

ঘটিরাম। কিরে কেষ্টা, হাসি পেলে হাসব না?

কেষ্টা। এই রে, পণ্ডিতমশাই আসছে—

ঘটিরাম ও কেষ্টা। এই রেঃ, এই রেঃ, এই রেঃ, পণ্ডিতমশাই আসছে—মাটিং চকার—তোর র‍্যাপারটা দে ত।

[ঘটিরাম ও কেষ্টার র‍্যাপার মুড়ি হইয়া উপবেশন। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। ভালো, ভালো! তোমরা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার না? নিত্যি নিত্যি

জমিদারমশাইকে বিরক্ত করাটা কি ভালো দেখায়?—ইকী! ক্যাবলাটা এখানে এয়েছে কি করতে? (দুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রতি) আমোলো যা! তোমাদের যত ইয়ার-বকশী বুঝি জোটাচ্ছ একে একে?

কেবল। দেখলেন মশাই? আমাকে অপমান কললে! আমায় ইয়ার-বকশী বললে, অমন বললে কিন্তু আমি গাইব না।

পণ্ডিত। তা নাই বা গাইলে—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যা না গান। গানের ধমকে আমাদের পর্যন্ত পিলে চমকে ওঠে—তা, অন্য পরে কা কথা!

[ছাতা ও বিশাল পুঁটলি লইয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। (ঘটি ও কেষ্টার প্রতি) আপনাদের কি হয়েছে? অমন করে বসে আছেন যে? কাশি? জ্বর? ন্যাড়া মাথা? ঠাণ্ডা লাগবে ব'লে?

পণ্ডিত। (ঘটি ও কেষ্টার প্রতি) কি হে, এখানে এসে হাজির হয়েছ? আচ্ছা বেরিয়ে নেও তারপর— [পণ্ডিতস্কন্ধে রাম কর্তৃক পুঁটুলি স্থাপন]
তুমি কি রকম মানুষ হে?

রামকানাই। কেন? বেশ দিব্যি মানুষটি।

পণ্ডিত। বলি চোখ দিয়ে দেখতে পাও না কি?

রামকানাই। চোখ দিয়ে দেখতে পাই না ত কি কান দিয়ে দেখতে পাই?

পণ্ডিত। না হে—তুমি বড় বাচাল—শাস্ত্রে বলেছে—

রামকানাই। না—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি—

পণ্ডিত। আহা, বলি, তোমায় তো কেউ এখেনে ডাকেনি?

রামকানাই। ডাকবে আবার কি? এ কি নিলেমের মাল পেয়েছ যে ডাকাডাকি করবে?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তবে অমন করে বসে থাকলে ত ভালো দেখায় না।

রামকানাই। ভালো দেখায় না কি হে? তোমাকে যে অশ্বথগাছের মামদো ভূতের মতো দেখা যায়, সে বেলা কি?

পণ্ডিত। আহা, বলি, যদি কিছু বলবার থাকে, তা ঝট্‌পট্ বলে বাড়ি যাও না কেন?

রামকানাই। হ্যাঁ, তাহলে তুমিও আমার পুঁটলিটা সরাবার সুবিধা পাও।

পণ্ডিত। কি আপদ! বলি পুঁটলিটা রেখে যেতে বললে কে? নিয়েই যাও না কেন?

রামকানাই। মুটের পয়সা দিবে কে?

পণ্ডিত। হাঁঃ—মুটের পয়সা দিবে কে? মুটের পয়সা দিবে!

রামকানাই। উঁঃ! দুৎ! তোমার ময়লা চাদরটা আমার নাকের কাছে নেড়ো না।

[জমিদারের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। সর সর, জমিদারমশাই আসছেন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সর, সর।

জমিদার। কি রে! রামা কখন এলি? বেশ, বেশ, ভালো আছিস ত?

রামকানাই। (প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে এই মাত্র আসছি—

পণ্ডিত। আপনার এই লোকটা ভারি উদ্ধতস্বভাব—কথা বলে যেন তেড়ে মারতে আসে।

জমিদার। ওরে রামা! বাবুদের কিছু বলিস টলিসনে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

জমিদার। ও আমার বহুকালের পুরোনো চাকর কিনা—কারুর কথা টথা বড় শোনে

টোনে না। তবে লোকটা ভালো—দেশে গিছিল, আজ বহুকাল পরে এল।

খেঁটুরাম ও দুলিরাম। ইনি হচ্ছেন কেবলচাঁদ ওস্তাদ—মস্ত গাইয়ে।

খেঁটুরাম। আশ্চর্য! যত ওস্তাদ এসেছিল, ওঁর চেহারা দেখেই দে চম্পট।

দুলিরাম। তা হবে না? এঁরই গান শুনে আমাদের নবাবসাহেব মূর্ছো গেছিলেন, এঁরই গান শুনবার জন্য কিষণবাবু তেতাল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গেছিলেন—

খেঁটুরাম। এঁকে সভায় রাখতে কত রাজা-বাদশা হদ্দ হল।

দুলিরাম। কত টাকাকড়ির শ্রাদ্ধ হল।

খেঁটুরাম। কত ওস্তাদ গাইয়ে জব্দ হল।

পণ্ডিত। ওহে, বেশি বাড়িয়ে কাজ কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অলমতিবিস্তারেন—বেশি বাড়াতে নেই।

খেঁটুরাম। আমি অনেক হাঙ্গামা করে তবে ওঁকে এনেছি।

দুলিরাম। তুই এনেছিস? দেখলেন মশাইরা, কাজ করব আমি, আর বাহাদুরি নেবেন উনি!

খেঁটুরাম। খবরদার!

দুলিরাম। চোপরও!

খেঁটুরাম। ফের!

পণ্ডিত। সমাশ্বসীহি! সমাশ্বসীহি, জমিদারমশায়ের সামনে এমন গর্হিত আচরণ করতে নেই! আহা! সঙ্গীতশাস্ত্ররসানভিজ্ঞ, সঙ্গীত আর ন্যায়শাস্ত্র বুঝলেন কিনা—অতি উপাদেয় জিনিস! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অভূততদ্ভাবে চবী সে এক অত্যদ্ভুদ ব্যাপার—

জমিদার। তাহলে গান আরম্ভ হোক। ওস্তাদজি আপনি মাঝে মাঝে আমাদের গান টান শোনাবেন—

কেবল। হ্যাঁ, তা শোনাব বৈকি—অবিশ্যি এর দরুন আমার সব কাজকর্মের বড্ড ভয়ঙ্কর ক্ষেতি হবে, কিন্তু তা হোক—

পণ্ডিত। আরে ছো, ছো! তুমি তো ভারি ছোটলোক হে। এই সামান্য কাজটুকু করতেও তোমাদের যত রাজ্যের আপত্তি! আজ যদি জমিদারমশাই আদেশ করেন, এখেনে একটা টোল খুলতে হবে—আমার একশো কাজ থাক, হাজার কাজ থাক, আমি অমনি টোল খুলতে লেগে যাব। কেন? না, এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত যে ওঁর খাতিরে কিছু ত্যাগ স্বীকার করি, হোক গে ক্ষেতি, তাতে কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? রামা! যাও ত, এখনি একটা লোক পাঠিয়ে আমার জিনিসগুলো ধাঁ ক'রে আনিয়ে দাও ত—চণ্ডী জমিদারমশায়ের সম্মান রাখতেই হবে।

জমিদার। কিন্তু এখেনে জায়গার যে বড় অসুবিধে—

পণ্ডিত। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ওর মধ্যেই সুবিধা করে নেব। বুঝলেন চণ্ডীবাবু, আপনি আমাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না। রামা!

রামকানাই। আবার কেন?

পণ্ডিত। ওই বাইরের বড় ঘরটায় আমার বন্দোবস্ত করে দাও ত।

রামকানাই। সেখেনে দেখলুম দুটি বাবু বসে আছেন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার গাঁয়ের লোক। আপনার বাগানটা দেখলুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তাই ওদের ব'লে ক'য়ে এনেছি; ওরা এ-বিষয়ে একেবারে এক্‌স্‌পার্ট। মাইনের জন্য ভাববেন না—পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে।

পণ্ডিত। যা! বাবুদের হটিয়ে দে। বলগে ওখেনে টোল বসবে।

দুলিরাম। সিকী! আমার গাঁয়ের লোক! হবুগ্রামের অপমান!

পণ্ডিত। আরে না, না—রামা. দেখিস যেন বাবুদের ধমক-ধামক করিসনে—জমিদার মশায়ের যাতে অখ্যাতি না হয়—মিষ্টি করে বলবি। আর দেখ (গলা নামাইয়া) নেহাৎ যদি না শোনে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দিস।

খেঁটুরাম। শোন্—ঘর-টর দিয়ে কাজ নেই—জিনিসপত্রগুলো এনে উঠোনে ফেলে রাখিস—

পণ্ডিত। আর দেখ্—ওই শব্দকল্পদ্রুমখানা আনতে ভুল হয় না যেন—আর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে—

দুলিরাম। যেমন কথামালা ধারাপাত—

পণ্ডিত। সেগুলো হারায় না যেন--

কেবল। হ্যাঁ—সেই গানের কথাটা চাপা পড়ে গেল—

রামকানাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানটা হয়ে যাক—তারপর যাব এখন।

কেবল। এখানে বাজিয়ে কেউ নেই?

রামকানাই। আমি বাজাতে পারি—দাও ত পাখোয়াজটা—ধত্তেরে কেটে তাগ ঘ্ড়ান্ ঘ্ড়ান্ নাগে নাগে নাগে নাগে—নাগে দেৎ ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে—কই! গান আসছে না বুঝি?

পণ্ডিত। ইকী! চাকরটা এরকম করে কেন?

জমিদার। পুরোনো লোক কিনা! রামা তুই এখন চুপ কর—বাবুদের বাধা দিসনে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে!

[কেবলচাঁদের গান]

তানানা তাইরে নারে—তারে না তাইরে নারে—
তারে না তাইরে নাইরে—না-তানা-ন্না—

রামকানাই। এই যা! তাল কেটে গেল!

কেবল। আর কেন? থাম না বাপু!

রামকানাই। কেন মশাই? থামব কেন? নাগেদেৎ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে দেৎ—দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে—

পণ্ডিত। ওহে, জমিদারমশায়ের সামনে অমন করতে নেই—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—ণর্ত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ—বুঝলে কিনা।

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা—পুরোনো মানুষ কিনা!

দুলিরাম। হ্যাঁ, ওস্তাদজি—ওই যে গাইলেন ওটা কি তাল বলছিলেন?

কেবল। ওটা—ওটা হচ্ছে মাদ্রাজী একতালা।

খেঁটুরাম। সবে একতালা? আহা, যখন চৌতালায় উঠবে—তখন না জানি কেমন হবে!

রামকানাই। তখন সব কানে তালা লেগে যাবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ ওস্তাদজি, তাহলে আপনার গানটা শিগগির শেষ করে ফেলুন—আহা, অতি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত!

রামকানাই। ভারি উচ্চাঙ্গ! সেই আমাদের একজন যা ইমনকল্যাণের আলাপ করেছিল—সেটা পুরোপুরি শিখতে পারিনি। যেটুকু শিখেছি শুনবেন? আ—আ—আ... কেউ কেউ কেউ।

জমিদার। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে। [দ্বার পর্যন্ত প্রস্থান]

[কেবলচাঁদের গান]

হায় রে সোনার ভারত—

[ঘটি ও কেষ্টার উচ্চহাস্য]

ঘটিরাম। হাসিয়ে দিলি যে?

কেষ্টা। হাসিয়ে দিচ্ছিস কেন রে?

ঘটিরাম। তুই ত আগে হাসছিলি—

কেষ্টা। যাঃ! আমি কখন হাসলাম—

কেবল। দেখলেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কী কাণ্ডটা কললে!

খেঁটুরাম। রামা! একে সটাং রাস্তা পার করে দিয়ে আয় ত—

রামকানাই। (ওস্তাদকে ধরিয়া) একে?

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান]

কেবল। এইও, ইস্টুপিড বেয়াদব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস্!

পণ্ডিত। ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক!

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা দেখি—তুই আমার নাম ডোবাবি দেখছি।

[রামকানাইয়ের প্রস্থান]

কেবল। হায়রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্থ হইল
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধূলায় পতিত রইল
যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এত সব ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান
আজকাল তাকেই কিনা—সব অবজ্ঞা করিতেছে এবং দেখাচ্ছে সবাই মর্তমান
কোথা সেই তিরিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ
সাড়ে চোদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান
সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে
সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!

দুলিরাম। এই! সিডিশাস্!

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কি বললে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?

খেঁটুরাম। তবে রে! সিডিশাস্ গান কচ্ছিস কেন রে?

দুলিরাম। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেণ্টের চাকরি করে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁরে, ওর মামাতো ভায়ের চাকরি ঘোচাবি কেন রে?

কেবল। আমি ত জানতুমনে—আমি জানতুমনে—

পণ্ডিত। জানতিনে কিরে? কেন জানতিনে? [প্রহার]

কেবল। কী! মারলি কেন রে? ফের মার দেখি! [পুনঃপ্রহার]
এবার মারবি ত একেবারে— [পুনঃপ্রহার]
উঃ! এত জোরে মারলি কেনরে ইস্টুপিড! দাঁড়া দেখাচ্ছি—

[পলায়ন]

পণ্ডিত। যা না গাইলেন! গলা শুনলে ছত্রিশ রাগিণী ছুটে পালায়।

দুলিরাম। ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের ‘গ’টা মেলে কিনা সন্দেহ!

পণ্ডিত। তোমরা কোত্থেকে এ সব আপদ জোটাও হে? জমিদারমশায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে কি তোমাদের একটুও দৃষ্টি নেই?

খেঁটুরাম। এই দুলিরামটাই ত যত নষ্টের গোড়া, যত রাজ্যের অঘামারা রোখো লোক ডেকে আনবে!

দুলিরাম। বিলক্ষণ। আমি ডেকে আনলাম? আমার সাতজন্মে ওর সঙ্গে আলাপ নেই।

খেঁটুরাম। এত করে বারণ কল্‌লুম, তবু ডেকে আনলে!

দুলিরাম। না, মশাই! ও নিজে ডেকে এনেছে আমি আদবে কিছু জানিনে!

পণ্ডিত। জানো না ত জানো না—তা অত গরম হবার দরকার কি? আমাদের ন্যায়-শাস্ত্রে বলেছে—"উষ্ণত্বমগ্ন্যা তপসংপ্রয়োগাৎ"—

জমিদার। এবারে গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দিখি—

খেঁটুরাম। আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা! উঃ!

দুলিরাম। আমাদের বেড়ালটা সর্দি-গর্মি হয়ে মারা গেছে—

জমিদার। এ সব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে—

পণ্ডিত। হ্যাঁ, সিদিন আমাদের ওখানে ধূমকেতুর ন্যাজ্ দেখা গিছিল—

দুলিরাম। কার ন্যাজ কে জানে?

খেঁটুরাম। ওঁরই ন্যাজ হয়ত।

জমিদার। ধূমকেতুটা এসে কি কাণ্ড কলল? ঝড়, বৃষ্টি ভূমিকম্প—

খেঁটুরাম। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি—

দুলিরাম। পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশন!

পণ্ডিত। আমি শুনিছি ওই পানের পোকার খবরটা নাকি সত্যি নয়!

খেঁটুরাম। আলবাৎ সত্যি! নন্দলাল ডাক্তার স্বচক্ষে দেখেছে লোকে পান খাচ্ছে আর মরছে!

জমিদার। ঈস্! বল কি হে? তাহলে ত কথাটা সত্যি বলতে হবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ—দূরবীণ দিয়ে সে পোকা দেখা গেছে—

খেঁটুরাম। কলকেতার সায়েব ডাক্তার বলেছে তার ভয়ঙ্কর তেজাল বিষ।

দুলিরাম। হ্যাঁ—আমি দেখিছি, শাদা মতন আবার ন্যাজ আছে। কার ন্যাজ কে জানে?

[রামকানাইয়ের দ্রুত প্রবেশ]

রামকানাই। এইরে সেই দাড়িওয়ালা! সেই দাড়িওয়ালা বাবুটা আমায় তেড়ে এসেছিল! উঃ!

সকলে। কি হয়েছে! কি হয়েছে!

রামকানাই। সেই বাইরের ঘরের বাবুরা—উঃ—আমায় বেদম মারপিট করেছে! একজন ছাগলদাড়ি বাবু আছে, সে আমায় দেখেই হঠাৎ ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে এসেছিল—উঃ!

পণ্ডিত। সিকী রে! তুই করেছিলি কি?

রামকানাই। আমি তো কিচ্ছু করিনি—আমি বললুম, এখেনে ঢোল বসবে, বাবুরা যদি একটু অন্যত্তর যান, নেহাৎ যদি না যান, আপনাদের ঘাড়ে ধাক্কা দেওয়া হবে।

দুলিরাম। কী! ভদ্রলোককে এমনি করে ইনসাল্ট্!

খেঁটুরাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

রামকানাই। আমি ত মিষ্টি করে বলেছিলুম—

খেঁটুরাম। ব্যাটা, তোমায় মিষ্টি জুতো না দিলে তুমি সিধে হবে না—

পণ্ডিত। আমার জিনিসপত্রগুলো কি কল্লি?

রামকানাই। ওই যে, বাইরের উঠোনে ফেলে রেখেছি!

পণ্ডিত। দেখলেন মশাই, কাণ্ডটা দেখলেন?

রামকানাই। ওই বাবুটি যে বললেন!

পণ্ডিত। যা, যা, যেখানে হয় শিগগির বন্দোবস্ত করে দে! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে এক জায়গায় এমনি লিখেছে—

রামকানাই। বলি ন্যায়শাস্ত্র শুনলে ত আর পেট ভরবে না! তোমরা কি এইখেনে বসেই রাত কাবার করবে নাকি? জমিদারমশায়ের কি খাওয়া-দাওয়া নেই?

জমিদার। ওরে রামা, অমন করে বলতে নেই—বাবুদের মান্য করে কথা বলিস—আর পণ্ডিতমশাইকে কি চোখ রাঙায়?

রামকানাই। যে আজ্ঞে, প্রাতঃ-প্রণাম পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত। রামা, নেতাইবাবুর বাড়ি আমার দুই পোড়ো থাকে, তাদের খবর দিস ত।

[পণ্ডিত, খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রস্থান]

জমিদার। রামা, দেখছিস ত কাণ্ডটা?

রামকানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ—

জমিদার। উৎপাত যে বেড়ে চলল—কি করা যায়?

রামকানাই। আজ্ঞে, হুকুম পেলেই সব সাফ করে দি।

জমিদার। না, না, ওরা আপনা থেকে উঠে যায়, এমন কিছু করা যায় না? অথচ আমার নিন্দেটা না হয়!

রামকানাই। তাহলে ওদের ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া দিলে হয় না?

জমিদার। দুৎ! এটাকে কিছু জিজ্ঞেস করাই ঝকমারি! যা, তুই এক কাজ কর—আমার মামাবাড়ি যা। সেখেন থেকে কেদারমামাকে ডেকে আনবি—তাকে সব বলে কয়ে আনিস!

রামকানাই। যে আজ্ঞে—

জমিদার। মামা এলেই সব সিধে করে দেবে—উকিলে বুদ্ধি কিনা!

[গান] নাছোড়বান্দা নড়েন না,—
উড়ে আসেন, জুড়ে বসেন, মাথায় কেন চড়েন না!
নাছোড়বান্দা নড়েন না!
যাবার নামটি করেন না।
ধাক্কা দিলে সরেন না।
—নাছোড়বান্দা নড়েন না!
কচ্ছে সবাই যাচ্ছা তাই!
চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গালি, হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই!
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই
আসছে যে-কেউ পাচ্ছে ঠাঁই,
ইকী রকম হচ্ছে ভাই?
কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই!

তৃতীয় দৃশ্য

[কেদারকৃষ্ণ, জমিদার ও রামকানাই]

কেদার। ডোণ্ট্ পরওয়ার ভাগনে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বড় জোর দুটো দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। রামা!

রামকানাই। আজ্ঞে—

কেদার। তুই মেলা বুদ্ধি খরচ করিসনে—যা বলব তাই করে যাবি। আগে আমার বইগুলো আর খাতা পেনসিলটে বার করে রাখ্। [রামকানাইয়ের প্রস্থান]

ভাগনে, তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে, আমি সব সাবাড় করে দিচ্ছি—কিছু গোলটোল বাধলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও—আমায় গাল দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দিও।

[উভয়ের প্রস্থান। পণ্ডিত ও দুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই বড় আপসোস কচ্ছিলেন—বলছিলেন, এই খেঁটুরামের উৎপাতে তাঁর আর সোয়াস্তি নেই—ওকে যত শিগগির পার অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় ক'রে দাও—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—বুঝলে কিনা।

দুলিরাম। হ্যাঁ, এ আর একটা মুশকিল কি? এক্ষুনি ঘাড় ধরে—

[খেঁটুরামের প্রবেশ]

দাঁড়ান আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনি। [প্রস্থান]

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই যা চটেছেন দুলিরামের উপর—কী বলব! দেখ, শেষটায় ওর জন্যেই তোমাদের সক্কলের অন্ন মারা যাবে। ওকে যদি তাড়াতে পার, আঃ—জমিদারমশাই যা খুশি হবেন!

খেঁটুরাম। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সব ব্যাটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছি, (তোমাকে সুদ্ধু)।

পণ্ডিত। আর তোমার নিন্দেটা যা করে, কী বলব—এইমাত্র তোমার নামে যা নয় তা বলে গেল।

[দুলিরামের প্রবেশ]

রামা! ওরে রামারে! ঝট করে দুটো পান দিয়ে যা ত—রামাটা গেল কোথায়? ওহে, রামাকে একটু ডেকে দাও ত।

খেঁটুরাম। না রে, ডাকিসনে।

দুলিরাম। রামা!—হয়ত বাড়ি নেই।

খেঁটুরাম। রামাটা ভারি দুষ্টু! এতক্ষণ হয়ত ছিল, যেই আপনি ডেকেছেন, অমনি হয়ত পালিয়েছে।

দুলিরাম। হয়ত অসুখ টসুখ করেছে।

পণ্ডিত। তোমরা হয়ত হয়ত করেই সব সারলে দেখছি! রামারে! [রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামা, জমিদারমশাই নিচে নামলে একটু খবর দিস ত, আমার একটু নিরিবিলি কথা আছে।

খেঁটুরাম। আমোলো যা! আমারও নিরিবিলি কথা আছে।

দুলিরাম। আমারও আছে—

রামকানাই। তোমরা বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজো, তিনি আজ নিচে নামছেন না—তাঁর মামা এসেছেন যে! তাঁকে কিন্তু তোমরা চটিও না, ভারি বদমেজাজ আর রগচটা—এই যে তিনি আসছেন—আসুন, আসুন—ইনিই কেদারকেষ্টবাবু, জমিদারমশায়ের মামা!

[সকলের অভিবাদনাদি]

পণ্ডিত। আসুন, আসুন—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আপনার ভাগনেটি—আহা! অতি চমৎকার লোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—

দুলিরাম। নাঃ! আবার ন্যায়শাস্ত্র শুরু করল।

খেঁটুরাম। চল আমরা একটু ঘুরে আসিগে। [প্রস্থান]

কেদার। এই লোক দুটোর চেহারা ত বড় সুবিধের নয়—

পণ্ডিত। তা সুবিধের হবে কোত্থেকে—হাজার হোক ছোটলোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—"মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।" আপনার ভাগনে তো কাউকে কিছু বলেন না—তাই ওরা আসকারা পেয়ে গেছে। এমনি বেয়াদবী করে—কী বলব!

কেদার। বটে! তা আপনারা প্রতিকার করেন না কেন?

পণ্ডিত। কি করি বলুন? আপনারা থাকতে আমার ত কিছু বলা উচিত হয় না।

কেদার। এক কাজ করুন, এর পর যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, ঘাড়টি ধরে বার করে দেবেন।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত করা উচিত। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—"যা শত্রু পরে পরে।"

কেদার। আপনার সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে—কী পাণ্ডিত্য! আবার কি মিষ্ট স্বভাব! আমার এই কয়টা লেখা আছে, এগুলো আপনাকে একটু শোনাই—এমন সমজদার লোক ত আর সচরাচর জোটে না! অমানিশার গভীর তমসাজাল ভেদ করিয়া ঐ পূর্বদিকে তরুণ তপন ধীরে ধীরে উঁকি মারছে। বিহঙ্গের কলকল্লোল, শিশিরসিক্ত বায়ুর হিল্লোলে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত মুখরিত উচ্ছ্বসিত হইয়া, আহা, স্বভাবের সেই শোভা ভারি চমৎকার হয়েছে! হে নিদ্রিত মানব সকল! ঐ শুন বাছুরগুলি ল্যাজ তুলিয়া হাম্বা হাম্বা রবে ছুটিতেছে, তোমরা 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত'। আহা, কবিরা ত সত্যই বলিয়াছেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল—'

পণ্ডিত। চমৎকার হয়েছে! আমার একটু কাজ আছে—এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার। একটু দাঁড়ান, এই জায়গাটা ভারি ইন্টারেস্টিং ঃ
দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, বিকাল নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই,—কেবল সেই এক কথা, সেই এক চিন্তা; সেই এক কল্পনা, এক জল্পনা, এক তন্ত্র, এক মন্ত্র। কেমন? সমুদ্রের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে—কেমন? ভাষার কেমন একটা সহজ ভঙ্গী আছে সেইটা লক্ষ করেছেন?—সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে সেই একই সুর, সেই একই ছন্দ, সেই

একই সঙ্গীতকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্ষান্তি নাই, বিচ্ছেদ নাই—

পণ্ডিত। দাঁড়ান, আমার বড় তাড়াতাড়ি—ধাঁ করে এক্ষুনি আসব। [প্রস্থান]

কেদার। হ্যাঁ, একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি—আচ্ছা, আবার ঘুরে আসুক—হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ব!

[নেপথ্যে]

খেঁটুরাম। দেখ, চোরের দশদিন আর সাধুর একদিন।

দুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ত সবই করবি, যা! যা!

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। দেখ, মেলা চালাকি করিসনে, কিছু বলিনে বলে?

দুলিরাম। একদিন ধরে এইসা পিট্টি দেব—

খেঁটুরাম। দেখ, এসব আমি পছন্দ করি না কিন্তু—

দুলিরাম। দাঁড়া, আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনছি—

[পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। (দুলির প্রতি) ওহে, হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বল, ঘা দু-চার লাগিয়ে দেও না—

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের লড়াই—পণ্ডিতের ইনটারফিয়ারেন্স]

অ্যাঁ! মারামারি কচ্ছ? এক্ষুনি ঘাড় ধরে বিদায় করে দেব।

খেঁটুরাম। কী! উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, আবার কথার ভঙ্গী দেখ।

দুলিরাম। ঘাড় ধরবে? আমার গাঁয়ের লোক দুটো গেল কোথায়?

পণ্ডিত। তোমাকে বলিনি ত! তোমাকে বলিনি!

খেঁটুরাম। তবে আমাকে বলেছ? [প্রহার]

পণ্ডিত। ইকী! উঃ! ওরে রামা! রামারে! শিগগির ছুটে আয়, ওহে—উঃ! দেখ, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উঃ!

[কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। তোমরা কী আরম্ভ করেছ বল দেখি? দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

খেঁটুরাম। কি আরম্ভ করেছিস বল্ দেখি?

দুলিরাম। দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ?

পণ্ডিত। আমাকে মারতে মারতে একেবারে কালশিরে পাড়িয়ে দিয়েছে।

কেদার। দেখ, আমার ভাগনে ভালোমানুষ, এসব সইতে পারে—কিন্তু আমার সহ্য হয় না। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে। [খেঁটুরাম ও দুলিরামকে গলহস্ত]

দুলিরাম। কী ভদ্রলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!

খেঁটুরাম। চাকর দিয়ে ইন্‌শল্ট্!

দুলিরাম। কী! এত বড় কথা! এক্ষুনি আমি রাগ করে বাড়ি চলে যাব। তোকে অপমান করেছে—কক্ষনো এখেনে থাকিস না—আচ্ছা থাক, এবারে মাপ করা গেল। আর একবার করলে টের পাইয়ে দেব। আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে খবর দিচ্ছি।

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের ডিগনিফাইড একসিট, রামকানাইয়ের প্রস্থান]

পণ্ডিত। দেখলেন ত! এর উপর ত আর ওষুধ চলে না!

কেদার। হ্যাঁ—তা আসুন—একটু কাব্যালাপ করা যাক।

পণ্ডিত। এই মাটি করেছ—আচ্ছা আজ রাত্রে বেশ করে শোনা যাবে।

কেদার। না, রাত্রে ত সুবিধে হবে না—আমার চোখ খারাপ কিনা! শুনুন—ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স খুব কম ছিল—সাত বছর কি আট বছর হবে, কি বড় জোর নয় কি দশ কি এগার। সেই সময় আমি একখানা বই পড়েছিলাম—আঃ, সে একখানা বইয়ের মতন বই বটে! এখনো যখন তার কথা মাঝে মাঝে স্মৃতিপথে উদিত হয়, মন যেন একেবারে উৎসাহে আপ্লুত হয়ে যায়। শুনুন—চমৎকার বই, বোধোদয়—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—

পণ্ডিত। ও আমি পাঁচশোবার পড়েছি।

কেদার। পড়েছেন? কেমন! স্বীকার করুন, ভালো বই না? শুনুন— [পাঠ]

পণ্ডিত। ঘ্যান ঘ্যান করে মাথা ধরিয়ে দিলে—

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রবেশ]

ঘটিরাম। মাথা ধরেছে? অ্যাঁ?

কেষ্টা। আজ বুঝি আমাদের ছুটি? অ্যাঁ? [পণ্ডিত কর্তৃক উভয়কে চপেটাঘাত]

পণ্ডিত। যা! এখন ত্যক্ত কবিসনে—

কেষ্টা। কিরে, তোকে মারল নাকি?

ঘটিরাম। দুৎ! আমাকে মারবে কেন? তোকে ত মারল।

কেষ্টা। হ্যাঁঃ! নিজে মার খেয়ে এখন—

ঘটিরাম। আমি দেখলুম তোকে মারল— [উভয়ের প্রস্থান]

কেদার। হ্যাঁ, তারপর শুনুন—

পণ্ডিত। এ তো আচ্ছা বেল্লিকের হাতে পড়া গেল! ইকী মশায়! বলছি শুনব না—কেন খামখা বিরক্ত কচ্ছেন?

কেদার। আহা! এইটে শুনে নিন—আমি ছেলেবেলায় একটা পোয়েট্রি লিখেছিলাম—তখন বয়েস অল্প। কিন্তু সে হিসেবে লেখাটা কেমন দেখুন—

একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেন কালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ভয় পেয়ে সকলে ত থরহরি কম্পমান
চিৎকারিল কেহ সুকরুণ আর্তরবে অথবা যেমতি
লট্‌খটে গরুর গাড়ি চলিবার কালে
প্রকাশে দারিদ্র্য নিজ বিচিত্র বিলাপে—
কেহ জপে রাম নাম—আমি হয়ে ক্রুদ্ধ
ডাকিলাম ভৃত্যকে—‘হরে, ধেয়ে যাও দ্রুত
রাস্তার দরজাটা করে দাও বন্ধ—
আর নিয়ে এস ঝট্‌ করে তিনতলা হতে
আমার সে দু-নলা বন্দুক’—এইরূপে
বাখানিল সবে মোর উপস্থিত বুদ্ধি
কহিল সকলে, ‘আমি মরিতাম নির্ঘাৎ
যদি না থাকিত ব্যাঘ্র পিঞ্জরের মধ্যে—’

পণ্ডিত। হাড় জ্বালালে দেখছি—

কেদার। বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল—এখন রামাকে লেলিয়ে দি গিয়ে— [প্রস্থান]

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের প্রবেশ]

পণ্ডিত। যাও, যাও, এখন আমায় ঘাঁটিও না, আমার মেজাজ ভালো নেই—

খেঁটুরাম। ওরে বাসরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই!

দুলিরাম। দেখিস্ ঘাঁটাস টাঁটাসনে—শেষটায় ব্রহ্মতেজে ভষ্ম হয়ে যাবি!

[রামকানাইয়ের প্রবেশ]

রামকানাই। ওয়াক্—থুঃ—থু, থু থু—ওয়াক্—

খেঁটুরাম। ইকীরে? ওরকম কচ্ছিস কেন?

রামকানাই। অ্যাঃ—থু—থু—কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলেছি।

দুলিরাম। কেরোসিন তেল খেয়েছিস?

খেঁটুরাম। সিকী! কেরোসিন খেতে গেলি কেন রে?

রামকানাই। শখ করে কি আর কেউ কেরোসিন খায়? শিশির গায়ে লেখা ছিল—লেমন্ সিরাপ!

দুলিরাম। এখন একটা দেশলাইয়ের কাটি খেয়ে ফেল্—তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

রামকানাই। কি পণ্ডিতমশায়, আপনার ন্যায়শাস্ত্রে আর কিছু বলে টলেনি?

খেঁটুরাম। (মশা মারিতে মারিতে) আর দাদা ন্যায়শাস্ত্র টাস্ত্র ভালো লাগে না—বলি আজকাল মশাটা কেমন বল দেখি?

রামকানাই। বরাবর যেমন থাকে, ছোট ছোট কালো মতন, উড়ে বেড়ায়—

খেঁটুরাম। আহা, বলি লাগে কেমন?

রামকানাই। তা কি করে বলব? কখনো ভাজাও করিনি, চচ্চড়িও খাইনি।

খেটুরাম। হ্যাঁ, বলি অত্যেচারটা দেখ্ছ ত?

রামকানাই। অত্যেচার আবার কি! চুরিও করে না, ডাকাতিও করে না, পরের বাড়িতে আড্ডাও মারে না—

পণ্ডিত। ওহে দেখ, তোমাদের ওসব ইয়ার্কি করতে হয় বাইরে গিয়ে কর—আমার কাছে নয়! রামা! আমার ব্যাকরণটা গেল কোথায়—

রামকানাই। ট্যাক্‌রম্?

পণ্ডিত। তবেরে, ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ—আমার সঙ্গে রসিকতা?

রামকানাই। আবার রসিকতা কি কললুম?

পণ্ডিত। বলি, বইখানা কি কাগে নিল, না উড়ে গেল বাতাসে?

রামকানাই। বাতাসা?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাতাসা—বাতাসা খাওয়াচ্ছি—এইরকম করে তোরা জিনিসপত্র লোসকান করবি? ব্যাটা হতভাগা জোচ্চোর— [প্রহার। দুলিরাম ও খেঁটুরামের পলায়ন]

রামকানাই। মেরে ফেললেরে! উঃ—ইকী মশাই! দাঁড়াও আমি মামাবাবুকে ডাকছি, আর পুলিসে খবর দিচ্ছি।

পণ্ডিত। ওহে শোনো শোনো—আমি কিন্তু সে রকম ভাবে মারিনি।

রামকানাই। মেরেছ তার আবার রকম বেরকম কি হে? পুলিস! পুলিস! উঃ!

[রামার পতন। কেদারের প্রবেশ। পণ্ডিতের পলায়ন]

কেদার। কিরে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় কললি যে! ব্যাপারটা কি?

রামকানাই। আমায় মেরেছে! উঃ—আমায় মেরেছে—উঃ! কান দুটো ভোঁ ভোঁ কচ্ছে —মাথা ঘুরছে!

কেদার। মেরেছে! বাঃ! এই তো চাই। দাঁড়া এইসা চাল চালব, একেবারে বাজি মাত। তুই এক কাজ কর, সেই দাড়িটা আর লাল পাগড়িটা ঠিক করে রাখ। আর ঐ উঠোনটায় বসে বসে আর্তনাদ করতে থাক, যখন 'কোন্ হ্যায় রে' বলে ডাক দেব অমনি এসে হাজির হবি—একেবারে রামসিং দারোগা, বুঝলি ত? তুই খালি চেহারাটা দেখিয়ে যাবি—বোল-চাল সব আমি দেব। বাঃ, আপনা থেকে দিব্যি কাজ এগিয়ে গেল, তারপর ও দুটোকে সরাতে কতক্ষণ?

[রামকানাইয়ের প্রস্থান। পণ্ডিতের প্রবেশ]

পণ্ডিত। রামার কী হয়েছে? বেশি কিছু হয়নি ত?

কেদার। না, না, বেশি কিছু হয়নি। খান চার পাঁচ পাঁজর ভেঙে গেছে আর ডিজেসচান অফ দি লান্‌গ্‌স—সাংঘাতিক! তা আপনি কিছু ব্যস্ত হবে না। ও ব্যাটা আবার পুলিসে খবর না দেয়! সেবারে একটা এরকম কেস হয়েছিল—পুলিসে টের পেয়ে পাঁচ বছরের মতো চালান করে দিয়েছিল।

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! পাঁচ বছর!!

কেদার। আপনি ব্যস্ত হবেন না! উঃ—সেবারে একটা লোক মারামারি করেছিল, তাকে দিয়েছিল ঘানি ঠেলতে। বলব কী মশাই, দেড় মাসে অর্ধেক রোগা!

পণ্ডিত। অ্যাঁ—অ্যাঁ একেবারে অর্ধেক! অ্যাঁ!

কেদার। তা আপনি বেশি ভাববেন না—ওই পুলিস ব্যাটারা কোনো রকমে টের না পেলেই হল—কিন্তু আজকাল যে রকম গোয়েন্দা টিকটিকির আমদানি হয়েছে—কোনো কথা লুকোবার যো নাই—আপনি কবার হাই তুললেন, তুড়ি দিলেন—সব খাতায় লেখা! সেবার এক ব্যাটা বামুন মারামারি করে লুকিয়েছিল—লুকোলে হবে কি? পুলিসে টের পেয়ে ধরে এনে পঁচিশ দফা জুতো!

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! বামুন? জুতো!!

কেদার। বাইরে কে? কোন হ্যায় রে? তা আপনি বেশি ব্যস্ত হবেন না! আমি থাকতে ভয় কি? কি রকম ভাবে মেরেছিলেন বলুন ত?

পণ্ডিত। খুব আস্তে পিঠের এইখেনে—

কেদার। পিঠে! এইখেনে!! সর্বনাশ! ৭৯৪ ধারা! এর উপর ত আমার হাত নেই —তা আপনি বেশি চিন্তিত হবে না। আমি দারোগাবাবুকে বলে কয়ে আপনার মেয়াদ কমিয়ে দেব।

[খেঁটুরাম ও দুলিরামের শশব্যস্তে প্রবেশ]

খেঁটুরাম। এক ব্যাটা পুলিস ইদিকে আসছে!!

দুলিরাম। আমায় দেখে রুল উঁচিয়ে আসছিল—আপনার বাক্সের মধ্যে একটা সোনার চেন ছিল—আমি কিন্তু সেটা চুরি করিনি।

খেঁটুরাম। চুরি হবে কোত্থেকে—যেখানে যা থাকে আমরা সব যত্ন করে তুলে রাখি।

[খেঁটুরাম ট্যাঁক দেখাইল। পুলিসের প্রবেশ]

খেঁটুরাম। এইরে! এইরে!

দুলিরাম। এই যে সিদিন নিতাইবাবুর একটা ঘড়ি চুরি হয়েছিল আমি কিন্তু তার কিছুই জানি না!

খেঁটুরাম। আর, সেদিন যে চৌরাস্তার মোড়ে একটা লোক বেদম ঠেঙা খেয়েছিল—আমি কিন্তু তার গায়ে হাতও দিইনি।

দুলিরাম। আমার পুঁটলির মধ্যে সোনার চেন, নক্সা কাটা রুপোর খাড়, দুটো আংটি এসব কিচ্ছু নেই।

পণ্ডিত। হাম্ পুজোর সময় তোম্‌কো বহুত মিষ্টান্ন আউর পুলিপিঠে খাওয়ায়গা।

কেদার। দারোগাবাবু আতা হায়?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। হাত কাড়া লেকের?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। বাড়ি সারচ্ হোগা?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। সব মাটি কললে—আচ্ছা, আমি ও ব্যাটাকে একটু ফাঁকতাল্‌লায় সরিয়ে নিচ্ছি, আপনি এই সুযোগে সরে পড়ুন—আর এ মুখো হবেন না—বছর দুই বাড়ি থেকে বেরোবেন না! তোমরা পালিও না কিন্তু। (পুলিসের প্রতি) আচ্ছা চল— [প্রস্থান]

পণ্ডিত। আর থামাথামি নেই—একেবারে সেই বদ্যি পাড়ায় মামার বাড়ি গিয়ে উঠব—ওরে ঘটে, ওরে কেষ্টা, দৌড়ে আয়—ও ঘর থেকে আমার বিছানাটা আর শব্দকল্পদ্রুমখানা নিয়ে আয় ত। শিগগির বাড়ি চল। [প্রস্থান]

দুলিরাম। আর কেন দাদা? পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে সরে পড়া যাক না!

খেঁটুরাম। হ্যাঁ—পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি দাদা?

দুলিরাম। জমিদার ব্যাটার কাণ্ডটা দেখ—আমাদের কি নাস্তানাবুদটাই কললে—চাকর দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা তার উপরে পুলিস!

খেঁটুরাম। আমরা বেচারারা যে দুটি করে খাচ্ছিলাম, সে আর তার সহ্য হল না।

দুলিরাম। ছোটলোক! ছোটলোক! ওরে, গল্প আক্কেল গড়ুড়মটা উঠিয়ে নে! যথা লাভ! [প্রস্থান]

[কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ]

কেদার। দেখলি তো রামা! একেই বলে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—মানুষ চেনা চাই। ঠিক লক্ষণ দেখে ওষুধ দিতে হয়—

রামকানাই। আজ্ঞে—ঝড়ে কাগ মরে আর ফকিরের কেরামত বাড়ে—

[জুড়ির গান]

ওরে ও চণ্ডীচরণ!
তোমার কি নাইরে মরণ!
কোন সাহসে চাকর ডেকে
ভদ্রলোকের কান মলাও!

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

প্রথম দৃশ্য । রামের শিবির

রাম। কাল রাত্তিরে আমি একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছি। দেখলুম কি, রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে—পপাত চ, মমার চ!

জাম্বুবান। তবে হয়তো রাবণ ব্যাটা সত্যি সত্যিই মরেছে—রাজস্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

সকলে। হয় না, হবে না—হতে পারে না।

রাম। আমি হনুমানকে বললুম, 'যা, ব্যাটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আয়।' হনুমান এসে বললে কি, 'ফেলবারও দরকার হল না—সে এক্কেবারে মরে গেছে।'

সকলে। বাঃ বাঃ!—একদম মরে গেছে—ব্যস। আর চাই কি, খুব ফুর্তি কর!

[বাইরে গোলমাল]

ঐ দেখ্ রাবণের রথ দেখা যাচ্ছে—দেখেছিস? ঐটা রাবণ, ঐ যে লাঠি কাঁধে—

সকলে। সে কি! রাবণ ব্যাটা তবু মরেনি—ব্যাটার জান্ তো খুব কড়া!

জাম্বুবান। এই হনুমান ব্যাটাই তো মাটি কললে—তখন রাবণকে সমুদ্রে ফেলে দিলেই গোল চুকে যেত—না, ব্যাটা আবার বিদ্যে জাহির করতে গেছে—'এক্কেবারে মরে গেছে'—

বিভীষণ। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—

[দূতের প্রবেশ]

সকলে। কি হে, খবর কি?

দূত। আজ্ঞে, আমি এইমাত্র আসছি—

লক্ষ্মণ। ব্যস! মস্ত খবর দিয়েছ আর কি!

জাম্বুবান। এইমাত্র আসছ? তোপ ফেলতে হবে?

রাম। আজ কি ঘটল না ঘটল সব ভালো করে গুছিয়ে বল।

দূত। আজ্ঞে, আমি ছান টান করেই পুঁইশাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে চাট্টি ভাত খেয়েই অমনি বেরিয়েছি—অবিশ্যি আজকে পাঁজিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ লিখেছিল, কিন্তু কি হল জানেন? আমার কুমড়োটা পচে যাচ্ছিল কিনা—

সকলে। বাজে বকিসনে—কাজের কথা বল্।

দূত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—খেয়ে উঠেই ঘণ্টা দু-তিন জিরিয়ে সেখানে গিয়ে দেখি খুব ঢাক-ঢোল বাজছে—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যাঁ র‍্যা র‍্যা—ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা—ধ্যার‍্যা—

সকলে। মার—ব্যাটাকে মার—ব্যাটার কান কেটে দে!

জাম্বুবান। ব্যাটার ধ্যার‍্যার‍্যার‍্যা—চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমাল!

সুগ্রীব। ব্যাটা, তুই ভালো করে ধারাবাহিকরূপে আদ্যোপান্ত পর্যায়পরম্পরা সব বলবি কি না?

রাম। তারপরে কি হল শুনি—ততঃ কিম্?

দূত। (গান) আসিছে রাবণ বাজে ঢক্ক ঢোল,
মহা ধুমধাম মহা হট্টগোল।

সকলে। ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌?

দূত। শঙ্খ হুলাহুলি সানাই নিঃস্বন
কর্তাল ঝঙ্কার অস্ত্রের ঝনন।

সকলে। ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌?

দূত। লাখো লাখো সৈন্য চলে সাথে সাথে
উড়িছে পতাকা সমুখে পশ্চাতে!

সকলে। ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌?

দূত। বীর দর্পে সবে করে কোলাহল
মহা আস্ফালনে কাঁপে ধরাতল।

সকলে। ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌?

দূত। তাহাদের রুদ্র দাপটের চোটে
ভয়ে প্রাণ উড়ে পিলে চমকে ওঠে।

সকলে। ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌?

দূত। আজি দুর্দিনে নাহি কারো রক্ষা।
দলে বলে সবে পাবি আজি অক্কা।

জাম্বুবান। চোপরাও বেয়াদব! মুখ সামলে কথা বলিস।

রাম। তুমি রাবণকে দেখেছ, এখান থেকে কত দূরে?

দূত। আজ্ঞে, এখেন থেকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাঁচ ঘণ্টা, না পঁচিশ ঘণ্টা!

দূত। আজ্ঞে একটু দ্রুত হাঁটলে পোয়া ঘণ্টা হতে পারে।

জাম্বুবান। তুমি কি করে আসছিলে? হামাগুড়ি দিয়ে?

রাম। কোনদিকে আসছিল, বল ত?

দূত। আজ্ঞে, তা তো জিজ্ঞেস করিনি!

সকলে। ব্যাটা! তুমি আছ কোন কর্মে?

রাম। তাড়াতাড়ি আসছিল, না আস্তে আস্তে?

দূত। আজ্ঞে, তাড়াতাড়ি—আজ্ঞে, আস্তে। আজ্ঞে—সেটা ঠিক ঠাওর করে দেখিনি!

সকলে। এটা কোথাকার অপদার্থ রে? দে, ওটাকে তাড়িয়ে দে।

বিভীষণ। (জাম্বুবানের প্রতি) মন্ত্রীমশাই! একটা কথা শুনুন! কানে কানে বলব--

জাম্বুবান। উঃ—দূৎ! বনমানুষ কোথাকার! তোর দাড়িতে ভারি গন্ধ! শুনব না—

দূত। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বিভীষণ। ব্যাটা হাসছিস কেন রে বেয়াদব? [প্রহার ও অর্ধচন্দ্র]

সুগ্রীব। ওরে, কে কোথায় আছিস? আমার গদাটা নিয়ে আয় ত।

সকলে। কেন? গদা কেন?

সুগ্রীব। রাবণকে ঠ্যাঙাব!

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। রাবণ বোধহয় আসছে!

সকলে। যা--যা, ব্যাটা এতক্ষণে এক বাসি সংবাদ নিয়ে এসেছে!

সুগ্রীব। চল হে লক্ষ্মণ, আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে— [সকলের উত্থান ও প্রস্থান]

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ]

দ্বিতীয় দৃশ্য । রণস্থল

[সুগ্রীবের প্রবেশ]

সুগ্রীব। (ভয়ে ভয়ে) কেউ নেই ত? [পাদচারণা]

[বিভীষণের প্রবেশ]

বিভীষণ। দেখ, হাঁটছে দেখ—বাঁদুরে বুদ্ধি কিনা!—দূৎ! যুদ্ধ করতে এসেছিস, ওমনি করে হাঁটলে লোকে বাঙাল বলবে যে!—এমনি করে হাঁট্। [নমুনা প্রদর্শন]

সুগ্রীব। রেখে দেও তোমার ভড়ং! আমাদের দেশে ওরকম হাড়গিলের মতো করে হাঁটে না।

বিভীষণ। তোদের দেশে আবার হাঁটতে জানে নাকি? আচ্ছা মানুষ ত!

সুগ্রীব। মানুষ বললে কেন হে? খামকা গালি দিচ্ছ কেন?

[নেপথ্যে] **জাম্বুবান।** ওরে তোরা পালিয়ে আয়, রাবণ আসছে।

বিভীষণ ও সুগ্রীব। অ্যাঁ--কি?

[গান]

যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়—
তবে তুই মরে যাবি—তবে তুই ম—রে—যা—বি
ওরে, পালিয়ে যারে পালিয়ে যা
তা না হলে মরে যাবি—
লগুড়ের গুঁতো খেয়ে হঠাৎ একদিন মরে যাবি।

বিভীষণ। ওরে আমার মনে পড়েছে—একটা বড্ড জরুরী কাজ বাকি আছে—সেটা চট করে সেরে আসছি। [প্রস্থান]

সুগ্রীব। এইবার বোধহয় রাবণ আসবে—আজ একটা কিছু হয়ে যাবে—ইসপার নয় উসপার—

[রাবণের প্রবেশ]

সুগ্রীব। [গান]
তবেরে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারব ঝ্যাঁটা
তোরে এখন রাখ্‌বে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল্।
(তোর) মুখের দুপাটি দন্ত
ভাঙিয়া করিব অন্ত
তোর এখনি হবে প্রাণান্ত
আয়রে ব্যাটা যমের বাড়ি চল্॥

রাবণ। [গান]
ওরে পাষন্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব।
যত অস্থি হাড়, হবে চুরমার, এমনি আছাড় মারিব॥

ব্যাটা গুলিখোর বুদ্ধি নেই তোর নেহাত তুই চ্যাংড়া।
আয় তবে আয় যষ্ঠির ঘায় করিব তোরে ল্যাংড়া॥

সুগ্রীব। রেখে দে তোর গলাবাজি
ওরে ব্যাটা ছুঁচো পাজি
অন্তিম সময়ে আজি
ইষ্টদেবে কররে নমস্কার।
তুইরে পাষণ্ড ঘোর
পাল্লায় পড়িলি মোর
উদ্ধার না দেখি তোর
মোর হাতে না পাবি নিস্তার॥

রাবণ। ওরে বেয়াদব কহিলে যে সব
ক্ষমা যোগ্য নহে কখন
তার প্রতিশোধ পাবিরে নির্বোধ
পাঠাব শমন সদন॥ [প্রহার]

সুগ্রীব। ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বুঝি মাথা ফাটি
নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে!
কাজ নেইরে খুঁচা খুঁচি
ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রাণটি হারাব কি শেষে? [সুগ্রীবের পলায়ন]

রাবণ। ছি, ছি, ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্! শেম্!!

[লক্ষ্মণের প্রবেশ]

রাবণ। [গান] আমার সহিত লড়াই করিতে
আগ্রহ দেখি যে নিতান্ত
বুঝেছি এবার ওরে দুরাচার
ডেকেছে তোরে কৃতান্ত
আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান
তুই ব্যাটা তার জানিস কি?
কোথায় লাগে বা কুরো পাট্‌কিন্
কোথায় রোজেদ্ ভেনিস্কি?
এই যে অস্ত্র দেখিছ পষ্ট
শোভিছে আমার হস্তে
ইহারই প্রভাবে যমালয়ে যাবে
বানর কুল সমস্তে।
অযোধ্যার লোকে যোদ্ধা হয়েছে
শুনে মরি আমি হাসিয়া
(আজি) দেখাব শক্তি রাখিব কীর্তি
দলে বলে সবে নাশিয়া॥

লক্ষ্মণ। [লাঠি চালাইয়া] হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—হর্ হর্ হর্ হর্—মার্, মার্, মার্, মার্, মার্—কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ কাট্— [শক্তিশেলাহত]

লক্ষ্মণ। হা হতোস্মি! [পতন ও মূর্ছা। রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের পকেট লুণ্ঠন]

[হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। অ্যাঁ! কি হচ্ছে—দেখে ফেলেছি!

[রাবণের পলায়ন। অন্যান্য বানরগণের আগমন]

বানরগণ। [গান] অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো—
যষ্ঠির বাড়ি সুগ্রীবে মারি
কল্লে যে তার মাথা গুঁড়ো,
অবাক করলে রাবণ বুড়ো॥
(আহা) অতি মহাতেজা সুগ্রীব রাজা
অঙ্গদেরি চাচা খুড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥
(আরে) গদা ঘুরাইয়া দিল উড়াইয়া
লক্ষ্মণেরি ধড়া চুড়ো—
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥
(ওরে) লক্ষ্মণে মেরে বানর দলেরে
কল্লে ব্যাটা তাড়াহুড়ো
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥
(ব্যাটা) বুদ্ধি বিপুল যুদ্ধে নিপুণ
কিন্তু ব্যাটা বেজায় ভুঁড়ো.
অবাক কল্লে রাবণ বুড়ো॥

[লক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান]

[সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য দ্বিতীয়ো সর্গঃ]

তৃতীয় দৃশ্য । রামচন্দ্রের শিবির

রাম। কিছু আগে একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল—বোধহয় কোথাও যুদ্ধ বেধে থাকবে।

বিভীষণ। তা হবে!

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ব্যান্ডেজ বন্ধ সুগ্রীবের সকাতর প্রবেশ]

বিভীষণ। আরে ও পালওয়ানজি, একি হল—ষাট্ ষাট্ ষাট্। [সকলের উচ্চহাস্য]

রাম। কি হে সুগ্রীব, তোমার যে দেখছি বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া হল।

বিভীষণ। আজ্ঞে, বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো—

রাম। যত তেজ বুঝি তোমার মুখেই।

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ, মুখেন মারিতং জগৎ।

রাম। আমি বলি কি তুমি মস্ত যোদ্ধা।

জাম্বুবান। যোদ্ধা ব'লে যোদ্ধা—ঢাল নেই তলোয়ার নেই খামচা মারেঙ্গা।

বিভীষণ। আমি বরাবরই বলে আসছি—

সুগ্রীব। দ্যাখ! তোর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আমার ভালো লাগে না—

রাম। রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি?—
পিঁপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নিপানে রুষি
সম্বরে খদ্যোত লীলা—

জাম্বুবান। আজ্ঞে ঠিক কথা
রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে—তখনি তো মাথা তুলি
চ্যাং, পুঁটি যত করে মহা আস্ফালন।

[বাইরে গোলমাল]

রাম। এত গোলমাল কিসের হে?

সুগ্রীব। রাবণ ইদিকে আসছে না ত?

জাম্বুবান ও বিভীষণ। অ্যাঁ—রাবণ আসছে—অ্যাঁ?

বিভীষণ। আমার ছাতাটা কোথায় গেল? ব্যাগটা?

জাম্বুবান। হ্যাঁরে তোর গায়ে জোর আছে? আমায় কাঁধে নিতে পারবি?

[জাম্বুবানের বিভীষণের কাঁধে চাপিবার চেষ্টা ও দূতের প্রবেশ]

দূত। শ্রীমান লক্ষ্মণ আসছেন।

[সকলে আশ্বস্ত]

রাম। অত হল্লা করে আসছে কেন? চেঁচাতে বারণ কর।

দূত। আজ্ঞে, তিনি আসছেন ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ, এক রকম আসছেনই বটে—মানে, তাঁকে নিয়ে আসছে।

জাম্বুবান। লোকটার কান মলে তাড়িয়ে দাও ত—ব্যাটা হেঁয়ালি পাকাবার আর জায়গা পায়নি!

[লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ ও গান]

বললেন যাহা জাম্বুবান (সাবাস গণৎকার হে)
আনুপূর্বিক ঘটল তাহা শুনতে চমৎকার হে।
পড়লেন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে (যেন) ঝড়ে কলাগাছ রে—
খাবি খেতে লাগলেন যেন ডাঙায় বোয়াল মাছ রে!
অনেক কষ্টে রৈল বেঁচে—(আহা) কপাল জোরে মৈল না—
(ওরে) স্বর্গ হৈতে কিছু তবু পুষ্পবৃষ্টি হৈল না!
ভাগ্যে মোরা সবাই সেথা ছিলাম উপস্থিত গো—
তা নৈলে ত ঘটত আজি হিতে বিপরীত গো!

রাম। হায়, হায়, হায়, হায়—হায় কি হল, হায় কি হল, হায় কি হল, হায় হায় হায়—
[মূর্ছা]

[বানরগণের মাঝে-মাঝে কলা ভক্ষণ]

বানরগণ। হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায়-হায়-হায়-হায়-হায়-হায়, হায় কি হল-হল-হল-হল, হায় কি হল-হল-হল-হল-হল (ইত্যাদি)।

জাম্বুবান। এতগুলো লোক কি সেখানে ঘোড়ার ঘাস কাটছিল নাকি?

সুগ্রীব। হনুমান ব্যাটা কি কচ্ছিল?

হনুমান। আমি বাতাস খাচ্ছিলুম।

সুগ্রীব। ব্যাটা, তুমি বাতাসা খাওয়ার আর সময় পাও নি?

[গান]
শোনরে ওরে হনুমান হওরে ব্যাটা সাবধান
আগে হতে পষ্ট ব'লে রাখি।
তুই ব্যাটা জানোয়ার নিষ্কর্মার অবতার
কাজে কর্মে দিস বড় ফাঁকি॥
কাজ কর্ম ছেড়ে ছুড়ে ঘুমোস খালি প'ড়ে প'ড়ে
অকাতরে নাকে দিয়ে তৈল—
শোন্‌রে আদেশ মোর এই দণ্ডে আজি তোর
অষ্ট আনা জরিমানা হৈল।

হনুমান। (জনান্তিকে) মোটে আট আনা?

বিভীষণ। তারপর, তোমাদের মৎলব কি স্থির হল?

সুগ্রীব। এইবার সবাই মিলে রাবণ ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে।

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিক কথা! ঠিক কথা!

[জাম্বুবানের নিদ্রা। সকলের গান]

রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো
(তার) মাথায় ঢেলে ঘোল (তারে) উল্টো গাধায় তোল
(তার) কানের কাছে পিটতে থাকো চৌদ্দ হাজার ঢোল॥
কাজ কি ব্যাটার বেঁচে (তার) চুল দাড়ি গোঁফ চেঁচে
নস্যি ঢোকাও নাকে, ব্যাটা মরুক হেঁচে হেঁচে।
(তার) গালে দাও চুন কালি (তারে) চিমটি কাটো খালি

(তার) চৌদ্দপুরুষ উড়িয়ে দাও পেড়ে গালাগালি।
(তারে) নাকাল কর আরো যে যেরকম পারো
রাবণ ব্যাটায় মারো, সবাই রাবণ ব্যাটায় মারো॥

[রামচন্দ্রের মূর্ছাভঙ্গ ও গাত্রোত্থান]

বিভীষণ। এই যে, শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোৎপাটন করেছেন!

রাম। তারপরে—ওষুধপত্রের কি ব্যবস্থা কললে?

সকলে। ঐ যা! ওষুধপত্রের ত কিছু ব্যবস্থা হল না?

রাম। মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা?

বিভীষণ। মন্ত্রীমশাই—একটু ঘুমোচ্ছেন।

সুগ্রীব। ব্যস! তবেই কেল্লা ফতে করেছেন আর কি!

সকলে। মন্ত্রীমশাই! আরে ও মন্ত্রীমশাই, আহা একবার উঠুন না!

[ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি]

বিভীষণ। বাবা! এ যে কুম্ভকর্ণের এক কাঠি বাড়া!

জাম্বুবান। (সহসা জাগিয়া) হ্যাঁরে, আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলি, ব্যাটা বেল্লিক, বেরসিক, বেআক্কেল, বেয়াদব—হাঁড়িমুখো ভূত!

সকলে। রাগ করবেন না—আহা রাগ করবেন না! কথাটা শুনুন।

[গান] আজকে মন্ত্রী জাম্বুবানের বুদ্ধি কেন খুলছে না?
সংকটকালে চটপট কেন যুক্তির কথা বলছে না?
সর্বকর্মে অষ্টরম্ভা হর্দম পড়ে নাক ডাকছে—
উল্টে কিছু বলতে গেলে বিট্‌কেল বিট্‌কেল গাল পাড়ছে।
মরছে লক্ষ্মণ জানছে তবু দেখছে চেয়ে নিশ্চিন্তে
এম্নি স্বভাব ছিল না তার থাকতাম যখন কিষ্কিন্ধে।
হ্যাংগাম দেখে হট্‌লে পরে নিন্দুক লোকে বলবে কি?
ভেবেই দেখ এম্নি করলে রাজ্যের কার্য চলবে কি?
মুখ্যু মোরা আক্কেল শূন্য একেবারেই বুদ্ধি নেই—
সূক্ষ্মযুক্তি বলতে কারো ঠাকুন্দাদার সাধ্যি নেই।
বলছি মোরা কিচ্ছু নেইকো চট্‌বার কথা এর মধ্যে
উঠে একবার ব্যবস্থা দেও প্রণাম করি ঠ্যাং পদ্মে॥

হনুমান। (জনান্তিকে) হ্যাঁরে, আমার লেজে পাড়িয়ে দিলি?

রাম। বুঝলে হে জাম্বুবান, তুমি কিনা হচ্ছ প্রবীণ লোক—এ-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার খুব অভিজ্ঞতা আছে—

জাম্বুবান। আজ্ঞে হ্যাঁ—সে কথা আগে বললেই হত—তা না ব্যাটারা খালি ধাক্কাই মারছে—'মন্ত্রীমশাই, আরে ও মন্ত্রীমশাই'—আমি বলি বুঝি ডাকাত পড়ল নাকি?

রাম। হ্যাঁ, এইবার একটা কিছু ব্যবস্থা দিয়ে ফেল।

জাম্বুবান। (হনুমানের প্রতি) এই কাগজে প্রেসক্রিপশান লিখে দিচ্ছি, এই ওষুধগুলো চট করে নিয়ে আসতে হবে।

হনুমান। আচ্ছা; কাল ভোর না হতে উঠে নিয়ে আসব।

জাম্বুবান। না, না, এত দেরি করতে হবে না—এখুনি যা।

হনুমান। আবার এত রাত্তিরে কোথায় যাব? সাপে কাটবে না বাঘে ধরবে।

সুগ্রীব। ব্যাটা, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

জাম্বুবান। না, ওষুধগুলো এখনই দরকার।

হনুমান। আঃ। হোমিওপ্যাথি লাগাও না।

জাম্বুবান। যা বলছি শোন্। এই যা গাছের কথা লিখলাম—বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী—এই সব গাছের শেকড় আনতে হবে।

হনুমান। আমি ডাক্তারখানা চিনিনে।

জাম্বুবান। আ মরণ আর কি! একি কলকাতার শহর পেয়েছিস নাকি যে, বাথগেট কোম্পানি তোর জন্যে দোকান খুলে বসবে? কৈলাস পাহাড়ের কাছে গন্ধমাদন পাহাড় আছে জানিস ত?

হনুমান। কৈলেস ডাক্তার আবার কে?

জাম্বুবান। বাস! কানের পটহটা দেখি ভারি সরেস—ব্যাটা, কৈলেস পাহাড় জানিসনে?

হনুমান। ও বাবা! সেই কৈলেস পাহাড়! এত রাত্তিরে আমি অত দূর যেতে পারব না।

জাম্বুবান। যাবিনে কি রে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল করে দেব। এখুনি যা—দেখিস পথে মেলা দেরি করিসনে।

হনুমান। আমার কান কটকট কচ্ছে—

রাম। আহা, যারে যা, আর গোল করিসনে—নে বকশিশ নে। [কলা প্রদান]

হনুমান। যো হুকুম। [কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান]

জাম্বুবান। তারপর রাত্তিরের জন্য সেনাপতি নির্বাচন কর।

রাম। কেন? রাত্তিরে যুদ্ধ করবে নাকি?

জাম্বুবান। তা কেন? একজনকে একটু খবরদারি করতে হবে ত! তা ছাড়া, হয়ত লক্ষ্মণকে নিয়ে যমদূতগুলোর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে।

সকলে। তা ত বটেই! মন্ত্রীমশাই না হলে এমন বুদ্ধি কার হয়?

সুগ্রীব। (স্বগত) হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার ভায়া বিভীষণকে কিঞ্চিৎ ফাঁপরে ফেলতে হচ্ছে—

[গান] আমার বচন শুন বিভীষণ করহ গ্রহণ সেনাপতি পদ
(আহা) সাজ সজ্জা কর, দিব্য অস্ত্র ধর সমরে সম্বর এ মহা বিপদ
(তুমি) বিপদে নির্ভীক বীর্যে অলৌকিক তোমার অধিক কেবা আছে আর
(আহা) জলেতে পাষাণ যায় গো ভাসান মুশকিলে আসান প্রসাদে তোমার—

সকলে। ঠিক কথা—উত্তম কথা।

বিভীষণ। তাই ত! মুশকিলে ফেললে দেখছি।

সুগ্রীব। শুন সর্বজনে আজিকে এক্ষণে বীর বিভীষণে কর সেনাপতি
(আহা) শ্রীরামের তরে সম্মুখ সমরে যদি যায় মরে কিবা তাহে ক্ষতি?

সকলে। তা ত বটেই—কিচ্ছু ক্ষতি নেই।

জাম্বুবান। বেশ ত! তাহলে তাই ঠিক হল—খবরদার। দেখ, ভালো করে পাহারা দিও। কোনো ব্যাটাকে পথ ছাড়বে না—স্বয়ং যম এলেও নয়।—আর দেখ যেন ঘুমিও না। [বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

বিভীষণ। ইকী গেরো! ভালো, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি!

[গান] বিধি মোর ভালে হায় কি লিখিল
আজ রাত্রে একি বিপদ ঘটিল।
দুর্মতি সুগ্রীব চির শত্রু মোর
ফেলিল আমারে সংকটেতে ঘোর।

জাম্বুবান ব্যাটা কুবুদ্ধির ঢেঁকি
তার চক্রে পড়ি নিস্তার না দেখি।
আসে যদি কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে—
ঠেকাব কেমনে একাকী তাহারে?
স্বর্গ হতে কহ দেবগণ সবে
আজি এ সংকটে কি উপায় হবে?
যম হস্তে আজি না দেখি নিস্তার
সুযুক্তি তাহার কহ সবিস্তার
শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর—
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন সর্বজনে মোর মৃত্যু হলে
শোকসভা ক'রো তোমরা সকলে।

[সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণেব শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য তৃতীয়ো সর্গঃ]

চতুর্থ দৃশ্য । শিবির প্রাঙ্গণ

[বিভীষণের পাহারাদারি—মধ্যে মধ্যে আয়নায় মুখাবলোকন ইত্যাদি]

বিভীষণ। জাম্বুবান বলছিলেন, ‘দেখো যেন ঘুমিও না’—বাপু, এমন অবস্থায় পড়ে যিনি ঘুম দিতে পারেন, তাঁকে আমি পাঁচশো টাকা বকশিশ দিতে পারি!

[পদচারণা ও উঁকি-ঝুঁকি]

তবে এ-পর্যন্ত যখন কোনো দুর্ঘটনা হয়নি—তাতে আমার কিছু কিছু ভরসা হচ্ছে—চাই কি, হয়ত বিনা গোলযোগে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে।...যাক! একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক—যমের ত ইদিকে আসবার কোনোই গতিক দেখছি না—আর, আসলেই বা কি? তাকে বাধা দেওয়াটা ত আর বুদ্ধিমানের কার্য হবে না!

[উপবেশন ও অচিরাৎ নিদ্রা। জাম্বুবানের প্রবেশ]

জাম্বুবান। দেখেছ, আধ ঘণ্টা না যেতেই ঘ্যাঁৎ ঘ্যাঁৎ করে নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে—ওরে বিভীষণ (খোঁচা দিয়া) ওঠ্!

বিভীষণ। (লাফাইয়া উঠিয়া) কেরে! ও—জাম্বুবান যে—তুই বুঝি মনে করিছিলি আমি ঘুমিয়ে পড়েছি? আমি কিন্তু সত্যি করে ঘুমোইনি।

জাম্বুবান। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমায় আর সমঝাতে হবে না। দিব্যি পড়ে নাক ডাকছে—আবার বলে, ‘সত্যি করে ঘুমোইনি।’

বিভীষণ। তুই টের পাসনি?—আমি মিট্‌মিট্ করে চেয়ে দেখছিলাম।

জাম্বুবান। না না—মিট্‌মিট্ করে দেখলে চলবে না—ভালো করে পাহারা দিতে হবে।

[প্রস্থান]

বিভীষণ। ব্যাটা ত ভারি জোচ্চোর! আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে।

[পুনরুপবেশন ও পুনর্নিদ্রা]

[যমদূতদ্বয়ের প্রবেশ]

প্রথম দূত। হ্যাঁরে, বাড়িটা ঠিক চিনে এসেছিস তো?

দ্বিতীয় দূত। আরে, হ্যাঁরে, হাঁ, এতদিন কাজ করেছি; একটা বাড়ি চিনতে পারব না?

প্রথম দূত। তোকে কি বাৎলিয়ে দিয়েছিল বল্ ত?

দ্বিতীয় দূত। আমাকে বলে দিয়েছে, যে, “সেই ডানদিকের উঠোনওয়ালা বাড়িটায় যাবি।”

প্রথম দূত। ডানদিক ত এই—আর উঠোনকে উঠোন মিলে গেছে, তবে ত ঠিকই এসেছি—

দ্বিতীয় দূত। হ্যাঁ, চল—মড়াটা খুঁজে দেখি! [অন্বেষণ করিতে করিতে বিভীষণোপরি পতন]

বিভীষণ। কেরে! কেরে!

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। [লাফাইয়া তিন হাত দূরে গিয়া] এটা কি আছে রে! এটা কি আছে রে!

দ্বিতীয় দূত। ও বাপ্পো—এ মানুষ্ আছে নাকি?

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ও বাপ্পো—মানুষ্? জীয়ন্ত মানুষ্? [ভয়ে কম্পিত]

দ্বিতীয় দূত। কৈ রে কিচ্ছু ত বলছে না!

প্রথম দূত। তাহলে বোধহয় কিচ্ছু বলবে না।

দ্বিতীয় দূত। হ্যাঁ, বেশ অমায়িক চেহারা! ওকে জিজ্ঞেস কর ত?

প্রথম দূত। তুই জিজ্ঞেস কর!

দ্বিতীয় দূত। তুই জিজ্ঞেস কর না! আমি তোকে ধরে থাকব—

প্রথম দূত। মশাই গো—মশাই—শুনুন মশাই—একটু পথ ছেড়ে দেবেন মশাই?

দ্বিতীয় দূত। আমরা মশাই—গরীব বেচারা মশাই—

বিভীষণ। (স্বগত) এ ত মজা মন্দ নয়! এরা দেখছি আমার ভয়ে থরহরি কম্পমান।

প্রথম দূত। চল একটু পাশ কাটিয়ে চলে যাই! [পাশ কাটিয়া যাইবার উদ্যোগ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ওরে নারে, চোখ রাঙাচ্ছে—

[গান]

দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো
তোমার প্রাণে একটুও কি দয়ামায়া নাই গো।
তোমার তুল্য খাঁটি বন্ধু আর কাহারে পাই গো?
তুমি ভরসা নাহি দিলে অন্য কোথা যাই গো!
এ সময়ে তোমা ভিন্ন কে আছে সহায় গো—
কার্যোদ্ধার না হলে ত না দেখি উপায় গো।
পথ ছেড়ে দাও মুক্ত কণ্ঠে তোমার গুণ গাই গো
দয়াবান গুণবান ভাগ্যবান মশাই গো॥

বিভীষণ। ভাগ্ ব্যাটারা, নইলে একেবারে প্রহারেন ধনঞ্জয় করে দেব।

[উভয় দূতের পলায়ন ও পুনঃপ্রবেশ]

প্রথম দূত। হ্যাঁরে, পালাচ্ছিস কোথা? খালি হাতে গেলে যমরাজা কাউকে আস্ত রাখবেন না।

দ্বিতীয় দূত। তাই ত! তাই ত! এ ত ভারি মুশকিল হল—কি করা যায় বল্ দেখি?

প্রথম দূত। আয় না, আমরাও ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করি গিয়ে।

দ্বিতীয় দূত। [গান] যখন পরাজয় খলু অনিবার্য
তখন যুদ্ধ কি বুদ্ধির কার্য?

প্রথম দূত। তবে তো মুশকিল উপায় কি হবে?
সাধ করে কেবল প্রাণটা হারাবে?

দ্বিতীয় দূত। আমিও তাই বলি লড়ায়ে কাজ নাই—
কাজেতে ইস্তফা এখনি দাও ভাই!

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। হায় কি ঘটিল হায় কি ঘটিল
এমন সাধের চাকুরি ঘুচিল!

বিভীষণ। ব্যাটারা রাত দুপুরে গান জুড়েছিস—চাব্‌কিয়ে রোগা করে দেব।

[দূতদ্বয় প্রস্থানোদ্যত ও দ্বারদেশে যমসহ সাক্ষাৎ]

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। দোহাই মহারাজ, দোহাই যমরাজা, আমাদের কিছু দোষ নেই—ওই এক ব্যাটা আমাদের পথ ছাড়ছে না।

[যমের প্রবেশ]

বিভীষণ। এই মাটি করেছে—এখন উপায়? আটকাতে গেলে যম মারবে, না আটকালে রাম মারবে। উভয় সংকট! যা থাকে কপালে, ব্যাটাকে পথ ছাড়ব না। (সদর্পে) তবে রে ব্যাটা—আমায় চিনিসনে? আমি থাকতে তুই ঢুকবি?

[যমের অগ্রসর হওয়া]

দ্বিতীয় দূত। ওরে এবার লড়াই বাধবে—

প্রথম দূত। হ্যাঁরে ভারি মজা দেখা যাবে—

দ্বিতীয় দূত। (বিভীষণের) পালা, পালা—এই বেলা পালা—

প্রথম দূত। হ্যাঁ, ঐ যে অস্তর দেখছ ওর একটি ঘা খেলেই সদ্য কেষ্ট প্রাপ্তি হবে।

বিভীষণ। তুই কে রে ব্যাটা মরতে এসেছিস?

যম।
কালরূপী মৃত্যু আমি যম নাম ধরি—
সর্বগ্রাসী সর্বভুক সকল সংহারি॥
সর্বকালে সমভাব সকলের প্রতি,
ত্রিভুবনে সর্বস্থানে অব্যাহত গতি॥
অন্তিমেতে দেখা দেই কৃতান্তের বেশে—
মোর সাথে পরিচয় জীবনের শেষে॥
সংসারের মহাযাত্রা ফুরায় যেমন—
শ্রান্তজনে শান্তি দেই আমিই শমন॥

[পাহাড় লইয়া হনুমানের প্রবেশ]

হনুমান। জয় রামের জয়! [যমের মাথায় পাহাড় স্থাপন। যমের পতন]

প্রথম দূত। ও কিরে!

দ্বিতীয় দূত। ঐ যা! চাপা পড়ে গেল!

প্রথম দূত। তাই ত রে, চাপা পড়ল যে!

দ্বিতীয় দূত। (সকাতরে) হ্যাঁরে আমার মাইনে কে দেবে?

প্রথম দূত। তাই ত! আমারও যে পাওনা আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দূত। ওগো, আমাদের কি হল গো—ওগো, আমরা যে ধনেপ্রাণে মলুম গো—(হনুমানের প্রতি) পালোয়ান মশাই গো—সর্বনাশ কললেন গো—হায়, আমাদের কি হল গো—

প্রথম দূত। ওরে যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি
দ্বিতীয় দূত। মোদের তেরো আনা মাইনে বাকি
প্রথম দূত। আহা দেখ্ না ব্যাটা হল নাকি?
দ্বিতীয় দূত। ওর চুলে ধরে দে না ঝাঁকি।
প্রথম দূত। এই বিপদকালে কারে ডাকি
হায় হায় যম ব্যাটা যে দিল ফাঁকি।—অ্যাঁক্

[হনুমান কর্তৃক দূতদ্বয়ের গলা পাকড়ানো]

হনুমান। ভাগ! ভাগ!—ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেধেছে।

[দূতদ্বয়ের প্রস্থান]

বিভীষণ। এবার সকলকে ডেকে নিয়ে আয়—

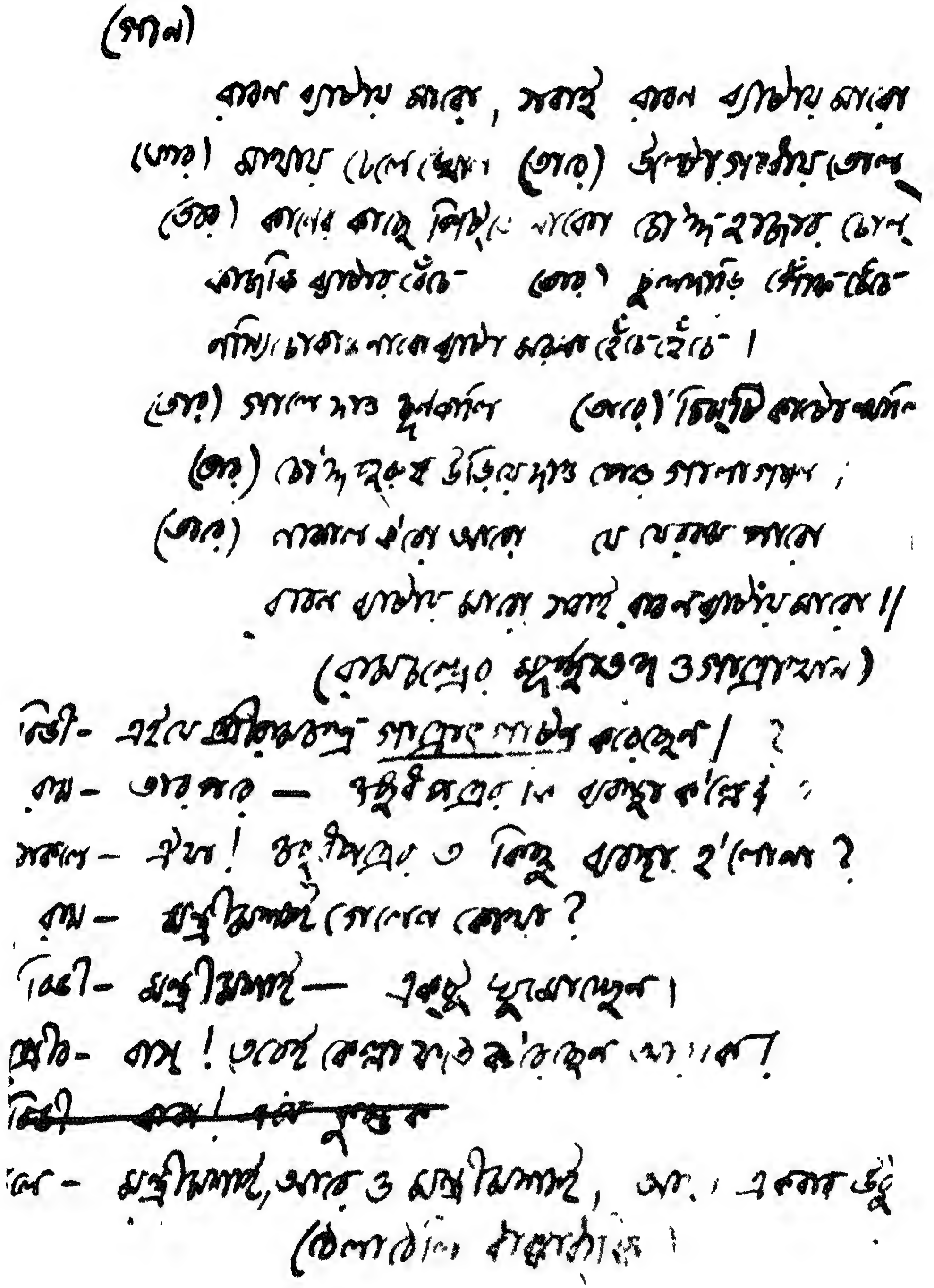

(গান)

কেমন ব্যাটায় মারে, সবাই কেমন ব্যাটায় মারে
(তোর) মাথায় ঢেলে ঝোলা (তোর) উৎপাত গুষ্টায় তোলা
(তোর) কানের কাছে পিটিয়ে বাজো চোখে হরতাল ঢেলে
আহাকি ব্যাটার তেরে (তোর) চুলগাছি টেনে-টেনে
নাসিকা টেপে নাকে ব্যাটা মলম ঘেঁষে ঘেঁষে।
(তোর) গালে দাও চুনকালি (তোর) টিমুটি মোচড় খালি
(তোর) চোখ্ দুটোয় উড়িয়ে দাও সেও গোলাগালাস ;
(তোর) নাকাল ক'রে মারে যে যেমন পারে
কেমন ব্যাটায় মারে সবাই কেমন ব্যাটায় মারে ॥

(রামচন্দ্রের মূর্চ্ছাভঙ্গ ও গাত্রোত্থান)

বিভী- এইযে শ্রীরামচন্দ্র গাত্রোত্থান করেছেন। ?
রাম- তারপর — বৃদ্ধমন্ত্রের কি খবর ??
সকলে — ওমা! বৃদ্ধমন্ত্রের ত কিছু খবর হ'লোনা ?
রাম — মন্ত্রীমশাই গেলেন কোথা ?
বিভী- মন্ত্রীমশাই — একটু ঘুমোচ্ছেন।
সুগ্রী- বাঃ! তবেই কেল্লা ফতে ক'রেছেন আপনারা!
~~বিভী — [illegible]! [illegible] কুম্ভক~~
সকলে — মন্ত্রীমশাই, ওগো ও মন্ত্রীমশাই, আঃ! একবার উঠে
তোলাতোলি লাগাও।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের পাণ্ডুলিপি

[হনুমানের প্রস্থান। লক্ষ্মণকে ধরাধরি করিয়া সকলের প্রবেশ]

সকলে। ওটা কিরে? ওটা কিরে?

হনুমান। আজ্ঞে, উপরেরটা গন্ধমাদন পাহাড়।

জাম্বুবান। ব্যাটা গোমুখ্যু কোথাকার, পাহাড়সুদ্ধু নিয়ে এসেছিস?

হনুমান। আজ্ঞে, গাছ চিনিনে।—আর ঐ নিচেরটা যমরাজা।

সকলে। আরে, আরে করেছিস কিরে ব্যাটা? করেছিস কি?

জাম্বুবান। থাক, ওমনি থাক। আগে লক্ষ্মণের একটা কিছু গতিক করে নি, তারপর দেখা যাবে—

[ঔষধান্বেষণ—ঔষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণের চেতনা লাভ]

সকলে। বা, বা! কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! কি সাফাই ওষুধ রে!

হনুমান। হাজার হোক—স্বদেশী ওষুধ ত!

সকলে। তাই বল! স্বদেশী না হলে কি এমন হয়?

জাম্বুবান। হ্যাঁ, এইবার যমকে ছেড়ে দাও।

[পাহাড় সরাইয়া যমকে মুক্তিদান]

যম। (চোখ রগ্‌ড়াইয়া লক্ষ্মণের প্রতি) সেকি! আপনি তবে বেঁচে আছেন?

লক্ষ্মণ। তা না ত কি? তুমি জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার আরম্ভ করলে কবে থেকে?

যম। আজ্ঞে, চিত্রগুপ্ত ব্যাটা আমায় ভুল বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমি এখনি গিয়ে ব্যাটার চাকরি ঘুচোচ্ছি— [প্রস্থান]

লক্ষ্মণ। হনুমান ব্যাটা বুঝি ওকে চাপা দিয়েছিল—ব্যাটার বুদ্ধি দেখ।

হনুমান। তা বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক—ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি ত।

বিভীষণ। আমি পাহারা না দিলে ওষুধ কি হত রে—ওষুধ আনতে আনতে যমের বাড়ি পর্যন্ত পেঁৗছে যেত। আমারই ত বাহাদুরি।

সুগ্রীব। অর্থাৎ কিনা আমার বাহাদুরি—আমি বললুম তবে ত বিভীষণ পাহারা দিল—আর বিভীষণ পাহারা দিল বলেই ত যমদূতগুলো আট্‌কা পড়ল।

জাম্বুবান। আরে ব্যাটা ওষুধের ব্যবস্থা কলল কে? তোদের বুদ্ধি সে সময় উড়ে গেছিল কোথায়?

রাম। হ্যাঁ, সেটা ঠিক—কিন্তু আমি যুক্তির কথা না জিজ্ঞেস করলে তুমি হয়ত এখনো পড়ে নাক ডাকাতে!

লক্ষ্মণ। আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম ত এত সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না—আর তোমরাও বিদ্যে জাহির করতে পারতে না।

জাম্বুবান। যাক, এখন মেলা রাত হয়ে গেছে, তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নিদ্রার চেষ্টা দেখ; তোমাদের মাথা ঠাণ্ডা হবে আর আমিও একটু ঘুমিয়ে বাঁচব।

হনুমান। আমায় কিছু বকশিশ দেবে না?

বিভীষণ। হ্যাঁ, ওকে চারটি বাতাসা দিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে দাও।

প্রথম। আমার কথাটি ফুরোলো

দ্বিতীয়। নটে গাছটি মুড়োলো।

তৃতীয়। ক্যান্‌রে নটে মুড়োলি

চতুর্থ। বেশ করেছি—তোর তাতে কিরে ব্যাটা।

সকলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

[ইতি সমাপ্তোয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য চতুর্থ সর্গঃ]

অবাক জলপান

[ছাতা মাথায় এক পথিকের প্রবেশ, পিঠে লাঠির আগায় লোটা-বাঁধা পুঁটলি, উস্কোখুস্কো চুল, শ্রান্ত চেহারা]

পথিক। নাঃ—একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘণ্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজের ঘিলু শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? গেরস্তের বাড়ি দুপুর রোদে দরজা এঁটে সব ঘুম দিচ্ছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। বেশি চেঁচাতে গেলে হয়তো লোকজন নিয়ে তেড়ে আসবে। পথেও ত লোকজন দেখছিনে।—ঐ একজন আসছে! ওকেই জিজ্ঞেস করা যাক।

[ঝুড়ি মাথায় এক ব্যক্তির প্রবেশ]

পথিক। মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

ঝুড়িওয়ালা। জলপাই? জলপাই এখন কোথায় পাবেন? এ ত জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান দিতে পারি—

পথিক। না না, আমি তা বলিনি—

ঝুড়িওয়ালা। না, কাঁচা আম আপনি বলেননি, কিন্তু জলপাই চাচ্ছিলেন কিনা, তা ত আর এখন পাওয়া যাবে না, তাই বলছিলুম—

পথিক। না হে, আমি জলপাই চাচ্ছিনে—

ঝুড়িওয়ালা। চাচ্ছেন না তো, 'কোথায় পাব' 'কোথায় পাব' কচ্ছেন কেন? খামকা এরকম করবার মানে কি?

পথিক। আপনি ভুল বুঝেছেন—আমি জল চাচ্ছিলাম—

ঝুড়িওয়ালা। জল চাচ্ছেন তো 'জল' বললেই হয়—'জলপাই' বলবার দরকার কি? জল আর জলপাই কি এক হল? আলু আর আলুবোখরা কি সমান? মাছও যা আর মাছরাঙাও তাই? বরকে কি আপনি বরকন্দাজ বলেন? চাল কিনতে গেলে কি চালতার খোঁজ করেন?

পথিক। ঘাট হয়েছে মশাই।। আপনার সঙ্গে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।

ঝুড়িওয়ালা। অন্যায় তো হয়েছেই। দেখছেন ঝুড়ি নিয়ে যাচ্ছি—তবে জলই বা চাচ্ছেন কেন? ঝুড়িতে করে কি জল নেয়? লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলে একটু বিবেচনা করে বলতে হয়। [প্রস্থান]

পথিক। দেখলে! কি কথায় কি বানিয়ে ফেললে! যাক, ঐ বুড়ো আসছে, ওকে একবার বলে দেখি।

[লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে এক বৃদ্ধের প্রবেশ]

বৃদ্ধ। কে ও? গোপ্‌লা নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না, আমি পুবগাঁয়ের লোক—একটু জলের খোঁজ কচ্ছিলুম—

বৃদ্ধ। বল কিহে? পুবগাঁও ছেড়ে এখেনে এয়েছ জলের খোঁজ করতে?—হাঃ, হাঃ, হাঃ। তা, যাই বল বাপু, অমন জল কিন্তু কোথাও পাবে না। খাসা জল, তোফা জল, চমৎকা-া-র জল।

পথিক। আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে।

বৃদ্ধ। তা ত পাবেই। ভালো জল যদি হয়, তা দেখলে তেষ্টা পায়, নাম করলে তেষ্টা পায়, ভাবতে গেলে তেষ্টা পায়। তেমন তেমন জল ত খাওনি কখনো! —বলি ঘুম্‌ড়ির জল খেয়েছ কোনোদিন?

পথিক। আজ্ঞে না, তা খাইনি—

বৃদ্ধ। খাওনি? অ্যাঃ! ঘুম্‌ড়ি হচ্ছে আমার মামাবাড়ি—আদত জলের জায়গা। সেখানকার যে জল, সে কি বলব তোমায়? কত জল খেলাম—কলের জল, নদীর জল, ঝরনার জল, পুকুরের জল—কিন্তু মামাবাড়ির কুয়োর যে জল, অমনটি আর কোথায় খেলাম না। ঠিক যেন চিনির পানা, ঠিক যেন ক্যাওড়া-দেওয়া সরবৎ!

পথিক। তা মশাই আপনার জল আপনি মাথায় করে রাখুন—আপাতত এখন এই তেষ্টার সময়, যা হয় একটু জল আমার গলায় পড়লেই চলবে—

বৃদ্ধ। তাহলে বাপু তোমার গাঁয়ে বসে জল খেলেই ত পারতে? পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে জল খেতে আসবার দরকার কি ছিল? 'যা হয় একটা হলেই হল' ও আবার কি রকম কথা? আর অমন তাচ্ছিল্য করে বলবারই বা দরকার কি? আমাদের জল পছন্দ না হয়, খেও না—বাস্‌। গায়ে পড়ে নিন্দে করবার দরকার কি? আমি ওরকম ভালোবাসিনে। হ্যাঃ— [রাগে গজগজ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রস্থান]

[পাশের এক বাড়ির জানলা খুলিয়া আর এক বৃদ্ধের হাসিমুখ বাহির করণ]

বৃদ্ধ। কি হে? এত তর্কাতর্কি কিসের?

পথিক। আজ্ঞে না, তর্ক নয়। আমি জল চাইছিলুম, তা উনি সে কথা কানেই নেন না—কেবলই সাত পাঁচ গপ্‌প করতে লেগেছেন। তাই বলতে গেলুম ত রেগে মেগে অস্থির!

বৃদ্ধ। আরে দুর দুর! তুমিও যেমন! জিজ্ঞেস করবার আর লোক পাওনি? ও হতভাগা জানেই বা কি, আর বলবেই বা কি? ওর যে দাদা আছে, খালিপুরে চাকরি করে, সেটা ত একটা আস্ত গাধা। ও মুখ্যুটা কি বললে তোমায়?

পথিক। কি জানি মশাই—জলের কথা বলতেই কুয়োর জল, নদীর জল, পুকুরের জল, কলের জল, মামাবাড়ির জল, ব'লে পাঁচ রকম ফর্দ শুনিয়ে দিলে—

বৃদ্ধ। হুঃ—ভাবলে খুব বাহাদুরি করেছি। তোমায় বোকা মতন দেখে খুব চাল চেলে নিয়েছে। ভারি ত ফর্দ করেছেন! আমি লিখে দিতে পারি, ও যদি পাঁচটা জল বলে থাকে তা আমি এক্ষুনি পঁচিশটা বলে দেব—

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি বলছিলুম কি একটু খাবার জল—

বৃদ্ধ। কি বলছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা শুনে যাও। বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিবের জল, হুঁকোর জল, ফটিক জল, রোদে ঘেমে জ—ল, আহ্লাদে গলে জ—ল, গায়ের রক্ত জ—ল, বুঝিয়ে দিল যেন জ—ল—কটা হয়? গোনোনি বুঝি?

পথিক। না মশাই, গুনিনি—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—

বৃদ্ধ। তোমার কাজ না থাকলেও আমাদের কাজ থাকতে পারে ত? যাও, যাও, মেলা বকিও না।—একেবারে অপদার্থের একশেষ! [সশব্দে জানলা বন্ধ]

পথিক। নাঃ, আর জলটল চেয়ে কাজ নেই—এগিয়ে যাই, দেখি কোথাও পুকুরটুকুর পাই কি না।

[লম্বা লম্বা চুল, চোখে সোনার চশমা, হাতে খাতা পেন্সিল, পায়ে কটকী জুতা, একটি ছোকরার প্রবেশ]

লোকটা নেহাৎ এসে পড়েছে যখন, একটু জিজ্ঞাসাই করে দেখি। মশাই, আমি অনেক দূর থেকে আসছি, এখানে একটু জল মিলবে না কোথাও?

ছোকরা। কি বলছেন? 'জল' মিলবে না? খুব মিলবে। একশোবার মিলবে! দাঁড়ান, এক্ষুনি মিলিয়ে দিচ্ছি—জল চল তল বল কল ফল—মিলের অভাব কি? কাজল-সজল-উজ্জ্বল-জ্বলজ্বল—চঞ্চল চল্ চল্, আঁখিজল ছল্‌ছল্, নদীজল কল্-কল্, হাসি শুনি খল্‌খল্, অ্যাঁকানল বাঁকানল, আগল ছাগল পাগল—কত চান?

পথিক। এ দেখি আরেক পাগল! মশাই, আমি সে রকম মিলবার কথা বলিনি।

ছোকরা। তবে কোন রকম মিল চাচ্ছেন বলুন? কি রকম, কোন ছন্দ, সব বলে দিন—যেমনটি চাইবেন তেমনটি করে মিলিয়ে দেব।

পথিক। ভালো বিপদেই পড়া গেল দেখছি—(জোরে) মশাই! আর কিছু চাইনে,—(আরো জোরে) শুধু একটু জল খেতে চাই!

ছোকরা। ও, বুঝেছি। শুধু—একটু—জল—খেতে—চাই। এই ত? আচ্ছা বেশ। এ আর মিলবে না কেন?—শুধু একটু জল খেতে চাই—ভারি তেষ্টা প্রাণ আই-ঢাই। চাই কিন্তু কোথা গেলে পাই—বল্ শীঘ্র বল্ নারে ভাই। কেমন? ঠিক মিলছে ত?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব মিলছে—খাসা মিলছে—নমস্কার। (সরিয়া গিয়া) নাঃ, বকে বকে মাথা ধরিয়ে দিলে—একটু ছায়ায় বসে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নি।

[একটা বাড়ির ছায়ায় গিয়া বসিল]

ছোকরা। (খুশী হইয়া লিখিতে লিখিতে) মিলবে না? বলি, মেলাচ্ছে কে? সেবার যখন বিষ্টুদাদা 'বৈকাল' কিসের সঙ্গে মিল দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন 'নৈপাল' বলে দিয়েছিল কে? নৈপাল কাকে বলে জানেন ত? নেপালের লোক হল নৈপাল। (পথিককে না দেখিয়া) লোকটা গেল কোথায়? দুত্তোর! [প্রস্থান]

[বাড়ির ভিতরে বালকের পাঠ—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। সমুদ্রের জল লবণাক্ত, অতি বিস্বাদ]

পথিক। ওহে খোকা! একটু এদিকে শুনে যাও ত?

[রুক্ষমূর্তি, মাথায় টাক, লম্বা দাড়ি খোকার মামা বাড়ি হইতে বাহির হইলেন]

মামা। কে হে? পড়ার সময় ডাকাডাকি করতে এয়েছ?—(পথিককে দেখিয়া) ও! আমি মনে করেছিলুম পাড়ার কোন ছোকরা বুঝি। আপনার কি দরকার?

পথিক। আজ্ঞে, জল তেষ্টায় বড় কষ্ট পাচ্ছি—তা একটু জলের খবর কেউ বলতে পারলে না।

মামা। (তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলিয়া) কেউ বলতে পারলে না? আসুন, আসুন। কি খবর চান, কি জানতে চান, বলুন দেখি? সব আমায় জিজ্ঞেস করুন, আমি বলে দিচ্ছি। (ঘরের মধ্যে টানিয়া লওন—ভিতরে নানারকম যন্ত্র, নকশা, রাশি রাশি বই)

কি বলছিলেন? জলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

পথিক। আজ্ঞে হাঁ, সেই সকাল থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি—

মামা। আহাহা! কি উৎসাহ! শুনেও সুখ হয়। এ রকম জানবার আকাঙ্ক্ষা কজনের আছে, বলুন ত? বসুন! বসুন! (কতগুলি ছবি, বই আর এক টুকরা খড়ি বাহির করিয়া) জলের কথা জানতে গেলে প্রথমে জানা দরকার, জল কাকে বলে, জলের কি গুণ—

পথিক। আজ্ঞে, একটু খাবার জল যদি—

মামা। আসছে—ব্যস্ত হবেন না। একে একে সব কথা আসবে। জল হচ্ছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন—[বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখলেন

পথিক। এই মাটি করেছে!

মামা। বুঝলেন? রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষণ করলে হয়—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। আর হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হলেই হল জল! শুনছেন ত?

পথিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, সব শুনছি। কিন্তু একটু খাবার জল যদি দেন, তাহলে আরো মন দিয়ে শুনতে পারি।

মামা। বেশ ত! খাবার জলের কথাই নেওয়া যাক না। খাবার জল কাকে বলে? না, যে জল পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর, যাতে দুর্গন্ধ নাই, রোগের বীজ নাই—কেমন? এই দেখুন এক শিশি জল—আহা, ব্যস্ত হবেন না। দেখতে মনে হয় বেশ পরিষ্কার, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে যদি দেখেন, দেখবেন পোকা সব কিলবিল করছে। কেঁচোর মতো কৃমির মতো সব পোকা—এমনি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখায় ঠিক এত্তো বড় বড়। এই বোতলের মধ্যে দেখুন, ও বাড়ির পুকুরের জল; আমি এইমাত্র পরীক্ষা করে দেখলুম, ওর মধ্যে রোগের বীজ সব গিজ্‌গিজ্‌ করছে—প্লেগ, টাইফয়েড, ওলাউঠা, ঘেয়োজ্বর—ও জল খেয়েছেন কি মরেছেন! এই ছবি দেখুন—এইগুলো হচ্ছে কলেরার বীজ, এই ডিপথেরিয়া, এই নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া—সব আছে। আর এই সব হচ্ছে জলের পোকা—জলের মধ্যে শ্যাওলা ময়লা যা কিছু থাকে, ওরা সেইগুলো খায়। আর এই জলটার কি দুর্গন্ধ দেখুন! পচা পুকুরের জল—ছেঁকে নিয়েছি, তবু গন্ধ।

পথিক। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ! করেন কি মশাই? ওসব জানবার কিচ্ছু দরকার নেই—

মামা। খুব দরকার আছে। এ সব জানতে হয়—অত্যন্ত দরকারী কথা!

পথিক। হোক দরকারী—আমি জানতে চাইনে, এখন আমার সময় নেই।

মামা। এই ত জানবার সময়। আর দুদিন বাদে যখন বুড়ো হয়ে মরতে বসবেন, তখন জেনে লাভ কি? জলে কি কি দোষ থাকে, কি করে সে সব ধরতে হয়, কি করে তার শোধন হয়, এসব কি জানবার মতো কথা নয়? এই যে সব নদীর জল সমুদ্রে যাচ্ছে, সমুদ্রের জল সব বাষ্প হয়ে উঠছে, মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে—এরকম কেন হয়, কিসে হয়, তাও ত জানা দরকার?

পথিক। দেখুন মশাই! কি করে কথাটা আপনাদের মাথায় ঢোকাব তা ত ভেবে পাইনে। বলি, বারবার করে যে বলছি—তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সেটা ত কেউ কানে নিচ্ছেন না দেখি। একটা লোক তেষ্টায় জল-জল করছে তবু জল খেতে পায় না, এরকম কোথাও শুনেছেন?

মামা। শুনেছি বৈকি—চোখে দেখেছি। বদ্যিনাথকে কুকুরে কামড়াল, বদ্যিনাথের হল হাইড্রোফোবিয়া—যাকে বলে জলাতঙ্ক। আর জল খেতে পারে না—যেই জল খেতে যায় অমনি গলায় খিঁচ ধরে যায়। মহা মুশকিল!—শেষটায় ওঝা ডেকে, ধুতুরো দিয়ে ওষুধ মেখে খাওয়াল, মন্তর চালিয়ে বিষ ঝাড়াল—তারপর সে জল খেয়ে বাঁচল। ওরকম হয়।

পথিক। নাঃ—এদের সঙ্গে আর পেরে ওঠা গেল না—কেনই বা মরতে এয়েছিলাম এখেনে? বলি, মশাই, আপনার এখানে নোংরা জল আর দুর্গন্ধ জল ছাড়া ভালো

খাঁটি জল কিছু নেই?

মামা। আছে বৈকি! এই দেখুন না বোতলভরা টাটকা খাঁটি 'ডিস্টিল ওয়াটার'—যাকে বলে 'পরিশ্রুত জল'।

পথিক। (ব্যস্ত হইয়া) এ জল কি খায়?

মামা। না, ও জল খায় না—ওতে ত স্বাদ নেই—একেবারে বোবা জল কিনা, এইমাত্র তৈরি করে আনল—এখনো গরম রয়েছে।

[পথিকের হতাশ ভাব]

তারপর যা বলছিলাম শুনুন—এই যে দেখছেন গন্ধওয়ালা নোংরা জল—এর মধ্যে দেখুন এই গোলাপী জল ঢেলে দিলুম—বাস, গোলাপী রঙ উড়ে শাদা হয়ে গেল। দেখলেন ত?

পথিক। না মশাই, কিচ্ছু দেখিনি—কিচ্ছু বুঝতে পারিনি—কিচ্ছু মানি না—কিচ্ছু বিশ্বাস করি না—

মামা। কি বললেন! আমার কথা বিশ্বেস করেন না?

পথিক। না, করি না। আমি যা চাই, তা যতক্ষণ দেখাতে না পারবেন, ততক্ষণ কিচ্ছু শুনব না, কিচ্ছু বিশ্বাস করব না।

মামা। বটে! কোনটা দেখতে চান একবার বলুন দেখি—আমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি—

পথিক। তাহলে দেখান দেখি। শাদা, খাঁটি, চমৎকার, ঠাণ্ডা, এক গেলাশ খাবার জল নিয়ে দেখান দেখি। যাতে গন্ধপোকা নেই, কলেরার পোকা নেই, ময়লাটয়লা কিচ্ছু নেই, তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখান দেখি। খুব বড় এক গেলাশ ভর্তি জল নিয়ে আয় ত।

মামা। এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি—ওরে ট্যাঁপা, দৌড়ে আমার কুঁজো থেকে এক গেলাশ জল নিয়ে আয় ত।

[পাশের ঘরে দুপদাপ শব্দে খোকার দৌড়]

নিয়ে আসুক, তারপর দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ জলে কি রকম হয়, আর এই নোংরা জলে কি রকম তফাৎ হয়, সব আমি এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

[জল লইয়া ট্যাঁপার প্রবেশ]

রাখ, এইখানে রাখ।

[জল রাখিবামাত্র পথিকের আক্রমণ—মামার হাত হইতে জল কাড়িয়া এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়া শেষ]

পথিক। আঃ! বাঁচা গেল!

মামা। (চটিয়া) এটা কি রকম হল মশাই?

পথিক। পরীক্ষা হল—এক্সপেরিমেণ্ট! এবার আপনি নোংরা জলটা একবার খেয়ে দেখান ত, কি রকম হয়?

মামা। (ভীষণ রাগিয়া) কি বললেন!

পথিক। আচ্ছা থাক, এখন নাই বা খেলেন—পরে খাবেন এখন। আর এই গাঁয়ের মধ্যে আপনার মতো আনকোরা পাগল আর যতগুলো আছে, সব কটাকে খানিকটে করে খাইয়ে দেবেন। তারপর খাটিয়া তুলবার দরকার হলে আমায় খবর দেবেন—আমি খুশী হয়ে ছুটে আসব—হতভাগা জোচ্চোর কোথাকার! [দ্রুত প্রস্থান]

[পাশের গলিতে সুর করিয়া কে হাঁকিতে লাগিল—'অবাক জলপান']

হিংসুটি

[পাঁচটি ছোট মেয়ের প্রবেশ]

প্রথম। আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছি—এমন মজার!

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম। কি ভাই—কি স্বপ্ন? বল্ না ভাই—

প্রথম। না ভাই, আমি ঐ ওকে বলব না—ও ভারি হিংসুটে।

পঞ্চম। আচ্ছা, নাই বা বললি। ভারি তো স্বপ্ন—আমি বুঝি আর স্বপ্ন দেখতে জানিনে—

প্রথম। দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে!

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আচ্ছা, ওকে নাই বা বললি, আমাদের বল না।

চতুর্থ। আর না হয় ও শুনলই বা—তাতে দোষ কি ভাই?

পঞ্চম। আমার বয়ে গেছে—ও ছাই স্বপ্ন আমি একটুও শুনতে চাই না।

প্রথম। শুনলি ভাই! কি রকম হিংসে করে করে কথা কয়? আমি কি ওকে শুনতে বলেছি?

চতুর্থ। কিসের স্বপ্ন ভাই?—রাজহাঁসের?

প্রথম। দুৎ! রাজহাঁসের স্বপ্নকে বুঝি মজার স্বপ্ন বলে?

চতুর্থ। হ্যাঁ—রাজহাঁসের স্বপ্ন খুব মজার হয়। আমি যখন রাজহাঁসদের সঙ্গে মেঘের মধ্যে ভাসছিলাম, তখন নীল নীল ঢেউগুলো সব আমার গায়ে লাগছিল। আর তারাগুলো সব ফুটেছিল, ঠিক যেন পদ্মফুলের মত! আমার খুব মজা লাগছিল।

পঞ্চম। তুই সেখানে দোলনা-দেওয়া লালফুলের বাগান দেখেছিলি?—আর পেখমধরা ময়ূর দেখেছিলি?

চতুর্থ। কই, না ত!

পঞ্চম। আমি দেখেছিলাম। ময়ূরদের পায়ে সোনার ঘুঙুর এমনি সুন্দর বাজছিল! —এমন সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুনলাম সকালবেলায় বোর্ডিঙের ঘণ্টা বাজছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, এর মধ্যে কি রকম বক্‌বক্ করতে লেগেছে! ওরা ইচ্ছে করে আমায় বলতে দেবে না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়। আহা, তোরা একটু থাম না বাপু—

প্রথম। আবার কিন্তু ও রকম করলে আমি কক্ষনো বলব না।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। না, না, কেউ বাধা দেব না—বল্।

প্রথম। আমি স্বপ্ন দেখেছি—ঐ বাগানের মধ্যে একটা মেলা হচ্ছে। আমি সেই মেলায় গিয়েছি, আর সেখানে এক মেম সকলকে পুতুল দিচ্ছে—ঠিক এত্তো বড় বড় পুতুল!—তার জন্যে পয়সা নিচ্ছে না!—আমায় একটা পুতুল দিল, তার মাথা ভরা কোঁকড়া চুল, এমনি মোটা মোটা গাল, আর ঠিক সত্যিকার মানুষের মতন কথা বলে।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। ও—মা—! কি চমৎকার!

তৃতীয়। হাত-পা নাড়তে পারে?

চতুর্থ। নিজে নিজে চলতে পারে?

দ্বিতীয়। হাসতে পারে?

প্রথম। হ্যাঁ, হাসতে পারে, খেলতে পারে, সব পারে।

পঞ্চম। সত্যিকার মানুষের মতন তৈরি?

দ্বিতীয়। কেন—এখন যে বড় কথা বলতে এয়েছিস?

তৃতীয়। তবে যে বলছিলি ছাই স্বপ্ন—তুই একটুও শুনতে চাস না—

চতুর্থ। তা কেন? তোরাই ত ভাই ওকে শুনতে দিচ্ছিলি না।

প্রথম। বেশ করেছি। ও কেন কথায় কথায় হিংসে করে? তারপর শোন—সবাইকে পুতুল দিল, কিন্তু কারু পুতুল ও রকম কথাও কয় না, খেলাও করে না—আর, ঐ ও একটা পুতুল পেয়েছিল—নোংরা, কালো, দাঁতভাঙা, বিচ্ছিরি মতন।

পঞ্চম। ইস! তা বৈকি! নিজের বেলায় সব ভালো ভালো, আর পরের বেলায় সব নোংরা আর ময়লা আর বিচ্ছিরি!

প্রথম। দেখলি ভাই, কি রকম হিংসে করে করে বলছে! মেমসাহেব ও রকম দিয়েছে, তা আমি কি করব ভাই?

তৃতীয়। হ্যাঁ, তা ছাড়া এ ত সত্যি নয়—স্বপ্ন।

দ্বিতীয়। স্বপ্ন নিয়ে আবার হিংসে কি?—ছি-ছি-ছি!

চতুর্থ। হ্যাঁ—তারপর কি হল ভাই?

প্রথম। তারপর সে পুতুল নিয়ে কত মজা হল—সব আমার মনেও নেই। শেষটায় কিন্তু ভাই আমার ভারি কষ্ট হয়েছিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কেন? কি হয়েছিল?

প্রথম। সে ভাই বলব কি—পুতুলটাকে সবাই নিয়ে দেখছে দেখছে, হঠাৎ দেখি পুতুলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আমার ভাই এমন কান্না পেতে লাগল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ। কি করে ভাঙল ভাই?

প্রথম। কি জানি, কি করে! আমার বোধহয়, নিশ্চয়ই ঐ হিংসুটিটা কখন হিংসে করে ভেঙে দিয়েছিল!

পঞ্চম। মাগো! এমন বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে আমার নামে!

প্রথম। তা বৈকি! যারা হিংসুটি, তারা স্বপ্নেও হিংসুটি হয়।

দ্বিতীয়। হয় না তো কি? নিশ্চয়ই হয়—হিংসুটি! হিংসুটি!

তৃতীয়। আমি কিন্তু ভাই যেদিন স্বপ্নে পথ হারিয়েছিলুম, সেদিন ও আমায় পথ বলে দিয়েছিল।

চতুর্থ। কি করে পথ হারিয়েছিলি ভাই?

তৃতীয়। সেই একটা বাগানের মধ্যে এক বুড়ি একটা কাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সবাইকে পাথর করে দিচ্ছিল—আর আমি কিছুতেই পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর ও এসে আমায় একটা লুকোনো পথ দেখিয়ে দিল, সেইখেন দিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম।

চতুর্থ। তবু কিন্তু, ভাই, ওরা ওকে হিংসুটি বলে!—আচ্ছা ভাই, তুই বুঝি খালি ময়ূরের স্বপ্ন দেখিস?

পঞ্চম। না—সে খালি একদিন দেখেছিলাম। অন্য সময়ে আমি আল্‌তামাসির স্বপ্ন দেখি।

তৃতীয়, চতুর্থ। আল্‌তা মাসি কে ভাই?

পঞ্চম। সে আমার একজন মাসি হয়। তার কেউ নেই কিনা, সব মরে গিয়েছে, তাই সে রোজ রোজ কাঁদে। আমি ভাই স্বপ্ন দেখি, আল্‌তা মাসির খোকাকে কত করে খুঁজছি; কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আর আল্‌তামাসির চোখ দিয়ে কেবলি জল পড়ছে।

প্রথম। দেখলি ভাই, আমার দেখাদেখি ও আবার এক স্বপ্ন বলতে লেগেছে। এমন হিংসুটে!

দ্বিতীয়। ওঃ! আমার ভাই বড় ঘুম পাচ্ছে।

তৃতীয়, চতুর্থ। সত্যি, আমারও!

প্রথম। আমারও ভাই ঘুম পেয়ে গেল!

পঞ্চম। হ্যাঁ, তাই ত! চোখ বুজে আসছে যে!

[একে একে সকলে বসিয়া পড়িল, ঘুমে চোখ ঢুলিতে লাগিল। স্বপ্নবুড়ি স্বপ্নের গান গাহিতে গাহিতে সকলের চোখে ঘুমের কাঠি বুলাইয়া দিল। রঙ-মাখানো বিশ্রী চেহারা, ঝুঁটিবাঁধা কে একজন আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ার পিছনে দাঁড়াইল। তাহার নাম হিংসে]

পঞ্চম। ঠিক যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। না, ভাই?

চতুর্থ। হ্যাঁ—সত্যি হচ্ছে, কি স্বপ্ন হচ্ছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।

তৃতীয়। ও মা! ও কে ভাই? ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে?

চতুর্থ, পঞ্চম। মাগো! কি বিশ্রী চেহারা!

হিংসে। দেখ্ ত, আমায় চিনিস কিনা?

প্রথম। হ্যাঁ,—কোথায় দেখেছি মনে নেই, কিন্তু চেনা চেনা লাগছে।

দ্বিতীয়। তুই কোথায় থাকিস ভাই?

হিংসে। তাও জানিসনে? এই ত, তোদের মনের মধ্যেই থাকি।

প্রথম। মনের মধ্যে থাকে সে আবার কি রকম ভাই? সেখানে কি থাকবার জায়গা আছে?

হিংসে। হ্যাঁ, আছে বৈকি। ঘর বাগান জল মাটি আকাশ—সব আছে।

দ্বিতীয়। তাই নাকি? তোর নাম কি ভাই?

হিংসে। আমার নাম হিংসে—হিংসুটিদের মনের মধ্যে যে থাকে, সেই হিংসে—

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। হিংসে হাসি চিম্‌সে বাঁকা—
কাল্‌কুট্‌কুট্ গরল মাখা।

দ্বিতীয়। কি সুন্দর কালো কালো হাত দেখেছিস?

প্রথম। হ্যাঁ, আবার মুখে কি সুন্দর রংবেরঙের কাজ করেছে!

চতুর্থ। মাগো! ওকে আবার সুন্দর বলছে!

তৃতীয়, পঞ্চম। এমন কুচ্ছিত! ছ্যাঃ!

প্রথম। আচ্ছা ভাই, যারা হিংসুটি, তারা বুঝি খুব দুষ্টু?

হিংসে। হ্যাঁ, দুষ্টু বৈকি—দুষ্টু আর ঝগড়াটে—

প্রথম। কথায় কথায় বুঝি রাগ করে?

হিংসে। হ্যাঁ, নিজেরা রাগ করে আর অন্যদের বলে হিংসুটি।

দ্বিতীয়। অন্যদের ভালো দেখতে পারে না, না?

হিংসে। এক্কেবারেই পারে না। এমনিও পারে না—স্বপ্নেও পারে না।

প্রথম। ঠিক ঐ ওর মতো!

দ্বিতীয়। আচ্ছা ভাই, তুই হিংসুটিদের মনের মধ্যে থাকিস কেন?

হিংসে। বা! তা নাহলে থাকব কোথায়? তোদের মনের মধ্যে, যেখানে কালো কালো ঝুল-মাখানো পর্দা ঝোলে, সেখানে ছ্যাঁকছেঁকে আগুন জ্বেলে বসি—আর কাটা কাটা ঝাল ঝাল কথা বানিয়ে খাই। ভারি আরাম!

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। কি ভয়ানক দুষ্টু!

হিংসে। দেখলি! ওরা আমাকে দুষ্টু বলছে, বিশ্রী বলছে—তাই ওদের কাছে আমি একটুও ঘেঁষি না। আর তোরা আমায় লক্ষ্মী বলিস, মনের মধ্যে আদর করে পুষে রাখিস—তাই তোদের সঙ্গে আমার কত ভাব।

প্রথম। দেখলি ভাই, কেমন মিষ্টি করে করে কথা বলছে!

দ্বিতীয়। দেখলি! আমাদের কত ভালোবাসে, আর ওদের একটুও ভালোবাসে না।

হিংসে। তাহলে এখন আসি ভাই? মনে থাকবে ত? এই আমার ছাপ রেখে গেলাম।

[কালো কালো আঙুল দিয়া দুইজনের গালে কালো ছাপ লাগাইয়া দিল। জাল গুটাইয়া লইয়া স্বপনবুড়ি চলিয়া গেল। আস্তে আস্তে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

তৃতীয়। ওমা! কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, মনেও নেই।

চতুর্থ। কি যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি! সেই হিংসে বলে একজন কে আছে—

পঞ্চম। কি আশ্চর্য! আমিও ঠিক তাই দেখেছি! ওদের সঙ্গে তার কত ভাব!

তৃতীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের মনের মধ্যে থাকে—

চতুর্থ। আর ঝাল ঝাল কথা খায়—

প্রথম। ও কি ভাই! তোর গালে অমন দাগ দিয়ে গেল কে?

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম। ও কি! সত্যি সত্যি ছাপ দিয়ে গেছে যে!

[দ্বিতীয়ার দাগ মুছিবার চেষ্টা]

সকলে। কি দুষ্টু! কি দুষ্টু! কি দুষ্টু!

প্রথম। আবার বলে আমাদের সঙ্গে ভাব করবে!

দ্বিতীয়। কক্ষনো আর কোনোদিন ভাব করব না।

প্রথম। এমনিও করব না, স্বপ্নেও করব না।

সকলে। কক্ষনো না, কক্ষনো না, কক্ষনো না।

চলচিত্ত-চঞ্চরি

প্রথম দৃশ্য

[সাম্য-সিদ্ধান্ত সভাগৃহ। ঈশানবাবু এক কোণে বসিয়া সংগীত রচনায় ব্যস্ত। জনার্দন তাঁহার নিকটেই উপবিষ্ট। সোমপ্রকাশ খুব মোটামোটা দু-তিনটি কেতাব লইয়া তাহারই একটাকে মন দিয়া পড়িতেছে, এমন সময়ে মাল্য হস্তে নিকুঞ্জের প্রবেশ]

জনার্দন। আচ্ছা, শ্রীখণ্ডবাবুরা কেউ এলেন না কেন বলুন দেখি?

নিকুঞ্জ। শুনলাম, ঈশেনবাবু নাকি ওঁদের কি ইন্সাল্ট করেছেন।

ঈশান। কি রকম! ইন্সাল্ট করলাম কি রকম? একটা কথা বললেই হল? এই জনার্দনবাবুই সাক্ষী আছেন—কোথায় ইন্সাল্ট হল তা উনিই বলুন।

জনার্দন। কই, কেমন ত কিছু বলা হয়নি—খালি স্বর্থপর মর্কট বলা হয়েছিল। তা ওঁরা যেমন অসহিষ্ণু ব্যবহার করছিলেন, তাতে ও রকম বলা কিছুই অন্যায় হয়নি।

সোমপ্রকাশ। আর যদি ইন্সাল্ট করেই থাকে তাতেই বা কি? তার জন্যে কি এইটুকু সাম্যভাব ওঁদের থাকবে না যে, হৃদ্যতার সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেন?

ঈশান। তা ত বটেই। কিন্তু ঐ যে ওঁরা একটি দল পাকিয়েছেন, তাতেই ওঁদের সর্বনাশ করেছে।

জনার্দন। অন্তত আজকের মতো এই রকম একটা দিনেও কি ওঁরা দলাদলি ভুলতে পারেন না?

সোমপ্রকাশ। যাই বলুন, এই সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত যা বলেছেন আমারও সেই মত। আমি বলি, ওঁরা না এসেছেন ভালোই হয়েছে।

[সত্যবাহনের শশব্যস্ত প্রবেশ]

সত্যবাহন। আসছেন, আসছেন, আপনারা প্রস্তুত থাকুন, এসে পড়লেন বলে। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা ঠিক আছে ত? নিকুঞ্জবাবুর আপনি সামনে আসুন। না, না, থাক, ঈশানবাবু আপনি একটু এগিয়ে যান।

ঈশান। আমি গেলে চলবে কেন? আমার গানটা আগে হয়ে যাক—

সত্যবাহন। না, না, ওসব গানটানে কাজ নেই—ওসব আজ থাক। আমার লেখাটা পড়তেই মেলা সময় যাবে—আর বাড়িয়ে দরকার নেই।

ঈশান। বেশ ত! আপনার লেখাটাই যে পড়তেই হবে তার মানে কি? ওটাই থাকুক না কেন?

সত্যবাহন। আচ্ছা, তাহলে তাই হোক—আপনাদের গান আর বাজনাই চলুক। আমার লেখা যদি আপনাদের এতই বিরক্তিকর হয়, তা হলে দরকার কি? চল সোমপ্রকাশ, আমরা চলে যাই।

সকলে। না, না, সে কি, সে কি! তা কি হতে পারে?

সোমপ্রকাশ। (গদগদ) দেখুন, আমি মর্মান্তিকভাবে অনুভব করছি, আজ আমাদের প্রাণে প্রাণে দিক্‌বিদিকে কত না আকুতি-বিকৃতি অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে—

জনার্দন। হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই হবে, তাই হবে। গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।

নিকুঞ্জ। ঐ এসে পড়েছেন।

সকলে। আসুন, আসুন। স্বাগতং, স্বাগতম্‌।

[ভবদুলালের প্রবেশ, অভ্যর্থনা ও সংগীত]

গুণিজন-বন্দন লহ ফুল চন্দন—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন।
আজি কি উদিল রবি পশ্চিম গগনে
জাগিল জগৎ আজি না জানি কি লগনে,
স্বাগত সংগীত গুঞ্জন পবনে—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন।
আলা-ভোলা বাবাজীর চেলা তুমি শিষ্য
সৌম্য মুরতি তব অতি সুখদৃশ্য,
মজিয়া হরষরসে আজি গাহে বিশ্ব—কর অভিনন্দন কর অভিনন্দন।

সত্যবাহন। সোমপ্রকাশ, আমার খাতাখানা দাও ত।

সোমপ্রকাশ। আজ আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে গোপনে গোপনে—

সকলে। আহা-হা, খাতাখানা চাচ্ছেন, সেইটা আগে দাও।

সত্যবাহন। (খাতা লইয়া) আজ মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন সেই চৈত্রমাসে আমরা আলাভোলা বাবাজীর আশ্রমে গিয়েছিলাম। ওঃ, সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম, আজও তা আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হয়ে আছে। দেখলাম মহা প্রশান্ত আলাভোলা বাবাজী হাস্যোজ্জ্বল মুখে পরম নির্লিপ্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁর পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। আজ আমাদের কি সৌভাগ্য যে বাবাজীর প্রিয়শিষ্য—একি, সোমপ্রকাশ, এ কোন খাতা নিয়ে এসেছ? ধুতি চারখানা, বিছানার চাদর একখানা, বালিশের ওয়াড় একখানা, বাকি একখানা তোয়ালে—এসব কি?

সোমপ্রকাশ। কেন? আপনিই ত আমার কাছে রাখতে দিলেন।

সত্যবাহন। বলি, একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে হয় ত, সাপ দিলাম না ব্যাং দিলাম? —দেখুন দেখি! এত কষ্ট করে রাত জেগে, সুন্দর একটি প্রবন্ধ লিখলাম, এখন নিয়ে এসেছে কিনা কার একটা ধোপার হিসেবের খাতা! এত যে বলি, নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে, তা কেউ শুনবে না!

ভবদুলাল। তা দেখুন, ওরকম ভুল অনেক সময়ে হয়ে যায়—করতে গেলাম এক, হয়ে গেল আর! আমার সেজোমামা একবার ঘিয়ের কারবার করে ফেল মেরেছিলেন—সেই থেকে কেউ গব্যঘৃত-বললেই তিনি ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। আমি ত তা জানি না; মামাবাড়ি গিয়েছি, মহেশদা বলল, 'বল ত গব্যঘৃত।' আমি চেঁচিয়ে বললাম 'গ-ব্য-ঘৃ-ত'—অমনি দেখি সেজোমামা ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে মারতে এয়েছে! দেখুন ত কি অন্যায়! আমি ত ইচ্ছা করে ক্ষেপাইনি!

সত্যবাহন। যাক, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা এই যে, বাইরের জিনিস যেমন মানুষের ভেতরে ধরা পড়ে, তেমনি ভেতরের জিনিসও সময় সময় বাইরে প্রকাশ পায়। আমাদের মধ্যে আমরা অন্তরঙ্গভাবে যেসব জিনিস পাচ্ছি সেগুলোকে এখন বাইরে প্রকাশ করা দরকার।

ভবদুলাল। ঠিক বলেছেন। এই মনে করুন, যে কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাটির

রস খেয়ে বাড়ে, সেই কেঁচোই আবার মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে।

সকলে। (মহোৎসাহে) চমৎকার! চমৎকার!

নিকুঞ্জ। দেখেছেন, কেমন সুন্দরভাবে উনি কথাটা গুছিয়ে নিলেন!

ভবদুলাল। তা হলে সমাদ্দার মশাই, আপনি ঐ যেটা পড়বেন বলেছিলেন, আমায় সেটা দেবেন ত। আমি একখানা বড় বই লিখছি, তাতে ওটা ঢুকিয়ে দেব—

সোমপ্রকাশ। এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনি যদি এ কাজের ভার নেন, তাহলে আমাদের ভেতরকার ভাবগুলি সুন্দরভাবে সাজিয়ে বলতে পারবেন।

জনার্দন। হ্যাঁ, এ বিষয়ে ওঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা দেখা যাচ্ছে।

ভবদুলাল। আর আপনার ঐ গানটিও আমায় শিখিয়ে দেবেন, ওটাও আমার বইয়ে ছাপতে চাই।

ঈশান। নিশ্চয়! নিশ্চয়! ওটা আমার নিজের লেখা। গান লেখা হচ্ছে আমার একটা বাতিক।

সোমপ্রকাশ। কি রকম আগ্রহ আর উৎসাহ দেখেছেন ওঁর?

ঈশান। তা ত হবেই। সকলের উৎসাহ কেন যে হয় না এই ত আশ্চর্য।

[গান]

এমন বিমর্ষ কেন?
মুখে নাই হর্ষ কেন?
কেন ভব-ভয়-ভীতি ভাবনা প্রভৃতি
বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?
(হায় হায় হায় বৃথা বয়ে যায় বর্ষ কেন?)

ভবদুলাল। (লিখিতে লিখিতে) চমৎকার! এটা আমার বইয়ে দিতেই হবে। আমার কি মুশকিল জানেন? আমিও পৌট্রি লিখি, কিন্তু তার সুর বসাতে পারি না। এই ত এবার একটা লিখেছিলাম—

বলি ও হরি রামের খুড়ো
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।

মশায়, কত রকম সুর লাগিয়ে দেখলাম—তার একটাও লাগল না। কি করা যায় বলুন ত?

ঈশান। ওর আর করবেন কি? ওটা ছেড়ে দিন না—

ভবদুলাল। তা অবিশ্যি, তবে টুইঙ্কল্, টুইঙ্কল্, লিটল্ স্টার—এই সুরটা অনেকটা লাগে—

[গান]

বলি ও হরিরামের খুড়ো—
(তুই) মরবি রে মরবি বুড়ো।
সর্দি কাশি হল্‌দি জ্বর
ভুগবি কত জল্‌দি মর।

কিন্তু এটাও ঠিক হয় না। ঐ যে 'মরবি রে মরবি' ঐ জায়গাটায় আরও জোর দেওয়া দরকার। কি বলেন?

ঈশান। হ্যাঁ, যে রকম গান—একটু জোরজার না করলে সহজে মরবে কেন?

সোমপ্রকাশ। (জনান্তিকে) কিন্তু শ্রীখণ্ডবাবুদের এ সমস্ত কাণ্ড প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।

সত্যবাহন। উচিত সে ত আজ বছর ধরে শুনে আসছি। উচিত হয় ত বলে ফেললেই হয়? নিকুঞ্জবাবু কি বলেন?

নিকুঞ্জ। নিশ্চয়ই। কিসের কথা হচ্ছিল?

সত্যবাহন। ঐ শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের কথা। এবারে 'সত্যসন্ধিৎসা'য় কি লিখেছি পড়েননি বুঝি?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা চমৎকার হয়েছে। পড়ে দিন না—উনি শুনে সুখী হবেন।

সত্যবাহন। (পাঠ) এই যে অগণ্য গ্রহ-তারকা মণ্ডিত গগনপথে ধরিত্রী ধাবমান, ভূধরকন্দর ভ্রাম্যমাণ—এই যে সাগরের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে দিক্‌দিগন্ত ধ্বনিত ঝংকৃত করিয়া, কি যেন চায়, কি যেন চায়—প্রতিধ্বনি বলিতেছে সাম্য সমীক্ষপন্থা।

নিকুঞ্জ। শুনছেন? ভাষায় কেমন সতেজ অথচ—সহজ ভঙ্গী, সেটা লক্ষ করেছেন? ওর মধ্যে শ্রীখণ্ডবাবুদের উপর বেশ একটু কটাক্ষ রয়েছে।

জনার্দন। তাহলে আশ্রমের কথাটা আগে বলে নিন—নইলে উনি বুঝবেন কেমন করে।

ঈশান। সেইটিই ত আগে বলা উচিত। সোমপ্রকাশ তুমি বল ত হে—বেশ ভালো করে গুছিয়ে বল।

সত্যবাহন। আচ্ছা তা হলে সোমপ্রকাশই বলুক—(অভিমান)

সোমপ্রকাশ। কথাটা হয়েছে কি—এই যে ওঁরা একটা আশ্রম করেছেন, তার রকম-সকমগুলো যদি দেখেন—সর্বদাই কেমন একটা—অর্থাৎ, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না—কি শিক্ষার দিক দিয়ে, কি অন্যদিক দিয়ে, যেমন ভাবেই দেখুন—আমার কথাটা বুঝতে পারছেন ত? যেমন, ইয়ের কথাটাই ধরুন না কেন—মানে সব কথা ত আর মুখস্থ করে রাখিনি!

ভবদুলাল। তা ত বটেই, এ ত আর একজামিন দিতে আসেননি।

নিকুঞ্জ। সমাদ্দার মশাইকে বলতে দাও না।

সত্যবাহন। না, না, আমায় কেন? আমি কি আপনাদের মতো তেমন গুছিয়ে ভালো করে বলতে পারি?

সকলে। কেন পারবেন না? খুব পারবেন।

সত্যবাহন। আর মশাই, ওসব ছোট কথা—কে কি বলল আর কে কি করল! ওর মধ্যে আমায় কেন?

জনার্দন। আচ্ছা, তাহলে আর কেউ বলুন না।

সত্যবাহন। কি আপদ! আমি কি বলব না বলছি? তবে, কি রকম ভাব থেকে বলছি সেটা ত একবার জানানো উচিত, তা নয় ত শেষকালে আপনারাই বলবেন সত্যবাহন সমাদ্দার পরনিন্দা করচে।

জনার্দন। হ্যাঁ, শুধু বললেই ত হল না, দশদিক বিবেচনা করে বলতে হবে ত?

সত্যবাহন। আমার হয়েছে কি, ছেলেবেলা থেকেই কেমন অভ্যাস—পরনিন্দা পরচর্চা এসব আমি আদবে সইতে পারি না।

জনার্দন। আমারও ঠিক তাই। ওসব এক্কেবারে সইতে পারি না।

সোমপ্রকাশ। পরনিন্দা ত দূরের কথা, নিজের নিন্দাও সহ্য হয় না।

সত্যবাহন। কিন্তু তা বলে সত্য কি আর গোপন রাখা যায়?

ভবদুলাল। গোপন করলে আরো খারাপ। ছেলেবেলায় একদিন আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে 'কু' করে শব্দ করেছিল। মাস্টার বললেন, 'কে করল, কে করল?' আমি ভাবলাম আমার অত বলতে যাবার দরকার কি। শেষটায় দেখি, আমাকেই ধরে মারতে লেগেছে। দেখুন দেখি! ওসব কক্ষনো গোপন করতে নেই।

জনার্দন। আমাদেরও তাই হয়েছে। কিছু বলি না বলে দিন দিন ওরা যেন আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে।

নিকুঞ্জ। আশ্রমের ছেলেগুলো পর্যন্ত যেন কি এক রকম হয়ে উঠছে।

জনার্দন। হ্যাঁ, ঐ রামপদটা সেদিন সমাদ্দার মশাইকে কি না বললে।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ কথাটা একবার বলুন দেখি, তাহলে বুঝবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

জনার্দন। হ্যাঁ, বুঝলেন? ছোকরার এতবড় আস্পর্ধা সমাদ্দার মশাইকে মুখের উপর বলে কি যে—হ্যাঁ, কি-না বললে!

নিকুঞ্জ। কি যেন—সেই খুলনার মকদ্দমার কথা নয় ত?

জনার্দন। আরে না, ঐ যে পিলসুজের বাতি নিয়ে কি একটা কথা।

সোমপ্রকাশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে কি একটা সংস্কৃত কথা তার দু-তিন রকম মানে হয়।

নিকুঞ্জ। ওঁরই কি একটা কথা ওঁরই উপর খাটাতে গিয়েছিল। মোটকথা, তার ও-রকম বলা একেবারেই উচিত হয়নি।

ভবদুলাল। কি আপদ! তা আপনারা এসব সহ্য করেন কেন?

সত্যবাহন। সহ্য না করেই বা করি কি? কিছু কি বলবার যো আছে? এই ত সেদিন একটা ছোকরাকে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললাম—'বাপু হে, ও-রকম বাঁদরের মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, বলি কেবল এয়ারকি করলে ত চলবে না! কর্তব্য বলে যে জিনিস আছে সেটা কি ভুলেও এক-আধবার ভাবতে নেই? এদিকে নিজের মাথাটি যে খেয়ে বসেছ!'—মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, এতেই সে একেবারে গজ্‌গজিয়ে উঠে আমার কথাগুলো না শুনেই হন্‌হন্‌ করে চলে গেল!

সোমপ্রকাশ। এই ত দেখুন না, এখানে সকলে সাধুসঙ্গে বসে কত সৎপ্রসঙ্গ হচ্ছে শুনলেও উপকার হয়। তা, ওরা কেউ ভুলেও একবার এদিকে আসুক দেখি, তা আসবে না।

জনার্দন। তা আসবে কেন? যদি দৈবাৎ ভালো কথা কানে ঢুকে যায়!

সত্যবাহন। আসল কথা কি জানেন? এসব হচ্ছে শিক্ষা এবং দৃষ্টান্ত। এই যে শ্রীখণ্ডদেব, লোকটি একটু বেশ অহং-ভাবাপন্ন। এই ত দেখুন না, আমাদের এখানে আমি আছি, এঁরা আছেন, তা মাঝে মাঝে আমাদের পরামর্শ নিলেই—

[রামপদর প্রবেশ]

এই দেখুন এক মূর্তিমান এসে হাজির হয়েছে।

নিকুঞ্জ। আরে দেখছিস আমরা বসে কথা বলছি, এর মধ্যে তোর পাকামো করতে আসবার দরকার কি বাপু?

জনার্দন। বলি, একি বাঁদর নাচ—না সঙের খেলা, যে তামাশা দেখতে এয়েছ?

রামপদ। (স্বগত) কি আপদ! তখনি বলেছি, আমায় ওখানে পাঠাবেন না—

নিকুঞ্জ। কি হে, তুমি সমাদ্দার মহাশয়ের সঙ্গে বেয়াদবি কর—এই রকম তোমাদের

আশ্রমে শিক্ষা দেওয়া হয়?

রামপদ। আমি? কই আমি ত—আমার ত মনে পড়ে না, আমি—

সত্যবাহন। আমি, আমি, আমি—কেবল আমি! আমি, আমি, এত আত্মপ্রচার কেন? আর কি বলবার বিষয় নেই?

ঈশান। 'আত্মম্ভরী অহঙ্কার আত্মনামে হুহুঙ্কার,
তার গতি হবে না হবে না—'

সোমপ্রকাশ। দেখ, ওরকমটা ভালো নয়—নিজের কথা দশজনের কাছে বলে বেড়াব, এ ইচ্ছাটাই ভালো নয়।

সত্যবাহন। আমি যখন খুলনায় চাকরি করতাম, ফাউসন সাহেব নিজে আমায় সার্টিফিকেট দিলে—'বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে উৎসাহে, চরিত্রে সাধুতায়, সেকেণ্ড টু ন-ন!!' কারুর চাইতে কম নয়। আমি কি সে কথা তোমায় বলতে গিয়েছিলাম?

নিকুঞ্জ। আমার পিসতুতো ভাই সেবার লাট সাহেবের সামনে গান করলে আমি কি তা নিয়ে ঢাক পিটিয়েছিলাম?

ঈশান। আমার তিন ভল্যুম ইংরাজী কাব্য 'ইন্ মেমোরিয়াম' 'ও মান্ধাতা!' 'ও মোর্‌স্!' যেবার বেরুল সেবার 'বেঙ্গলী'-তে কি লিখেছিল জানেন ত? 'উই কনগ্র্যাচুলেট দি ডিস্টিংগুইস্‌ড্ অথার অফ দিস মনুমেণ্টাল প্রোডাকশান (ডাব্‌ল্ ডিমাই অক্‌টেভো ৯৭৪ পেজেস) হু ইজ এভিডেণ্টলি ইন পোজেশান অভ এ স্টুপেণ্ডাস অ্যামাউণ্ট অভ অ্যাস্টাউডিং ইনফরমেশান!'

এ'রা যদি কথাটা না তুলতেন, আমি কি গায়ে পড়ে গল্প করতে যেতুম?

রামপদ। কি জানি মশাই, আমায় শ্রীখণ্ডবাবু পাঠিয়ে দিলেন—তাই বলতে এলুম।

সত্যবাহন। দেখ তর্ক করো না—তর্ক করে কেউ কোনোদিন মানুষ হতে পারেনি।

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, ওটা তোমাদের ভারি একটা বদভ্যাস। আজ পর্যন্ত তর্ক করে কোনো বড় কাজ হয়েছে এরকম কোথাও শুনেছ?

ঈশান। এই যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাতে করে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রকে চালাচ্ছে, সে কি তর্ক করে চালাচ্ছে?

সোমপ্রকাশ। আমি দেখছি এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতের সকলেরই এক মত।

সত্যবাহন। আমার সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা বইখানাতে একথা বার বার করে দেখিয়েছি যে তর্ক করে কিছু হবার যো নেই। মনে করুন যেন তর্ক হচ্ছে যে, আফ্রিকা দেশে সেউ-ফল পাওয়া যায় কি না। মনে করুন যদি সত্যি করে সে ফল থাকে, তবে আপনি বলবার আগেও সে ছিল বলবার পরেও সে থাকবে। আর যদি সে ফল না থাকে, তবে আপনি হ্যাঁ বললেও নেই, না বললেও নেই। তবে তর্ক করে লাভটা কি?

ভবদুলাল। তা ত বটেই—ফোড়া যদি পাকবার হয় তাকে আদুড় করেই রাখ—আর পুলটিশ দিয়েই ঢাক, সে টন্‌টনিয়ে উঠবেই।

নিকুঞ্জ। আরে মশাই এ সব বলিই বা কাকে—আর বললে শোনেই বা কে!

সোমপ্রকাশ। শুনলেই বা বোঝে কয়জন আর বুঝলেই বা ধরতে পারে কয়জন? ঐ ধরাটাই আসল কিনা।

[ঈশানের সংগীত]

ধরি ধরি ধর ধর ধরি কিন্তু ধরে কই?
কারে ধরি কেবা ধরে ধরাধরি করে কই?
ধরনে ধারণে তারে ধরণী ধরিতে নারে
আঁধার ধারণা মাঝে সে ধারা শিহরে কই?

জনার্দন। কথাটা বড় খাঁটি। এই যে আমাদের সমীক্ষা-চক্র আর সমসাম্য-সাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ড ভাব, এ সমস্ত ধরেই বা কে, আর ধরতে জানেই বা কে?

সত্যবাহন। ধরা না হয় দূরের কথা, ও-বিষয়ে ভালো ভালো বই যে দু-একখানা আছে, সেগুলো পড়া উচিত। আমি বেশি কিছু বলছি না—অন্তত আমার সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা, এ দুখানা পড়তে পারে ত!

ভবদুলাল। তাহলে ত পড়ে দেখতে হচ্ছে। কি নাম বললেন বইটার?

সত্যবাহন। সাম্য-নির্ঘণ্ট, তিন টাকা দু আনা, আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তিন ভল্যুম, খণ্ড-সিদ্ধান্ত অখণ্ড-সিদ্ধান্ত আর খণ্ডাখণ্ড-সিদ্ধান্ত—সাত টাকা চার আনা। দুখানা বই এক সঙ্গে নিলে সাড়ে নয় টাকা, প্যাকিং চার পয়সা, ডাকমাশুল সাড়ে পাঁচ আনা, এই সবসুদ্ধ ন টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা।

ভবদুলাল। তা এটা আপনার কোন এডিশন বললেন?

ঈশান। আঃ—ফাস্ট্ এডিশন মশাই, ফাস্ট এডিশন—এই ত সবে সাত বছর হল, এর মধ্যেই কি?

সত্যবাহন। তা আমি ত আর অন্যদের মতো বিজ্ঞাপনের চটক দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটাই না।

ঈশান। হ্যাঁ, উনি ত আর নিজে পেটান না—ওঁর পেটাবার লোক আছে। তা ছাড়া এইসব কাগজওয়ালাগুলো এমন হতভাগা, কেউ ওঁর বইয়ের সুখ্যাতি করতে চায় না।

সত্যবাহন। কেন, সচ্চিন্তা-সন্দীপিকায় বেশ লিখেছিল।

ঈশান। ও হ্যাঁ, আপনার মেজোমামা লিখেছিলেন বুঝি?

সত্যবাহন। মেজোমামা নয়, সেজোমামা। কি হে, তোমার এখানে হাঁ করে সব কথা শুনবার দরকার কি বাপু? [রামপদর প্রস্থান]

ভবদুলাল। আচ্ছা, ঐ যে খণ্ডাখণ্ড কি সব বলছিলেন, ওগুলোর আসল ব্যাপারটা কি একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা এই বেলা বুঝে নিন। এ-বিষয়ে উনিই হচ্ছেন অথরিটি।

সত্যবাহন। ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে যাকে বলে পৃথগ্‌দর্শন। যেমন কুকুরটা ঘোড়া নয়, ঘোড়াটা গরু নয়, গরুটা মানুষ নয়—এই রকম। এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড খণ্ড—এই সাধারণ ইতর লোকে যেমন মনে করে।

ভবদুলাল। (স্বগত) দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বলছে সাধারণ ইতর লোক!

সত্যবাহন। আর অখণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যাকে আমরা বলি 'কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং' অর্থাৎ এই যে নানারকম সব দেখছি এ কেবল দেখবার রকমারি কিনা! আসলে বস্তু হিসাবে ঘোড়াও যা গরুও তা—কারণ বস্তু ত আর স্বতন্ত্র নয়—মূলে কেন্দ্রগতভাবে সমস্তই এক অখণ্ড—বুঝলেন না?

ভবদুলাল। হ্যাঁ, বুঝেছি। মানে কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং—এই ত?

সত্যবাহন। হ্যাঁ, বস্তুমাত্রেই হচ্ছে তার কেন্দ্রগত কতকগুলি গুণের সমষ্টি। মনে করুন, ঘোড়া আর গরু—এদের গুণগুলি সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন। ঘোড়া চতুষ্পদ, গরু চতুষ্পদ, ঘোড়া পোষ মানে, গরু পোষ মানে—সুতরাং এখান দিয়ে অখণ্ড হিসাবে কোনো তফাৎ নেই, এখানে ঘোড়াও যা গরুও তা। আবার দেখুন, ঘোড়াও ঘাস খায় গরুও ঘাস খায়—এও বেশ মিলে যাচ্ছে, কেমন?

ভবদুলাল। কিন্তু ঘোড়ার ত শিং নাই, গরুর শিং আছে—তা হলে সেখান দিয়ে মিলবে কি করে?

সত্যবাহন। সেখানে গাধার সঙ্গে মিলবে। এমনি করে সব পদার্থের সব গুণ নিয়ে যদি কাটাকাটি করা যায় তবে দেখবেন খণ্ড ফ্র্যাক্‌শন সব কেটে গিয়ে বাকি থাকবে—এক। তাকেই বলি আমরা অখণ্ড-তত্ত্ব।

ভবদুলাল। এইবার বুঝেছি। এই যেমন তাসে তাসে জোড় মিলিয়ে সব গেল কেটে, বাকি রইল—গোলামচোর।

সত্যবাহন। কিন্তু সাধন করলে দেখা যায়, এর উপরেও একটা অবস্থা আছে। সেটা হচ্ছে সমসাম্যভাব, অর্থাৎ খণ্ডাখণ্ড-মীমাংসা। এ অবস্থায় উঠতে পারলে তখন ঠিকমতো সমীক্ষা সাধন আরম্ভ হয়।

ভবদুলাল। ‘সমীক্ষা’ আবার কি?

সত্যবাহন। সাধনের স্তরে উঠে যেটা পাওয়া যায়, তাকে বলে সমীক্ষা—সেটা কি রকম জানেন?

ভবদুলাল। থাক, আজ আর নয়। আমার আবার কেমন মাথার ব্যারাম আছে।

সত্যবাহন। না, আমি ওর ভেতরকার জটিল তত্ত্বগুলো কিছু বলছি না, খালি গোড়ার কথাটা একটুখানি ধরিয়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ এটুকু তলিয়ে দেখবেন যে ঘোড়াটা যে অর্থে ঘাস খাচ্ছে গরুটা ঠিক সে অর্থে ঘাস খাচ্ছে কিনা—

ভবদুলাল। তা কি করে খাবে? এ হল ঘোড়া, ও হল গরু—তবে দুজনের যদি একই মালিক হয়, তবে এ-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে, ও-ও মালিকের অর্থে খাচ্ছে—

সত্যবাহন। না, না—আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতে পারেননি।

ভবদুলাল। ও—তা হবে। আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। আজকে তাহলে উঠি। অনেক ভালো ভালো কথা শোনা গেল—বই লেখবার সময় কাজে লাগবে।

ঈশান। ওঁকে একখানা নোটিস দিয়েছেন ত?

জনার্দন। ও, না। এই একখানা নোটিস নিয়ে যান ভবদুলালবাবু। আজ অমাবস্যা, সন্ধ্যার সময় আমাদের সমীক্ষা-চক্র বসবে।

সোমপ্রকাশ। আজ ঈশানবাবু চক্রাচার্য—ওঃ! ওঁর ইয়ে শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।

ঈশান। এই তত্ত্ব-টত্ত্ব যে সব শুনলেন ওগুলো হচ্ছে বাইরের কথা। আসল ভেতরের জিনিস যদি কিছু পেতে চান তবে তার একমাত্র উপায় হচ্ছে সমীক্ষা-সাধন।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমীক্ষা মন্দির

[অন্ধকার ঘরের মাঝখানে লাল বাতি, ধূপধুনা ইত্যাদি। কপালে চন্দন মাখিয়া ঈশান উপবিষ্ট, তার পাশে একদিকে সোমপ্রকাশ ও জনার্দন, অপর দিকে নিকুঞ্জ ও দুইটি শূন্য আসন।]

[ঈশানের সংগীত ও তৎসঙ্গে সকলের যোগদান]

ঈশান। দেখতে দেখতে সব যেন নিস্তেজ হয়ে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল। বোধ হল যেন ভেতরকার খণ্ড খণ্ড ভাবগুলো সব আলগা হয়ে যাচ্ছে। যেন চারদিকে কি একটা কাণ্ড হচ্ছে, সেটা ভেতরে হচ্ছে কি বাইরে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। কেবল মনে হচ্ছে, ঝাপসা ছায়ার মতো কে যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। ঘুরছে ঘুরছে আর মনের বাঁধন সব খুলে আসছে।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

ভবদুলাল। (সশব্দে খাতা ফেলিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে) বাস্ রে! কি গরম!

সকলে। স্-স্-স্-স্...

ভবদুলাল। এখন সেই মক্ষিকা চক্র হবে বুঝি?

নিকুঞ্জ। এখন কথা বলবেন না—স্থির হয়ে বসুন।

সোমপ্রকাশ। মক্ষিকা নয়—সমীক্ষা।

ঈশান। অনেকক্ষণ চেয়ে তারপর ভয়ে ভয়ে বললাম, 'কে?' শুনলাম আমার বুকের ভিতর থেকে ক্ষীণ সরু গলায় কে যেন বললে 'আমি।' বোধ হল যেন ছায়াটা চলতে চলতে থেমে গেল। তখন সাহস করে আবার বললাম 'কে?' অমনি 'কে-কে-কে' বলে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে কে যেন পর্দার মতো সরে গেল—চেয়ে দেখলাম, আমিই সেই ছায়া, ঘুরছি ঘুরছি আর বাঁধন খুলছে!

জনার্দন। মনের লাটাই ঘুরছে আর সুতো খুলছে, আর আত্মা-ঘুড়ি উধাও হয়ে শূন্যে উড়ে গোঁৎ খাচ্ছে!

ঈশান। কালের স্রোতে উজান ঠেলে ঘুরতে ঘুরতে চলছি আর দেখছি যেন কাছের জিনিস সব ঝাপসা হয়ে সরে যাচ্ছে, আর দূরের জিনিসগুলো অন্ধকার করে ঘিরে আসছে। ভূত, ভবিষ্যৎ সব তাল পাকিয়ে জমে উঠছে আর চারিদিক হতে একটা বিরাট অন্ধকার হাঁ করে আমায় গিলতে আসছে। মনে হল একটা প্রকাণ্ড জঠরের মধ্যে অন্ধকারের জারকরসে অল্পে অল্পে আমায় জীর্ণ করে ফেলছে আর সৃষ্টি প্রপঞ্চের শিরায় আমি অল্পে অল্পে ছড়িয়ে পড়ছি। অন্ধকার যতই জমাট হয়ে উঠছে, ততই আমায় আস্তে আস্তে ঠেলছে আর বলছে, 'আছ নাকি, আছ নাকি?' আমি প্রাণপণে চিৎকার করে বললাম—'আছি।' কিন্তু কোনও আওয়াজ হল না—খালি মনে হল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা

নিঃশ্বাসের মতো উঠছে আর পড়ছে।

ভবদুলাল। উঃ! বলেন কি মশাই?

ঈশান। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, কোনো স্থল নেই, বস্তু নেই—খালি একটা অন্ধপ্রাণের ঘূর্ণি ঝড়ের বাঁধন ঠেলে ঠেলে বুদ্বুদের মতো চারিদিকে ফুলে উঠছে। দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসাব মিলছে না। অন্ধকারের ভাঁজে ভাঁজে পঞ্চতন্মাত্রা সাজানো থাকে, এক জায়গায় তার কাঁচা মশলাগুলো ভূতশুদ্ধি না হতেই হুড়্‌হুড়্ করে স্থূলপিণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি চিৎকার করে বলতে গেলুম 'সর্বনাশ! সর্বনাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়েছে—' কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকে বেরোলই না। বেরোল খালি হা হা হা হা একটা বিকট হাসির শব্দ। সেই শব্দে আমার সমীক্ষাবন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল।

ভবদুলাল। আপনি চলে আসবার পর আমি দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না, আর গুমরে গুমরে ফেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস ফিস করে বলছে—'শেক দি বট্‌ল্, শেক দি বট্‌ল্!'—সত্যি!

ঈশান। কি মশাই আবোল তাবোল বকছেন!

সোমপ্রকাশ। দেখুন, এসব বিষয়ে ফস্ করে কিছু বলতে নেই—আগে ভিতরে ভিতরে ধারণা সঞ্চয় করতে হয়।

জনার্দন। হ্যাঁ, সব জিনিসে কি আর মেকি চলে?

ভবদুলাল। ও, ঠিক হয়নি বুঝি? তা আমার ত অভ্যেস নেই—তার উপর ছেলেবেলা থেকেই কেমন মাথা খারাপ। সেই একবার পাগলা বেড়ালে কামড়েছিল, সেই থেকে ঐ রকম। সে কি রকম হল জানেন? আমার মেজোমামা, যিনি ভাগলপুরে চাকরি করেন, তাঁর ঐ পশ্চিমের ঘরটায় টেঁপি, টেঁপির বাপ, টেঁপির মামা, মনোহর চাটুয্যে—না, মনোহর চাটুয্যে নয়—মহেশ দা, ভোলা—

ঈশান। তাহলে ঐ চলুক, আমি এখন উঠি।

ভবদুলাল। শুনুন না—সবাই বসে বসে গল্প করছে এমন সময়ে আমরা ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ বলে বেড়ালটাকে তাড়া করে ঘরের মধ্যে নিতেই বেড়ালটা এক লাফে জানালার উপর যেই না উঠেছে, অমনি আমি দৌড়ে গিয়ে খপ্ করে ধরেছি তার ল্যাজে—আর বেড়ালটা ফ্যাস করে আমার হাতের উপর কামড়ে দিয়েছে।

[ঈশানের প্রস্থানোদ্যম]

ভবদুলাল। এই একটু শুনে যান—গল্পটা ভারি মজার।

ঈশান। দেখুন, এটা হাসবার এবং গল্প করবার জায়গা নয়।

ভবদুলাল। তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন।

ঈশান। গল্প কি মশাই? সমীক্ষা কি গল্প হল?

জনার্দন। কাকে কি বলে তাই জানেন না, কেন তর্ক করেন মিছিমিছি?

ভবদুলাল। না, না, তর্ক করব কেন? দেখুন তর্ক করে কিছু হবার যো নেই। এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, এ যে তর্ক করে সব চালাচ্ছে, সে কি ভালো করছে? আমি তর্কের জন্য বলিনি।

সত্যবাহন। দেখুন, এ আপনাদের ভারি অন্যায়। ভুলচুক কি আর আপনাদের হয়

না? অমন করলে মানুষের শিখবার আগ্রহ থাকবে কেন?

[আশ্রমের ছাত্র বিনয়সাধনের প্রবেশ]

ঈশান। ঐ দেখ, আবার একটি এসে হাজির। তুমি কে হে?

বিনয়সাধন। আমি? হ্যাঁঃ, আমার কথা কেন বলেন? আমি আবার একটা মানুষ! হ্যাঁ, কি যে বলেন?

ঈশান। বলি, এখানে এয়েছ কি করতে?

সত্যবাহন। কি নাম তোমার?

বিনয়সাধন। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবিনয়সাধন। [পকেট হইতে পত্র বাহির করিয়া] ভবদুলালবাবু কার নাম?

সত্যবাহন। কেন হে, বেয়াদব? সে খবরে তোমার দরকার কি?

নিকুঞ্জ। এ কি এয়ার্কি পেয়েছ? তোমার বাপ ঠাকুর্দার বয়সী ভদ্রলোক সব—ছি, ছি, ছি!

জনার্দন। কি আস্পর্ধা দেখুন ত!

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ—কার বাপের নাম কি, শ্বশুরের বয়েস কত, ওর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

সত্যবাহন। এঁরই নাম ভবদুলালবাবু। এখন কি বলতে চাও এঁর বিরুদ্ধে বল।

বিনয়সাধন। না, না, বিরুদ্ধে বলব কেন?

সত্যবাহন। কাপুরুষ! এইটুকু সৎসাহস নেই—আবার আস্ফালন করতে এসেছ?

বিনয়সাধন। আহা, আমার কথাটাই আগে বলতে দিন—

সত্যবাহন। শুনলেন ভবদুলালবাবু? ওর কথাটা আগে বলতে দিতে হবে। আমাদের কথাগুলোর কোন মূল্যই নেই।

নিকুঞ্জ। দশজনে যা শুনবার জন্যে কত আগ্রহ করে আসে, এঁরা সে সব তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

সোমপ্রকাশ। এইজন্য সাধকেরা বলেন যে মানুষের ভূয়োদর্শনের অভাব হলে মানুষ সব করতে পারে।

বিনয়সাধন। কি আপদ! মশায় চিঠিখানা দিতে এসেছিলুম তাই দিয়ে যাচ্ছি—এই নিন। আচ্ছা ঝকমারি যা হোক! [দ্রুত প্রস্থান]

সোমপ্রকাশ। মানুষের মনের গতি কি আশ্চর্য! একদিকে হেরিডিটি আর একদিকে এন্‌ভাইয়ারনমেণ্ট—এই দুয়ের প্রভাব এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

ভবদুলাল। (পত্র পাঠ করিয়া) শ্রীখণ্ডবাবু আমাকে কাল ওখানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

ঈশান। কি! এত বড় আস্পর্ধা! আবার নিমন্ত্রণ করতে সাহস পান কোন মুখে?

সত্যবাহন। না, যাব না আমরা। সত্যবাহন সমাদ্দার ওঁসব লোকের সম্পর্ক রাখে না।

ভবদুলাল। উনি লিখছেন, 'কাল ছুটির দিন, আপনার সঙ্গে নিরিবিলি বসিয়া কিছু সৎপ্রসঙ্গ করিবার ইচ্ছা আছে।'

ঈশান। ঐ দেখেছেন? 'নিরিবিলি বসিয়া'। কেন বাপু, আমরা এক-আধজন ভদ্রলোক থাকলে তোমার আপত্তিটা কি?

জনার্দন। এর থেকেই বোঝা উচিত যে ওঁর মতলবটা ভালো নয়।

নিকুঞ্জ। ঠিক বলেছেন। মতলব যদি ভালোই হবে, তবে এত ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ কেন? নিরিবিলি বসতে চান কেন?

সোমপ্রকাশ। বুঝলেন ভবদুলালবাবু, আপনি ওখানে যাবেন না। গেলেই বিপদে পড়বেন।

ভবদুলাল। বল কি হে? ছুরিছোরা মারবে নাকি?

সোমপ্রকাশ। না, না, বিপদটা কি জানেন? চিন্তাশীল লোকেরা বলেন যে, বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোনো অবান্তর স্বরূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়।

ভবদুলাল। (পুলকিতভাবে) এ আবার কি বলে শুনুন।

সোমপ্রকাশ। স্বয়ং হার্বার্ট স্পেন্সার একথা বলেছেন। আপনি হার্বার্ট স্পেন্সারকে জানেন ত?

ভবদুলাল। হ্যাঁ...হার্বার্ট, স্পেন্সার, হাঁচি, টিকটিকি, ভূত, প্রেত সব মানি।

সত্যবাহন। আপনি ভাববেন না ভবদুলালবাবু, আপনার কোনো ভয় নেই। আমি আপনার সঙ্গে যাব, দেখি ওরা কি করতে পারে।

নিকুঞ্জ। বাস, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ঈশান। সেই জুবিলির বছর কি হয়েছিল মনে নেই? শ্রীখণ্ডবাবু ওঁদের ওখানে এক বক্তৃতা দিলেন, আমরা দল বেঁধে শুনতে গেলাম। গিয়ে শুনি, তার আগাগোড়াই কেবল নিজেদের কথা। ওঁদের আশ্রম, ওঁদের সাধন, ওঁদের যত সব ছাইভস্ম, তাই খুব ফলাও করে বলতে লাগলেন।

সত্যবাহন। শেষটায় আমি বাধ্য হয়ে উঠে তেজের সঙ্গে বললাম, 'লালাজি দেওনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যে অখণ্ড-সাধন-ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে, তা যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে সে হচ্ছে আমাদের সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।'

ঈশান। ওঁরা সে সব ভেঙেচুরে এখন বিজ্ঞানের আগড়ুম-বাগড়ুম করছেন। আরে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বললেই কি লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়!

নিকুঞ্জ। বেশি দূর যাবার দরকার কি? ওঁরা কি রকম সব ছেলে তৈরি করছেন তাও দেখুন, আর আমাদের সোমপ্রকাশকেও দেখুন।

জনার্দন। একটা আদর্শ ছেলে বললেই হয়।

সোমপ্রকাশ। না, না, ছি ছি ছি, কি বলছেন! আমি এই যেমন লোহিত সাগর আর ভূমধ্য সাগরের মধ্যে সুয়েজ প্রণালী, আমায় সেই রকম মনে করবেন।

জনার্দন। আসল কথা হচ্ছে, আমরা এখন সাধনের যে স্তরে উঠেছি, ওঁরা সে পর্যন্ত ধারণা করতেই পারেননি।

নিকুঞ্জ। ওঃ! গতবারে যদি আপনি থাকতেন! ঈক্ষা ও সমীক্ষা সম্বন্ধে সমাদ্দার মশাই যা বললেন শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ঈশান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঁটা দিয়ে ত উঠত, কিন্তু এখন দুপুর রাত পর্যন্ত আপনাদের ঐ আলোচনাই চলবে নাকি!

[সকলের গাত্রোত্থান]

সত্যবাহন। তাহলে এই কথা রইল, কাল আপনার বাড়ি হয়ে আমি আপনাকে নিয়ে যাব। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম

[ছাত্রেরা সেমিসার্কল হইয়া দণ্ডায়মান। শিক্ষক নবীনবাবু প্রভৃতি ব্যস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। শ্রীখণ্ডদেব ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের উপর বড় বড় বই সাজাইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। একপাশে কতকগুলি অদ্ভুত যন্ত্র ও অর্থহীন চার্ট প্রভৃতি। দেয়ালে কতকগুলি কার্ডে নানারকম মটো লেখা রহিয়াছে।]

নবীন। (জানলা দিয়া বাহিরে তাকাইয়া) এই মাটি করেছে! সঙ্গে সঙ্গে সত্যবাহন সমাদ্দারও আসছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড। আসুক, আসুক। একবার চোখ মেলে সব দেখে যাক। তারপর দেখি, ওর কথা বলবার মুখ থাকে কিনা।

নবীন। এসে একটা গোলমাল না বাধালেই হয়।

শ্রীখণ্ড। তা যদি করে তাহলে দেখিয়ে দেব যে শ্রীখণ্ড লোকটিও বড় কম গোলমেলে নয়।

[সত্যবাহন ও ভবদুলালের প্রবেশ]

সত্যবাহন। এই যে, ছেলেগুলো সব হাজির রয়েছে দেখছি।

শ্রীখণ্ড। না, সব আর কোথায়? ছুটিতে অনেকেই বাড়ি গিয়েছে।

সত্যবাহন। খালি খুব খারাপ ছেলেগুলো রয়ে গেছে বুঝি?

শ্রীখণ্ড। খারাপ ছেলে আবার কি মশায়? মানুষ আবার খারাপ কি? খারাপ কেউ নয়! ঘোর অসাম্য বদ্ধ পাষণ্ড যে তাকেও আমরা খারাপ বলি না।

ভবদুলাল। তা ত বটেই। ও-সব বলতে নেই। আমি একবার আমাদের গোবরা মাতালকে খারাপ লোক বলেছিলাম, সে এত বড় একটা থান ইট নিয়ে আমায় মারতে এসেছিল। ওরকম কক্ষনো বলবেন না।

সত্যবাহন। সে কি মশায়! যে খারাপ তাকে খারাপ বলব না? আলবাৎ বলব। খারাপ ছেলে!

শ্রীখণ্ড। আহা-হা, উনি আশ্রমের শিক্ষক—নবীনবাবু।

সত্যবাহন। ও, তাই নাকি? যাই হোক, তুমি কি পড় হে ছোকরা?

ছাত্র। শব্দার্থ-খণ্ডিকা, আয়স্কন্ধ-পদ্ধতি, লোকাষ্টপ্রকরণ, সিন্নেক্‌স্ কস্‌মোপোডিয়া, পালস এক্সট্রা সাইক্লিক ইকুইলিব্রিয়ম অ্যান্ড দি নেগেটিভ জিরো—

সত্যবাহন। থাক, থাক, আর বলতে হবে না! দেখুন, অত বেশি পড়িয়ে কিছু লাভ হয় না। আমি দেখেছি ভালো বই খান-দুই হলেই এদিককার শিক্ষা সব একরকম হয়ে যায়।

ভবদুলাল। আমার 'চলচিত্তচঞ্চরি' বইখানা আপনাদের লাইব্রেরিতে রাখেন না কেন?

শ্রীখণ্ড। বেশ ত, দিন না এক কপি।

ভবদুলাল। আচ্ছা, দেব এখন। ওটা হয়েছে কি, বইটা এখনো বেরোয়নি। মানে খুব বড় বই হচ্ছে কিনা; অনেক সময় লাগবে। কোথায় ছাপতে দিই বলুন ত?

শ্রীখণ্ড। ও, এখনো ছাপতে দেননি বুঝি?

ভবদুলাল। না, এই লেখা হলেই ছাপতে দেব। আগে একটা ভূমিকা লিখতে হবে ত? সেটা কি রকম লিখব তাই ভাবছি। খুব বড় বই হবে কিনা!

শ্রীখণ্ড। কি নাম বললেন বইখানার?

ভবদুলাল। কি নাম বললাম? চলচঞ্চল, কি না? দেখুন ত মশাই, সব ঘুলিয়ে দিলেন—এমন সুন্দর নামটা ভেবেছিলাম।

সত্যবাহন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল বাজারে দুখানা বই বেরিয়েছে—সাম্য-নির্ঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত-বিশুদ্ধিকা—তাতে শিক্ষাতত্ত্ব আর সাধনতত্ত্ব এই দুটো দিকই সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীখণ্ড। ঐ ত—ও বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না। আমরা বলি—অখণ্ড শিক্ষার আদর্শ এমন হওয়া উচিত যে তার মধ্যে বেশ একটা সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য থাকবে—যেমন নিঃশ্বাস এবং প্রশ্বাস।

সত্যবাহন। ঐ করেই ত আপনারা গেলেন। এদিকে ছেলেগুলোর শাসন-টাসনের দিকে আপনাদের এক ফোঁটা দৃষ্টি নেই।

শ্রীখণ্ড। শাসন আবার কি মশাই? জানেন, ছেলেদের ধমক-ধামক শাসন এতে আমি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করি।

ভবদুলাল। আমারও ঠিক ঐ রকম। আমি যখন পাটনায় মাস্টার ছিলুম—একদিন একেবারে বারো চোদ্দটা ছেলেকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দেখলুম সন্ধ্যের সময় ভারি ক্লেশ হতে লাগল—হাত টন্‌টন্‌, কাঁধে ব্যথা।

সত্যবাহন। যাক, যে কথা বলছিলাম। আমরা আজ কদিন থেকে বিশেষভাবে চিন্তা করে বেশ বুঝতে পারছি যে এদের শিক্ষার মধ্যে কতকগুলো গুরুতর গলদ থেকে যাচ্ছে। কেবল নির্বিকল্প সত্যের অনুরোধেই আমি সেদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি। যথা—(পাঠ)—প্রথম সাম্যসাধনাদি অবশ্য সম্পাদনীয়—বিষয় অনৈকাগ্রতা, অনভিনিবেশ ও চঞ্চলচিত্ততা।

ভবদুলাল। 'চলচিত্তচঞ্চরি'—মনে হয়েছে।

সত্যবাহন। বাধা দেবেন না। দ্বিতীয়—বিবিধ মৌলিক বিষয়ে সম্যক শিক্ষাভাব-জনিত খণ্ডাখণ্ড বিচারহীনতা। তৃতীয়—বিবেক-বৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা—

ভবদুলাল। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন। হোক দেরি। বিবেকবৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত—

ভবদুলাল। ওটা বলা হয়েছে—

সত্যবাহন। আঃ—নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা ও আত্মপ্রচার-তৎপরতা। চতুর্থ—শ্রদ্ধা গাম্ভীর্যাদি পরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব। পঞ্চম—

শ্রীখণ্ড। দেখুন, ও-সব এখন থাক। আপনাদের এ-সব অভিযোগ আমরা অনেক শুনেছি। তার জবাব দেবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু তাহলেও সম্যক শিক্ষাভাব বলে যেটা বলছেন সেটা একেবারে অন্যায়। যে-রকম সাবধানতার সঙ্গে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে আমরা আধুনিক মেটাসাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অনুসারে সমস্ত শিক্ষা দিয়ে থাকি—তার সম্বন্ধে এমন অভিযোগের

কোনো প্রমাণ আপনি দিতে পারেন?

সত্যবাহন। একশোবার পারি। তাহলে শুনবেন? আপনাদেরই কোন এক ছাত্রের কাছে কোন একটি ভদ্রলোক খণ্ডাখণ্ডের যে ব্যাখ্যা শুনলেন—আমাদের নিকুঞ্জবাবুর দাদা বলছিলেন সে একেবারে রাবিশ—মানেই হয় না।

শ্রীখণ্ড। তাতে কি প্রমাণ হল? ও ত একটা শোনা কথা।

সত্যবাহন। দেখুন, নিকুঞ্জবাবু আমার অত্যন্ত নিকট বন্ধু। তাঁর দাদাকে অবিশ্বাস করা আর আমাকে মিথ্যাবাদী বলা একই কথা।

শ্রীখণ্ড। তাহলে দেখছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করতে হয়।

সত্যবাহন। দেখুন, উত্তেজিত হবেন না। উত্তেজিতভাবে কোনো প্রসঙ্গ করা আমার রীতিবিরুদ্ধ।

ভবদুলাল। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সত্যবাহন। আঃ—কেন বাধা দিচ্ছেন? জিজ্ঞাসা করি খণ্ডাখণ্ডের যে তত্ত্বপর্যায় সেটা আপনারা স্বীকার করেন ত?

শ্রীখণ্ড। আমরা বলি, খণ্ডাখণ্ডটা তত্ত্বই নয়—ওটা তত্ত্বাভাষ। আর সমসাম্য যেটাকে বলেন সেটা সাধন নয়—সেটা হচ্ছে একটা রসভাব। আপনারা এ-সব এমনভাবে বলেন যেন খণ্ডাখণ্ড সমসাম্য সব একই কথা। আসলে তা নয়। আপনারা যেখানে বলেন—কেন্দ্রগতং নির্বিশেষং, আমরা সেখানে বলি—কেন্দ্রগতং নির্বিশেষঞ্চ। কারণ ও-দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। আপনারা যা আওড়াচ্ছেন ও-সব সেকেলে পুরোনো কথা—এ-যুগে ও-সব চলবে না। একালের সাধন বলতে আমরা কি বুঝি শুনবেন—? (ছাত্রের প্রতি) বল ত, সাধন কাকে বলে।

ছাত্র। নবাগত যুগের সাধন একটা সহজ বৈজ্ঞানিক প্রণালী যার সাহায্যে একটা যে কোনো শব্দ বা বস্তুকে অবলম্বন করে তারই ভিতর থেকে উত্তরোত্তর পর্যায়-ক্রমে নানা রকম অনুভূতির ধারাকে অব্যাহত স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রীখণ্ড। শুনলেন ত? আপনাদের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাৎ। ওটা আবার বল ত হে।

ছাত্র। (পুনরাবৃত্তি)

সত্যবাহন। দেখুন, কোনো কথা ধীরভাবে শুনবেন সে সহিষ্ণুতা আপনার নেই। অকাট্য কর্তব্যের প্রেরণায় আপনারই উপকারের জন্য এ-কথা আজকে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ঐ অহঙ্কার ও আত্মসর্বস্বতাই আপনার সর্বনাশ করবে। চলুন, ভবদুলালবাবু।

ভবদুলাল। এই একটু শুনে যাই। বেশ লাগছে মন্দ না।

সত্যবাহন। তাহলে শুনুন, খুব করে শুনুন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড--
[প্রস্থান]

ভবদুলাল। হ্যাঁ, তারপর সেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, ওটা এই আশ্রমের একটা বিশেষত্ব—একটা গ্রাজুয়েটেড সাইকো-থীসিস অভ ফোনেটিক ফরম্স! ওটা অবলম্বন করে অবধি আমরা আশ্চর্য ফল পাচ্ছি। অথচ আমাদের প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রেরা পর্যন্ত এর সাধন করে থাকে। মনে করুন যে-কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—কতখানি জোরের কথা একবার ভাবুন ত?

ভবদুলাল। চমৎকার! আমার চলচ্চিত্তচঞ্চরিতে ওটা লিখতেই হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে কোনো সাধারণ শব্দ বা বস্তু—একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

শ্রীখণ্ড। হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? 'গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্র-দিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে', গো মানে গরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং'; 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে—মিউজিক অভ দি স্ফীয়ার্স—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ খণ্ডিকায় এই রকম দেড় হাজার শব্দ আমি খণ্ডন করে দেখিয়েছি! গরুর সূত্রটা বল ত হে।

ছাত্রগণ। খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী
শবদে শবদে মন্থিত অরণী,
ত্রিজগৎ যজ্ঞে শ্বাশ্বত স্বাহা—
নন্দিত কলকল ক্রন্দিত হাহা!
স্তম্ভিত সুখ দুখ মন্থন মোহে
প্রলয় বিলোড়ন লটপট লোহে;
মৃত্যু ভয়াবহ হম্বা হম্বা
রৌরব তরণী তুহুঁ জগদম্বা
শ্যামল স্নিগ্ধা নন্দন বরণী
খণ্ডিত গোধন মণ্ডল ধরণী॥

ভবদুলাল। ঐ গোরুর কথা যা বললেন—আমি দেখেছি মহিষেরও ঠিক তাই। জয়রামের মহিষ একবার আমায় তাড়া করেছিল—তারপর যেই না গুঁতো মেরেছে অমনি দেখি সব বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তখন মনে হল—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানিচ। আচ্ছা আপনারা সমীক্ষা-টমীক্ষা করেন না?

শ্রীখণ্ড। ওগুলো মশায়, করে করে বুড়ো হয়ে গেলাম। আসল গোড়াপত্তন ঠিক না হলে ও-সবে কিছু হয় না। ওদের খণ্ডাখণ্ড আর আমাদেব শব্দার্থ-খন্ডন—দুটোই দেখলেন ত? আসল কথা ওদের মতলবটা হচ্ছে একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবেন। খণ্ড সাধন হতে না হতেই ওঁরা এক লাফে আগ ডালে গিয়ে চড়ে বসতে চান। তাও কি হয় কখন?

নবীন। দেখুন, এরা কিছু শুনবে বলে আশা করে আছে। আপনি এদের কিছু বলুন।

ভবদুলাল। বেশ ত, দেখ বালকগণ, চলচিত্তচঞ্চরি বলে আমার একখানা বড় বই হবে —ডবল ডিমাই ৭০০ কি ৮০০ পৃষ্ঠা—দামটা এখনো ঠিক করিনি—একটু কম করেই করব ভাবছি—আচ্ছা, চার-টাকা করলে কেমন হয়? একটু বেশি হয় না? আচ্ছা ধরুন ৩৷৷০ টাকা? ঐ বইয়ের মধ্যে নানারকম ভালো ভালো কথা লেখা থাকবে। যেমন মনে কর, এই এক জায়গায় আছে—চুরি করা মহাপাপ—যে না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করে তাহাকে চোর বলে। তোমরা না বলে কখনো পরের জিনিস নিয়ো না। তবে অবিশ্যি সব সময় ত আর বলে নেওয়া যায় না। যেমন, আমি একবার একটি ভদ্রলোককে বললাম, 'মশায় আপনার সোনার ঘড়িটা আমাকে দেবেন?' সে বলল, 'না দেব না।' ছোটলোক! আমরা ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলাম তার নাম মনে নেই—তার মধ্যে একটা গল্প ছিল—তার সবটা মনে পড়ছে না—ভুবন বলে একটা ছেলে তার মাসির কান কামড়ে দিয়েছিল। মনে কর

তার নিজের কান ত নয়—মাসির কান। তবে না বলে কামড়ে নিল কেন? এর জন্য তার কঠিন শাস্তি হয়েছিল।

শ্রীখণ্ড। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই থাক। আবার আসবেন ত?

ভবদুলাল। আসব বই কি! রোজ আসব। এই ত আজকেই আমার সতেরো পৃষ্ঠা লেখা হয়ে গেল। এ রকম হপ্তাখানেক চললেই বইখানা জমে উঠবে। আচ্ছা আজ আসি। [গুন গুন গান করিতে করিতে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

[ঈশান, নিকুঞ্জ, জনার্দন ও সোমপ্রকাশ উপবিষ্ট। সত্যবাহনের প্রবেশ]

জনার্দন। তারপর সেদিন ওখানে কি হল?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, আপনি ক'দিন আসেননি; আমরা শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছি।

সত্যবাহন। হবে আর কি, হুঃ! এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয় যে শ্রীখণ্ডবাবু একদিন আমাদেরই একজন ছিলেন। আজ আমাদের সংস্পর্শে থাকলে তাঁর কি এমন দশা হত? সামান্য ভদ্রতা পর্যন্ত ওঁরা ভুলে গেছেন।

ঈশান। ভবদুলালবাবুকে ওখানেই রেখে এলেন নাকি?

সত্যবাহন। তাঁর কথা আর বলবেন না। তিনি তাঁর গুরুর নামটি একেবারে ডুবিয়েছেন। কি বলব বলুন, তাঁর সামনে শ্রীখণ্ডবাবু আমায় বার বার কি রকম দারুণভাবে অপমান করতে লাগলেন—উনি তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলেন না—উলটে বরং ওঁদের সঙ্গেই নানারকম হৃদ্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

নিকুঞ্জ। ছি, ছি, ছি, এ একেবারে অমার্জনীয়।

সোমপ্রকাশ। দেখুন, কিসে যে কি হয় তা কি কেউ বলতে পারে? আমরা অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছি ভবদুলালবাবু আমাদের ত্যাগ করেছেন—আমি বলি কে জানে?—হয়ত অলক্ষিতে আমাদের প্রভাব এখনো তাঁর উপর কাজ করছে।

সত্যবাহন। ওসব কিছু বিশ্বাস নেই হে—সামান্য বিষয়ে যে খাঁটি ও ভেজাল চিনতে পারে না—তার থেকে কি আর আশা করতে বল?

ঈশান। (গান) কিসে যে কি হয় কে জানে!
কেউ জানে না, কেউ জানে না
যার কথা সে বুঝেছে সে জানে।

[বাহিরে পদশব্দ ও গান গাহিতে গাহিতে ভবদুলালের প্রবেশ—টুইঙ্কল-টুইঙ্কল-এর সুর]

ভয় ভয় ভীতি ভাবনা প্রভৃতি—

ঈশান। ও কি রকম বিশ্রী সুরে গাইছেন বলুন ত?

ভবদুলাল। ওটা আমার একটা নতুন গান।

ঈশান। আপনার গান কি রকম? আমি আজ পাঁচ বছর ওটা গেয়ে আসছি। আর ওটার ও রকম সুর মোটেই নয়। ওটা এই রকম—(গান)।

ভবদুলাল। তাই নাকি? ওটা আপনার গান? ঐ যা, ওটাও আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে দিয়ে ফেলেছি। তা আপনার নামেই দিয়ে দেব।

নিকুঞ্জ। কি মশায়, আপনার আশ্রমিক পর্ব শেষ হল?

ভবদুলাল। কি বললেন? কি পর্বত?

নিকুঞ্জ। বলি আশ্রমের শখটা মিটল?

ভবদুলাল। হ্যাঁ, দুদিন বেশ জমেছিল, তারপর ওঁরা কি রকম করতে লাগলেন তাই চলে এলাম। আসবার সময় একটা ছেলের কান মলে দিয়ে এসেছি।

সোমপ্রকাশ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন দূরের জিনিসকে কাছে এনে দেখায় তেমনি কিছুক্ষণ আগে আমার একটা অনুভূতি এসেছিল যে আপনি হয়ত আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

ভবদুলাল। ওঁদের আশ্রমে একটা দূরবীণ আছে—তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্‌কা ফোস্‌কা মতন পড়ে যায়। বোধ হয় থাউজ্যাণ্ড হর্‌স্‌-পাওয়ার, কি তার চাইতেও বেশি হবে।

ঈশান। এত বুজরুকিও জানে ওরা।

জনার্দন। ওঁকে ভালোমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাং বুঝিয়ে দিয়েছে।

ভবদুলাল। হ্যাঁ, ব্যাং বলতে মনে হল—সোমপ্রকাশের কথা ওঁরা কি বলেছেন শোনেননি বুঝি?

সোমপ্রকাশ। না, না, কিছু বলেছেন নাকি?

ভবদুলাল। আমি ওঁদের কাছে সোমপ্রকাশের সুখ্যাতি করছিলাম, তাই শুনে শ্রীখণ্ডবাবু বললেন যে আমরা চাই মানুষ তৈরি করতে—কতকগুলো কোলা ব্যাং তৈরি করে কি হবে?

নিকুঞ্জ। আপনি এর কোনো প্রতিবাদ করলেন না?

ভবদুলাল। না—তখন খেয়াল হয়নি।

সোমপ্রকাশ। মানুষকে চেনা বড় শক্ত। হ্যর্বাট ল্যাথাম্‌ তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ক্ষমতা এবং অক্ষমতার দুইয়েরই মৌলিক রূপ এক। ওঁরা একথা স্বীকার করবেন কিনা জানি না।

ভবদুলাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব স্বীকার করেন—এই ত সেদিন আমায় বলছিলেন যে ঈশেন আর সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দ্যাখ্‌ আর ও বলে আমায় দ্যাখ্‌। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোসের মতন চেহারা, ওরও তেমনি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা!

সত্যবাহন। কি! এত বড় আস্পর্ধা! আমায় কানকাটা খরগোস বলে!

ভবদুলাল। না, না, আপনাকে ত তা বলেননি—আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ। কি অভদ্র ভাষা! আমায় কিছু বললে?

ভবদুলাল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—তা বললে, নিকুঞ্জ কোনটা? —ঐ যে ছাগ্‌লা দাড়ি, না যার ডাবা হুঁকোর মত মুখ?

নিকুঞ্জ। আপনি কি বললেন?

ভবদুলাল। আমি বললাম ডাবা হুঁকো।

নিকুঞ্জ। নাঃ—এক একটা মানুষ থাকে, তাদের মাথায় খালি গোবর পোরা!

ভবদুলাল। কি আশ্চর্য! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক তাই বলেন। বলেন ওদের মাথায় খালি গোবর—তাও শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেছে।

সত্যবাহন। এসব আর সহ্য হয় না। মশায়, আপনি ওখানে ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?

ঈশান। আহা, ও কি? উনি আগ্রহ করে আসছেন সে ত ভালোই।

জনার্দন। হ্যাঁ, বেশ ত, উনি আসুন না।

সত্যবাহন। আগ্রহ কি নিগ্রহ কে জানে?

নিকুঞ্জ। হ্যাঁ, অত অনুগ্রহ নাই করলেন।

ভবদুলাল। হাঃ, হাঃ, হাঃ, ওটা বেশ বলেছেন। ছেলেবেলায় আমাদের সঙ্গে একজন পড়ত—সেও ঐ রকম কথা গোলমাল করত। দ্রাক্ষাকে বলত দ্রাহ্মা! ঐ 'ক'-এ মূর্ধণ্য 'ষ'-এ ক্ষ, আর 'হ'-এ 'ম'-এ হ্ম, বুঝলেন না?

সত্যবাহন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি মশায়।

ভবদুলাল। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—শৃগাল ও দ্রাক্ষা ফল। দ্রাক্ষা বলে এক রকম ফল আছে—মানে আছে কিনা জানি না, কিন্তু তর্ক করে ত লাভ নেই' মনে করুন যদি বলেন নেই, তা সে আপনি বললেও আছে, না বললেও আছে। তাহলে তর্ক করে লাভ কি? কি বলেন?

সত্যবাহন। আপনার কাছে কোনো কথা বলাই বৃথা।

ভবদুলাল। না, না, বৃথা হবে কেন? ওটা আমার চলচিত্তচঞ্চরিতে দিয়েছি ত। আপনার নাম করেই দিয়েছি।

সত্যবাহন। আমার নাম করেছেন, কি রকম? আপনি ত সাংঘাতিক লোক দেখছি মশায়। দেখুন, ঐ যা-তা লিখবেন আর আমার নামে চালাবেন—এ আমি পছন্দ করি না।

ভবদুলাল। বাঃ! নাম করব না? তা নইলে শেষটায় লোকে আমায় চেপে ধরবে আর আমি জবাব দিতে পারব না, তখন? সে হচ্ছে না। ঐ ঈশানবাবুর বেলাও তাই। যার যার গান, তার তার নাম।

সত্যবাহন। দেখুন, আপনি সহজ কথা বুঝবেন না আবার জেদ করবেন।

ভবদুলাল। ও, ভুল হয়েছে বুঝি? তা আমার আবার মাথার ব্যারাম আছে কিনা। সেই সেবার সজারুতে কামড়েছিল—

ঈশান। কি মশায়, সেদিন বললেন বেড়াল, আর আজ বলছেন সজারু।

ভবদুলাল। ও, তাই নাকি? বেড়াল বলেছিলাম নাকি? তা হবে। তা, ও বেড়ালও যা সজারুও তাই। ও কেবল দেখবার রকমারি কিনা। আসলে বস্তু ত আর স্বতন্ত্র নয়। কারণ কেন্দ্রগতং নির্বিশেষম্। কি বলেন? ওটাও দিয়ে দিই, কেমন?

সত্যবাহন। দেখুন, যে বিষয়ে আপনার বুঝবার ক্ষমতা হয়নি সে বিষয়ে এ রকম যা-তা যদি লেখেন তবে আপনার সঙ্গে আমার জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি।

ভবদুলাল। কি মুশকিল! শ্রীখণ্ডবাবুও ঠিক ঐ রকম বললেন। ওঁদেরই কতকগুলো ভালো ভালো কথা সেদিন আমি ছেলেদের কাছে বলছিলাম; এমন সময় উনি রেগে—'ও-সব কি শেখাচ্ছেন' বলে একেবারে তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিলেন। তাই ত চলে এলাম।

ঈশান। একি মশায়? খাতায় এসব কি লিখেছেন!

ভবদুলাল। কেন, কি হয়েছে বলুন দেখি?

ঈশান। কি হয়েছে? এই আপনার চলচিত্তচঞ্চরি? এসব কি? ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ঈশেনবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হাঁ করে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিঃশ্বাস উঠছে আর পড়ছে—সব ঝাপ্‌সা দেখছে—গা ঝিম-ঝিম—নাক্স ভমিকা থার্টি—

ভবদুলাল। বাঃ! ও ওগুলো ত আপনাদেরই কথা। শুধু নাক্স ভমিকাটা আমার লেখা।

[ঘোর উত্তেজনা]

সকলে। দিন দেখি খাতাখানা।

ভবদুলাল। আঃ—আমার চলচিত্তচঞ্চরি—

সত্যবাহন। ধ্যেৎ তেরি চলচিত্তচঞ্চরি—

ভবদুলাল। ওকি মশায়—টানাটানি করেন কেন? একে ত শ্রীখণ্ডবাবু তেইশখানা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন—হাঁ, হাঁ, হাঁ, করেন কি, করেন কি? দেখুন দেখি মশায়, আমার চলচিত্তচঞ্চরি ছিঁড়ে দিলে!

[ছেঁড়া খাতা সংগ্রহের চেষ্টা]

সত্যবাহন। এই ঈশেনবাবুর যত বাড়াবাড়ি। আপনার ওসব গান আর সমীক্ষা ওঁকে শোনাবার কি দরকার ছিল?

ঈশান। আপনি আবার আহ্লাদ করে ওঁর কাছে খণ্ডাখণ্ডের ব্যাখ্যা করতে গেলেন কেন?

ভবদুলাল। খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তা কি হয়েছে। আবার লিখব—চলচিত্তচঞ্চরি—লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড় বড় করে সোনাব জলে লেখা—চলচিত্তচঞ্চরি—পাবলিশ্‌ড্‌ বাই ভবদুলাল। একুশ টাকা দাম করব। তখন দেখব—আপনাদের ঐ সাম্যঘণ্ট আর সিদ্ধান্ত বিসূচিকা কোথায় লাগে।

[গান]

সংসার কটাহ তলে জ্বলে রে জ্বলে!
জ্বলে মহাকালানল জ্বলে জ্বল জ্বল,
সজল কাজল জ্বলে রে জ্বলে।
অলক তিলক জ্বলে ললাটে,
সোনালী লিখন জ্বলে মলাটে,
খেলে কাঁচাকচু জ্বলে চুলকানি
জ্বলে রে জ্বলে।

ভাবুক-সভা

[ভাবুকদাদা নিদ্রাবিষ্ট—ছোকরা ভাবুকদলের প্রবেশ]

ভাবুক নং ১। ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ না ব্যাপারটা?
ভাবুকদাদা মূর্ছাগত, মাথায় গুঁজে র‍্যাপারটা!
ভাবুক নং ২। তাইত বটে! আমি বলি এত কি হয় সহ্য?
সকাল বিকাল এমন ধারা ভাবের আতিশয্য!
নং ১। অবাক কল্লে! ঠিক যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত—
ভাবের ঝোঁকে এক্কেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত।
সাংঘাতিক এ ভাবের খেলা বুঝতে নারে মূর্খ—
ভাবরাজ্যের তত্ত্ব রে ভাই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম!
নং ২। ভাবটা যখন গাঢ় হয়—বলে গেছেন ভক্ত—
হৃদয়টাকে এঁটে ধরে আঠার মতো শক্ত।
নং ১। (যখন) ভাবের বেগে জোয়ার লেগে বন্যা আসে তেড়ে,
আত্মারূপী সূক্ষ্ম শরীর পালায় দেহ ছেড়ে—
(কিন্তু) হেথায় যেমন গতিক দেখছি শঙ্কা হচ্ছে খুবই
আত্মা পুরুষ গেছেন হয়তো ভাবের স্রোতে ডুবি।
যেমন ধারা পড়ছে দেখ গুরু গুরু নিশ্বাস,
বেশিক্ষণ বাঁচবে এমন কোরো নাক বিশ্বাস।
কোনখানে হায় ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম কোনো স্নায়ু
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা, তাইতে অল্প আয়ু।

[বিলাপ সংগীত]

ভবনদী পার হবি কে চড়ে ভাবের নায়?
ভাবের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভবের পারে যায় রে
ভাবুক ভবের পারে যায়।
ভবের হাটে ভাবের খেলা, ভাবুক কেন ভোল?
ভাবের জমি চাষ দিয়ে ভাই ভবের পটোল তোল রে
ভাই ভবের পটোল তোল।
শান বাঁধান মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চরে—
ভাবের মাথায় টোক্কা দিলে বাক্য-মাণিক ঝরে রে মন
বাক্য-মাণিক ঝরে।
ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায়
ভাব-তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে
ভাবুক ভাবের খাবি খায়।

[কীর্তন 'জমাট' হওয়ায় ভাবুকদাদার নিদ্রাচ্যুতি]

ভাবুক দাদা। জুতিয়ে সব সিধে কর্‌ব, ব'লে রাখছি পষ্ট,—
চ্যাঁচামেচি ক'রে ব্যাটা ঘুমটি করলি নষ্ট?
নং ১। ঘুম কি হে? সিকি কথা? অবাক কল্লে খুব!
ঘুমোওনি ত—ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব।
ঘুমোয় যত ইতর লোকে—তেলী মুদি চাষা—
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা।
দাদা। সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝোঁকে টং,
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দেখছি ভাবের রং;
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকনো নদীর পাঁকে,
ভাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক পড়ে থাকে।
নং ১। তাই ত বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গুঁজি
ভাবের ঘোরে ভোঁ হয়ে যাই চক্ষু দুটি বুজি।
নং ২। হাঃ হাঃ হা—দাদা তোমার বচনগুলো খাসা,
ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে ঠাসা!
দাদা। ভাবের ঝোঁকে দেখতেছিলেম স্বপ্ন চমৎকার
কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার।
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দমকায়,
গাছের পাতা শিহরি কাঁপে, বিজলী ঘন চমকায়,
মাভৈ রবে ডাকছি সবে খুঁজছি ভাবের রাস্তা,
(এই) ভণ্ডগুলোর গণ্ডগোলে স্বপ্ন হল ভ্যাস্তা।
নং ১। যা হবার তা হয়ে গেছে—ব'লে গেছেন আর্য—
গতস্য শোচনা নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্য।
নং ২। কি আশ্চর্য, ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশায়
এমনি করে মহাত্মারা পড়েন ভাবের দশায়!
দাদা। অন্তরে যার মজুত আছে ভাবের খোরাকি—
(তার) ভাবের নাচন মরণ বাঁচন বুঝবি তোরা কি?
নং ২। পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা—আর কি প্রমাণ বাকি
পায়ের ধুলো দাও ত দাদা মাথায় একটু মাখি।
দাদা। সবুর কর স্থিরোভব, রাখ এখন টিপ্পনী,
ভাবের একটা ধাক্কা আসছে, সরে দাঁড়াও এক্ষনি!

[ভাবের ধাক্কা]

নং ১। বিনিদ্র চক্ষু, মুখে নাহি অন্ন
আক্কেল বুদ্ধি জড়তাপন্ন!
স্নানবিহীন যে চেহারা রুক্ষ—
এত কি চিন্তা—এত কি দুঃখ?
নং ২। সঘনে বহিছে নিশ্বাস তপ্ত—
মগজে ছুটিছে উদ্দাম রক্ত।
দিন নাই রাত নাই—লিখে লিখে হাত ক্ষয়—
একেবারে প'ড়ে গেলে ভাবের পাতকোয়!

দাদা। শৃঙ্খল টুটিয়া উন্মাদ চিত্ত
আঁকুপাঁকু ছন্দে করিছে নৃত্য—
নাচে ল্যাগ্‌ব্যাগ্‌ তাণ্ডব তালে
ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।
জাগ্রত ভাবের শব্দ পিপাসা
শূন্যে শূন্যে খুঁজিছে ভাষা।
সংহত ভাবের ঝঙ্কার মাঝে
বিদ্রোহ ডম্বরু অনাহত বাজে।
নং ২। (হ্যাঁ হ্যাঁ) ঐ শোনো দুড়্‌দাড়্‌ মার মার শব্দ
দেবাসুর পশুনর ত্রিভুবন স্তব্ধ।
নং ১। বাজে শিঙা ডম্বরু শাঁখ জগঝম্প,
ঘন মেঘ গর্জন, ঘোর ভূমিকম্প—!
দাদা। কিসের তরে দিশেহারা ভাবের ঢেঁকি পাগল পারা
আপনি নাচে নাচে রে!
ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্যধ্বনি চিত্তধামে
গভীর সুরে বাজে রে!
নাচে ঢেঁকি তালে তালে যুগে যুগে কালে কালে
বিশ্ব নাচে সাথে রে!
রক্ত-আঁখি নাচে ঢেঁকি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি
নৃত্যে মাতে মাতে রে!
নং ১। চিন্তা পরাহত বুদ্ধি বিশুষ্কা
মগজে পড়েছে ভীষণ ফোস্কা!
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে!
ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদা রক্ষে!
নং ২। সূক্ষ্ম নিগূঢ় নব ঢেঁকিতত্ত্ব,
ভাবিয়া ভাবিয়া নাহি পাই অর্থ!
দাদা। অর্থ! অর্থ ত অনর্থের গোড়া!
ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ-চোরা।
যত সব তালকানা অঘামারা আনাড়ে
'অর্থ অর্থ' করি খুঁজে মরে ভাগাড়ে!
(আরে) অর্থের শেষ কোথা কোথা তার জন্ম
অভিধান ঘাঁটা, সে কি ভাবুকের কম্ম?
অভিধান, ব্যাকরণ, আর ঐ পঞ্জিকা—
ষোলো আনা বুজরুকী আগাগোড়া গঞ্জিকা।
মাখন-তোলা দুগ্ধ, আর লবণহীন খাদ্য,
(আর) ভাবশূন্য গবেষণা—একি ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ?

ভাবের নামতা

ভাবের পিঠে রস তার উপরে শূন্য—
ভাবের নামতা পড় মাণিক বাড়বে কত পুণ্য—
(ওরে মাণিক মাণিক রে নামতা পড় খানিক রে)

ভাব এক্কে ভাব, ভাব দুগুণে ধোঁয়া,
তিন ভাবে ডিসপেপ্‌শিয়া—ঢেকুর উঠবে চোঁয়া
(ওরে মাণিক মাণিক রে চুপটি কর খানিক রে)
চার ভাবে চতুর্ভুজ ভাবের গাছে চড়—
পাঁচ ভাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়।
(ওরে মাণিক মাণিক রে এবার গাছে চড় খানিক রে)

যবনিকা পতন

শব্দকল্পদ্রুম

প্রথম দৃশ্য

[গুরুজির আশ্রম। হরেকানন্দ, জগাই, বেহারী, পটলা, বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য শিষ্যরা উপবিষ্ট]

হরেকানন্দ। দেখ্‌ জগাই, তুই বললে বিশ্বেস করবিনে—

সকলে। কেউ বিশ্বেস করবে না—

হরেকানন্দ। কাল থেকে মনটা আমার এমনি ওলটপালট করছে, সারারাত আর ঘুম হয়নি। দুপুরে একটু তন্দ্রার ভাব এয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ প্রশ্নটা তেড়ে উঠে মনের মধ্যে এমনি গুঁতো মারলে—

বেহারী। ওর একটা কবিরাজী ওষুধ আছে খুব ভালো—আয়াপানের শেকড় না বেটে—

হরেকানন্দ। দেখ্‌ বড় যে বেশি ওপর চালাকি কচ্ছিস, এক কথায় সব কটার মুখ বন্ধ করে দিতে পারি—জানিস্‌? পরশু রাত্তিরে গুরুজি নিজে আমায় ডেকে নিয়ে যেসব ভেতরকার কথা বলেছেন, জানিস্‌?

বেহারী। হ্যাঁরে পটলা, সত্যি নাকি?

পটলা। কিসের? সব মিছে কথা।

বেহারী। এমন মিথ্যে কথা বলতে পারে এই হরেটা—ছিঃ ছিঃ—রাম, রাম—

[বেহারীর সংগীত]

রাম কহ—ইয়ে রাম কহ
বলবেন না আর মশাই গো, মানুষ নয় সব কশাই গো
তলে তলে যত শয়তানী—(রাম কহ)
এই কিরে তোদের ভদ্রতা ঘ্যান ঘ্যান ক্যাঁচ ক্যাঁচ সর্বদা
ডুবে ডুবে জল খাও সব জানি (রাম কহ)

হরেকানন্দ। প্রশ্ন যখন এয়েছে, জবাব তার একটা আসবেই আসবে—তা তোমাদের ধমকানি আর চোখরাঙানি, হাসি ঠাট্টা আর এয়ার্কি, এসব বেশিদিন টিঁকছে না।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হে, তর্কটা কিসের একবার শুনতে পাই কি? কিই বা প্রশ্ন হল আর তা নিয়ে মামলাটাই বা কিসের? —আচ্ছা, হরিচরণ কি বল?

হরেকানন্দ। হরিচরণ! দেখ্‌লি, আমায় হরিচরণ বলছে! 'হরিচরণ' কি মশাই?

বিশ্বম্ভর। তবে, ওরা যে 'হরে হরে' বলছিল!—

হরেকানন্দ। হরে বললেই হরিচরণ? 'ক' বললেই কার্তিকচন্দ্র?

জগাই। ওঁর নাম শ্রীহরেকানন্দ—

বিশ্বম্ভর। হরে কাননগু—

হরেকানন্দ। আরে খেলে যা! তুমি কোথাকার মুখ্যু হে?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে, ফরেশডাঙার—আপনি?

হরেকানন্দ। দেখ, এই যে ছ্যাবলামি আর 'ডোণ্ট কেয়ার' এসব ভালো নয়। কাউকে যদি নাই মানবে, তবে বাপু ইদিকে এসো টেসো না।

[হরেকানন্দের মৌনাবলম্বন—সাড়ম্বর]

বেহারী। (জনান্তিকে) দেখ্ পটলা—সিদিন রাত্তিরে একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—কদিন থেকে গুরুজিকে বলব বলব ভাবছি—কিন্তু ঐ হরেটার জন্যে বলা হচ্ছে না। দেখলি না, সেদিন ঐ ফকিরের গল্পটা বলতেই কি রকম হেসে উঠল—গল্পটা জমতেই দিল না।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ, হ্যাঁ? ফকিরের স্বপ্নটা কি হয়েছিল?

বেহারী। আ মোলো যা! মশাই, আমরা আমরা কথা কইছি—আপনি মধ্যে থেকে অমন ধারা করছেন কেন?

বিশ্বম্ভর। ও বাবা! এও দেখি ফোঁস্ করে! মশাই, আমার ঘাট হয়েছে—আপনাদের কথা আপনারা বলুন—আমার ওসব শুনে টুনে দরকার নেই—

[বিশ্বম্ভরের সংগীত]

শুনতে পাবিনে রে শোনা হবে না
এসব কথা শুনলে তোদের লাগবে মনে ধাঁধা
কেউ বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা।
(কেউ বা বুঝে না)
কারে বা কই কিসের কথা, কই যে দফে দফে
গাছের পরে কাঁঠাল দেখে তেল মেখ না গোঁফে
(কাঁঠাল পাবে না)
একটি একটি কথায় যেন সদ্য দাগে কামান
মন বসনের ময়লা ধুতে তত্ত্ব কথাই সাবান
(সাবান পাবে না)
বেশ বলেছ ঢের বলেছ ঐখেনে দাও দাঁড়ি
হাটের মাঝে ভাঙ্‌বে কেন বিদ্যে বোঝাই হাঁড়ি
(হাঁড়ি ভাঙ্‌বে না)

বেহারী। আহা, রাগ করেন কেন মশাই? আমি স্বপ্ন দেখেছি বই ত নয়—আর সে স্বপ্নও এমন কিছু নয়। আমি দেখলুম, একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে এক সন্নিসি বসে বসে ঘড় ঘড় করে নাক ডাকছে!

বিশ্বম্ভর। বলেন কি মশাই? তারপর?

বেহারী। বাস্! তারপর আর কি? সে নাক ডাকছে ত ডাকছেই!

বিশ্বম্ভর। কি আশ্চর্য! আপনার গুরুজিকে জিজ্ঞেস করবেন ত—

পটলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা চেপে গেলে চলবে না দাদা—ওটা বলতে হবে—দেখিস্, তখন হরেটার মুখ একেবারে দিস্ কাইণ্ড অভ স্মল হয়ে যাবে—

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ বুঝলেন, বেশ একটু রং চং দিয়ে বলবেন।

বেহারী। আ মোলো যা! আমার স্বপ্ন আমার যেমন ইচ্ছা তেমন করে বলব।

[গুরুজির শুভাগমন। হরেকানন্দ ও বেহারীলালের যুগপৎ কথা বলিবার চেষ্টা]

হরেকানন্দ। একটা প্রশ্ন এই কদিন থেকে—

বেহারী। সিদিন একটা স্বপ্ন দেখলুম—

হরেকানন্দ। তার জন্যে দুদিন ধরে আর সোয়াস্তি নাই—

বেহারী। একটু নিরিবিলি যে জিজ্ঞেস করব তার ত যো নেই—

হরেকানন্দ। তাই জগাইকে আমি বলছিলুম—

বেহারী। পটলা জানে আর এই ভদ্রলোকটি সাক্ষী আছেন—

হরেকানন্দ। আঃ—কথা বলতে দাও না—

বেহারী। কেন ওরকম করছ বল দেখি?

গুরুজি। এত গোলমাল কিসের?

বেহারী। আজ্ঞে, হরে বড় গোলমাল কচ্ছে—

হরেকানন্দ। বিলক্ষণ! দেখলেন মশাই—

বেহারী। হয়েছে কি, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম—

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি।

বেহারী। আমি স্বপ্ন দেখলুম, অমাবস্যার রাত্তিরে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে ঢুকে আর বেরুবার পথ পাচ্ছিনে। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখি এক সন্নিসি—

পটলা। তার মাথায় এয়া বড় জটা—

বিশ্বম্ভর। তার গায়ে মাথায় ভস্মমাখা—তার উপর রক্ত-চন্দনের ছিটে—

বেহারী। (স্বগত) কি আপদ! স্বপ্ন দেখলুম আমি আর রং ফলাচ্ছেন ওঁরা!—সন্নিসিকে খাতির টাতির করে পথ জিজ্ঞেস করলুম—বললে বিশ্বেস করবেন না! মশাই, সে কথার জবাবই দিলে না। বসে ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড় করে নাকই ডাকছে, নাকই ডাকছে।

পটলা। সে নাক ডাকানি এক অদ্ভুত ব্যাপার—নাক ডাকতে ডাকতে সারে গামা পাধা নিসা...করে সুর খেলাচ্ছে।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! আর সাতটে সুরের সঙ্গে রামধনুর সাতটে রং একবার ইদিকে আসছে, একবার উদিকে যাচ্ছে।

বেহারী। সুরের সঙ্গে রঙের সঙ্গে না মিশে দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে চারদিক সব ফরসা হয়ে উঠল—আমি ত অবাক হ'য়ে হাঁ করে রইলুম!

বিশ্বম্ভর। যে বলে এটা বাজে স্বপ্ন, সে নাস্তিক!

গুরুজি। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! এ একেবারে ভেতরকার প্রশ্নে এসে ঠেকেছে—এতদিন বলব বলব করেও যে কথা বলা হয়নি, সেই কথার মূলে এসে ঘা দিয়েছ! বৎস হরেকানন্দ, তুমি স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থই বটে।

বেহারী। ও ত স্বপ্ন দেখেনি—আমি দেখেছিলুম—

পটলা। হ্যাঁ—ওরা ত দেখেনি—আমরা দেখেছিলুম—

হরেকানন্দ। আমি ত এই বিষয়েই প্রশ্ন করব ভেবেছিলাম কিনা। ঐ যে ভেতরকার প্রশ্ন যেটা বলে বলেও বলা হচ্ছে না, আমার প্রশ্নই হচ্ছে তাই।

গুরুজি। হ্যাঁ। তোমরা স্বপ্নে যা দেখেছ, তা যথার্থই বটে। শব্দই আলোক! শব্দই বিশ্ব—শব্দই সৃষ্টি—শব্দই সব! আর দেখ, সৃষ্টির আদিতে এক অনাহত শব্দ ছিল, আর কিছুই ছিল না। দেখ—প্রলয়ের শেষে যখন আর কিছু থাকবে না—তখনও শব্দ থাকবে। এই যে শব্দ, এ সেই শব্দ। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, যে শব্দের আর অন্ত নাই, মানুষ ঘাটে ঘাটে ধাপে ধাপে যুগের পর যুগ প্রশ্ন করতে করতে যার কিনারা পায়নি—সেই শব্দের তুমি নাগাল পেয়েছ। একে বলে

অন্তর্দৃষ্টি। দেখ, শব্দকে তোমরা তাচ্ছিল্য কোরো না—এই শব্দকে চিনতে পারেনি বলেই, এই আমি আসবার আগে, যে যা কিছু করতে চেয়েছে সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই কথাটুকু বলবার জন্যই আমি এতদিন দেহ ধারণ করে রয়েছি।

বিশ্বম্ভর। হ্যাঁ হ্যাঁ,—ঠিক বলেছেন! আমার মনের কথাটা টেনে বলেছেন। এ সংসার মায়াময়—সবই অনিত্য—দারাপুত্রপরিবার তুমি কার কে তোমার? সব দুদিন আছে দুদিন নেই। বুঝলেন কিনা? আমি ছেলেবেলায় একটা পদ্য লিখেছিলুম, শুনবেন? কি না?

ভব পান্থবাসে এসে
কেঁদে কেঁদে হেসে হেসে
ভুগে ভুগে কেশে কেশে,
দেশে দেশে ভেসে ভেসে
কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে
এত ভালোবেসে বেসে
টাকা মেরে পালালি শেষে!

গুরুজি। বেদ বল, পুরাণ বল, স্মৃতি বল, শাস্ত্র বল, এসব কি? কতগুলো বাক্য, অর্থাৎ কতগুলো শব্দ—এই ত? এই যে সব শঙ্খ ঘণ্টা, মন্ত্রতন্ত্র হ্রীং ক্লীং ঝাড় ফুঁক নাম জপ এসব কি? একি শব্দ নয়? সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব হব কচ্ছিল, তখন যদি 'ওম্' শব্দ করে প্রণব ধ্বনি না হত, তবে কি সৃষ্টি হতে পারত? শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়। বেশি কথায় কাজ কি? বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ কেন? শিবের মুখে বিষাণ কেন? হাতে তার ডমরু কেন? নারদ যখন স্বর্গে যায়, চলতে চলতে বীণা বাজায় কেন? এসব কি শব্দ নয়? আর অনাদিকাল হতে যে অনাহত শব্দ যোগীদের ধ্যান কর্ণে ধ্বনিত হয়ে আসছে, সে কি শব্দ নয়? আর সেই কালিন্দীর কূলে যমুনার তীরে শ্যামের যে বাঁশরী বেজেছিল, সেও কি শব্দ নয়? এমনি করে ভেবে দেখ, যা ভাববে তাই শব্দ—শাস্ত্রে বলেছে 'শব্দ ব্রহ্ম'—

বিশ্বম্ভর। আমাদের মতিলাল সেবার যে ভুঁইপটকা বানিয়েছিল, উঃ—তার যে শব্দ! আমি ও বিষয়ে একটা কবিতা লিখেছি শুনবেন?

হরেকানন্দ। দেখ, গুরুজির সামনে এরকম বেয়াদবি, এটা কি ভালো হচ্ছে?

বিশ্বম্ভর। ভালরে ভাল! ইনি বলছেন স্বপ্নের কথা—উনি তাঁর প্রশ্ন হাঁকছেন, এ-ও ফোঁড়ন দিচ্ছে—ও-ও ফোঁড়ন দিচ্ছে—আর আমি কথা কইলেই যত দোষ?

বেহারী। আহা, গুরুজি আছেন যে, তাঁকে ডিঙিয়ে কথা বলবে?

বিশ্বম্ভর। গুরুজির ন্যাজ ধরে ধরেই যে ঘুরতে হবে তার মানে কি?

জগাই। ন্যাজ বলেছে! গুরুজির ন্যাজ বলেছে!

পটলা। তুই থাম্ না, তোর ন্যাজ ত বলেনি—

গুরুজি। ওরে হতভাগা, শব্দ নিয়ে তোরা ছেলেখেলা করিস—শব্দ যে কি জিনিস আজও তোরা বুঝলিনে। কিন্তু এখন বুঝবার সময় হয়েছে। এই নাও আমার শব্দসংহিতা—এইটে এখন পড়ে নেও। ওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি এই যে—এক একটি শব্দ এক একটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে ঊর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কি না! যে সঙ্কেত জানে সে ঐ কুণ্ডলীর সাহায্যে করতে না পারে এমন কাজ নেই। তাই বলছি তোমরা প্রস্তুত হও—অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে সেই সঙ্কেত মন্ত্র দিয়ে

তোমাদের দেখাব, শব্দের কি শক্তি! রাতারাতি স্বর্গ বরাবর পৌঁছে দেবে। পথ পথ করে সব ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু শব্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

[শিষ্যগণের উচ্ছ্বাস ও গদগদভাব]

[গান—ধূম কীর্তন]

তাই ফিরি তুমি আমি ধাঁধায় দিবস যামী
তাই ফিরে মহাজন পথে-পথে অনুখন
অন্ধ আঁধারে মরে নামি।
নিজ বেগে নিজ তালে শব্দ ফিরে দেশে কালে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
ভুবন ঘেরিল পথ জালে।
প্রাণে প্রাণে এঁকে বেঁকে পথ যায় হেঁকে হেঁকে
আপনি পথিক পথ চালায় আপন রথ
সেই পথে চল আগে থেকে॥

গুরুজি। পূর্বে পূর্বে ঋষিরা এই শব্দমার্গকে ধরে ধরেও ধরতে পারেনি। কেন? ঐ যে সান্নিসি অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছিল, কেন ডাকছিল? শব্দমার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সংকেতটুকু ধরতে পারেনি। ওরা যে ধরেছে সে সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—ঢোঁড়া শব্দ। তা করলে ত চলবে না! জ্যান্ত জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে ধরে মট্‌মট্ করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে জমে উঠতে থাকবে—আর ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলব। এইজন্যে তোমাদের ঐ শব্দসংহিতাখানা পড়ে রাখতে বলছি।

[প্রস্থান। শিষ্যগণের 'শব্দসংহিতা' পাঠ]

শ্রীশ্রীগুরু প্রসাদগুণে তত্ত্বদৃষ্টি লভি
জগৎখানা ঠেকছে যেন শব্দে আঁকা ছবি
শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া
চক্রমুখে মন্ত্র ঠুকে বাঁধন কর ঢিলা
শব্দ দিয়ে শব্দ কাটো, এই ত শব্দলীলা,
যাঁহা স্বর্গ তাঁহা মর্ত তাঁহা পাতালপুরী
সত্য মিথ্যা একই মূর্তি খেলছে লুকোচুরি!
ভালো মন্দ বিষম ধন্দ কিছু না যায় বোঝা
সহজ কথায় মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে করে সোজা।
ভক্ত বলেন "আদ্যিকালের সাদার নামই কালো
আঁধার ঘন জমাট হলে তারেই বলে আলো।"
শাস্ত্রে বলে "সৃষ্টি মূলে শব্দ ছিল আদি"
জগৎস্রোতে জড়ের বাঁধন শব্দে রাখে বাঁধি।
বস্তুতত্ত্ব বন্ধ মায়া সদ্য পরিহরি
শব্দ চক্রে ঘোরে বিশ্ব সূক্ষ্ম দেহ ধরি!
শব্দ ব্রহ্মা, শব্দ বিষ্ণু, শব্দ সরস্বতী
বিশ্বযজ্ঞ ধ্বংসশেষে শব্দে মাত্র গতি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য । স্বর্গ কাণ্ড

গুরুজি। ঘনায়েছে কলিকাল ঘেরিয়ে আঁধার জাল
পাতিয়ে প্রলয় ফাঁদ কাল রাহু ধরে চাঁদ।
ওই শোনো অতি দূরে সুদূর অসুর পুরে
ভেদিয়া পাতাল তল ওই ওঠে কোলাহল;
ওই রে আঁধার ফুঁড়ি ওই আসে গুড়ি গুড়ি
ঐ এল লাখে লাখ, দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁক॥

[গান] ওরে ভাই তোরে তাই কানে-কানে কইরে
ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে
নিঝুম রাতে ফিস্‌ফাস্‌, বাতাস ফেলে নিঃশ্বাস
স্বপ্নে যেন খোঁজে কারে কৈ কৈ কৈ রে!
আঁধার করে চলাচল স্তব্ধ দেহ রক্ত জল
শব্দ নাচে হাড়ে হাড়ে হৈ হৈ হৈ রে।
পাণ্ডু ছায়া অন্ধ হিম শূন্যে করে ঝিম্‌ ঝিম্‌
ঐরে গেল গা ঘেঁষে আর ত আমি নই রে।
মর্মকথা বলি শোন্‌ লাগল প্রাণে 'কলিশন্‌'
প্রাণপণে হেঁকে বল মা ভৈ ভৈ রে॥

গুরুজি। দেবতা সবে গাত্র তোলো স্বপ্নলীলা সাঙ্গ হল
দেখ্‌ রে জেগে কাণ্ডটা কি সৃষ্টি বাঁধন ভাঙল নাকি?
ঈশান কোণে মেঘের পরে শব্দ তরল রক্ত ঝরে
পাণ্ডু বরণ দখিনে বামে অন্ধ আঁধার শব্দ নামে।
প্রলয় বাদল রক্ত রাঙা পাগল জেগেছে আগল ভাঙা
উল্কা ঝলকে বিজলী ছোটে গহন শূন্যে শিহরি ওঠে।
তুহিন তিমির ধরণী গায় সভয় পবন থমকি চায়
হরষে পিশাচী পিশাচে কয় রক্ত মড়ক জগতময়।
হে অলক্ষ্মী একি খেলা অনাহূত হেন বেলা
নৃত্য তোমার এমনি ধারা সৃষ্টিছাড়া ছন্দোহারা!
অনাদৃতে হুহুকময়ী খেয়াল তব সর্বজয়ী—
কহ আজি কেন স্কন্ধে, চাপিলে নাছোড়বন্দে!
কেন ঠাট্টা সর্বনাশী, কেন অট্টআঁধার হাসি,
কেন আজি ঘুমটি ভাঙাও, অকারণে চক্ষু রাঙাও?

সকলে। [গান] কেন কেন কেনরে কেন কেন?
চেঁচিয়ে কাঁচা ঘুম ভাঙ কেন?

পট্‌কা শব্দ অট্টরোল,   শঙ্খ ঘণ্টা ঢক্ক ঢোল
স্বর্গপুরী হদ্দ হৈল বাদ্যভাণ্ড হট্টগোল।
দেবতা বিলকুল কান্দে গো   তল্পিতল্পা বান্ধে গো
পাগলা রাহু একলা তেড়ে গিলতে চাহে চান্দে গো।
আগডুম্ বাগ্‌ডুম শব্দ ছায়   চিত্ত গুড়্ গুড়্ দপ্‌দপায়
দন্ত কড়্‌মড়্, হাড্ডি মড়্‌মড়্ প্রাণটা ধড়্‌ফড়্ সর্বদাই॥

গুরুজি। কাকস্য পরিবেদনা   বৎসগণ আর কেঁদ না,
গতস্য শোচনা নাস্তি   যথা কর্ম তথা শাস্তি;
মিথ্যা এত কান্না কেন   অলমতি বিস্তারেণ?
অত্র এখন দেবতা সভায়   ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌ছে সবাই
তোমরা একটু ক্ষান্ত হও   শান্ত হয়ে মন্ত্র কও॥

[বৃহস্পতি-স্তোত্র]

এ ভব সঙ্কট অর্ণব মন্থনে মাকুরু সংহার মাকুরু সংহার মাকুরু সংহার মাকুরু হে
হে গুরু গীষ্পতি অষ্টম দিক্‌পতি হে গুরু রক্ষ হে হে গুরু রক্ষ হে গুরু হে॥

[বৃহস্পতির আবির্ভাব]

বৃহস্পতি। মাকুরু কোলাহল ভো ভো শিষ্য হে
দরজাটুকু ছেড়ে বোসো আজকে বড় গ্রীষ্ম হে,
আসনটাকে মাড়িও না বোসো না কেউ সোফাতে।
তোমার গায়ে গন্ধ বড় সরে দাঁড়াও তফাতে।
কি বলছিলে বলে ফেল নেইক আমার চাকর বাকর—
সময় কেন নষ্ট কর ক'রে মেলা বকর বকর?
কারুর বাড়ি যজ্ঞি নাকি বংশ প্রথা চিরন্তন?
তোমার বুঝি ছেলের ভাতে ফলার ভোজে নিমন্ত্রণ?
তোমার বুঝি মেয়ের বিয়ে—আটকে ছিল অনেকদিন?
যা হোক এবার উৎরে গেল রয়ে সয়ে বছর তিন।
তোমার বাড়ি শ্রাদ্ধ নাকি? ঘর জামাইটি গেছেন মরে,
বেজায় বুঝি ভুগেছিল ডেঙ্গু জ্বরে বছর ভরে?
সকলে। বিপদকালে হৃৎপিস্থতে ঠাকুর মোদের যুক্তি দাও
ঐ চরণের শরণ নেব মরণ হতে মুক্তি দাও॥

বৃহস্পতি। মরবে যে তা আগেই জানি—যেমনতর অনাসৃষ্টি
ইন্দ্র তোমার এসব দিকে একেবারেই নাইক দৃষ্টি!
কাজে কর্মে নেইক ছিরি কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই
অমৃত সে ভেজাল-গোলা দেবতাগুলো খাচ্ছে তাই।
মড়ক সে ত হবেই এতে সর্দিগর্মি বেরিবেরি
একে একে মরবে সবাই আর বেশি দিন নেইক দেরি।
হাজার কর ডিসিনফেক্টো, হাজার কেন ওষুধ গেলো—
যা হোক তোমরা যে যার মতো উইলপত্র লিখে ফেলো।
দেবতালীলা সাঙ্গ যদি নেহাৎ যাবে জাহান্নমে
যার যা কিছু দেবার থাকে দাও না লিখে আমার নামে!

[বীণা হস্তে নারদের প্রবেশ ও গান]

ও বীণা তুই দেখবি মজা বাদ্যি বাজা (তারে না তানা)
হেন সুযোগ মাগ্যি বড়   ও বীণা তোর ভাগ্যি বড়
এত মজা আর পাবি না পাগ্‌লা বীণা (তারে না তানা)
নাচি আমি সঙ্গে তোরি,   বাহু তুলে রঙ্গ করি
তোরে বাজাই আপনি বাজি নাচিয়ে নাচি (তারে না তানা)
লাঠালাঠি রক্ত মাটি   দেখে লাগে দাঁত-কপাটি
ও বীণা তুই থাকবি তফাৎ লাগবে হঠাৎ (তারে না তানা)

বৃহস্পতি। কি গো ঠাকুর অলক্ষুণে—ঝাড়তে এলে পায়ের ধুলো?
দেখ্‌ছি এবার হ্যাপায় পড়ে মরবে তবে দেবতাগুলো।
নারদ। নাকে ছিপি কানে তুলো ভায়া বড় বিজ্ঞ যে
ডিঙোতে চাও টপাটপ আমা হেন দিগ্‌গজে।

[ইন্দ্র ও অশ্বিনীর প্রবেশ]

অশ্বিনী। শব্দ শুনে দৌড়ে এলাম যুদ্ধটুদ্ধু লাগল কি?
দৈত্য দেখে ভীষণ ভয়ে দেবতারা সব ভাগ্‌ল কি?
বৃহস্পতি। ওঁর কথা কেউ শুনো নাক ঠাকুর বড় রগ্‌চটা
তাই ত ইন্দ্র তোমার হাতে দেখছি না যে বজ্রটা!
ইন্দ্র। বজ্র সে কি হেথায় আছে, গিয়েছে সে কোন্ চুলোয়
তার বেঁধে তায় কাজে লাগায় মর্তলোকের লোকগুলোয়।
নারদ। তোমাদের খুব স্নেহ করি, কাজ কি বলে সবিস্তার
এমনি উপায় বাৎলে দেব এক্কেবারে পরিষ্কার।
বৃহস্পতি। একটা উপায় আছে বটে—তোমায় সেটা খুলে জানাই
হাড় কখানা দাও না মোদের নতুন করে বজ্র বানাই!
তোমার হাড়ে বজ্র গড়ে পিট্‌লে পরে দমাদম্
একটি ঘায়ে মরবে না যে সেই ব্যাটারাই নরাধম।
শুষ্ক হাড়ে ঘুণ ধরেছে, সূক্ষ্মতর শক্তি তায়
জ্বলবে ভালো হাড্ডি তোমার কাজ কি বল বক্তৃতায়।
নারদ। হোঁৎকোমুখো গণ্ডে গোদ আমার উপর টিপ্পুনি
আমায় তুমি মরতে বল? মরবে তুমি এক্ষুনি!
আমার উপর চক্ষু ঠারো? আমায় বল কুন্দুলে
মুখে মাখ জুতোর কালি—গালে লাগাও চুন গুলে।

[কার্তিকের প্রবেশ]

কার্তিক। আমায় সবাই মাপ কোরো ভাই, হয়ে গেল আসতে দেরি
হিসেব মতো পছন্দসই হচ্ছিল না চোস্ত টেরি!
গোঁফ জোড়াটা মেপে দেখি ডাইনে একটু গেছে উঠে
লাগল দেরি সামলে নিতে টেনেটুনে ছেঁটেছুঁটে!
চাকর ব্যাটা খেয়ালশূন্য কাজে কর্মে ঢিলে দিয়ে
শেষ মুহূর্তে কাপড়খানা কুঁচিয়ে দিল গিলে দিয়ে।
নারদ। তুমিই এখন ভরসা এদের তুমিই এদের কর্ণধার

তুমিই এদের ত্রাণ কর ভাই নইলে সবই অন্ধকার!
বলছি এদের বারে বারে নেই রে উপায় যুদ্ধ বই
তোমরা সবাই হট্‌লে এখন কোথায় আমি মুখ লুকাই?

কার্তিক। লড়াই করে মরতে যাবে আর ত আমার সেদিন নয়
কারে তুমি হুকুম কর শর্মা কারো অধীন নয়!
যে কয় জনা যুদ্ধে যাবেন ফিরবে না তার অর্ধেকও
তল্পিতল্পা বাঁধ রে ভাই থাকতে সময় পথ দেখ।

১। আমি বলি ঢের হয়েছে শান্তি বাদ্য পিটিয়ে দাও
হাঙ্গামাতে কাজ কি বাপু আপস করে মিটিয়ে দাও!

২। শাস্ত্রে বলে শোন্ রে চাচা আপ্‌না বাঁচা আগে ভাগে—
পিট্টি খেয়ে মরবি কেন থাকলে দেহ কাজে লাগে!

৩। কিসের দাদা স্বর্গভূমি কিসের পুরী পাঁচতলা
দৈত্য যখন ধরবে ঠেসে করবে তুমি কাঁচকলা।

৪। ত্যাগ কর ভাই মিথ্যে মায়া ত্যাগ কর এ স্বর্গধাম
আর ত সবই ছাড়তে পার প্রাণটুকুরই বড্ড দাম!

নারদ। কিসের এত ভাবনা তোদের মিথ্যে এত কিসের ডর
যুক্তি করে দেখ্‌না ভেবে ঠাণ্ডা হয়ে হিসেব কর।
না হয় দুটো খস্‌বে মাথা না হয় দুটো ভাঙ্‌ত ঠ্যাং
তাই বলে কি ঢুক্‌বি ভয়ে কুয়োর মধ্যে জ্যান্ত ব্যাং।
আমরা যদি দেবতা হতুম দৈত্য দেখলে ক্যাঁক্ ক'রে
ঘাড়টি ধরে পিট্টি দিতুম হাড্ডি মাসে এক ক'রে।

ইন্দ্র। অস্ত্রগুলো মর্চে-পড়া অনেক কালের অনভ্যাস
এমন হলে লড়বে নাকো স্বয়ং বলেন বেদব্যাস।

নারদ। বিষ্টু বল আত্মাপাখি! এমন দিনও ঘটল শেষে
দৈত্য বেড়ায় বুক ফুলিয়ে দেবতা পালায় ছদ্মবেশে!
আসছি ধেয়ে ব্যস্ত হয়ে পয়সা-কড়ি খরচ ক'রে
করলে না কেউ খাতির আমায় ডাকলে না কেউ গরজ ক'রে!
তোমরা সবাই ডুবে মরো ইন্দ্র তোমার গলায় দড়ি
কার্তিকেয় মরবে তুমি ঐরাবতের তলায় পড়ি।
মরব এবার দেহত্যাগে এ-ভবে আর থাকছি নেকো
ঐখেনেতেই মূর্ছা যাব তোমরা সবাই সাক্ষী থেকো। [শয়ন ও মূর্ছা।]

বৃহস্পতি। ব্রহ্মহত্যা আমার ঘরে   ও ঠাকুর তোর পায়ে পড়ি
মরতে চাও ত বাইরে মর   আমরা কেন দায়ে পড়ি?
অশ্বিনী গো বদ্যিমশাই   দাঁড়িয়ে কেন চুপ্‌টি ক'রে
ঠাকুর হোথা তুলছে পটল   বাঁচাও তারে যুক্তি ক'রে।

[অশ্বিনী কর্তৃক রোগ পরীক্ষাদি।]

অশ্বিনী। বদ্যি রাজা ধন্বন্তরি   শিষ্য হয়ে স্মরণ করি
তোমার নামে মন্ত্র পড়ি   হাতে নিলাম জ্যান্ত বড়ি
প্রেত পিশাচ শুদ্ধি হোক   যেই খাবে তার বুদ্ধি হোক
রুষ্ট বায়ু ক্ষান্ত হও   মরা মানুষ জ্যান্ত হও

মুক্ত হবে পিত্ত দোষ
নিত্য রবে চিত্ততোষ
লুপ্ত নাড়ি শক্ত বেশ
উঠবে কেঁচে পক্ক কেশ।
ঘুচবে পিলে ছুটবে বাৎ
ফোকলা মুখে উঠবে দাঁত
রাত্রি দিনে ফুর্তি রবে
কার্তিকেরি মূর্তি হবে।
কিন্তু যারা মিথ্যে কয়
নাইকো যাদের চিত্তে ভয়
মিথ্যে রোগের নিত্যি ভান
ওষুধ তাদের মৃত্যুবাণ।
রোগ যেথা নয় সত্যিকার
তোর পরে নাই ভক্তি যার
জ্যান্ত বড়ি বিষ বড়ি
কণ্ঠে তাদের দিস্‌ দড়ি।
নয়কো যে-জন শান্তরকম
হয় যেন সে জ্যান্ত জখম—
নৃত্য কোঁদল বন্ধ রবে
চক্ষু দুটি অন্ধ হবে,
জ্বল্‌বে গরল তিক্ত ধাবা
নাচবে রোগী ক্ষিপ্ত পারা
গণ্ডে ফোড়া তুণ্ডে বাত
ভণ্ডজনের মুণ্ডপাত!
ও বড়ি তুই নিদান কর
বিচার বুঝে বিধান কর
কপট রোগী খবরদার
ওষুধ আমার সমঝদার।

[নারদের গাত্রোত্থান]

নারদ। গা-ঝিমঝিম মাথা ঘোরা এক্কেবারে কেটে গেল
মূর্ছা আমার আপনি সারে ওষুধটা কেউ চেটে ফেল।
হায় রে হায় কলির ফেরে দেবতা গুরু ভোগ না পায়
যার লাগি লোক চুরি করে চোর ব'লে সে চোখ পাকায়।
তোদের ভেবেই শরীর মাটি রাত্রে আমার ঘুমটি নেই
তোদের ছেড়ে জগৎ যেন ব্যঞ্জনেতে নুনটি নেই।
তোদের তরেই মূর্ছা গেলাম, তোদের তরেই প্রাণটি ধরি
তোরাই আমার মাথার মাণিক তোরাই আমার কলসী দড়ি।
এই কি তোদের দেবতাগিরি এই কি সাহস জ্বলন্ত!
দুয়ো দেবতা দুয়ো ইন্দ্র দেবতাকুলের কলঙ্ক!

[গান]

বীণা রে এই কি রে তোর সেই সনাতন দেবতা এরা
বৃহস্পতি। রাখ তোমার বকর বকর ভগ্ন ঢেঁকির কচকচি
মিথ্যে তুমি প্যাঁচাল পাড় বাক্য ঝাড় দশগজি
ঐদিকে যে বিশ্ব ডোবে বান ডেকেছে সৃষ্টিতে
লুটিয়ে গেল চুটিয়ে গেল শব্দ বাণের বৃষ্টিতে।
অর্থহারা শব্দ ফিরে স্থাবর হতে জঙ্গমে
বিশ্বব্যাপার উধাও হল শব্দ সাগর সঙ্গমে
ঘূর্ণি পাকের ছন্দ জাগে গুপ্তগভীর গর্জনে
মুক্ত কৃপাণ শক্তি মাতে অর্থমহিষ মর্দনে।
আদিকালের বাদ্যি বাজে স্বর্গ মর্ত ফাক্কিকার
ধাক্কা লাগে গোলকধামে রোধ করে তায় শক্তি কার।
শব্দ ধারায় বর্ষা যেন কৃষ্ণ ভাদ্র অষ্টমী
শীঘ্র দেখ ছিদ্র খুঁজে কার এ সকল নষ্টামী।

গুরুজি। ওরে বাস্‌ রে! এমনি ব্যাপার? আর কি আছে রক্ষে?
আরেক টুকুন সবুর কর দেখবে ধোঁয়া চক্ষে
মন্ত্র নাচে ছন্দ নাচে শব্দ নাচে রঙ্গে
বুকের শব্দ শোষণ করে রক্তধারার সঙ্গে
দেখবে ক্রমে শব্দ জমে হাত পা হবে ঠাণ্ডা
শক্ত কঠিন শব্দ দিয়ে মারবে মাথায় ডাণ্ডা—
অর্থ বাঁধন হুড়্‌কো ভেঙে শব্দ এল পশ্চিমে
যার খুশি হয় বসে থাক আমরা দাদা বসছিনে। [সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[স্বর্গপথে সশিষ্য গুরুজি—বহু পশ্চাতে বিশ্বম্ভর]

বিশ্বকর্মা। আদিকাল হতে বিশ্ব ফিরে মহাচক্রপথে,
চক্রে চলে জলস্থল, চক্রে ঘোরে ভূমণ্ডল—
সেই চক্রে চির গণ্ডি ঘেরা শব্দ করে চলাফেরা।
মহাকাল ফিরে শূন্যে বস্তুরূপ মাগি, স্পর্শে তার শব্দ উঠে জাগি
অর্থ তারে চক্রপথে টানি ঘোরায় আপন ঘানি—
বাক-অর্থ দোঁহে যুক্ত নিত্য বসবাস ইতি কালিদাস॥
আজ কেন রুদ্ধ পথ খুলে   মন্ত্রাঘাত করি শব্দ মূলে
ছিন্ন করে শব্দের বাঁধন—অসাধ্য সাধন!
কাল চক্র ব্যূহ ভেদ করি   ঊর্ধ্বগতি কুণ্ডলীর মুক্ত পথ ধরি
জাগে ঐ নিদ্রিত অশনি—   হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনি!
অন্ধকার রাতে অংগহীন শব্দের পশ্চাতে
কার তপ্ত নিশ্বাসের রুদ্ধ অভিশাপ জপিছে প্রলাপ?

[মন্ত্রপাঠ]

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং   ইঁটপাটকেল চিৎ পটাং
গন্ধ গোকুল হিজিবিজি   নো অ্যাড্‌মিশন ভেরি বিজি
নন্দী ভৃংগী সারেগামা   নেইমামা তাই কানামামা
মুশকিল আশান উড়ে মালি   ধর্মতলায় কর্মখালি
চীনে বাদাম সর্দি কাশি   ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।

গুরুজি। দাঁড়াও আমাদের গতি যে ক্রমশ মন্দীভূত হয়ে আসছে, সেটা কি তোমরা অনুভব করেছ?

সকলে। আজ্ঞে—ক্রমশই কমে আসছে—

গুরুজি। এর কি কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারছ? কেউ কি পশ্চাতে পড়ে থাকছ?

বেহারী। আজ্ঞে, আপনার পরেই এই ত আমি আসছি-

হরেকানন্দ। তার পরেই আমি শ্রীহরেকানন্দ—

জগাই। তার পর আমি—জগাই—

পটলা। তার পর আমি—

গুরুজি। তবে এর কারণ কি? শব্দের আকর্ষণটা বেশ অনুভব করছ কি?

পটলা। আজ্ঞে, আমার বাক্য পিছন দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

গুরুজি। সর্বনাশ!—তবে একবার নির্বিশেষ মন্ত্রটা বেশ ক'রে উচ্চারণ ক'রে শক্তি সঞ্চার ক'রে—তারপর তাকিয়ে দেখ—কিছু দেখা যায় কিনা—

সকলে। গো গাবৌ গাবঃ—গো গাবৌ গাবঃ—গো গাবৌ গাবঃ—

বিশ্বম্ভর। ইত্যমরঃ

সকলে। কে শব্দ করে?

পটলা। সেই লোকটা!

সকলে। সর্বনাশ! ও আবার চায় কি?

বিশ্বম্ভর। ঐ যে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ সেইখেনে যাব।

গুরুজি। বৎস বিশ্বম্ভর, তুমি আসলেই যদি, তবে এমন পশ্চাতে পড়ে থাকছ কেন?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে—বেজায় পরিশ্রম লাগছে—

গুরুজি। কেন? তুমি কি সম্যকরূপে মন্ত্রে আরোহণ করতে পার নাই? তুমি কি কোনোরূপ ভার বহন করে আনছ?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে—এই শরীরটে—

গুরুজি। ও সব ছেড়ে দাও—কিছুক্ষণ ধুক্‌ধুক্ মন্ত্র জপ কর—ও সব স্থূল সংস্কার কেটে যাবে—

[ছাত্রগণের মন্ত্রজপ]

বিশ্বম্ভর। আমি ভাবছিলুম—

সকলে। ভাবছিলে? সর্বনাশ!—সর্বনাশ, ভেব না, ভেব না—

গুরুজি। শব্দের ঘাড়ে চিন্তাকে চাপাচ্ছ—? ছিঃ! অমন ক'রে শব্দশক্তি ম্লান কোরো না—আমার পূর্ব উপদেশ স্মরণ কর—শব্দের সঙ্গে তার অর্থের যে একটা সূক্ষ্ম ভেদাভেদ আছে সাধারণ লোকে সেটা ধরতে পারে না।

সকলে। তাদের শব্দজ্ঞান উজ্জ্বল হয়নি—

সকলে। তারা শব্দের রূপটিকে ধরতে জানে না—

গুরুজি। তারা ধরে তার অর্থকে। তারা শব্দ চক্রের আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেমন কর্মবন্ধন, যেমন মোহবন্ধন, যেমন সংসারবন্ধন,—তেমনি শব্দবন্ধন!

সকলে। শব্দবন্ধনে পড়োনা— প'ড়োনা—

গুরুজি। শব্দকে যে অর্থ দিয়ে ভোলায়—সে অর্থপিশাচ। শব্দকে আটকাতে গিয়ে সে নিজেই আট্‌কা পড়ে। নিজেকেও ঠকায় শব্দকেও বঞ্চিত করে। সে কেমন জানো? এই মনে কর, তুমি বললে 'পৃথিবী'—তার অর্থ করে দেখ দেখি?—সূর্য নয় চন্দ্র নয় আকাশ নয় পাতাল নয়—সব বাদ—শুধু পৃথিবী! এরা নয় ওরা নয় তারা নয়—এসব কি উচিত? আবার যদি বল 'পৃথিবী গোল'—তার সঙ্গে অর্থ জুড়ে দেখ দেখি, কি ভয়ানক সংকীর্ণতা!—পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তা বলা হল না—পৃথিবীর উত্তরে কি দক্ষিণে কি, তা বলা হল না—তার তিনভাগ জল একভাগ স্থল, তা বলা হল না—তবে বলা হল কি? গোটা পৃথিবীটার সবই ত বাদ গেল! এটা কি ভালো?

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে না—এটা ত ভালো ঠেক্‌ছে না—তাহলে কি করা যায়?

গুরুজি। তাই বলেছিলাম—শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ, আগে তাকে ভাঙ। শুধু পৃথিবী নয়, শুধু গোল নয়, শুধু এটা নয়, শুধু ওটা নয়; আবার এটাই ওটা, ওটাই সেটা—তাও নয়। তবে কী? না সবই সব। তাকেই আমরা বলি গো গাবৌ গাবঃ—

[গো গাবৌ গাবঃ—
হলদে সবুজ ওরাং ওটাং—ইত্যাদি]

[বিশ্বকর্মার আবির্ভাব]

বিশ্বকর্মা। নিঝুম তিমির তীরে   শব্দহারা অর্থ আসে ফিরে
কালের বাঁধন টুটে   দশদিক কেঁদে উঠে
দশদিক উড়ে শব্দধূলি   উড়ে যায় উড়ে যায় মোক্ষপথ ভুলি—
ভেবেছ কি উদ্ধতের হবে না শাসন?   জাগে নি কি সুপ্ত হুতাশন?
বিদ্রোহের বাজেনি সানাই?   শব্দ আছে প্রতিশব্দ নাই?
শব্দমুখে প্রতিলোম শক্তি এস ঘিরে   কুণ্ডলীর মুখ যাও ফিরে
শব্দঘন অন্ধকার নিত্যঅর্থভারে   নামে বৃষ্টি ধারে
শব্দ যজ্ঞ হবিকুণ্ড অফুরন্ত ধূম   এই মারি শব্দকল্পদ্রুম।

['দ্রুম' শব্দে সশিষ্য গুরুজির স্বর্গ হইতে পতন]

মামা গো!

[ঘরের এক পাশে মাদুরে বসিয়া একটি ছেলে কাগজ হাতে লইয়া কি যেন ভাবিতেছে; অন্য পাশে তাহার দিকে পিছন করিয়া আরাম-কেদারার উপর হাত পা ছড়াইয়া তাহার মামা আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছেন।]

বালক। (হঠাৎ ব্যাকুলস্বরে) মামা!

মামা। (চমকিয়া) কি রে!

বালক। ও মামা!

মামা। (একটুখানি মাথা তুলিয়া) আরে, হল কি?

বালক। (প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে) মামা গো!

মামা। (বিরক্তভাবে) আরে, কি হল তাই বল্ না? খালি 'মামা' 'মামা' করতে লেগেছে!

বালক। ও মামা গো, তা হলে কি হবে গো?

মামা। (উঠিয়া বসিয়া ভ্যাংচান সুরে) এই, তোমার পিঠে ঘা দু'চার পড়বে গো—আর হবে কি?

বালক। (ঘ্যাঙানি সুরে) না মামা, দেখ না—এই কাগজে কি লিখেছে!

মামা। কি আবার লিখবে? ওদের যা খুসী তাই লিখেছে—তোর তা নিয়ে চ্যাঁচাবার দরকার কি?

বালক। শোন না একবার কি বলছে ওরা—(মামার কাছে গিয়ে পাঠ) "আমেরিকার কোন বিখ্যাত মানমন্দির হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তত্রস্থ দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একটি ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আগামী জুন মাসে এই ধূমকেতু পৃথিবীর নিকটবর্তী হইবে এবং তখন পৃথিবীর সহিত তাহার সংঘর্ষ হইবে।"

মামা। হবে ত হবে—তাতে চেঁচাবার কি হয়েছে?

বালক। (আবার কাঁদ কাঁদ) যদি ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে, আর পৃথিবী চুরমার হয়ে ভেঙে যায়? —তাহলে ত,—

মামা। যাঃ যাঃ—কাঁচের পুতুল কিনা, অমনি চুরমার হয়ে ভেঙে যাবে!

বালক। যদি ধূমকেতুটা ধুম করে আমাদের বাড়ির উপর এসে পড়ে?—কিংবা ভূমিকম্প হয়?

মামা। (ভ্যাংচান সুরে) কিংবা বাড়িতে আগুন লেগে যায়, কিংবা পরেশনাথের পাহাড় তোর মাথায় এসে পড়ে, কিংবা তোর মগজের গোবরগুলো শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে যায়!

বালক। (অত্যন্ত গম্ভীরভাবে) তা কখন কি হয় কিছু ত বলা যায় না। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) এই ত, গোবিন্দরও ত মামা ছিল, সে মামা ত গত বছর সর্দিগরমি হয়ে মরে গেল।

মামা। মরেছে ত আপদ গেছে, তাতে হয়েছে কি?

বালক। না, তাই বলছিলুম—এই সেদিনও ত আমাদের জিমনাস্টিক মাস্টার পিলে হয়ে মরে গেল। তাহলে কে কতদিন বাঁচবে, কখন মরবে, কখন কি হবে, কিছু ত বলা যায় না—

মামা। (কতক রাগে, কতক ব্যঙ্গসুরে) ওরে বাবারে! এ যে একেবারে বৈরাগীর দাদা-ঠাকুর হয়ে উঠল দেখি।—দেখ্! কান ধরে এমন থাপ্পড় লাগাব!

বালক। (আবার কাঁদ কাঁদ) বা! ব্রজলালের বাবা যদি এক মাস আগে মরে যেত, তাহলে সে কি ব্রজলালকে সেদিন এমন চমৎকার সুন্দর প্রাইজ দিতে পারত?

মামা। (কটমট করিয়া তাকাইয়া) তুই কি বলতে চাস বল্ দেখি।

বালক। (হঠাৎ কাঁদিয়া) তুমি যে বলেছিলে আমাকে প্রাইজ দেবে—কই দিচ্ছ না ত—শেষটায় যদি—ভ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

মামা। (ধমক দিয়া) সেই কথাটা সোজাসুজি একসময়ে বললেই হত—তার জন্য ঘ্যাঙানি ঘোঙানি করে আমার ঘুমটি নষ্ট করবার কি দরকার ছিল? (চড় মারিয়া) যা! আজ বিকেলে প্রাইজ পাবি এখন।

[হাসিতে হাসিতে ও গালে হাত ঘষিতে ঘষিতে বালকের প্রস্থান]

জীবনী

অজানা দেশ

সেদিন একটা বইয়ে মাঙ্গো পার্কের কথা পড়ছিলাম। প্রায় সওয়া শ বৎসর আগে অর্থাৎ লিভিংস্টোনের অনেক পূর্বে মাঙ্গো পার্ক আফ্রিকার অজানা দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। এক-একজন মানুষের মনে কেমন নেশা থাকে, নূতন দেশ নূতন জায়গার কথা শুনলে তারা সেখানে ছুটে যেতে চায়। তারা অসুবিধার কথা ভাবে না, বিপদ-আপদের হিসাব করে না—একবার সুযোগ পেলেই হয়। মাঙ্গো পার্ক এইরকমের লোক ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ২৪ বৎসর মাত্র, তখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান করতে গিয়েছিলেন। তার কিছুদিন আগে একজন ইংরাজ সেই অজানা দেশে ডাকাতের হাতে মারা যান—অথচ পার্ক তা জেনেও মাত্র দুজন সে-দেশী চাকর সঙ্গে সেই পথেই বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর উদ্দেশ্য সেই নদী ধরে ধরে তিনি আফ্রিকার ঐ অঞ্চলটা বেশ করে ঘুরে আসবেন। তখনও আফ্রিকার ম্যাপে সেইসব জায়গায় বড় বড় ফাঁক দেখা যেত আর সেগুলোকে 'অজানা দেশ' বলে লেখা হত।

সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সে সময়ে অনেকটা আরব ও মুর জাতীয় মুসলমানদের হাতে ছিল। ইউরোপীয় লোক সেখানে গিয়ে পাছে তাদের ব্যবসা কেড়ে নেয়, এই ভয়ে সাহেব দেখলেই তারা নানারকম উৎপাত লাগিয়ে দিত। পার্ককেও তারা কম জ্বালাতন করেনি; কতবার তাঁকে ধরে বন্দী করে রেখেছে—তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়েছে—তাঁর লোকজনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, এমনকি তাঁকে মেরে ফেলবার জন্যও অনেকবার চেষ্টা করেছে। তার উপর সে দেশের অসহ্য গরম আর নানারকম রোগের উৎপাতেও তাঁকে কম ভুগতে হয়নি। একবার জলের অভাবে তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে, তিনি গাছের পাতা শিকড় ডাঁটা চিবিয়ে তৃষ্ণা দূর করতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তাতে কি তৃষ্ণা যায়? সারাদিন পাগলের মতো জল খুঁজে খুঁজে, সন্ধ্যার কিছু আগে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারপর যখন তাঁর জ্ঞান হল তখন তিনি চেয়ে দেখেন, ঘোড়াটা তখন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সূর্য অস্ত গেছে, চারিদিক ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে, কাজেই আবার তাঁকে ঘোড়ায় চড়ে জলের সন্ধানে বেরোতে হল। তারপর যখন তাঁর দেহে আর শক্তি নাই, মনে হল প্রাণ বুঝি যায় যায়, তখন হঠাৎ উত্তরদিকে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠল। তা দেখে তাঁর আবার উৎসাহ ফিরে এল, তিনি বৃষ্টির আশায় সেইদিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে ক্রমে ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল, বাদলা হাওয়া দেখা দিল, তারপর কড়্‌কড়্‌ করে বাজ পড়ে ঝমাঝম বৃষ্টি নামল। পার্ক তখন তাঁর সমস্ত কাপড় বৃষ্টিতে ধরে দিয়ে, সেই ভিজা কাপড় নিংড়িয়ে তার জল খেয়ে তৃষ্ণা দূর করলেন। তখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রি, বিদ্যুতের আলোতে কম্পাস দেখে দিক স্থির করে, আবার তাঁকে সারারাত চলতে হল।

একবার তিনি সারাদিন না খেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে এক সহরে গিয়ে হাজির হতেই, সেখানকার রাজা হুকুম দিলেন, "তুমি গ্রামে ঢুকতে পারবে না।" তিনি সেখান থেকে অন্য এক গ্রামে গেলেন, সেখানেও লোকেরা তাঁকে দেখে ভয়ে পালাতে লাগল—তিনি যে বাড়িতেই যান লোকে দরজা বন্ধ করে দেয়। শেষটায় হতাশ হয়ে তিনি একটা গাছের তলায় বসে পড়লেন। এইরকম অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর, একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক আর তার মেয়ে এসে, তাঁকে ডেকে তাদের বাড়িতে নিয়ে খেতে আর বিশ্রাম করতে দিল। সে-দেশীয় মেয়েরা সন্ধ্যার পর ঘরে বসে চরকায় সুতো কাটে আর গান গায়। মাঙ্গো পার্কের নামে তারা গান বানিয়ে গেয়েছিল—সেই গানটার অর্থ এই—"ঝড় বইছে আর বৃষ্টি পড়ছে, আর বেচারা সাদা লোকটি শ্রান্ত অবশ হয়ে আমাদের গাছতলায় এসে বসেছে। ওর মা নেই, ওকে দুধ এনে দেবে কে? ওর স্ত্রী নেই, ওকে ময়দা পিষে দেবে কে? আহা, ঐ সাদা লোকটিকে দয়া কর। ওর যে মা নেই, ওর যে কেউ নেই।"

তিনি অনেকবার 'মুর'দের হাতে পড়েছিলেন। এক একটা গ্রামে তিনি যান আর সেখানকার সর্দার তাঁকে ডেকে পাঠায়, নাহয় লোক দিয়ে ধরপাকড় করে নিয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় তারা তাঁর কাছ থেকে, প্রায়ই কিছু না কিছু বকশিস আদায় না করে ছাড়ত না। এমনি করে তাঁর সঙ্গের জিনিসপত্র প্রায় সবই বিলিয়ে দিতে হয়েছিল। একবার এক সর্দার তাঁর ছাতাটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে মহা খুশী! ছাতাটাকে সে ফট্ ফট্ করে খোলে আর বন্ধ করে আর হো হো করে হাসে। কিন্তু ওটা দিয়ে কি কাজ হয়, সে কথাটা বুঝতে তার নাকি অনেকখানি সময় লেগেছিল। আসবার সময় মাঙ্গো পার্কের নীল কোট আর তাতে সোনালী বোতাম দেখে, সর্দার মশাই কোটটাও চেয়ে বসলেন। তখন সেটা তাকে না দিয়ে আর উপায় কি? যাহোক, সর্দারের মেজাজ ভাল বলতে হবে, সে ছাতা আর কোটের বদলে তাঁকে অনেক জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে, তাঁর চলাফিরার সুবিধা করে দিল। কিন্তু সকল সময়ে তিনি এত সহজে পার পাননি। আলি নামে এক মুর রাজার দল তাঁকে বন্দী করে, মাসখানেক খুব অত্যাচার করেছিল। প্রথমটা তারা ঠিক করল যে, এই বিধর্মী খৃষ্টানকে মেরে ফেলাই ভাল। তারপর কি যেন ভেবে তারা আবার বলল, "ওর ঐ বেড়ালের মতো চোখ দুটো গেলে দেও।" যাহোক শেষটায় সেখানকার রানীর অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

এমনি করে অত্যাচার অপমান চুরি ডাকাতি সব সহ্য করে, মাঙ্গো পার্ক শেষটায় একেবারে ফকির হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর লোকজন কাপড়চোপড় জিনিসপত্র, এমনকি ঘোড়াটি পর্যন্ত সঙ্গে রইল্ না। কিন্তু এত কষ্ট সয়েও শেষটায় যখন তিনি নাইগার নদীর সন্ধান পেলেন, তখন তাঁর মনে হল এত কষ্ট এত পরিশ্রম সব সার্থক হয়েছে। এমনি করে তিনি দুই বৎসর সে দেশ ঘুরে, তারপর দেশে ফিরে আসেন। এই দুই বৎসরের সব ঘটনা তিনি প্রতিদিন লিখে রাখতেন। আমরা এখানে যা লিখছি তার প্রায় সবই তাঁর সেই ডায়ারি থেকে নেওয়া।

আফ্রিকার নিগ্রো জাতীয় লোকদের আমরা সাধারণত 'অসভ্য জাতি' বলে থাকি—কিন্তু মাঙ্গো পার্ক বলেন যে, মুর বা আরব জাতীয় লোকেদের মধ্যে যারা কতকটা 'সভ্য' হয়েছে, তাদের চাইতে এই অসভ্যেরা অনেক ভাল। আমাদের দেশে যেমন সাঁওতালরা প্রায়ই খুব সরল আর সত্যবাদী হয়, মোটের উপব এরাও তেমনি। তাদের দেশে তারা বিদেশী লোক দেখেনি, কাজেই হঠাৎ অদ্ভুত পোশাক পরা হলদে চুল

নীল চোখ সাদা রঙের মানুষ দেখলে তাদের ভয় হবারই কথা। কিন্তু তবু বিপদ-আপদে পার্ক তাদের কাছেই সাহায্য পেতেন,—মুর বা আরবদের কাছে নয়।

দেশের নানান স্থানে নানান জাতীয় লোক, তাদের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। একবার মাঙ্গো পার্ক মালাকোণ্ডা বলে একটা সহরে এসে শুনলেন, আরও উত্তরে খুব বড় একটা লড়াই চলছে—'ফুতা-তরা'র রাজা আবুল কাদের অসভ্য জালফদের রাজা দামেলকে আক্রমণ করেছেন। এই আবুল কাদের আর দামেলের যুদ্ধ বড় চমৎকার। আবুল কাদের একজন দূতকে দিয়ে দামেলের কাছে দুখানা ছুরি পাঠিয়ে দিলেন, আর বলে দিলেন—"দামেল যদি মুসলমান হতে রাজি হন, তবে এই ছুরি দিয়ে আবুল কাদের নিজের হাতে তাঁর মাথা কামিয়ে দিবেন, আর যদি রাজি না হন তবে ঐ ছুরিটি দিয়ে তাঁর গলা কাটা হবে। এর মধ্যে কোন্‌টি তাঁর পছন্দ?" দামেল একথা শুনে বললেন, "কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না। আমি মাথাও কামাতে চাই না, গলায় ছুরিও বসাতে চাই না।" আবুল কাদের তখন প্রকাণ্ড দলবল সঙ্গে নিয়ে, জালফদের দেশে লড়াই করতে এলেন। জালফদের অত সৈন্য-সামন্ত নেই, তারা নিজেদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে, পথের পাতকুয়া সব বন্ধ করে, সহর গ্রাম সব ছেড়ে পালাতে লাগল। এমনি করে তিনদিন পর্যন্ত আবুল কাদের ক্রমাগত এগিয়েও লড়াইয়ের কোন সুযোগ পেলেন না। তিনি যতই এগিয়ে চলেন, কেবল নষ্ট গ্রাম আর পোড়া সহরই দেখেন, কোথাও জল নাই খাবার কিছু নাই, লুটপাট করবার মতো কোন জিনিসপত্র নাই। চতুর্থ দিনে তিনি পথ বদলিয়ে সারাদিন হেঁটে একটা জলা জায়গার কাছে এলেন। সেখানে কোনরকমে তৃষ্ণা দূর করে ক্লান্ত হয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, এমন সময় ভোর রাত্রে দামেল তাঁর দলবল নিয়ে, মারমার করে তাদের উপরে এসে পড়লেন। আবুল কাদেরের দল সে চোট আর সামলাতে পারল না—তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গেল, অনেকে মারা পড়ল, কিন্তু অধিকাংশই জালফদের হাতে বন্দী হল—সেই বন্দীদের একজন হচ্ছেন আবুল কাদের নিজে। জালফরা মহা ফুর্তিতে আবুল কাদেরকে বেঁধে দামেলের কাছে নিয়ে গেল। সকলে ভাবল এইবার দামেল বুঝি তাঁর বুকে ছুরি মেরে তাঁর শত্রুতার প্রতিশোধ নেবেন। কিন্তু দামেল সেরকম কিছুই না করে, জিজ্ঞাসা করলেন, "আবুল কাদের, তুমি যথার্থ বল ত—আজ তুমি বন্দী না হয়ে যদি আমি বন্দী হতাম, আর তোমার কাছে আমায় নিয়ে যেত, তাহলে তুমি কি করতে?" আবুল কাদের বললেন, "তোমার বুকে আমার বল্লম বসিয়ে দিতাম। তুমি তার বেশি আর কি করবে?" দামেল বললেন, "তা নয়! তোমায় মেরে আমার লাভ কি? আমার এইসব নষ্ট ঘরবাড়ি কি আর তাতে ভাল হয়ে যাবে, আমার প্রজারা কতজনে মারা পড়েছে—তারা কি আবার বেঁচে উঠবে? তোমায় আমি মারব না। তুমি রাজা, কিন্তু রাজার ধর্ম থেকে তুমি পতিত হয়েছ। যতদিন তোমার সে দুর্মতি দূর না হয়, ততদিন তুমি রাজত্ব করবার যোগ্য হবে না—ততদিন তুমি আমার দাসত্ব করবে।" এইভাবে তিনমাস নিজের বাড়িতে বন্দী করে রেখে তারপর তিনি আবুল কাদেরকে ছেড়ে দিলেন। এখনও নাকি সে দেশের লোকেরা দামালের এই আশ্চর্য মহত্ত্বের কথা বলে গান করে।

নাইগার নদীর আশেপাশে যেসব নিগ্রোরা থাকে তাদের 'ম্যাণ্ডিঙ্গো' বলে। তাদের সম্বন্ধে পার্ক অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন। তারা মনে করে, এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড সমতল মাঠের মতো; তার শেষ কোথায় কেউ জানতে পারে না, কারণ তার চারিদিক মেঘে ঘেরা। তারা বছরের হিসাব দেয় বড় বড় ঘটনার নাম করে, যেমন 'কুরবানা

যুদ্ধের বছর' 'দামেলের বীরত্বের বছর'। পার্ক যে-সকল গ্রামে গিয়েছিলেন, তার কোন কোনটিতে সেই বছরকে বলা হত 'সাদা লোক আসবার বছর।'

এর পরেও পার্ক আর-একবার দলবল নিয়ে আফ্রিকায় যান, এবং সেইখানেই প্রাণ হারান। এবার গোড়াতেই জ্বর-জারি হয়ে তাঁর লোকজন সব মারা যেতে লাগল। সাতচল্লিশজন সাহেবের মধ্যে তিন মাসে কুড়ি জন মারা গেল, বাকী অনেকগুলি অসুখে একেবারে কাহিল হয়ে পড়ল। চার মাসে তিনি আবার নাইগার নদীর ধারে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি আর সঙ্গে দুই-একটি নিগ্রো ছাড়া আর সকলেই প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। তারপর তিনি নৌকায় চড়ে জলের পথে কয়েকদিন গেলেন, কিন্তু চারিদিক থেকে মুরেরা ক্রমাগত আক্রমণ করে, তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। শেষটায় যখন তাঁর সঙ্গের সাতটি মাত্র সাহেব বেঁচে আছে, এমন সময় অনেক কষ্টে নিগ্রোদের দেশে এসে তিনি মনে করলেন, এতক্ষণে নিরাপদ হওয়া গেল। কিন্তু এইখানেই নদী পার হবার সময় তিনি দলবলশুদ্ধ নিগ্রোদের হাতে মারা গেলেন। তাঁর একটিমাত্র বিশ্বস্ত নিগ্রো চাকর, তাঁর চিঠিপত্র নিয়ে ফিরে এসে এই খবর দিল যে, নদীর স্রোতের মধ্যে নৌকাকে বেকায়দায় পেয়ে নিগ্রোরা তাঁদের মেরে কেটে সব লুটে নিয়েছে। তখন পার্কের বয়স ৩৪ বৎসর মাত্র।

ডেভিড লিভিংস্টোন

স্কটল্যান্ডের এক গরীব তাঁতির ঘরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম হয়। খুব অল্প বয়স হতেই ডেভিড তার বাপের সঙ্গে কারখানায় কাজ করতে যেত, সেখানে তাকে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা খাটতে হত। কিন্তু তার উৎসাহ এমন আশ্চর্য রকমের ছিল যে, এত পরিশ্রমের পরেও সে রাত্রে একটা গরীব স্কুলে পড়তে যেত। যখনই একটু অবসর হত সে তার বই নিয়ে পড়ত, নাহয় মাঠে ঘাটে ঘুরে নানারকম পোকা মাকড় গাছ পাথর প্রভৃতি সংগ্রহ করে বেড়াত।

এমনি করে লিভিংস্টোনের বাল্যকাল কেটে গেল। তারপর উনিশ বৎসর তাঁর মাহিনা বাড়তে, বাড়ির অবস্থা একটু ভাল হল। তখন তিনি কারখানার মালিকের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করে নিলেন, যাতে তিনি বছরে ছয় মাস কাজ করতেন আর বাকী ছ'মাস গ্লাস্‌গো সহরে গিয়ে পড়াশুনো করতেন। সেখানে কয়েক বছর ডাক্তারি পড়ে এবং ধর্মশিক্ষার পরীক্ষা পাশ করে, ২৭ বৎসর বয়সে তিনি অসভ্য জাতিদের মধ্যে শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য চাকুরি নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গেলেন। আফ্রিকায় তখনও সাহেবরা বেশি যাতায়াত করেনি—ম্যাপের অনেক স্থানেই তখন অজানা দেশ বলে লেখা থাকত। সেই অজানা দেশে অচেনা লোকের মধ্যে লিভিংস্টোন বাস করতে গেলেন।

পাদ্রী ডাক্তার লিভিংস্টোন দেখতে দেখতে আফ্রিকার নানা ভাষা শিখে ফেললেন, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখ-দুঃখের কথা সব জানলেন—আর দেশটাকে তাঁর এত ভাল লাগল যে, তার সেবায় জীবনপাত করতে তিনি প্রস্তুত হলেন। সে দেশের লোকের বড় দুঃখ যে, দুষ্ট পর্তুগীজ আর আরব দস্যুরা তাদের

নিয়ে দাস করে রাখে, ছাগল গরুর মতো হাটে বাজারে তাদের বিক্রি করে। বেচারীরা হাতীর দাঁত, পাখির পালক ও নানারকম জন্তুর চামড়ার ব্যবসা করে. বিলাতী জাহাজে করে সওদাগরেরা তাদের জিনিস কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু মাঝপথে এইসব দুষ্টু লোকেরা তাদের মারধর করে বেঁধে নিয়ে যায়। লিভিংস্টোন এইসব অত্যাচারের কথা শুনে একেবারে ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন, যেমন করে হোক, এ অত্যাচার থামাতে হবে।

. তিনি দেখলেন, ব্যবসা করতে হলে সেই লোকদের এমন সব পথ দিয়ে যেতে হয়, যেখানে পর্তুগীজ আর আরবরা তাদের সহজেই ধরে ফেলতে পারে—সমুদ্রে যাওয়া আসার আর কোন সহজ রাস্তা তাদের জানা ছিল না। তাদের দেশে বাণিজ্যের কোন ভাল বন্দোবস্ত নাই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় লোকদের মধ্যে ব্যবসা চালাবার কোন সুযোগ নাই। লিভিংস্টোন তখন পথঘাটের সন্ধান করে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বড় বড় নদীর পথ ধরে দিনের পর দিন চলে চলে, কত নতুন দেশ নতুন পাহাড় নতুন লোকের খবর পেলেন। এই কাজ তাঁর এত ভাল লাগল আর তাতে তাঁর এত উৎসাহ হল যে, তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে, পাদ্রির কাজ ফেলে, এই কাজেই দিন রাত লেগে রইলেন।

ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন, আফ্রিকার এপার ওপার পূব পশ্চিম যাওয়ার মতো পথ পাওয়া গেলে তবে বাণিজ্যের খুব সুবিধা হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই রাস্তার খোঁজে তিনি কয়েকজন সে-দেশী লোকের সঙ্গে কালাহারি মরুভূমি পার হয়ে ক্রমাগত উত্তর-পশ্চিম মুখে ঘুরতে ঘুরতে, পাঁচ বছরে পর্তুগীজ রাজ্যে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে এসে হাজির হলেন। পথের কষ্ট এবং জ্বরে ভুগে তাঁর শরীর তখন একেবারে ভেঙে গেছে, আর যেন নড়বার শক্তি নাই। কিন্তু তিনি সহজে থামবার লোক নন; কয়েক মাস বিশ্রাম করেই তিনি আবার ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সেখান থেকে একেবারে পূর্বদিকে সমুদ্রের কূল পর্যন্ত না গিয়ে তিনি থামবেন না।

জলের পথ দিয়ে নানা নদীর বাঁক ধরে ঘুরতে ঘুরতে, তিনি ক্রমে জাম্বেসি নদীতে এসে পড়লেন। তাঁর আগে আর কোন বিদেশী সে জায়গা দেখে নাই। সেখানকার লোকদের সঙ্গে তিনি আলাপ করে এক আশ্চর্য খবর শুনলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের দেশেও কি ধোঁয়ায় গর্জন করতে পারে?" লিভিংস্টোন বললেন, "সে কি রকম?" তারা বলল, "তুমি ধোঁয়া-গর্জনের পাহাড় দেখনি?" লিভিংস্টোনের ভারি আগ্রহ হল, এ জিনিসটা একবার দেখতে হবে। সেই জাম্বেসি নদী দিয়ে নৌকা করে তিনি অনেক দূর গিয়ে দেখলেন, এক জায়গায় ধোঁয়ার মতো পাঁচটা স্তম্ভ উঠেছে, তার চারদিকের দৃশ্য এত সুন্দর যে, লিভিংস্টোনের বোধ হল এমন চমৎকার স্থান তিনি আগে কখনও দেখেননি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, নদীটা গেল কোথায়? সামনে খালি চড়া আর পাহাড়; নদীর চিহ্নমাত্র নাই—আর পাহাড়ের ওদিকে খালি ধোঁয়া আর গর্জন। সেইখানে নৌকা বেঁধে লিভিংস্টোন হেঁটে দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কি? গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর বোধ হল যে তাঁর জন্ম সার্থক—তাঁর এত বৎসরের পরিশ্রম সার্থক। তিনি দেখলেন, নদীটা একটা পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ঢুকে পাহাড়ের পেট কেটে তিনশ হাত খাড়া ঝরনার মতো ঝরে পড়ছে। এত বড় ঝরনা লিভিংস্টোন কোনদিন চক্ষে দেখেননি। পড়বার বেগে ঝরনার জল ভয়ানক শব্দে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে প্রায় ২০০ হাত উঁচু হয়ে উঠছে

—তার উপর সূর্যের আলো পড়ে চমৎকার রামধনুর ছটা বেরিয়েছে—আর সেই ঝাপসা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে রংবেরঙের গাছপালা পাহাড় জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন ছিটের পর্দা।

এমনি করে কত আশ্চর্য আবিষ্কার করতে করতে লিভিংস্টোন একেবারে নূতন পথ দিয়ে দুই বছরে আফ্রিকার পূর্বকূলে এসে পড়লেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে সকলের কাছে সম্মান লাভ করে, তিনি দলবল নিয়ে আবার সেই জাম্বেসি নদীর ধারে ফিরে গেলেন। এবারে তাঁর স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গেলেন—আর ইংরাজ গভর্নমেণ্ট তাঁকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, তারপর তাঁর সঙ্গের লোকজন অনেকেই ফিরে গেলেন। ক্রমে বিলাত থেকে খরচ আসাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু লিভিংস্টোন একাই নিজের খরচে ঘুরতে লাগলেন। এবার নূতন পথে তিনি উত্তর-পূর্ব মুখে বড় বড় হ্রদের দেশ দিয়ে, একেবারে ইজিপ্টের কাছে 'নায়াসাতে' এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে সে-দেশী দু-চারটি লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না—কিন্তু তারা তাঁকে এত ভালবাসত যে, ঘোর বিপদের মধ্যেও তাঁকে ছেড়ে যেতে রাজি হয়নি।

লিভিংস্টোন কি তাদের কম ভালবেসেছিলেন! সেই আঁধার দেশের লোকের দুঃখে তাঁর যে কি দুঃখ—তাঁর বইয়ের পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। পর্তুগীজদের অত্যাচারের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কথাগুলো যেন আগুন হয়ে উঠত। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ লেখা এই—"এই নির্জন দেশে বসে আমি এই মাত্র বলতে পারি, পৃথিবীর এই কলঙ্ক (দাস ব্যবসায়) যে মুছে দিতে পারবে—ভগবানের অজস্র আশীর্বাদে সে ধন্য হয়ে যাবে।"

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫০ বৎসর বয়সে তিনি শেষবার আফ্রিকায় ঘুরতে গিয়েছিলেন—তারপর আর দেশে ফেরেননি। এবার তিনি গোড়া হতেই নানারকম বিপদে পড়েছিলেন—তাঁর জন্য যে রসদ পাঠান হল কতক তাঁর কাছে পৌঁছলই না—বাকী সব চুরি হয়ে গেল। তারপর ক' বছর ধরে তাঁর আর কোন খবরই পাওয়া গেল না। ক্রমে দেশের লোক ব্যস্ত হয়ে উঠল, লিভিংস্টোনের কি হল জানবার জন্য চারিদিকে লেখালেখি চলতে লাগল। শেষটা স্ট্যান্‌লি বলে একজন ওয়েলশ যুবক তার খবর আনতে আফ্রিকায় গেলেন। এত বড় মহাদেশের মধ্যে একজন লোককে আন্দাজে খুঁজে বার করা যে খুবই বাহাদুরির কাজ, তাতে আর সন্দেহ কি? স্ট্যান্‌লি বছরখানেক ঘুরে তাঁর দেখা পেলেন বটে, কিন্তু তখন লিভিংস্টোনের মর-মর অবস্থা। তিনি এত রোগা আর দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে, দেখলে চেনা যায় না। স্ট্যান্‌লির সাহায্যে লিভিংস্টোন কতকটা সেরে উঠলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছুদিন ঘুরলেন, কিন্তু দেশে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "আমি এই দেশের নির্জন নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যেই এ জীবন শেষ করব।"

তারপর, বছরখানেক পরে একদিন লিভিংস্টোন তাঁর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন,—আর উঠলেন না। তাঁর লোকেরা তাঁকে ডাকতে এল, তখন দেখল যে তিনি সেই অবস্থাতেই মারা গেছেন। বিশ্বাসী চাকরেরা অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করে পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে, সমুদ্রের কূল পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ বয়ে এনে জাহাজে তুলে দিল। ইংলণ্ডে যাঁরা বীর, যাঁরা দেশের নেতা, যাঁদের কীর্তিতে দেশের গৌরব বাড়ে, তাঁদের কবর দেওয়া হয় 'ওয়েস্টমিনস্টার এবি'তে। সেই ওয়েস্টমিনস্টার এবিতে যদি যাও, সেখানে লিভিংস্টোনের সমাধি দেখতে পাবে!

কলম্বস

চারশ বৎসর আগে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে সকলেই পূর্বমুখে পারস্যের ভিতর দিয়া আসিত। তখন পণ্ডিতেরা সবেমাত্র পৃথিবীটাকে গোল বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্রিস্টোফার কলম্বস নামে ইটালি দেশীয় এক নাবিক ভাবিলেন, যদি সত্য সত্যই পৃথিবীটা গোল হয়, তবে ত পূর্ব মুখে না গিয়া ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গেলেও, সেই ভারতবর্ষের কাছাকাছিই কোথাও পৌঁছান যাইবে। এ-বিষয়ে তাঁহার বিশ্বাস এতদূর হইয়াছিল যে, তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কেবল বিশ্বাস আর সাহস থাকিলেই হয় না—কলম্বস গরীব লোক, তিনি জাহাজ পাইবেন কোথা, লোকজন জোগাড় করিবেন কিসের ভরসায়? তিনি দেশে দেশে ধনীলোকদের কাছে দরখাস্ত করিয়া ফিরিতে ফিরিতে পর্তুগালে আসিয়া হাজির হইলেন। ক্রমে তাঁহার মতলবের কথা রাজার কানে গিয়া পৌঁছিল—তিনি তাঁর মন্ত্রীদের উপর এই বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দিলেন। মন্ত্রীরা ভাবিল, 'এ লোকটার কথা যদি সত্য হয়, তবে খামখা এই বিদেশীকে সাহায্য না করিয়া, আমরাই একবার এ চেষ্টাটা করিয়া দেখি না কেন?' তাঁহারা কলম্বসের কাছে তাহার হিসাবশুদ্ধ সমস্ত নকশা চাহিয়া লইলেন, এবং গোপনে কয়েকজন পর্তুগীজ নাবিককে সেই পশ্চিমের পথে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই ঝড় তুফান আর কেবল অকূল সমুদ্র দেখিয়া তাহারা ভয়ে ফিরিয়া আসিল। কলম্বস যখন জানিতে পারিলেন যে, রাজকর্মচারীরা তাঁহাকে এইভাবে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন রাগে ও ঘৃণায় তিনি সে দেশ ত্যাগ করিয়া স্পেন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সাত বৎসর রাজদরবারে দরখাস্ত বহিয়া, তারপর রাণী ইসাবেলার কৃপায় তিনি তাঁহার এতদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইলেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঠিক ৪২৫ বৎসর পূর্বে কলম্বস ভারতবর্ষের সন্ধানে যাত্রা করেন।

ক্রমাগত ৭০ দিন পশ্চিম মুখে চলিয়াও কলম্বস ডাঙার সন্ধান পাইলেন না। ইহার মধ্যে তাঁহার সংগের লোকেরা কতবার নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, কতবার তাহারা বাড়ি ফিরিবার জন্য জেদ করিয়াছে, সমুদ্রের কূল-কিনারা না দেখিয়া কতজন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়াছে—এমনকি কলম্বসকে মারিয়া ফেলিবার জন্যও তাহারা কতবাব ক্ষেপিয়াছে। কিন্তু কলম্বস অটল প্রশান্তভাবে সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন, "ভয় নাই! আরেকটু ভরসা করিয়া চল, সমুদ্রের শেষ পাইবে।" ৭১ দিনের দিন দূরে কূল দেখা দিল। তখন সকলের আনন্দ দেখে কে। পরদিন তাঁহারা নূতন দেশে এক অজানা দ্বীপে অজানা জাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তারপর কি আনন্দে সে দেশ হইতে নানা ধনরত্ন অলংকারে জাহাজ ভরিয়া, সে-দেশী লোক সংগে লইয়া, তাঁহারা সেই সংবাদ দিবার জন্য দেশে ফিরিলেন। তখন দেশে কলম্বসের সম্মান দেখে কে! কলম্বস ভাবিয়াছিলেন তিনি ভারতবর্ষের কাছে কোন দ্বীপে আসিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক

তিনি যেখানে গিয়াছিলেন সেটা আমেরিকার বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে। ইহার পর তিনি আরও দুবার পশ্চিমে যান, এবং শেষের বার আমেরিকা পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই ভুলের জন্যই এখনও আমেরিকার লোকেদের 'ইণ্ডিয়ান' বলা হয়—আর ম্যাপে ঐ দ্বীপগুলার নাম লেখা হয় পশ্চিম ইণ্ডিজ।

দুঃখের বিষয়, শেষ জীবনে কলম্বসের অনেক শত্রু জুটিয়াছিল, তাহারা রাজার কাছে কোনরকম নালিশ করিয়া রাজাকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে। রাজা কলম্বসকে সভায় হাজির করিবার জন্য লোক পাঠান—তখন কলম্বস ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ। রাজার লোক কলম্বসের হাতে শিকল বাঁধিয়া, তাঁহাকে জাহাজে কয়েদ করিয়া রাজার কাছে চালান দিল। সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধের দুর্দশা দেখিয়া রাজার মনে কি দয়া হইল, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু কলম্বস এ অপমানের কথা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবিতে ভাবিতে, দারিদ্র্য ও অনাদরের মধ্যেই এই কীর্তিমান পুরুষের জীবন শেষ হইল।

জোয়ান

সে প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার কথা। ফরাসি জাতির তখন বড়ই দুঃখের দিন। দেশের রাজা হলেন পাগল—আর অপদার্থ রাজপুত্র সারাদিন আমোদেই মত্ত। দেশের মধ্যে কোথাও শান্তি নেই, শৃঙ্খলা নেই—চারিদিকে কেবল দলাদলি আর যুদ্ধবিবাদ। ঘরের শত্রু দেশের লোক, তার উপর বাইরের শত্রু ইংলণ্ডের রাজা। দেশশুদ্ধ সবাই দলাদলি নিয়ে ব্যস্ত, সেই সুযোগে ইংরাজরাজ দলবলশুদ্ধ ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে একধার থেকে দেশটা দখল করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁকে বাধা দিবার কেউ নাই। এমনই দেশের দুর্দিন।

ফ্রান্সের এক নগণ্য গ্রামের সামান্য এক কৃষকের মেয়ে, তার নাম জোয়ান। সমস্ত দেশের দুঃখ যেন এই মেয়েটির প্রাণে এসে বেজেছিল। ফ্রান্সের পাহাড় নদী, ফ্রান্সের ঘরবাড়ি সব যেন তার আপনার জিনিস ছিল। ফরাসি বীরদের আশ্চর্য কাহিনী শুনতে শুনতে তার উৎসাহ আগুন হয়ে জ্বলে উঠত, আর ফরাসিদের দুঃখের কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখের জল আর ফুরাত না। ফ্রান্সকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। আর ভালবাসত তার আপনার গ্রামটিকে। সেই মিউজ নদীর ধারে ছোট্ট ডমরেমি গ্রামটি, তার গির্জার গায়ে কত সাধু 'সেইণ্ট্' কত মহাপুরুষের পাথর মূর্তি। সেখানে সারাদিন গির্জার ঘণ্টা বাজে আর গির্জার জানালা দিয়ে রঙিন আলো বাইরে আসে। সেখানে বুড়ো ওক গাছ আছে, আর দেবতার কুয়ো আছে, তাদের সম্বন্ধে কত আশ্চর্য গল্প লোকের কাছে শোনা যায়। জোয়ানের কাছে এ সমস্তই সুন্দর আর সমস্তই সত্যি বলে মনে হত। সে অবাক হয়ে গির্জার কাছে বাগানে এসে বসে থাকত, আর ভাবত কে যেন তাকে ডাকছে। দেশের দুঃখে সে যখন কাঁদত তখন কে যেন তাকে বলত, "ভয় নাই, জোয়ান! তোমার এ দুঃখ আর থাকবে না।" জোয়ান চেয়ে দেখত কোথাও কেউ নাই, খালি সেণ্ট মাইকেলের ঝক্ঝকে সুন্দর মূর্তিটি যেন তার দিকে

করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে কারা যেন আলোর পোশাক পরে তার কাছ দিয়ে চলে যেত। জোয়ান কিছু বুঝত না, কেবল আনন্দে তার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত, তার দু চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়ত। এমনি করে কতদিন যায়, একদিন হঠাৎ সে শুনল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। অতি মধুর অতি সুন্দর গলায় কে যেন বলছে "জোয়ান! দুঃখিনী জোয়ান! ঈশ্বরের প্রিয় কন্যা জোয়ান! তুমি ওঠ। তোমার দেশকে বাঁচাও; রাজপুত্র আমোদ-বিলাসে ডুবে আছেন, তাঁকে উৎসাহ দাও; সৈন্যদের মনে নতুন সাহস জাগিয়ে তোল; রাজমুকুট রাজাকে ফিরিয়ে এনে দাও।" জোয়ান স্তব্ধ হয়ে সব শুনতে লাগল। সে যেন সত্যি সত্যিই দেখল সে আর সেই সামান্য কৃষকের মেয়ে নয়। তার মনে অদ্ভুত সাহস আর শক্তি এসেছে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল যে ফ্রান্সের সৈন্য আবার বিপুল তেজে যুদ্ধ করছে, আর সে নিজে অস্ত্র ও পতাকা নিয়ে তাদের আগে আগে চলেছে।

এ কি অদ্ভুত কথা! সামান্য চাষার মেয়ে, সে না জানে লেখাপড়া, না জানে সংসারের কিছু, তার উপর এ কি অসম্ভব আদেশ! কিন্তু জোয়ানের মনে আর কোন সন্দেহ হল না। সে সকলকে বলল, "আমায় রাজার কাছে নিয়ে চল।" এ কথা যে শোনে সেই হাসে, সেই বলে "মেয়েটা পাগল।" তার বাবা বললেন "মেয়েটার বড় সাহস বেড়েছে, কোন্‌দিন বিপদ ঘটাবে দেখছি।" গ্রামের যে সর্দার সে বলল, "মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে বন্ধ করে রাখ।" গির্জার যে বুড়ো পাদ্রি সেও এসে জোয়ানকে গালাগালি দিয়ে শাসিয়ে গেল। কিন্তু জোয়ান তবু তার সেই এক কথাই বলে "আমি রাজার কাছে যাব।" যাহোক শেষে জোয়ানের কথাই ঠিক হল। ছদ্মবেশে গ্রাম থেকে বেরিয়ে, কত বাধা বিপদের ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই শ মাইল পথ পার হয়ে একদিন সে সত্যি সত্যিই রাজদরবারে গিয়ে হাজির হল। সেখানে গিয়ে সে রাজার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল "আমি চাষার মেয়ে জোয়ান। ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন শুধু এই কথা বলবার জন্য যে, রীম্‌স্‌ নগর জয় করে আবার তুমি রাজা হবে।" পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে, তার মুখে এমন কথা শুনে সভাশুদ্ধ সকলে হেসে অস্থির। কিন্তু রাজার মুখে হাসি নেই—তিনি জোয়ানের শান্ত মুখের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছেন আর তাঁর মনে হচ্ছে—এ মেয়ে বড় সামান্য মেয়ে নয়; এ যা বলছে তা সত্যি হবে। তখনই হুকুম হল "সৈন্যেরা সব প্রস্তুত হও, আবার যুদ্ধে যেতে হবে। ঈশ্বরের দূত জোয়ান তোমাদের সেনাপতি হবেন।"

তারপর মহা উৎসাহে সব ফিরে চলল। যেদিকে ইংরাজ সৈন্য গ্রাম নগর সব দখল করে পথঘাট আগলিয়ে আছে সেইদিকে সবাই চলল। ঝক্‌ঝকে সাদা বর্ম পরে যোদ্ধার বেশে চাষার মেয়ে তাদের আগে আগে চলেছে। তার হাতে সাদা নিশান, তার উপর সোনালী কাজ করা যীশুখৃষ্টের মূর্তি। চারিদিকের গ্রামবাসীরা এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্য ছুটে এল—তারা জোয়ানকে ঘিরে আনন্দে কোলাহল করে বলতে লাগল "দেবতার মেয়ে জোয়ান! দেবতার মেয়ে জোয়ান!" এমনি করে সকলে মিলে অর্লেয়াঁ সহরে ইংরাজের শিবিরের সামনে উপস্থিত হল। সেইখানে এসে জোয়ান ইংরাজের কাছে এই খবর পাঠাল, "তোমরা আমার কথা শোন। নগরের চাবি আমার কাছে দিয়ে তোমরা এ সহর ছেড়ে চলে যাও, এ দেশ ছেড়ে তোমাদের দেশে ফিরে যাও। যদি না যাও তবে আমি তোমাদের দুর্গ ভেদ করে যাব আর চারিদিক এমন তোলপাড় করে তুলব যে হাজার বছর কেউ এ দেশে তেমন কাণ্ড দেখেনি।" ইংরাজ হেসে বললেন, "চাষার মেয়ে, চাষবাস গরুবাছুর নিয়ে থাক।" কিন্তু জোয়ান তার

দলবলশুদ্ধ যখন ইংরাজ শিবির আক্রমণ করলেন, তখন তার অদ্ভুত উজ্জ্বল মূর্তি দেখে ইংরাজের সাহস ও বুদ্ধিবল সব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কে বা তখন যুদ্ধ করে, কে বা ফরাসি সৈন্যের সামনে দাঁড়ায়—দু একবার মাত্র আক্রমণের বেগ সহ্য করে ইংরাজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এক সপ্তাহ মধ্যেই অর্লেয়াঁ সহর উদ্ধার হয়ে গেল। এই সংবাদ যখন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল তখন ফরাসিদের মনে কি যে উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠল, তার আর বর্ণনা হয় না।

কিন্তু ফ্রান্সের যাঁরা সেনাপতি ছিলেন, তাঁদের হিংসুকে মনগুলো হিংসায় জ্বলতে লাগল। তাঁরা এতদিন যা করতে পারলেন না, একটা কোথাকার পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ে কিনা তাই করে দিল। তাঁরা ভিতরে ভিতরে নানারকম শত্রুতা করে জোয়ানের কাজে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁরা শত্রুতা করে আর কি করবেন —সৈন্যেরা তখন জোয়ানকেই মানে, দেশের লোক জোয়ানের কথাই শোনে, জোয়ানকে তারা দেবতার মতো ভক্তি করে। এমনি করে জোয়ান গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহর উদ্ধার করতে করতে তাঁর সেই পুরানো ডমরেমি গ্রামের কাছে এসে পড়লেন। গ্রামের লোকেরা তখন দল বেঁধে তাদের জোয়ানকে দেখতে চলল। তারা দেখল, ফ্রান্সের সৈন্য আবার উৎসাহ করে যুদ্ধে চলেছে, আবার ফ্রান্সের গৌরবে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—আর তাদের আগে আগে রাজার সঙ্গে শ্বেত পতাকা নিয়ে আলোর মতো উজ্জ্বল পোশাকে চলেছেন চাষার মেয়ে জোয়ান! যারা আগে জোয়ানকে ঠাট্টা করেছিল, বাধা দিয়েছিল, শাসন করতে চেয়েছিল, তারা আজ গর্ব করে বলতে লাগল, "এই ত আমাদের জোয়ান—আমাদের গ্রামের মেয়ে।" আর জোয়ানের বাবা, সেই বৃদ্ধ চাষা যে তার মেয়েকে ডুবে মরবার কথা বলেছিল, আনন্দে তার দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। সে বলল, "আমার ঘরেও এমন মেয়ে জন্মেছিল!"

সেনাপতিরা চলেছেন পদে পদে বাধা দিবার জন্য। এক একটা সহর জয় হয় আর তাঁরা রাজাকে বলেন, "আর গিয়ে কাজ নাই। হঠাৎ সৈন্যদের একটু উৎসাহ হয়ে কতগুলো সহর দখল করা গেছে। কিন্তু বেশি লোভ করলে, এর পরে ভারি বিপদ হবে।" কিন্তু জোয়ান বলে, "আমি জানি, রীম্‌স্‌ নগর পর্যন্ত আমায় যেতে হবে সেখানে রাজার অভিষেক হবে।" যখন রাজার মনও বিমুখ হয়ে পড়ল, তখন জোয়ান কেঁদে বলল, "আর কিছুদিন আমার কথা শুনুন—তারপর আমি চলে যাব। শেষে আর সময় হবে না, আমি আর এক বছরের বেশি বাঁচব না।" যখন ত্রয় নগরের কাছে এসে ইংরাজের সৈন্যবল দেখে কাপুরুষ রাজা মন্ত্রণা করতে বসলেন, তখন জোয়ান তাঁর মন্ত্রণাসভায় ঢুকে বলল, "এমন করে সময় নষ্ট করবেন না।" সভার মন্ত্রীরা বললেন, "তোমায় ছয়দিন মাত্র সময় দিলাম, এর মধ্যে যদি সহর দখল করতে না পার, তাহলে আমরা ফিরে যাব।" জোয়ান বলল, "ছয়দিন কেন? তিনদিন সময় দিন।" তার পরেরদিনই সে সৈন্য নিয়ে ত্রয় নগরের দ্বারে উপস্থিত হতেই ইংরাজ প্রহরীরা বিনাযুদ্ধেই দ্বার ছেড়ে পথ ছেড়ে সহর ছেড়ে উত্তরের দিকে সরে পড়ল। তারপর ক্রমে রীম্‌স্‌ নগরও উদ্ধার হল; মহা সমারোহ করে রাজার অভিষেক হয়ে গেল; জোয়ান নিজের হাতে রাজার মাথায় মুকুট তুলে দিল। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "ফ্রান্সের গৌরবমণি জোয়ান! আজ তুমি কি পুরস্কার পেতে ইচ্ছা কর?" জোয়ান বলল, "আমার ত সব ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে—যদি অনুগ্রহ করতে চান, তবে আমার জন্মস্থান ডমরেমি গ্রামকে আজ থেকে খাজনামুক্ত করে দিন।" সেই থেকে আজ পর্যন্ত ডমরেমি গ্রাম আর সরকারী খাজনা দেয় না—আজও রাজস্ব হিসাবের খাতায় জোয়ানের নাম

করে বলা হয়, তার খাতিরে খাজনা মাপ।

তারপর জোয়ান বলল, "আমার কাজ এখন শেষ হয়েছে। এখন আমি আমার গ্রামে ফিরে যাই।" কিন্তু সেনাপতিরা উল্টাসুর ধরে বললেন, "এতদূর এলাম যখন, তখন পারিস পর্যন্ত যাওয়া যাক।" জোয়ানের মনে এতদিন আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, কিন্তু এখন যেন আর তার সে ভরসা নাই। এতদিন তার মনে হত দেবতারা তার সঙ্গে আছেন, আজ প্রথম তার মনে হল সংসারে সে একা—পৃথিবীতে কেউ তার সহায় নেই। তবু রাজার আদেশ মানতে হবে। জোয়ান সৈন্য নিয়ে পারিসের দিকে চললেন। কিন্তু দুদিন না যেতেই অকৃতজ্ঞ নরাধম রাজা গোপনে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি করে, জোয়ানকে শত্রুর মুখে ফেলে নিজে দলবল নিয়ে সরে পড়লেন। জোয়ানের জীবনে এই প্রথমবার তার পরাজয় হল। এমন বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ রাজা, কিন্তু জোয়ান তাকে ছাড়তে পারল না। দুদিন যেতে না যেতেই রাজা আবার বিপদে পড়েছেন; সে খবর শুনেই জোয়ান তাঁর উদ্ধারের জন্য সৈন্য নিয়ে ছুটে গেল। এই তার শেষ যাত্রা। একদিন ঘোর যুদ্ধের মধ্যে তার নিজেরই দলের লোক তাকে ইংরাজের কাছে ধরিয়ে দিল।

তারপর সে কি দুঃখের দিন! শিশুর মতো নির্মল সুন্দর জোয়ানকে পশুর মতো খাঁচার মধ্যে পুরে, শিকল দিয়ে তার হাত পা বেঁধে, তার শত্রুরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। কত লোকে কাঁদল, কত লোকে তার জন্য আকুল হয়ে প্রার্থনা করল, কিন্তু দেশের রাজা, দেশের বীর যোদ্ধা সেনাপতি, কেউ তার উদ্ধারের জন্য ছুটে গেল না, কেউ তার হয়ে একটি কথা পর্যন্ত বলল না। রাজা নির্বাক নিশ্চিন্ত, রাজার বিরোধী যারা তারা ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিল। দেশী বিদেশী সকল শত্রু মিলে এই একটি অসহায় মেয়েকে ধ্বংস করবার জন্য মিথ্যা বিচারের ভড়ং করতে বসল। কত তর্জন শাসন, আর কত অন্যায় নির্যাতন করে, কত মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে, তারা জোয়ানকে জব্দ করতে চাইল। যুদ্ধের মধ্যেও যে কাউকে আঘাত করেনি; যুদ্ধের সময়েও যে একদিনের জন্যও ভগবানকে ভোলেনি; যার শেষ বিশ্বাস ছিল অস্ত্রে নয়, বর্মে নয়, কিন্তু দেবতার আশীর্বাদে; ধর্ম-ব্যবসায়ী পাদ্রিরা তাকে শয়তানের দূত বলে, ধর্মদ্রোহী মিথ্যাবাদী বলে, পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিলেন! শেষ পর্যন্ত জোয়ানের বিশ্বাস টলেনি। সে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "যা করেছি, দেবতার আদেশে করেছি। তার জন্য আমার কোন অপরাধ হয়নি।" কিন্তু যখন তাকে খোঁটার মধ্যে বেঁধে চারিদিকে কাঠ সাজিয়ে দিল, যখন নিষ্ঠুর ঘাতকেরা মশাল নিয়ে সেই কাঠে আগুন ধরাতে এল, তখন ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। তার মনে হল সেই ডমরেমি গ্রামের কথা,—সেই যে গির্জার ধারে দেবতার বাণী সে শুনেছিল, সেই যে আলোর মতো দেবতারা তাকে ডেকে ডেকে আশার কথা বলেছিলেন,—সেই কথা তার মনে হল। কিন্তু হায়! সেই দেবতারা আজ কোথায়? তাঁরাও কি জোয়ানকে ভুলে গেলেন? অসহায় শিশুর মতো জোয়ান কেঁদে উঠল "সেণ্ট মাইকেল! সেণ্ট মাইকেল! আজ তুমি কোথায়?" সে ব্যাকুল ডাক শুনে নিষ্ঠুর বিচারকের চোখেও জল এল। চারিদিকে কান্নার রোল উঠল। কিন্তু অন্ধ হিংসার শাসন টলবার নয়। যার পায়ের ধুলো নেবার যোগ্য তারা নয়, সেই মেয়েকে পুড়িয়ে মেরে ধর্মযাজকেরা নিশ্চিন্ত হলেন,—ভাবলেন যাহোক এতদিনে ধর্ম বাঁচল।

পিপাসার জল

ইংলণ্ডের ইতিহাসে বীরত্বের জন্য যাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয়, সার ফিলিপ সিডনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। রানী এলিজাবেথ হইতে সাধারণ প্রজা পর্যন্ত সকলেই তাঁহার বীরত্বের কথা জানিত এবং তাঁহাকে সম্মান করিত। এলিজাবেথ বলিতেন, "সার ফিলিপ এই যুগের শ্রেষ্ঠ রত্ন।" সার ফিলিপ যে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি কেবল যোদ্ধা ছিলেন না,—একাধারে যোদ্ধা, পর্যটক, পণ্ডিত, গায়ক ও কবি ছিলেন। কিন্তু লোকে আজও যে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছে, সে কেবল তাঁহার সাহস, বাহুবল বা প্রতিভার জন্য নয়। নানাদিকে তাঁহার নানা কীর্তির কথা যদি সমস্তই লোপ পাইয়া যায়, তবু তাঁহার মৃত্যুকালের শেষ বীরত্বের কাহিনীই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

সুটফেনের যুদ্ধে আহত হইয়া সার ফিলিপের মৃত্যু হয়। যুদ্ধের আরম্ভেই তাঁহার ঘোড়া মরিয়া যায় এবং তিনি আহত হইয়া মাটিতে পড়েন। কিন্তু তাঁহার যুদ্ধের উৎসাহ তখনও মিটে নাই; তখনই আর এক ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার যুদ্ধের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খানিকক্ষণ ভীষণ যুদ্ধের পর তাঁহার এ ঘোড়াটিও যখন মারা পড়িল, তখন তিনি আবার এক ঘোড়া আনিয়া তৃতীয়বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারে শত্রুপক্ষের একটি গুলি তাঁহার বুকে লাগিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার ঘোড়া পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে তাঁহাকে শিবিরের কাছে আনিয়া ফেলিয়া দিল। তাঁহার দলের লোকেরা সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু ডাক্তার বলিলেন, বাঁচিবার কোন আশা নাই।

জ্বরে ও যন্ত্রণায় অবসন্ন হইয়া যখন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল, তখন দারুণ পিপাসা দেখা দিল,—একটু জলের জন্য তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে জল কি সব সময় পাওয়া যায়? বহু চেষ্টার পর অনেক কষ্টে একটি ঘটিতে করিয়া একটু জল আনিয়া তাঁহার হাতে দেওয়া হইল। তিনি মাথা তুলিয়া সেই জল পান করিতে যাইবেন, এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহারই পাশ দিয়া দুজন লোকে একটি আহত সৈনিককে লইয়া যাইতেছে; এবং সে বেচারী এমন করুণভাবে তাঁহার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া আছে, যে মনে হয়, একটু জল পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। সার ফিলিপ তৎক্ষণাৎ ঘটিটি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নাও, আমার চাইতে তোমার দরকার বেশি।"("Thy need is greater than mine")

ইহার কিছু পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সারা জীবন নানা বীরত্বের পরিচয় দিয়া, মৃত্যুকালেও তিনি দেখাইয়া গেলেন যে তিনি কত বড় বীর।

আর একজন বীরের কথা শোনা যায়, যিনি পিপাসার সময়ে হাতের কাছে জল পাইয়াও সে জল পান করিতে চাহেন নাই। অস্ট্রিয়ার রাজা রুডলফ্ একবার যুদ্ধ যাত্রা করিয়া সসৈন্যে এমন জায়গায় গিয়া পড়িলেন, যেখানে আশেপাশে কোথাও

জল পাওয়া যায় না। জল আনিবার জন্য বহুদূরে লোক পাঠান হইল; তাহারা কখন ফিরিবে, পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বেলা যতই বাড়িয়া চলিল, জলের জন্য সকলে ততই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "আহা, আমাদেরই এত যন্ত্রণা, রাজা রুডল্‌ফ্‌ না জানি কত কষ্ট পাইতেছেন।" শেষে এদিক ওদিক অনেক খুঁজিয়া এক পথিকের কাছে এক পেয়ালা জল পাওয়া গেল। সেই জল আনিয়া রাজাকে দেওয়া হইল। রুডল্‌ফ্‌ জলের পেয়ালা হাতে লইয়া বলিলেন, "এতগুলি তৃষ্ণার্ত লোক, এতটুকু জলে তাহাদের কি হইবে? আমার পিপাসা শুধু আমার নিজের জন্য নয়; আমার প্রত্যেক সৈন্যের পিপাসা যতক্ষণ না মিটিবে ততক্ষণ আমার তৃষ্ণা মিটিবে কিরূপে?" এই বলিয়া তিনি পেয়ালা মাটিতে উপুড় করিয়া পৃথিবীর জল পৃথিবীকে ফিরাইয়া দিলেন।

আর একটি এইরূপ গল্প আছে, সেও বহুদিনের কথা। প্রায় তিনশ বৎসর আগে সুইডেনের সঙ্গে ডেনমার্কের যুদ্ধ হইয়াছিল। একটি যুদ্ধের পর অনেকগুলি আহত লোক যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ডেন সৈনিকের সঙ্গে এক বোতল জল ছিল। বোতল খুলিয়া সে সবেমাত্র জল পান করিতে যাইবে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল একটু দূরে কে যেন যন্ত্রণায় কোঁকাইতেছে। শুনিয়া তাহার মনে ভারি দয়া হইল; সে টানিয়া হ্যাঁচড়াইয়া কোনরকমে সেই লোকটির কাছে গিয়া দেখিল, সে একজন শত্রুপক্ষীয় সুইড। কিন্তু ডেন সৈনিকটি শত্রুমিত্র বিচার না করিয়া মুমূর্ষু শত্রুর মুখের কাছে বোতল লইয়া বলিল, "আহা! তোমার বড় বেশি আঘাত লাগিয়াছে—এই জল খাও।" সুইড সৈনিক এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া, হঠাৎ এক পিস্তল তুলিয়া জলদাতার কাঁধে গুলি করিল। ডেন বেচারী, শত্রুর উপকার করিতে গিয়া আবার সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়া পড়িয়া গেল।

এমন করিলে কাহার না রাগ হয়? ডেন চীৎকার করিয়া বলিল, "হতভাগা, আমি তোকে জল দিতে গেলাম, আর তুই আমায় খুন করিতে উঠিলি? দাঁড়া, তোকে আমি আচ্ছারকম শাস্তি দেই। আগে সবটা জল তোকে দিতেছিলাম, এখন অর্ধেকের বেশি কখনই দিব না।" এই বলিয়া সে বোতলের জল খানিকটা পান করিয়া, তারপর বোতলটা শত্রুর হাতে গুঁজিয়া দিল।

ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল

এক চাষার এক কুকুর ছিল, তার নাম ক্যাপ। একদিন এক দুষ্ট লোকে পাথর ছুঁড়িয়া ক্যাপের একটি পা খোঁড়া করিয়া দিল। চাষা ভাবিল, 'এই খোঁড়া কুকুর লইয়া আমি কি করিব? এ আর আমার কোন কাজে লাগিবে না।' শেষটায় কুকুর বেচারাকে মারিয়া ফেলাই ঠিক হইল। একটি ছোট মেয়ে, তার নাম ফ্লরেন্স, সে এই কথা শুনিতে পাইয়া বলিল, "আহা মারবে কেন? আমায় দেও, আমি ওকে সারিয়ে দেব।" তারপর সে ক্যাপকে বাড়িতে লইয়া গিয়া তার পায়ে পট্টি বাঁধিয়া, তাহাতে ঔষধ দিয়া, সেঁক দিয়া, রীতিমত শুশ্রূষা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার খোঁড়া

পা সারাইয়া দিল। তখন সেই চাষা বলিল, "ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তা নইলে আমার এমন কুকুরকে আমি মিছামিছি মেরে ফেলতাম।"

কেবল এই একটি ঘটনা নয়, প্রায়ই এমন দেখা যাইত যে, মেয়েটি হয়ত বাগানে বেড়াইতেছে, আর কাঠবিড়ালিগুলা তাঁহার কাছ হইতে খাবার লইবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাড়ির ঘোড়াটা পর্যন্ত তাঁর গলার আওয়াজ শুনিলে, বেড়ার উপর দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিত! ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল বড়লোকের মেয়ে, তাঁর পয়সাকড়ির ভাবনা ছিল না, কোন অভাব ছিল না। তাঁর বাবারও খুব ইচ্ছা, ছেলেমেয়েরা সকলে খুব ভাল লেখাপড়া শেখে। সুতরাং অল্প বয়স হইতেই ফ্লরেন্সের মনে লেখাপড়ার ঝোঁক ছিল সেটা কিছু আশ্চর্য নয়। কিন্তু লোকে যে ঐ বয়স হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধা করিত, সেটা তাঁহার লেখাপড়ার বাহাদুরির জন্য নয়—তার কারণ এই যে, তিনি যেমন মন প্রাণ দিয়া সকলকে ভালবাসিতেন, লোকের সেবা করিতেন এবং লোকের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে পারিতেন, এমন আর কেহ পারিত না। আশেপাশে যেখানে যত গরীবের স্কুল আর হাসপাতাল ছিল, ফ্লরেন্স তাহার সবগুলির মধ্যেই থাকিতেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডে কয়েদীদের অবস্থা বড় ভয়ানক ছিল। জেলখানাগুলি অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর এবং তাহাদের বন্দোবস্ত এমন বিশ্রী যে, একবার যে জেলে ঢুকিয়াছে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে আবার ভাল হওয়া একরূপ অসম্ভব। মিসেস ফ্রাই নামে একজন ইংরাজ মহিলা এই কয়েদীদের উন্নতির জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে ছিলেন—কিসে তাহারা আবার চাকরি পায়, কিসে তাহারা সমাজের কাছে ভাল ব্যবহার পায়, কিসে তাহাদেব মধ্যে আবার সাধুভাব ফিরিয়া আসে, তিনি এই চিন্তাতেই সমস্ত সময় কাটাইতেন। ইঁহার সঙ্গে ফ্লরেন্সের আলাপ হওয়ায়, দুজনেরই উৎসাহ খুব বাড়িয়া গেল।

ফ্লরেন্স বুঝিলেন যে ইংলণ্ডের হাসপাতালগুলির উন্নতি করিতে হইলে রোগীব সেবার জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক চাই। সেবার কাজ মেয়েদের দ্বারাই খুব ভাল রকমে হইবার কথা, সুতরাং তাঁহার মনে এই চিন্তা আসিল যে, একদল মেয়েকে রোগীর শুশ্রূষা বিষয়ে ভালরকম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সে সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এ-বিষয়ে কিছু কিছু বন্দোবস্ত ছিল। সেখানে এমন সব শুশ্রূষাকারিণীর দল ছিল, যাঁহারা আবশ্যকমত রোগীর শুশ্রূষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে আহতের সেবার জন্য সকল সময়ে প্রস্তুত থাকিতেন। ফ্রান্স দেশে Sisters of mercy নামে একদল সন্ন্যাসিনী বহুকাল হইতে অতি আশ্চর্যরূপে এই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। জার্মানিতেও শুশ্রূষা-শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ছিল। মিসেস ফ্রাইয়ের সঙ্গে ফ্লরেন্স পরামর্শ করিলেন, 'একবার ঐ সকল দেশ ঘুরিয়া এই বিষয়ে কিছু শিক্ষা করিয়া আসি'। যেমন কথা তেমনি কাজ; ফ্লরেন্স পরম উৎসাহে বিদেশে গিয়া এই শিক্ষায় লাগিয়া রহিলেন। সেখানে তাঁহার বুদ্ধি উৎসাহ ও সেবার আগ্রহ দেখিয়া, সকলেই অবাক হইয়া গেল! তিনি ছয় মাসের মধ্যে রীতিমত পরীক্ষা পাশ করিয়া এবং সকল বিষয়ে আশ্চর্য সফলতা দেখাইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার শরীর এমন ভাঙিয়া পড়িল যে, তাঁহার কাজ আরম্ভ করিতে আরও বছরখানেক দেরী হইয়া গেল। সুস্থ হইয়াই তিনি চারিদিকে হাসপাতাল আতুরাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর।

ইহার কিছুদিন পরেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের

যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইংরাজেরা সে সময়ে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইল। তাহাদের চিকিৎসার জন্য বা আহতের সেবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিবার সময় হইল না। ইহার ফল এই হইল যে, চারিদিকে অসম্ভবরকম বেবন্দোবস্ত দেখা দিল; এমনকি রুগ্ন ও আহত সৈন্যগণ হাসপাতালে গিয়া, ঔষধপথ্য ও চিকিৎসার অভাবে দলে দলে মরিতে লাগিল। সে সময়ের অবস্থা এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে. যুদ্ধে যত লোক মারা পড়ে তাহার সাতগুণ লোকে হাসপাতালে প্রাণ হারায়।

এই সকল কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে পর লোকে শিহরিয়া উঠিল। 'কি করা যায়. কিরূপে এ অবস্থা দূর হয়' এই ভাবনায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িল। তখন ইংলণ্ডের যুদ্ধমন্ত্রী নিজে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলকে লিখিলেন. "আপনি এই কাজের ভার লইতে পারেন কি?" এমন ডাক শুনিয়াও কি ফ্লরেন্স নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? তিনি কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া. ৩৪ জন শুশ্রূষাকারিণী (nurse) সঙ্গে যুদ্ধস্থানে চলিলেন। শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোকে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আর ভয় নাই।"

মিস নাইটিঙ্গেলের দল যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখিলেন কাজ বড় সহজ নয়। ছোট্ট একটি হাসপাতাল, তাহার মধ্যে চার হাজার লোক ঘেঁষাঘেঁসি করিয়া শুইয়া আছে। অধিকাংশই জ্বর ও আমাশয়ে ভুগিতেছে– আহতের সংখ্যা খুবই কম। ঔষধের কোন ব্যবস্থা নাই---পথ্যাপথ্যের বিচার নাই--যাহার ভাগ্যে যাহা জুটিতেছে সে তাহাই খাইতেছে। তার উপর হাসপাতালের বিছানাপত্র সমস্ত এমন ময়লা ও দুর্গন্ধ যে. সুস্থ লোকেও সেখানে অসুস্থ হইয়া পড়ে। শুশ্রূষাকারিণীর দল প্রথমে নিজেরা হাসপাতাল ধুইয়া সাফ করিলেন; তারপর প্রত্যেকটি বিছানা মাদুর চাদর পরিষ্কার করিয়া কাচিলেন। কে কি খাইবে. কাহার কি ঔষধ চাই এ সমস্তের ব্যবস্থা করিলেন। মিস নাইটিঙ্গেল নিজে রান্নাঘরের সমস্ত গুছাইয়া পথ্যের বন্দোবস্ত করিলেন। দেখিতে দেখিতে হাসপাতালের চেহারা ফিরিয়া গেল। চারিদিক ঝর্ঝরে পরিষ্কার; ক্রমে হতাশ রোগীদের মুখে প্রফুল্লতা দেখা দিল--চারিদিকে সকলের উৎসাহ জাগিয়া উঠিল—সকলে বলিল, "মিস নাইটিঙ্গেল নিজে সব ভার লইয়াছেন, আর ভয় নাই।" যেখানে অর্ধেকের বেশি লোক বিনা চিকিৎসায় মরিতেছিল, সেখানে এখন শতকরা ৯৮ জন প্রাণে বাঁচিয়া মিস নাইটিঙ্গেলের জয়জয়কার করিতে লাগিল। তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, সকলের খবর লইতেছেন, সকলের কাছে কত কথা বলিতেছেন—কতজনকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য কত গল্প করিতেছেন--কতজন লিখিতে পারে না, তিনি তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিতেছেন। সাধে কি তাহারা বলিত, "ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বর্গের দেবী. তাঁর ছায়া লাগিলে মানুষ পবিত্র হয়।"

তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হইল. সকলে দেশে ফিরিল—তখন ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের সম্মানের জন্য বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। তিনি সে সমস্ত এড়াইয়া ভগ্ন শরীরে চুপচাপ লুকাইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু লোকে তাহা শুনিবে কেন? তাহারা তাঁহার জন্য মনুমেণ্ট তুলিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠাইয়া, তাঁহার নামে শুশ্রূষা শিক্ষার আয়োজন করিয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাইয়াছে; রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নত করিয়াছে; দেশ বিদেশ হইতে কতরকমের সম্মান তাঁহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া বার বার তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কাজ করিলে তাহার আর তুলনা হয় না।" ইহার পরেও মিস নাইটিঙ্গেল প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন এবং জীবনের

শেষ পর্যন্ত সর্বদাই অসংখ্য প্রকার সেবার কাজে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এখন এই যে ইউরোপের যুদ্ধে এত 'রেডক্রস' 'এম্বুলেন্স' প্রভৃতির নাম শোন, আহতের সেবার জন্য এত চেষ্টা, এত আয়োজন দেখ, বলিতে গেলে এ সমস্তেরই মূলে ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল।

খোঁড়া মুচির পাঠশালা

পোর্ট্স্মাউথের বন্দরে এক খোঁড়া মুচি থাকিত, তাহার নাম জন পাউন্ডস। ছেলেবেলায় জন তাহার বাবার সঙ্গে জাহাজের কারখানায় কাজ করিত। সেইখানে পনের বৎসর বয়সে এক গর্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার উরু ভাঙিয়া যায়। সেই অবধি সে খোঁড়া হইয়াই থাকে এবং কোন ভারি কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গরীবের ছেলে, তাহার ত অলস হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলে না—কাজেই জন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক বুড়া মুচির কাছে জুতা সেলাইয়ের কাজ শিখিতে গেল। তারপর সহরের একটা গলির ভিতরে ছোট একটি পুরাতন ঘর ভাড়া করিয়া সে একটা মুচির দোকান খুলিল।

জনের রোজগার বেশি ছিল না, কিন্তু সে মানুষটি ছিল নিতান্তই সাদাসিধা; সামান্যরকম খাইয়া-পরিয়াই স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। এমনকি, কয়েক বৎসরের মধ্যে সে কিছু টাকাও জমাইয়া ফেলিল। তখন সে ভাবিল, 'এখন আমার উচিত আমার ভাইদের কিছু সাহায্য করা।' তাহার দাদার এক ছেলে ছিল, সে ছেলেটি জন্মকাল হইতেই খোঁড়া মতন, তাহার পা দুইটা বাঁকা। জন দাদাকে বলিল, "এই ছেলেটির ভার আমি লইলাম।" ছেলেটিকে লইয়া জন ডাক্তারকে দেখাইল। ডাক্তার বলিলেন, "এখন উহার হাড় নরম আছে, এখন হইতে যদি পায়ে 'লাস্' বাঁধিয়া রাখ, তবে হয়ত সারিতেও পারে।" সামান্য মুচি, 'লাস্' কিনিবার পয়সা সে কোথায় পাইবে? সে রাত জাগিয়া পরিশ্রম করিয়া নিজের হাতে লাস্ বানাইল, এবং সেই লাস্ পরাইয়া, যত্ন ও শুশ্রূষার জোরে অসহায় শিশুটিকে ক্রমে সবল করিয়া তাহার খোঁড়ামি দূর করিল।

ততদিনে ছেলের লেখাপড়া শিখিবার বয়স হইয়াছে। পাউন্ডস নিজেই তাহাকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার প্রথম ভাবনা হইল এই যে, একা একা লেখাপড়া শিখিলে শিশুর মনে হয়তো ফুর্তি আসিবে না, তাহার দু-একজন সঙ্গী দরকার। এই ভাবিয়া সে পাড়ার দু-একটি ছেলেমেয়েকে আনিয়া তাহার ক্লাসে ভর্তি করিয়া দিল। দুটি একটি হইতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাতটি হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতেও খোঁড়া মুচির মন উঠিল না—সে ভাবিতে লাগিল, 'আহা, ইহারা কেমন আনন্দে উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে; কিন্তু এই সহরের মধ্যে এমন কতশত শিশু আছে, যাহাদের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না।' তখন সে আরও ছাত্র আনিয়া তাহার ছোট্ট ক্লাসটিকে একটি রীতিমত পাঠশালা করিয়া তুলিল।

যেদিন তাহার একটু অবসর জুটিত, সেইদিনই দেখা যাইত জন পাউন্ডস খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তায় রাস্তায় ছেলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যত রাজ্যের

অসহায় শিশু, যাদের বাপ নাই, মা নাই, যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া সে তাহার পাঠশালায় ভর্তি করিত। ছেলে ধরিবার জন্য তাহার প্রধান অস্ত্র ছিল আলুভাজা! প্রথমে এই আলুভাজা খাওয়াইয়া পাউণ্ডস রাস্তার শিশুদের ভুলাইয়া আনিত। আলুভাজার লোভে তাহারা পাঠশালায় আসিত, কিন্তু যে আসিত সে আর ফিরিত না। মাস্টারমহাশয়ের কি যে আকর্ষণশক্তি ছিল, আর ঐ অন্ধকার পাঠশালার মধ্যে কি যে মধু ছেলেরা পাইত, তাহা কেহই বুঝিত না; কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল।

চার হাত চওড়া, বারো হাত লম্বা, সরু বারান্দার মতো ঘর; তাহার মাঝখানে বসিয়া মাস্টারমহাশয় জুতা সেলাই করিতেছেন আর পড়া বলিয়া দিতেছেন, আর চারিদিকে প্রায় চল্লিশটি ছাত্রের কোলাহল শুনা যাইতেছে। কেহ পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ অঙ্ক বুঝাইয়া লইতেছে। কেহ সিঁড়ির উপর, কেহ মেঝের উপর, কেহ চৌকিতে, কেহ বাক্সে—আর নিতান্ত ছোটদের কেহ কেহ হয়তো মাস্টারের কোলে—এইরকম করিয়া মহা উৎসাহে লেখাপড়া চলিয়াছে। বাহিরের লোকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিত।

গরীব মাস্টার ছাত্রদের কাছে এক পয়সাও বেতন লইত না—এতগুলি ছাত্রকে সে বই জোগাইবে কোথা হইতে? তাহাকে সহরে ঘুরিয়া পুরানো পুঁথি ছেঁড়া বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইত, এবং তাহাতেই ছেলেদের পড়ার কাজ কোনরকমে চলিয়া যাইত। কয়েকখানা স্লেট ছিল, তাহাতেই সকলে পালা করিয়া লিখিত। পাঠশালায় সামান্য যোগ বিয়োগ হইতে ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অঙ্ক শিখান হইত। কেবল তাহাই নয়, এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তাহার কাছে কাপড় সেলাই করিতে এবং জুতা মেরামত করিতেও শিখিত। সকলে মিলিয়া তীর ধনুক ব্যাট বল ঘুড়ি লাটাই খেলনা পুতুল প্রভৃতি নানারকম জিনিস নিজেরাই তৈয়ারি করিত। তাহাদের খাওয়া-পরার সমস্ত অভাবের কথাও গরীব মাস্টারকেই ভাবিতে হইত। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া জন পাউণ্ডসের উপর কোন কোন লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহারা মাঝে মাঝে গরম কাপড়-চোপড় পাঠাইয়া দিত। সেইসব কাপড় পরিয়া ছেলেমেয়েরা যখন উৎসাহে খোঁড়া মাস্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত, তখন মাস্টারমহাশয়ের মুখে আনন্দ আর ধরিত না।

এমন করিয়া কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, জন পাউণ্ডস বুড়া হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার পাঠশালা চলিতে লাগিল। আগে যাহারা ছাত্র ছিল, তাহারা ততদিনে বড় হইয়া উঠিয়াছে। কতজনে নাবিক হইয়া কত দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছে, কতজনে সৈন্যদলে ঢুকিয়া যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতেছে। নূতন ছাত্রদের পড়াইবার সময়ে এইসব অতি পুরাতন ছাত্ররা তাদের বৃদ্ধ গুরুকে দেখিবার জন্য পাঠশালায় হাজির হইত। তাহারই ছাত্রেরা যে সৎপথে থাকিয়া উপার্জন করিয়া খাইতেছে, এবং এখনও যে তাহারা তাহাদের খোঁড়া মাস্টারকে ভোলে নাই, এই ভাবিয়া গৌরবে আনন্দে বৃদ্ধের দুই চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িত।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের দিনে ৭২ বৎসর বয়সে পাঠশালার কাজ করিতে করিতে বৃদ্ধ হঠাৎ শুইয়া পড়িল। বন্ধুবান্ধব উঠাইতে গিয়া দেখিল, তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। হয়ত তখনও লোকে ভাল করিয়া বোঝে নাই যে কত বড় মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় আশি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন ইংলণ্ডের সহরে সহরে অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষার জন্য কত ব্যবস্থা, কত

আয়োজন; কিন্তু এ সমস্তের মূলে ঐ খোঁড়া মুচির পাঠশালা। সেই পাঠশালায় যাহারা পড়িতে আসিত, কেবল তাহারাই যে জন পাউণ্ডসের ছাত্র তাহা নয়—যাঁহারা নিজেদের অর্থ দিয়া, দেহের শক্তি দিয়া, একাগ্র মন দিয়া, অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই গৌরবের সঙ্গে এই খোঁড়া মুচিকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আমরাও আচার্য জন পাউণ্ডসের শিষ্য।"

এই খোঁড়া মুচির নাম সকলের কাছে স্মরণীয় রাখিবার জন্য, তাঁহার ভক্তেরা মিলিয়া তাঁহার একটি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সক্রেটিস

সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা—গ্রীস দেশে এথেন্স নগরের একটি গরীবের ঘরে একটি কুশ্রী ছেলের জন্ম হয়। গরীবের ছেলে, পরনে তার ছেঁড়া কাপড়, দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় কিনা সন্দেহ—সে আবার লেখাপড়া শিখিবে কিরূপে? সে পাথরের মূর্তি গড়িতে পারিত—তাই বেচিয়া এবং অবসরমত লোকের কাছে দুকথা শিখিয়া মানুষ হইতে লাগিল। এমন সময় ক্রাইটো নামে একটি ধনী লোক এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়া, তাহার মিষ্ট ব্যবহারে এত খুসী হইলেন যে, তিনি তখনই নিজের খরচে তাহার পড়াশুনার ভাল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সকলেই ভাবিল, গরীবের ছেলে ভাল লেখাপড়া শিখিয়া, এইবার একটা ভাল চাকুরী বা ব্যবসা করিবে।

এথেন্স নগরে তখন একদল লোক থাকিত, তাহাদের ব্যবসা ছিল পণ্ডিতি করা। তাহারা লোকের কাছে পয়সা লইয়া আড্ডা খুলিত এবং সেখানে বড় বড় কথা আওড়াইয়া চুলচেরা তর্ক করিয়া, নানারকম বিদ্যার ভড়ং দেখাইত। তাহাদের বোলচালে ভুলিয়া লোকে মনে করিত, না জানি তাহারা কত বড় পণ্ডিত! একটু বয়স হইলেই সেই গরীবের ছেলে এই পণ্ডিত মহলের পরিচয় লইতে আসিলেন। মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা, নিতান্ত ভালমানুষটির মতো আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেন, যেন তিনি কিছুই জানেন না—কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের ঠেলায় পণ্ডিতের দল অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতে গিয়া একজন পণ্ডিত এমন নাকাল হইয়া আসিলেন যে, দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। খালি পা, মোটা কাপড় পরা, খাঁদা বেঁটে গরীব লোকটিকে রাস্তায় ঘাটে সকলেই চিনিয়া ফেলিল। তিনি পথে বাহির হইলে সকলে দেখাইয়া দিত 'ঐ সক্রেটিস'।

দেখিতে দেখিতে এইসব মূর্খ পণ্ডিতদের উপর সক্রেটিসের ঘোর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়, হায়, এইসব অপদার্থের হাতে পড়িয়া, এথেন্সের ছেলেগুলি একেবারে মাটি হইয়া গেল। ইহারা কেবল কথা কাটাকাটি করিতে শিখিল—কেহ জ্ঞানলাভ করিতে চায় না, মানুষের মতো মানুষ হইতে চায় না, —শুধু লোকের কাছে নাম কিনিতে চায়, ছলে বলে ক্ষমতা জাহির করিতে চায়।' সক্রেটিস তেজের সহিত চারিদিকে বলিতে লাগিলেন, "এমন করিয়া কোন মানুষ বড় হইতে পারে না। কেবল টাকাকড়ি ও যশ-মানের জন্য ছুটাছুটি করিও না, ধর্ম-

পথে থাক এবং জ্ঞান লাভ কর—নহিলে তোমরা অধঃপাতে যাইবে।" লোকে অবাক হইয়া গরীবের মুখে এই সকল কথা শুনিত এবং যে একবার আসিত সেই তাঁহার কথায় ও আশ্চর্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। দেখিতে দেখিতে সক্রেটিসের অনেক বন্ধু ও শিষ্য জুটিয়া গেল। শহরের অনেক বড় বড় লোক পর্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল। কোন বিদেশী রাজা অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া সক্রেটিসকে তাঁহার নিজের সভায় লইতে চাহিলেন। কিন্তু সক্রেটিস বলিলেন, "আমি এ অনুগ্রহ লইয়া আপনার কাছে ঋণী থাকিতে চাহি না। আমার টাকারই বা প্রয়োজন কি? এই এথেন্স সহরে অতি অল্প খরচেই দুবেলা আহার করিয়া থাকা যায়; আর কাছেই ঝরনার জল, তাহার জন্য পয়সা দিতে হয় না। সুতরাং আমার ত কোন অভাব দেখি না।"

সে সময়ে গ্রীস দেশে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। একবার কোন এক যুদ্ধে সক্রেটিসকে পাঠান হইল। যাহারা যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই দেশে ফিরিয়া, সক্রেটিসের আশ্চর্য শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিল। ঘোর শীতের সময়ে যখন বরফে সকল দিক ঢাকিয়া ফেলে, লোকেরা কম্বলের জামা গায় দিয়াও শীতে কাঁপিতে থাকে, সক্রেটিস তাহার মধ্যে খালি পায়ে সামান্য কাপড় পরিয়া অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ডেলিয়ামের যুদ্ধে যখন শত্রুপক্ষ সক্রেটিসের দলকে হটাইয়া দিল, তখনকার একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়াছেন, সেই বিপদের সময়েও সক্রেটিসের শান্ত চেহারা ও নিশ্চিন্ত হাসিমুখ দেখিয়া এথেন্সের লোকদের মনে আবার সাহস ফিরিয়া আসিল। শত্রুপক্ষের সৈন্যরা চারিদিকে মারধর করিতেছিল কিন্তু সক্রেটিসের কি আশ্চর্য তেজ, তাঁহার কাছে ঘেঁসিতেও কেহ সাহস পায় নাই।

সক্রেটিস নিজে গরীবের গরীব কিন্তু সারাজীবন সকলকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দিতেন। এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র ছিল না। কেহ তাঁহাকে রাগ করিয়া কথা বলিতে শুনে নাই; নিজের সামান্য কর্তব্যটুকুও অবহেলা করিতে দেখে নাই। শত্রুমিত্র সকলের জন্য মুখে তাঁহার হাসিটুকু লাগিয়াই থাকিত। কেহ কড়া কথা বলিলে বা মিথ্যা গালাগালি করিলেও তিনি তাহাতে বিরক্ত হইতেন না। কত দুষ্ট লোকে তাঁহার উপদেশ শুনিতে গিয়া কাঁদিয়া ফিরিত, তাঁহার মুখের একটি কথায় কত অন্যায়, কত অত্যাচার থামিয়া যাইত। দুঃখ বিপদের সময় কতদূর হইতে কত লোকে তাঁহার পরামর্শ শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। "যাহা ন্যায় বুঝিব তাহাই করিব" একথা তাঁহার মুখেই শোভা পাইত; কারণ তাঁহার যেমন কথা তেমনি কাজ। এমন সাধু লোককে যে সকলে ভালবাসিবে, ঋষি বলিয়া ভক্তি করিবে তাহাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু সক্রেটিসেরও শত্রুর অভাব ছিল না। একদল লোক—কেহ হিংসায় কেহ রাগে কেহ নিজের স্বার্থের জন্য—সর্বদা তাঁহার অনিষ্ট করার চেষ্টা করিত। সক্রেটিসকে সেকথা জানাইলে তিনি তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন।

একবার সে দেশের শাসনকর্তারা তাঁহাকে হুকুম দিলেন "আমরা অমুককে সাজা দিব, তুমি তাহার খোঁজ করিয়া দাও।" সক্রেটিস তাহাদের মুখের উপর বলিলেন, "আমি অন্যায় কাজে সাহায্য করি না।" শাসনকর্তারা চটিলেন। আর একবার এথেন্সের লোকেরা কয়েকজন সেনাপতির উপর ক্ষেপিয়া, জুলুম করিয়া বিনা বিচারে তাহাদের মারিতে চাহিয়াছিল, একমাত্র সক্রেটিস ছাড়া সে কার্যে বাধা দিতে আর কাহারও সাহস হয় নাই। এই ব্যাপারেও তাঁহার অনেক শত্রু জুটিল। পণ্ডিতের দলও আগে হইতেই ক্ষেপিয়া ছিল। তারপর যখন চারিদিক হইতে নানা শ্রেণীর লোকে সক্রেটিসের

কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল, তখন শাসনকর্তারা ভাবিলেন, ইহার মনে নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে—এ হয়ত কোনদিন এই সকল লোককে ক্ষ্যাপাইয়া একটা গোলমাল বাধাইয়া তুলিবে। তাঁহারা সক্রেটিসকে শাসাইয়া দিলেন, "খবরদার, তুমি এথেন্সের যুবকদের সঙ্গে আর কথাবার্তা বলিতে পারিবে না।" সক্রেটিস তাহাতে ভয় পাইবেন কেন? তিনি পূর্বেরই মতো উৎসাহে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যাহারা জ্ঞানের অহংকার করিয়া বেড়ায় তাহারাই যথার্থ মূর্খ, যাহারা অন্যায় করিয়া দেশের আইনকে ফাঁকি দেয়, তাহারা জানে না যে ভগবানের কাছে ফাঁকি চলে না। যে মানুষ খাওয়া-পরায় অল্পতেই সন্তুষ্ট, সহজভাবে সরল কথায় সৎচিন্তায় সময় কাটায়, সেই সুখী—আধপেটা খাইয়াও সুখী; মানুষের নিন্দা অত্যাচারের মধ্যেও সুখী।" এমনি করিয়া ঋষি সক্রেটিস ৭২ বৎসর বয়স পর্যন্ত যুবকের মতো উৎসাহে নিজের কাজ করিয়া গেলেন।

ইহার মধ্যে সক্রেটিসের শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া এথেন্সের বিচার সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায় নালিশ উপস্থিত করিল। শত্রুর দল যে যেখানে ছিল সকলে হাঁ হাঁ করিয়া সাক্ষ্য দিতে আসিল—"সক্রেটিস বড় ভয়ানক লোক, সে এথেন্সের সর্বনাশ করিতেছে।" অন্যায় বিচারে হুকুম হইল "সক্রেটিসকে বিষ খাওয়াইয়া মার।" সক্রেটিসের বন্ধুরা বলিলেন, "হায় হায়, বিনা দোষে সক্রেটিসের শাস্তি হইল।" সক্রেটিস হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কি বলিতে চাও যে আমি দোষ করিয়া সাজা পাইলেই ভাল হইত?"

সক্রেটিসকে কয়েদ করিয়া রাখা হইল, কবে তাঁহাকে বিষ খাওয়ান হইবে সেদিনও স্থির হইল। জেলের অধ্যক্ষ সক্রেটিসের ভক্ত ছিলেন, তিনি বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন সক্রেটিসকে রাতারাতি এথেন্স হইতে সরাইয়া ফেলিবেন; কিন্তু সক্রেটিস তাহাতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার দেশের লোকে বিচার করিয়া বলিয়াছেন আমার শাস্তি হউক। আমি সে শাস্তিকে এড়াইয়া দেশের আইনকে অমান্য করিতে চাই না।" ক্রমে দিন ঘনাইয়া আসিল। সক্রেটিসের বন্ধুরা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন, কেহ কেহ রাগে দুঃখে এথেন্স ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—মহাপণ্ডিত প্লেটো প্রভৃতি কয়েকটি শিষ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার কাছেই বসিয়া রহিলেন। সক্রেটিসের প্রশান্ত মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই, তিনি সকলকে আশ্বাস দিতেছেন, উৎসাহের সঙ্গে বলিতেছেন "দেহ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দেহের মধ্যে যে থাকে সে অমর—এই দেহে যখন প্রাণ থাকিবে না, আমি তখনও থাকিব।" একজন শিষ্য বলিলেন "মৃত্যুর পর আপনাকে কোথায় কবর দিব?" সক্রেটিস বলিলেন "যেখানে ইচ্ছা; কিন্তু মৃত্যুর পর আমায় পাইবে কোথায়?" এমন সময় জেলের প্রধান কর্মচারী কাঁদিতে কাঁদিতে বিষের পাত্র আনিয়া ধরিল এবং সক্রেটিসের কাছে ক্ষমা চাহিল। সক্রেটিস তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া, হাসিমুখে বিষ পান করিলেন। তারপর শিষ্যদের সহিত কথা বলিতে বলিতে ক্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত পা অবশ হইয়া আসিল। শেষে মৃত্যু আসিয়া মহাপুরুষের জীবন শেষ করিয়া দিল। সক্রেটিস মরিয়া অমর হইলেন; তাঁহার নাম চিরকালের জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে থাকিয়া গেল।

দানবীর কার্নেগী

বড়লোক হবার সখ থাকলেই যে মানুষ বড়লোক হতে পারে না, তার দৃষ্টান্ত গল্পে তোমরা পড়েছ। এখন একটি সত্যকারের বড়লোকের কথা বলব, যিনি গরীব বাপ-মায়ের ঘরে জন্মেও কেবল আপনার চেষ্টায় ও আগ্রহে, জগতের মহাধনী ক্রোড়পতিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এক সামান্য পল্লীগ্রামের এক নগণ্য পরিবারে এন্‌ড্রু কার্নেগীর জন্ম হয়। তাঁর বয়স যখন তেরো বৎসর মাত্র তখন তাঁর বাবা উপার্জনের চেষ্টায় সপরিবারে আমেরিকায় চাকরী করতে যান। সেইখানে গিয়েই এক সুতোর কারখানায় তাঁতির মজুর হয়ে, কার্নেগী মাসে সাড়ে বারো টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করলেন! এই তাঁর প্রথম রোজগার। তারপর চৌদ্দ বছর বয়সে তাঁর আরেকটু ভাল একটা চাকরী জুটল, তিনি এক টেলিগ্রাফ অফিসের ছোকরা পিয়নের কাজ পেলেন। এই কাজ তিনি কেমন করে জোগাড় করলেন, সে গল্পটিও চমৎকার।

টেলিগ্রাফ অফিসের দরজায় বিজ্ঞাপন ছিল, "ছোকরা পিয়ন চাই।" তাই দেখে কার্নেগী খোঁজ নেবার জন্য ভিতরে ঢুকলেন। টেলিগ্রাফের কেরানী একটা অচেনা ছোকরাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখেই, হাঁক দিয়ে বললে, "কি চাও ?" কার্নেগী বললেন, "বড় সাহেবকে চাই!" কেরানী তেড়ে উঠে বললে, "যাও, যাও, দেখা হবে না।" পরের দিন সকালে কার্নেগী আবার ঠিক তেমনিভাবে সেখানে গিয়ে হাজির। কেরানী দেখলে, সেই ছোকরা আবার এসেছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে "কি চাও ?" জবাব হল "বড় সাহেবকে চাই।" সেদিনও কেরানী তাকে চট্‌পট্ ঘর থেকে বার করে দিল। পরের দিন আবার সেই সময়ে সেই ছোকরা এসে হাজির,—বলে "বড় সাহেবকে চাই।" কেরানী ভাবল, ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, একবার বড় সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা যাক। বড় সাহেব সব শুনে বললেন, "পাঠিয়ে দাও ত, দেখি ছোকরা কি চায়।" সেইদিনই কার্নেগী টেলিগ্রাফ অফিসের কাজে ভর্তি হলেন। বাপ-মায় ভাবলেন, ছেলে 'চাকরে' হয়ে উঠল—বেশ দু পয়সা রোজগার করবে।

পিয়নের কাজ করতে করতেই কার্নেগী টেলিগ্রাফের কলকায়দা সব শিখে ফেললেন, আর কিছুদিন বাদেই তিনি সেখানকার রেলস্টেশনের তারওয়ালা বা অপারেটর হয়ে বসলেন। তারপর দেখতে দেখতে ক্রমে টেলি-বিভাগের বড় সাহেব বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হতেও তাঁর বেশি দেরী লাগল না। এই সময় থেকে তিনি রেলগাড়ি আর খনির তেলের ব্যবসা করে খুব টাকা করতে আরম্ভ করেন। লাভের টাকা আবার নূতন নূতন ব্যবসায় খাটিয়ে তিনি বড় বড় কারবার জমিয়ে তুললেন। তারপর ক্রমে পাঁচ-সাতটা প্রকাণ্ড লোহার কারখানা কিনে ফেলে, তিনি নিজে সেইগুলো চালাতে লাগলেন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স না হতেই তিনি পৃথিবীর মধ্যে একজন নামজাদা লোহার মালিক হয়ে উঠেছিলেন।

এমনি করে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে, তিনি ৫৬ বৎসর বয়সে সব বিষয়কর্ম থেকে অবসর নিয়ে স্কটল্যাণ্ডে সেই তাঁর জন্মস্থানে গিয়ে বসলেন। বললেন, "রোজগার যথেষ্ট করেছি, এখন এই বুড়ো বয়সে আর 'টাকা টাকা' করে ছুটে বেড়ান ভাল দেখায় না। এতদিন যা সঞ্চয় করেছি, এখন দানের মত দান করে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।" সেই থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর দানব্রত পালন করে গিয়েছেন।

কার্নেগীর মতো অথবা তাঁর চাইতেও বড় লোক পৃথিবীতে আরও আছেন—কিন্তু এমন অজস্রভাবে দান আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। কত দেশে, কত সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে, কত ছোট ছোট পাঠশালায়, কত বড় বড় কলেজে, তাঁর কীর্তির পরিচয় রয়েছে। শুধু লাইব্রেরি করবার জন্যই নানা জায়গায় তিনি প্রায় বিশ কোটি টাকা খরচ করে গেছেন। স্কটল্যাণ্ডের গরীব ছাত্রদের পড়ার সাহায্যের জন্য তিনি অন্তত তিন কোটি টাকা দান করেছেন। তাঁর নিজের জন্মস্থান সেই ছোট্ট গ্রামটি আজ বেশ একটি সহর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কেবল তাঁর দানের জোরে। এই সহরটির উন্নতির জন্য তিনি সম্পত্তি রেখে গেছেন, তার আয় হয় বছরে চার লক্ষ টাকা। বীরত্বের পুরস্কারের জন্য আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে তিনি দুটি Hero fund বা বীর ভাণ্ডার স্থাপন করে গেছেন; বিপদের সময়ে অন্যের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যারা নিজেরা আহত ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, এই ভাণ্ডার থেকে তাদের খাওয়া-পরার সমস্ত খরচ দেওয়া হয়। এমনি করে ছোট বড় যত অসংখ্যরকমের দান তিনি করে গেছেন, সব যদি এক সঙ্গে ধরা যায়, তাহলে তাঁর দানের হিসাব হয় প্রায় একশ কোটি টাকা!

এত টাকা আমাদের ভাল করে কল্পনাই হয় না। হিসাব বলবার সময় 'অযুত লক্ষ নিযুত কোটি অর্বুদ বৃন্দ' সব আমরা গড় গড় করে বলে যাই, কিন্তু সে যে কত বড় অঙ্কের হিসাব তার ধারণা করতে গেলেই মাথায় গোল লেগে যায়। একশ কোটি টাকা কতখানি জান? একজন লোক যদি প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে টাকা দান করে তাহলে একদিনে তার ছিয়াশি হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু এই হিসাবেও একশ কোটি টাকা খরচ করতে তার অন্তত বত্রিশ বৎসর সময় লাগবে—তাও, যদি সারাদিন সারারাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সে কেবল ঐ কাজই করতে থাকে! একশ কোটি টাকা ভাঙিয়ে যদি পয়সা আনাও, তাহলে সেই পয়সা দিয়ে এই কলকাতার মতো গোটা দুই সহরকে একেবারে ঢেকে দেওয়া যাবে। এই ভারতবর্ষের সমস্ত লোক, ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ, সবাই মিলে যদি সেই পয়সা কুড়োতে আসে, তাহলে প্রত্যেকে প্রায় দুইশ পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে।

এই কয়েকদিন হল কার্নেগীর মৃত্যু-সংবাদ এদেশে এসেছে। তাঁর জীবনের সঞ্চিত টাকা তিনি প্রায় সমস্তই দান করে গিয়েছেন—তার তুলনায় যা বাকী রয়ে গেছে, সে কেবল সিন্ধুকের মধ্যে এক মুষ্টির মতো।

নোবেলের দান

পাঁচ বৎসর আগে যখন ইউরোপ হইতে সংবাদ আসিল যে, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নোবেল প্রাইজ' পাইয়াছেন, তখন দেশময় একটা উৎসাহের ঢেউ ছুটিয়াছিল। 'নোবেল প্রাইজ' জিনিসটা কি তাহা অনেকেই জানিত না, তাহারা সে বিষয়ে আগ্রহ করিয়া খোঁজ করিতে লাগিল।

আলফ্রেড বের্নহার্ড নোবেল সুইডেন দেশের একজন রাসায়নিক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় সওয়া তিন কোটি টাকার সম্পত্তি দান করিযা যান। যাঁহারা বিজ্ঞান-জগতে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, যাঁহারা সাহিত্যে উন্নতি করেন এবং বিশেষভাবে যাঁহারা জগতে শান্তি স্থাপনের সহায়তা করেন, প্রতি বৎসর তাঁহাদের সম্মানের জন্য এই সম্পত্তির আয় হইতে 'নোবেল প্রাইজ' নামে লক্ষাধিক টাকার অর্ঘ দেওয়া হয়। যে-কোন দেশের যে-কোন লোক এই অর্ঘলাভের যোগ্য হইলেই তাহা পাইতে পারেন।

এই নোবেল লোকটির জীবনের কাহিনী বড় অদ্ভুত। দুর্বল স্বাস্থ্য লইয়া রুগ্ন ভগ্ন দেহে তিনি সারা জীবন কাটাইয়াছিলেন। একদিকে তিনি অত্যন্ত ভীরু ও নিরীহ ভালমানুষ ছিলেন, সামান্য দুঃখ কষ্ট বা উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু অপরদিকে তাঁহার মনের এমন অসাধারণ বল ছিল, ঘোর বিপদের মধ্যে ও রোগের যাতনার মধ্যে তিনি শান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেন। সমস্ত জীবন তিনি বোমা ও বারুদের মশলা লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় যে সকল সময়ে প্রাণটি হাতে করিয়া চলিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন; ইহাতে যে অনেক লোকের প্রাণ গিয়াছে তাহাও তাঁহার জানা ছিল, কিন্তু সে চিন্তা তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই।

আলফ্রেড নোবেলের পিতা রুশিয়ার যুদ্ধ কারখানার কারিকর ছিলেন। গোলা-বারুদ লইয়া তাঁহার কারবার, এবং সেই কাজে বালক নোবেলও তাঁহার সহায় ছিল। কেবল যে যুদ্ধের কাজেই বারুদের ব্যবহার হয় তা নয়। তার একটি মস্ত কাজ, পাহাড় ভাঙা। রেলপথ বসাইবার জন্য এবং রাস্তাঘাট বা সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার জন্য অনেক সময়ে পাহাড় ভাঙিয়া সমান করিতে হয়। কোদাল ঠুকিয়া এই কাজ করিতে গেলে অসম্ভবরকম পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিতে হয়। সাধারণ বারুদের সাহায্যে এ কাজ অনেকটা সহজ হয়, কিন্তু বারুদের তেজ সব সময়ে এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নোবেলের সময়েও অনেক জিনিসের কথা লোকে জানিত, যাহার তেজ বারুদের চাইতেও ভয়ানক—কিন্তু এই সমস্ত জিনিস এত সামান্য কারণে ফাটিয়া যায় যে তাহাকে কাজে লাগাইতে কেহ সাহস পাইত না। কাজ করিতে গিয়া সামান্য একটু গরম বা সামান্য একটু আঁচড় অথবা ধাক্কা লাগিলেই ঘর বাড়ি উড়িয়া এক প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া যাইত। নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া সে অসুবিধা দূর করেন। ডিনামাইটের শক্তি

সাধারণ বারুদের চাইতে আটগুণ বেশি অথচ তাহাকে লইয়া সাবধানে নাড়াচাড়া করিলে কোন ভয়ের কারণ নাই।

ডিনামাইট ছাড়াও তিনি আরও অনেকরকম বারুদের মশলা আবিষ্কার করেন। আজকাল কামানের গোলা ছুঁড়িবার জন্য যে-সকল প্রচণ্ড বারুদ ব্যবহার করা হয় তাহাও নোবেলের আবিষ্কারের ফল। এই সমস্ত সাংঘাতিক জিনিসের কারবারের জন্য নোবেল বড় বড় কারখানা বসাইয়া পৃথিবী জুড়িয়া প্রকাণ্ড ব্যবসা চালাইয়া, তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন। একবার একটি কারিকরের অসাবধানতায় সমস্ত কারখানাটি উড়িয়া যায় এবং অনেক লোক মারা পড়ে ও অনেক লক্ষ টাকা নষ্ট হয়। তাহাতেও নোবেলের উৎসাহ দমে নাই—তিনি আবার নূতন করিয়া কারখানা করাইলেন এবং এরূপ দুর্ঘটনা যাহাতে আর না হয়, তাহার জন্য অনেক সুন্দর বন্দোবস্ত করিলেন। সে কারখানা আজও চলিতেছে।

কারখানার ভিতরে যদি ঢুকিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিবে "সাবধান হওয়া" কাহাকে বলে। যে-সকল স্থানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানে প্রত্যেক ঘরের চারিদিকে মাটি উঁচু করিয়া পাহাড়ের মতো দেওয়াল দেওয়া হইয়াছে। ঘরগুলি খুব হাল্কা করিয়া তৈয়ারি, তাহার মেজের উপর পুরু করিয়া চট মোড়া। যাহারা কাজ করে, তাহাদের পায়ে কাপড়ের জুতা—কোথাও কোন শব্দ করিবার নিয়ম নাই। সেখানে আগুন জ্বালান দূরে থাকুক, কারখানার ত্রিসীমানার মধ্যে দিয়াশালাই আনিতে দেওয়া হয় না। কোনরকম লোহার জিনিস সেখানে আনা নিষেধ, কাঁটা পেরেক পর্যন্ত আনিবার উপায় নাই। এইরকমের অসংখ্য নিয়ম নিষেধ মানিয়া তবে কারখানা চালাইতে হয়। ভগ্ন শরীরে এইরকম সাংঘাতিক জিনিসের কারবার করিয়া নিত্য বিপদের মধ্যে যাঁহার জীবন কাটিল, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাঁহার শেষ চিন্তা হইল এই যে, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য, এবং জ্ঞান ও আনন্দের বিস্তারের জন্য উপায় করিতে হইবে। তাহারই ফলে, এই নোবেল প্রাইজ।

কিন্তু কেবল এই দানই নোবেলের শ্রেষ্ঠ দান নয়। ডিনামাইট প্রভৃতি যে-সমস্ত রাসায়নিক অস্ত্র তিনি জগতকে দিয়া গেলেন, সেও বড় সামান্য দান নয়। যুদ্ধের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে, সভ্য মানুষের যে-সমস্ত বড় বড় কীর্তি, তাহার অনেকগুলিই সহজ ও সম্ভব হইয়াছে কেবল নোবেলের ঐ অস্ত্রের গুণে। মাটি উড়াইয়া পাহাড় ফাটাইয়া পাথর সরাইয়া পথঘাট রেলপুল বসান হইতেছে, খাল কাটিয়া নদীর পাড় ভাঙিয়া জলের স্রোতকে নানাদিকে চালান হইতেছে সমুদ্রের সঙ্গে সমুদ্র জুড়িয়া নূতন নূতন জলপথের সৃষ্টি হইতেছে, খনি ব্যবসায়ী খনি খুঁড়িতে গিয়া পাঁচ মাসের কাজ পাঁচ মিনিটে সারিতেছে, সভ্য দেশের চাষা বিনা লাঙলে সামান্য পরিশ্রমে বড় বড় জমি ফুঁড়িয়া চষিয়া ফেলিতেছে!

নেপোলিয়ান যখন ইটালি বিজয় করিতে চলিলেন তখন সকলে বলিয়াছিল, "কি অসম্ভব কথা! এই দুরন্ত শীতে তুমি সৈন্য লইয়া আল্প্‌স্‌ পাহাড় পার হইবে কিরূপে?" নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "There shall be no Alps!" 'আল্প্‌স্‌ পাহাড় থাকিবে না'—অর্থাৎ সে আমায় বাধা দিতে পারিবে না। নেপোলিয়ান আল্প্‌স্‌ পার হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার প্রায় শত বৎসর পরে যখন ফ্রান্স, ইটালি ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে আল্প্‌স্‌ পাহাড় ভেদ করিয়া রেলপথ বসান হইতেছিল, তখন নোবেলও বলিতে পারিতেন, "There shall be no Alps!" লক্ষ যুগের পাহাড়ের বাঁধন একটি রুগ্নদেহ দুর্বল মানুষের বুদ্ধির কাছে পরাস্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িল।

আর্কিমিডিস

প্রায় বাইশ শত বৎসর আগে, গ্রীস সাম্রাজ্যের অধীন সাইরাকিউস নগরে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। আর্কিমিডিসের মতো অসাধারণ পণ্ডিত সেকালে গ্রীক জাতির মধ্যে আর দ্বিতীয় ত ছিলই না—সমস্ত পৃথিবীতে তাঁহার সমান কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। দিন রাত তিনি আপনার পুঁথিপত্র লইয়া কি যে চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন, আর অংক কষিয়া কষিয়া কত যে আশ্চর্য তত্ত্বের হিসাব করিতেন, লোকে তাহার কিছুই বুঝিত না—কেবল দু-দশজন পণ্ডিত লোকে পরম আগ্রহে আদর করিয়া তাহার সংবাদ লইত, আর অবাক হইয়া বলিত, "পণ্ডিতের মতো পণ্ডিত যদি কেউ থাকে, তবে সে হচ্ছে আর্কিমিডিস।"

সাইরাকিউসের রাজা হীয়েরো ছিলেন আর্কিমিডিসের বন্ধু। তিনি কেবলই বলিতেন, "এত বড় পণ্ডিত হইয়া তোমার কি লাভ হইল, যদি লোকে তোমার কদর না বোঝে? তুমি কেবল বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্ব আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হিসাব নিয়া থাক; মানুষের কাজে লাগে এমন সব যন্ত্র করিয়া দেখাও—লোকে বুঝুক তুমি কত বড় পণ্ডিত!" বন্ধুর কথায় আর্কিমিডিস মাঝে মাঝে 'কোন জিনিস' গড়িবার দিকে মন দিতেন। তাহার ফলে নানারকম 'স্ক্রু', জল তুলিবার জন্য প্যাঁচাল 'পাম্প', জলে-চালান বাতাসে-চালান কতরকম যন্ত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হইল। পাখা টানিবার জন্য দেয়ালে যে চাকার 'পুলি' খাটান থাকে, সেই পুলি জিনিসটাও আর্কিমিডিসের আবিষ্কার। বড় বড় মালপত্র বোঝাই হইয়া এত যে কলের গাড়ি আর এত যে জাহাজ পৃথিবীময় ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর বড় বড় কারখানায় এত যে ভারি ভারি কলকামান লোহা-লক্কড় লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সবখানেই দেখিবে মাল উঠানোর জন্য 'পুলি' না হইলে চলে না। মূর্খ লোকে যখন আর্কিমিডিসের কলকব্জার পরিচয় পাইল, তখন তাহারাও ভাবিতে লাগিল, 'লোকটা পণ্ডিত বটে।'

আর্কিমিডিসের জীবনের একটি গল্প তোমরা বোধহয় অনেকে শুনিয়া থাকিবে। রাজা হীয়েরো এক সেকরার কাছে একটি সোনার মুকুট গড়াইতে দিয়াছিলেন। সেকরা মুকুটটি গড়িয়াছিল ভালই কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, সে সোনা চুরি করিয়াছে এবং সেই চুরি ঢাকিবার জন্য মুকুটের মধ্যে খাদ মিশাইয়াছে। কোন সহজ উপায়ে এই চুরি ধরা যায় কিনা জানিবার জন্য বন্ধু আর্কিমিডিসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আর্কিমিডিস সব শুনিয়া বলিলেন, "একটু ভাবিয়া বলিব।" ভাবিতে ভাবিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন স্নানের সময়ে কাপড় ছাড়িয়া সবে তিনি স্নানের টবে পা দিয়াছেন, এমন সময় খানিকটা জল উছলিয়া পড়ামাত্র, হঠাৎ সেই প্রশ্নের এক চমৎকার মীমাংসা তাঁহার মাথায় আসিল! তখন কোথায় গেল স্নান! তিনি তৎক্ষণাৎ 'Eureka!' 'Eureka!' (পেয়েছি! পেয়েছি!) বলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

যে জিনিস পাইয়া তিনি আনন্দে এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন, বিজ্ঞানে এখনও তাহাকে "আর্কিমিডিসের তত্ত্ব" বলা হয়। ভারি জিনিসকে জলে ছাড়িলে, তাহার 'ওজন' কমিয়া যায়; কি পরিমাণ কমিবে তাহাও হিসাব করিয়া বলা যায়। কোন হালকা জিনিসকে জলে ভাসাইলে, তাহার খানিকটা ডোবে, খানিকটা ভাসিয়া থাকে। ঠিক কতখানি ডোবে তাহারও হিসাব আছে। আর্কিমিডিসের তত্ত্বে এই সকল কথারই আলোচনা করা হইয়াছে। আর্কিমিডিস রাজাকে বলিলেন, "ঐ মুকুটের ওজন যতখানি, ঠিক সেই ওজনের সোনা লইয়া একটা জলভরা পাত্রে পরীক্ষা করিতে হইবে। পাত্রের মধ্যে মুকুটটা ডুবাইয়া দিলে কতখানি জল উছলিয়া পড়ে, তাহা মাপিয়া দেখুন, তারপব আবার জল ভরিয়া সেই ওজনের একতাল সোনা ডুবাইয়া দেখুন কতটা জল পড়ে। মুকুট যদি খাঁটি সোনার হয়, তবে দুই বারেই ঠিক একই পরিমাণ জল বাহির হইবে। যদি খাদ মিশান থাকে, তবে মুকুটটা সেই ওজনের সোনার চাইতে আয়তনে কিছু বড় হইবে, সুতরাং তাহাতে বেশি জল ফেলিয়া দিবে।"

কোন কোন চশমার কাচ এমন থাকে যে, তাহাতে অনেকখানি সূর্যের আলোককে অল্প জায়গার মধ্যে ধরিয়া আনা যায়। সেইরকম কাচ বেশ বড় করিয়া বানাইলে, তাহাব মধ্যে রোদ ধরিয়া আগুন জ্বালান চলে। সরার মতো গর্তওয়ালা আরশি দিয়াও এই কাজটি করান যায়। আর্কিমিডিস এইরকম আরশিও বানাইয়াছিলেন। শোনা যায়, রোমের যুদ্ধ জাহাজ যখন সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসে, তখন তিনি এইরকম আরশি দিয়া কড়া রোদ ফেলিয়া, তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেন। কেবল তাহাই নয়, রোমীয় সেনাপতি মার্সেলাস যখন সৈন্য-সামন্ত লইয়া সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসেন, তখন আর্কিমিডিস নগররক্ষার জন্য নানারকম অদ্ভুত নূতন নূতন যুদ্ধযন্ত্রের আয়োজন করিলেন। সে-সকল যন্ত্রের পরিচয় পাইয়া রোমীয় সৈন্য বহুদিন পর্যন্ত নগরের কাছে ঘেঁষিতে সাহস পায় নাই। তাহার পরে কত যুগ যুগ ধরিয়া, দেশে দেশে আর্কিমিডিসের অদ্ভুত কীর্তির কথা লোকের মুখে শোনা যাইত।

রোমীয় সৈন্যেরা সে-সকল যুদ্ধযন্ত্রের যে বর্ণনা দিয়াছে, তাহা পড়িলে বেশ বুঝা যায়, সেগুলি তাহাদের মনে কিরকম ভয়ের সঞ্চার করিয়াছিল। বড় বড় থামের মতো চূড়া হঠাৎ দেয়ালের উপর মাথা তুলিয়া, হুড়হুড় করিয়া শত্রুর উপর রাশি রাশি পাথর ছুঁড়িয়া মারে, আবার পর মুহূর্তেই দেয়ালের পিছনে ডুব মারে। বড় বড় কলের ধাক্কায় কড়ি বড়গা ছুটিয়া শত্রুর জাহাজে গিয়া পড়ে, দূর হইতে প্রকাণ্ড নখাল সাঁড়াশি চালাইয়া শত্রুর জাহাজ উপড়াইয়া আনে। এ সকল দেখিয়া রোমের সৈন্য আর রোমের জাহাজ নগর ছাড়িয়া দূরে হটিয়া গেল। মার্সেলাস বলিলেন, "যুদ্ধ করিয়া সাইরাকিউস দখল করা কাহারও সাধ্য নয়। তোমরা পথ ঘাট আটকাইয়া এইখানেই বসিয়া থাক। নগরের খাদ্য যখন ফুরাইবে, তখন আপনা হইতেই ইহারা হার মানিবে।" প্রায় তিন বৎসর বিনা যুদ্ধে রোমীয়েরা সাইরাকিউসের চারিদিক ঘেরিয়া রাখিল। তারপর নগরের লোকদের যখন না খাইয়া মারা যাইবার মতো অবস্থা হইল, তখন সাইরাকিউস দখল করা সহজ হইয়া আসিল। মার্সেলাস হুকুম দিলেন, "যাও, নগর লুট করিয়া আন। কিন্তু খবরদার, আর্কিমিডিসের কোন অনিষ্ট করিও না।"

আর্কিমিডিস তখন কি একটা হিসাব করিতেছেন, নগরে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাঁহার হুঁশও নাই। কতগুলা অঙ্ক ও রেখা কষিয়া তাহারই চিন্তায় তিনি ডুবিয়া আছেন। রোমীয় সৈন্যেরা সেই ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধকে আর্কিমিডিস বলিয়া চিনিতে

পারিল না। তাহারা কোলাহল করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি তাঁহার চিন্তার মধ্যে এমনই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, সে কথা তাঁহার কানেই গেল না। তিনি একবার খালি হাত তুলিয়া বলিলেন, "হিসাবে ব্যাঘাত দিও না।" মূর্খ সৈনিক তৎক্ষণাৎ তলোয়ারের আঘাতে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। তাঁহার জীবনের শেষ হিসাব আর সম্পূর্ণ হইল না—তাঁহারই রক্তধারায় সে হিসাব মুছিয়া ফেলিল! কি তত্ত্বের আলোচনায় তিনি এমন করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন, তাহা জানিবারও আর কোন উপায় নাই।

আর্কিমিডিসের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া মার্সেলাসের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি পরম যত্নে আর্কিমিডিসের কবরের উপর অতি সুন্দর সমাধি নির্মাণ করাইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছিলেন। তাহার পর দুই হাজার বৎসর চলিয়া গেল, মানুষের ইতিহাসে এই বিজ্ঞানবীর মহাপুরুষের নাম এখনও অমর হইয়া আছে।

গ্যালিলিও

সে সাড়ে তিনশত বৎসর আগেকার কথা। ইটালি দেশে পিসা নগরে সম্ভ্রান্ত বংশে গ্যালিলিও-র জন্ম হয়। গ্যালিলিওর পিতা অংকশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, শিল্প সংগীত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তাঁহার দখল ছিল। কিন্তু তবু সংসারে তাঁহার টাকা পয়সার অভাব লাগিয়াই ছিল। সুতরাং তিনি ভাবিলেন পুত্রকে এমন কোন বিদ্যা শিখাইবেন, যাহাতে ঘরে দুপয়সা আসিতে পারে। স্থির হইল, গ্যালিলিও চিকিৎসা শিখিবেন।

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই গ্যালিলিওর মনের ঝোঁক অন্যদিকে। ডাক্তারি বই পড়ার চাইতে তিনি কলকব্জা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেই বেশি ভালবাসিতেন। সকলে বলিত, "ওসব শিখিয়া লাভ কি? যাহাতে পয়সা হয় তাই শিখিতে চেষ্টা কর।" উনিশ বৎসর বয়সে একদিন ঘটনাক্রমে জ্যামিতি বিষয়ে এক বক্তৃতা শুনিয়া, গ্যালিলিও সেইদিন হইতেই জ্যামিতি শিখিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু বেশিদিন তাঁহার কলেজে পড়া হইল না। তাঁহার পিতার দুরবস্থা ক্রমে বাড়িয়া শেষটায় এমন হইল যে, তিনি আর পড়ার খরচ দিতে পারেন না। কলেজের কর্তারাও দেখিলেন, এ ছোকরা নিজের পড়াশুনার চাইতে জ্যামিতি ও অন্যান্য 'বাজে' বইয়েতেই বেশি সময় নষ্ট করে। বুঝাইতে গেলে উল্টা তর্ক করে, আপনার জেদ ছাড়িতে চায় না। সুতরাং গ্যালিলিওর কলেজে টেঁকা দায় হইল। তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আবার অংকশাস্ত্রে মন দিলেন। তারপর পঁচিশ বৎসর বয়সে অনেক চেষ্টার পর, তিনি মাসিক ষোল টাকা বেতনে সামান্য এক মাস্টারির চাকরী লইলেন।

কিন্তু এ চাকরীও তাঁহার বেশিদিন টিঁকিল না। কেন টিঁকিল না, সে এক অদ্ভুত কাহিনী। সে সময়ে লোকের ধারণা ছিল, এবং পণ্ডিতেরাও এইরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, যে-জিনিস যত ভারি, শূন্যে ছাড়িয়া দিলে সে তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। গ্যালিলিও একটা উঁচু চূড়া হইতে নানারকম জিনিস ফেলিয়া দেখাইলেন যে, একথা মোটেও সত্য নয়। সব জিনিসই ঠিক সমান হিসাবে মাটিতে পড়ে। তবে, কাগজ পালক প্রভৃতি নিতান্ত হালকা জিনিস যে আস্তে আস্তে পড়ে তার কারণ এই যে,

হালকা জিনিসকে বাতাসের ধাক্কায় ঠেলিয়া রাখে। ঠিক কিরকমভাবে জিনিস কত সেকেণ্ডে কতখানি পড়ে, তাহারও তিনি চমৎকার হিসাব বাহির করিলেন। কিন্তু এত বড় আবিষ্কারে লোকে খুশি না হইয়া বরং সকলে গ্যালিলিওর উপর চটিয়া গেল। পণ্ডিতেরা পর্যন্ত গ্যালিলিওর হিসাব প্রমাণ কিছু না দেখিয়াই সব আজগুবি বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। এবং তাহার ফলে ঘোর তর্ক উঠিয়া গ্যালিলিওর চাকরীটি গেল।

যাহা হউক, অনেক চেষ্টায় গ্যালিলিও আবার আর একটি চাকরী জোগাড় করিলেন এবং কয়েক বৎসর একরূপ শান্তিতে কাটাইলেন। কিন্তু বিনা গোলমালে চুপচাপ করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে তিনি কোপার্নিকাসের মত সমর্থন করিয়া তুমুল তর্ক তুলিলেন। কোপার্নিকাসের পূর্বে লোকে বলিত "পৃথিবী শূন্যে স্থির আছে—সূর্য গ্রহ চন্দ্র তারা সব মিলিয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে।" কোপার্নিকাস যখন বলেন যে, 'পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে' তখন লোকে তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। সুতরাং গ্যালিলিও যখন আবার সেই মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আবার একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সে সময়কার পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে—কিন্তু গ্যালিলিও একাই তেজের সহিত তর্ক চালাইয়া সকলকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের আবিষ্কার করেন। হল্যাণ্ড দেশের এক চশমাওয়ালা কেমন করিয়া দুইখানা কাচ লইয়া আন্দাজে পরীক্ষা করিতে গিয়া দৈবাৎ একটা দূরবীক্ষণ বানাইয়া ফেলে। এই সংবাদ ক্রমে ইটালি পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল; গ্যালিলিও শুনিলেন যে, একরকম যন্ত্র বাহির হইয়াছে, তাহাতে দূরের জিনিস খুব নিকটে দেখা যায়। শুনিয়াই তিনি ভাবিতে বসিলেন এবং রাতারাতি জিনিসটার সংকেত বাহির করিয়া নিজেই একটা দূরবীণ বানাইয়া ফেলিলেন। হল্যাণ্ডের চশমাওয়ালাটি দূরবীণ দিয়া দূরের ঘরবাড়ি দেখিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, গ্যালিলিও তাহাকে আকাশের দিকে ফিরাইলেন।

দূরবীণে আকাশ দেখিয়া তাঁহার মনে কি যে আনন্দ হইল, সে আর বলা যায় না। তিনি যেদিকে দূরবীণ ফিরান, যাহা কিছু দেখিতে যান সবই আশ্চর্য দেখেন। চাঁদের উপর দূরবীণ কষিয়া দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গে ফোস্কা! কোন জন্মের সব আগ্নেয় পাহাড় তার সারাটি গায়ে যেন চাক বাঁধিয়া আছে। বৃহস্পতিকে দেখা গেল একটা চ্যাপ্টা গোলার মতো—তার আবার চার চারটি চাঁদ। সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ! ছায়াপথের ঝাপ্‌সা আলোয় যেন হাজার হাজার তারার গুঁড়া ছড়াইয়া আছে। শুক্রগ্রহ যে ঠিক আমাদের চাঁদের মতো বাড়ে কমে, দূরবীণে তাহাও ধরা পড়িল। এমনি করিয়া গ্যালিলিও কত যে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন তাহার আর শেষ নাই। অবশ্য এসব কথাও লোকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না—কোন কোন পণ্ডিত গ্যালিলিওর সঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়া, তাঁহার দূরবীণ দেখিয়া তবে সব বিশ্বাস করিলেন। কেহ কেহ সব দেখিয়াও বলিলেন, "ওসব কেবল দেখার ভুল—চোখে ধাঁধা লাগিয়া ঐরূপ দেখায়—আসলে আকাশে ওরকম কিছু নাই।" একজন পণ্ডিত দূরবীণ দিয়া বৃহস্পতির চাঁদ দেখিতে সাফ অস্বীকার করিলেন।

ক্রমে কথাটা গুরুতর হইয়া উঠিল। লোকে বলিতে লাগিল, গ্যালিলিও এইরকমভাবে যা-তা প্রচার করিতে থাকিলে লোকের ধর্মবিশ্বাস আর টিঁকিবে না। পৃথিবী স্থির হইয়া আছে, এ কথাই যদি লোকে বিশ্বাস না করে, তবে কিসে তাহারা বিশ্বাস

করিবে? স্বয়ং ধর্মগুরু পোপ আদেশ দিলেন, "তুমি এই সকল জিনিস লইয়া বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিও না। তোমার যা বিশ্বাস, তা তোমারই থাক। তাহা লইয়া যদি লোকের মনে নানারকম সন্দেহ জন্মাইতে যাও, তবে ভাল হইবে না।" গ্যালিলিও বুঝিলেন যে 'ভাল হইবে না' কথাটার অর্থ বড় সহজ নয়। নিজের প্রাণটি বাঁচাইতে হইলে আর গোলমাল না করাই ভাল। কয়েক বৎসর গ্যালিলিও চুপ করিয়া রহিলেন—অর্থাৎ ঐ বিষয়ে চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার মনের রাগ ও ক্ষোভ গেল না। কিছুদিন জোয়ার ভাঁটা ধূমকেতু ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া, তিনি আবার সেই পৃথিবী ঘোরার কথা লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবারে 'পৃথিবী ঘোরে' একথা স্পষ্টভাবে না বলিয়া, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধদলকে নানারকমে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া সকলকে ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। তখন পাদ্রির দল তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিল যে, গ্যালিলিও ধর্মগুরু পোপকে অপমান করিয়াছেন। অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু পাদ্রিদের ধর্মবিচার সভায় গ্যালিলিওর উপর তাঁহার সমস্ত কথা ফিরাইয়া লইবার হুকুম হইল—না লইলে প্রাণদণ্ড। গ্যালিলিওর বয়স তখন প্রায় ৭০ বৎসর। অনেক অত্যাচারের পর তিনি তাঁহার কথা ফিরাইয়া লইলেন। সভায় সকলের সম্মুখে বলিলেন, "আমি যাহা শিক্ষা দিয়াছি, তাহা ভুল বলিয়া স্বীকার করিলাম।" কিন্তু মুখে একথা বলিলেও তাঁহার মন তাহা মানিল না—তিনি পাশের একটি বন্ধুকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "অস্বীকার করিলে হইবে কি? এই পৃথিবী এখনও চলিতেছে।"

এইরূপে নিজের জীবনের উপার্জিত সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করিয়া, তিনি মনের ক্ষোভে ভগ্নদেহে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। তারপর যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহাকে আর বাহিরে কোথাও বড় দেখা যাইত না। নিজে সারাজীবন সাধনা করিয়া যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তাহা প্রাণ খুলিয়া প্রচার করিতে পারিলেন না, এই দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন শেষ হইল। যদি গ্যালিলিও জানিতেন আজ জগতের লোকে তাঁহার শিক্ষা এমন সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তবে বোধহয় বৃদ্ধের শেষ জীবন এত কষ্টের হইত না।

ডারুইন

ছেলেবেলায় আমরা শুনিয়াছিলাম "মানুষের পূর্বপুরুষ বানর ছিল।" ইহাও শুনিয়াছিলাম যে, ডারুইন নামে কে এক পণ্ডিত নাকি একথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ডারুইন এমন কথা কোনদিন বলেন নাই। আসল কথা এই যে, অতি প্রাচীনকালে বানর ও মানুষের পূর্বপুরুষ একই ছিল। সেই এক পূর্বপুরুষ হইতেই বানর ও মানুষ, এ-দুই আসিয়াছে—কিন্তু সে যে কত দিনের কথা তাহা কেহ জানে না।

তখন হইতেই আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল, পণ্ডিতেরা এত খবর জানেন কি করিয়া? তাঁহারা ত সেই প্রাচীনকালের পৃথিবীটাকে চক্ষে দেখিয়া আসেন নাই, তবে তাহার সম্বন্ধে এত সব কথা তাঁহারা বলেন কিসের জোরে? যাহা হউক, আমরা ত আর পণ্ডিত নই, তাই অনেক কথাই আমাদের মানিয়া লইতে হয়। মানিতে হয়

যে এই পৃথিবীটা ফুটবলের মতো গোল এবং সে লাট্টুর মতো ঘোরে, আর সূর্যের চারিদিকে পাক দিয়া বেড়ায়—যদিও এসবের কিছুই আমরা চোখে দেখি না। ছেলেবেলায় ভাবিতাম, পণ্ডিতদের খুব বুদ্ধি বেশি, তাই তাঁহারা অনেক কথা জানিতে পারেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কেবল তাহা নয়। বুদ্ধি ত বটেই, তাছাড়া আরও কয়েকটি জিনিস চাই, যাহা না থাকিলে কেহ কোনদিন যথার্থ পণ্ডিত হইতে পারে না। তাহার মধ্যে একটি জিনিস, ঠিকমতো দেখিবার শক্তি। সাধারণ লোকে যেমন দুই-একবার চোখ বুলাইয়া মনে করে ইহার নাম 'দেখা'—পণ্ডিতের দেখা সেরকম নয়। তাঁহারা একই বিষয় লইয়া দিনের পর দিন দেখিতেছেন, তবু দেখার আর শেষ হয় না। মাথার উপর এত যে তারা সারারাত মিটমিট করিয়া জ্বলে, আবার দিনের আলোয় মিলাইয়া যায়, পণ্ডিতেরা কত হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা দেখিতেছেন তবু তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। বছরের কোন্ সময়ে কোন্ তারা ঠিক কোন্খানে থাকে, কোন্ তারাটা কতখানি স্থির বা কিরকম অস্থির, তাদের রকমসকম কোন্টার কেমন—এইসবের সূক্ষ্ম হিসাব লইতে লইতে পণ্ডিতদের বড় বড় পুঁথি ভরিয়া উঠে। সেইসব হিসাব ঘাঁটিয়া তাহার ভিতর হইতে কত আশ্চর্য নূতন কথা তাঁহারা বাহির করেন, যাহা সাধারণ লোকের কাছে অদ্ভুত ও আজগুবি শুনায়।

আজ এক পণ্ডিতের কথা বলিব, তাঁহাকে কেহ বুদ্ধিমান বলিয়া জানিত না, মাস্টারেরা তাঁহার উপর কোনদিনই কোন আশা রাখেন নাই—বরং সকলে দুঃখ করিত 'এ ছেলেটার আর কিছু হইবে না।' অথচ এই ছেলেই কালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে আপনার নাম রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম চার্লস ডারুইন। পড়ার দিকে ডারুইনের বুদ্ধি খুলিত না, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। সেটি কেবল নানা অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করা! শামুক ঝিনুক হইতে আরম্ভ করিয়া, পুরাতন ভাঙা জিনিস বা পাথরের কুচি পর্যন্ত নানা জিনিসে তাঁহার বাক্স ও পড়িবার টেবিল বোঝাই হইয়া থাকিত। বালকের এই আগ্রহটা অন্য লোকের কাছে অন্যায় বাতিক বা উপদ্রব বলিয়াই বোধ হইত, কিন্তু তবু কেহ তাহাতে বড় একটা বাধা দিত না। কারণ, ডারুইনের মনটা স্বভাবতই এমন কোমল এবং তাঁহার স্বভাব এমন মিষ্ট ছিল যে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

ছেলেবেলায় পড়ার মধ্যে একটি বই ডারুইন খুব মন দিয়া পড়িয়াছিলেন—তাহাতে পৃথিবীর নানা অদ্ভুত জিনিসের কথা ছিল। সেই বই পড়িয়া অবধি তাঁহার মনে দেশ-বিদেশ ঘুরিবার শখটা জাগিয়া উঠে। কলেজে আসিয়া ডারুইন প্রথমে গেলেন ডাক্তারি শিখিতে। সে সময় ক্লোরোফর্ম ছিল না, তাই রোগীদের সজ্ঞানেই অস্ত্র-চিকিৎসার ভীষণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত। সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়া করুণহৃদয় ডারুইনের মন এমন দমিয়া গেল যে, তাঁহার আর ডাক্তারি শেখা হইল না। তখন তিনি ধর্মযাজক হইবার ইচ্ছায় স্কটল্যান্ড ছাড়িয়া ইংলন্ডে ধর্মতত্ত্ব শিখিতে আসিলেন। শিক্ষার দশা এবারও প্রায় পূর্বের মতোই হইল—কারণ, বাল্যকালে তিনি গ্রীক প্রভৃতি যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, এ কয় বছরে তাহার সবই প্রায় ভুলিয়া বসিয়াছেন, ভুলেন নাই কেবল সেই নানা জিনিস সংগ্রহের অভ্যাসটা। কলেজে তাঁহার সহপাঠী বন্ধুরা দেখিত, ডারুইন সুযোগ পাইলেই মাঠে ঘাটে জঙ্গলে পোকামাকড় সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন। হয়ত সারাদিন কোন পোকার বাসার কাছে পড়িয়া, তাহার চালচলন স্বভাব সমস্ত যারপরনাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছেন। এ বিষয়ে কেবল নিজের চোখে দেখিয়া তিনি এমন সব আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করিতেন, যাহা কোন পুঁথিতে

পাওয়া যায় না। বন্ধুরা এইসব ব্যাপার লইয়া নানারকম ঠাট্টা তামাসা করিত, কেহ কেহ বলিত, "ডারুইন পণ্ডিত হইবে দেখিতেছি।" ডারুইন যে পণ্ডিত হইতে পারেন, এটা কাহারও কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথা বলিয়া বোধ হইত না।

এইরূপে বাইশ বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে "বীগল" নামে এক জাহাজ পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইল—ডারুইন বিনা বেতনে প্রাণিতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য তাহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন। পাঁচ বৎসর জাহাজে করিয়া তিনি পৃথিবীর নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়াইলেন এবং প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ে এমন আশ্চর্য নূতন জ্ঞান লাভ করিলেন যে, তাহা তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও জীবনকে একেবারে নূতন পথে লইয়া চলিল। ডারুইন বলেন ইহাই তাঁহার জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় ঘটনা।

তারপর কুড়ি বৎসর ধরিয়া ডারুইন এই সমস্ত বিষয় লইয়া গভীরভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। প্রাচীনকালে যে-সকল জীবজন্তু পৃথিবীতে ছিল, আজ তাহারা নাই, কেবল কতগুলি কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাই। আজ যে-সকল জীবজন্তু দেখিতেছি, তাহারাও ভুঁইফোঁড় হইয়া হঠাৎ দেখা দেয় নাই--ইহারাও সকলেই সেই আদিমকালের কোন না কোন জন্তুর বংশধর। কেমন করিয়া এ পরিবর্তন হইল? এরূপ পরিবর্তন হইবার কারণ কি? যে গাছের যে ফল তাহার বীচি পুঁতিলে সেই ফলেরই গাছ হয়, তাহাতে সেইরূপই ফল ফলে, আমরা ত এইরূপই দেখি। যে জন্তুর আকার-প্রকার যেমন, তার ছানাগুলাও হয় সেরূপ। শেয়ালের বংশে শেয়ালই জন্মে। শেয়ালের ছানা, তার ছানা, তার ছানা, তার ছানা, এরূপ যতদূর দেখিতে পাই সকলেই ত শেয়াল। তবে এ আবার কোন্ সৃষ্টিছাড়া নিয়ম, যাহাতে এক জন্তুর বংশে ক্রমে এমন জন্তুর জন্ম হয়, যাহাকে আর সেই বংশের সন্তান বলিয়া চিনিবার যো থাকে না? ডারুইন দেখিলেন তিনি যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতেই নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের অতি চমৎকার মীমাংসা করা যায়।

যাহারা ওস্তাদ মালী তাহারা ভাল ভাল গাছের 'কলম' করিবার সময়, বা বীজ পুঁতিবার সময় যে-সে গাছের বীজ বা কলম লইয়া কাজ করে না। ভাল গাছ, ভাল ফুল, ভাল ফল বাছিয়া বাছিয়া, তাহাদের মধ্যে নানারকম মিশাল করাইয়া, খুব সাবধানে পছন্দমত গাছ ফুটাইয়া তোলে। যেগুলা তাহার পছন্দমত নয়, সেগুলাকে সে একেবারেই বাদ দেয়। তাহার ফলে অনেক সময় গাছের চেহারার আশ্চর্যরকম উন্নতি ও পরিবর্তন দেখা যায়। একটা সামান্য জংলি ফুল মানুষের চেষ্টা ও যত্নে আজ সুন্দর গোলাপ হইয়া উঠিয়াছে—নানা লোকে গোলাপের চর্চা করিয়া আপন পছন্দমত নানারূপ বাছাই করিয়া, নানারকম মিশাল দিয়া কত যে নূতনরকমের গোলাপ গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। যাহারা ব্যবসার জন্য বা সখের জন্য নানারূপ জন্তু পালে তাহারা জানে যে, কোন জন্তুর বংশের উন্নতি করিতে হইলে, রুগ্ন কুৎসিত বা অকর্মণ্য জন্তুগুলাকে বাদ দিতে হয়। তাহার পর যেরূপ গুণ ও লক্ষণ দেখিয়া বাছিয়া বাছিয়া জোর মিলাইবে, বংশের মধ্যে সেইসব লক্ষণ ও গুণ পাকা হইয়া উঠিবে। লম্বা শিংওয়ালা ভেড়া চাও ত বাছিবার সময় লম্বা শিং দেখিয়া বাছিবে। তাহাদের যেসব ছানা হইবে, তাহাদের মধ্যে যেগুলার শিং ছোট, তাহাদের বাদ দিবে। এইরূপে ক্রমে লম্বা শিঙের দল গড়িয়া উঠিবে।

ডারুইন দেখিলেন, মানুষের বুদ্ধিতে যেমন নানারকম বাছাবাছি চলে, প্রাণিজগতেও সর্বত্রই স্বাভাবিকভাবে সেইরূপ বাছাবাছি চলে। যারা রুগ্ন যারা দুর্বল মরিবার

সময় তাহারাই আগে মরে, যাহারা বাহিরে নানা অবস্থার মধ্যে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তাহারাই টিঁকিয়া যায়। কাহারও গায়ে জোর বেশি, সে লড়াই করিয়া বাঁচে; কেহ খুব ছুটিতে পারে, সে শত্রুর কাছ হইতে পলাইয়া বাঁচে; কাহারও চামড়া মোটা, সে শীতে কষ্ট সহিয়া বাঁচে; কাহারও হজম বড় মজবুত, সে নানা জিনিস খাইয়া বাঁচে; কাহারও গায়ের রং এমন যে হঠাৎ চোখে মালুম হয় না, সে লুকাইয়া বাঁচে। বাঁচিবার মতো গুণ যাহার নাই সে বেচারা মারা যায়, আর সেই সব গুণ আর লক্ষণ যাহাদের আছে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, তাহাদেরই বংশ বিস্তার হয়, আর বংশের মধ্যে সেইসব বাছা বাছা গুণগুলিও পাকা হইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য সংগ্রাম করিতে করিতে, বাহিরের নানা অবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জন্তুর চেহারা নানারকমভাবে গড়িয়া ওঠে।

ডারুইন দেখাইলেন, এইরূপে এবং আরও নানা কারণে, আপনা হইতেই এক একটা জন্তুর চেহারা নানারকমে বদলাইয়া যায়। সেই হুঁকার গল্প তোমরা শুনিয়াছ, যার সবই ঠিক ছিল কেবল নল্‌চে আর মালাটি বদল হইয়াছিল? এক একটা জানোয়ারও ঠিক সেইরূপ নল্‌চে মালা সবই বদল করিয়া নূতন মূর্তি ধারণ করে—তখন তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন জন্তু বলিয়া ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ডারুইনের কথা বলিতে গেলে দুটি গুণের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হয়—একটি তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় আর একটি তাঁহার মিষ্ট স্বভাব। তাঁহার শরীর কোনকালেই খুব সুস্থ ছিল না—জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর সে শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের শক্তি আশ্চর্যরকম সতেজ ছিল। প্রতিদিন ভোরের আগে ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি বাগানে যাইতেন—সেখানে ফুল ফল আর মৌমাছি আর প্রজাপতির সঙ্গে পরিচয় করিতে করিতে কোন্‌দিক দিয়া যে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত কত সময় তাঁহার সে খেয়ালই থাকিত না।

ডারুইনকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা বলেন যে, সকলকে প্রাণ দিয়া এমন ভালবাসিতে আর কেহ পারে না। শুধু মানুষ নয়, পশুপক্ষী নয়, গাছের ফুলটিকে পর্যন্ত তিনি এমনভাবে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন যে, লোকে অবাক হইয়া যাইত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইলে ইংরাজ জাতি সেই 'অল্পবুদ্ধি' ছাত্রকে পরম আদরে বিজ্ঞানবীর নিউটনের পাশে সমাধি দেন।

পাস্তুর

মানুষের যতরকম রোগ হয়, আজকালকার ডাক্তারেরা বলেন, তার সবগুলিই অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর কীর্তি। এই জীবাণু বা "মাইক্রোব" (Microbe) গুলিই সকল রোগের বীজ। পথে ঘাটে বাতাসে মানুষের শরীরের ভিতরে বাইরে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। আজকালকার চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহাদের খাতির খুব বেশি। এই জীবাণুগুলির ভালরূপে পরিচয় লওয়া, ইহাদের চালচলনের সংবাদ রাখা এবং এগুলিকে জব্দ করিবার নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা, এখনকার ডাক্তারিবিদ্যার খুব একটা বড় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে চিকিৎসাপ্রণালী আশ্চর্যরকম উন্নতি লাভ

করিয়াছে। এই সমস্ত উন্নতি এবং এই নূতন প্রণালীর মূলে ফরাসী পণ্ডিত লুই পাস্তুর। পাস্তুর একা এ বিষয়ে নূতন আবিষ্কার ও নূতন চিন্তা দ্বারা মানুষের জ্ঞান ও চেষ্টাকে যে কতদূর অগ্রসর করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

প্রায় ৯৪ বৎসর আগে পাস্তুরের জন্ম হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই শিক্ষকদের মুখে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা শুনা যাইত। সেসময়কার বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই রসায়নবিদ্যায় তাঁহার খুব নাম শুনা গিয়াছিল। ৪৫ বৎসর বয়সে যখন তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া প্যারিসে আসেন তখনও লোক তাঁহাকে খুব বড় রাসায়নিক পণ্ডিত বলিয়াই জানিত। কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ পড়িল আর একটা ব্যাপারের উপর—'জিনিস পচে কেন?' এই প্রশ্ন লইয়া তিনি ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এবং পুরাতন শিক্ষকেরা ইহাতে ভারি দুঃখিত হইলেন। সকলেই বলিতে লাগিলেন "পাস্তুরের এমন বুদ্ধি ছিল, চেষ্টা করিলে সে রসায়নশাস্ত্রে কত কি করিতে পারিত; সে কিনা একটা বাজে বিষয় লইয়া সময় নষ্ট করিতে বসিল।"

কিন্তু পাস্তুর ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি ভাবিলেন ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে হইবে। আগে লোকের ধারণা ছিল সব জিনিস বাতাস লাগিয়া 'আপনা-আপনি' পচিয়া যায়। পাস্তুর দেখাইলেন, দুধে একপ্রকার জীবাণু থাকে যাহার জন্য দুধ টকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাখন যে পচে তাহাও আর একপ্রকার জীবাণুর কাণ্ড। ভাত চিনি বা ফলের রস পচাইয়া যে মদ প্রস্তুত হয়, সেখানেও জীবাণু। নানাপ্রকার জীবাণু বাতাসে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইজন্য অনেক জিনিস আদুল রাখিলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। পাস্তুর আরও দেখাইলেন যে, খুব গরম লাগাইলে এই জীবাণুগুলি মরিয়া যায়। এইরূপে জীবাণু নষ্ট করিয়া এক টুকরা মাংস বা খানিকটা দুধ একটা শিশির মধ্যে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেখা গেল যে, এ অবস্থায় সেগুলি আর পচিতে পারে না। আজকাল লোকে দুধ জমাইয়া টিনে আঁটিয়া বিক্রি করে, নানাপ্রকার ফল চিনির রসে ফুটাইয়া মাসের পর মাস বোতলে পুরিয়া রাখে, কতরকম মাছ মাংস, কতরকম খাবার জিনিস বাতাসশূন্য পাত্রে করিয়া চালান দেয়। পাস্তুর যদি জীবাণু তাড়াইয়া জিনিস বাঁচাইবার সংকেতটি বলিয়া না দিতেন, তবে এ সকল কিছুই সম্ভব হইত না।

এই সময়ে ফ্রান্সে রেশম পোকার একরকম রোগ দেখা দিয়া, রেশমের কারবারের ভয়ানক ক্ষতি আরম্ভ করিল। পাস্তুর এই ব্যাপারটার সন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, এই রোগের মূলে একপ্রকার জীবাণু। সেই জীবাণুটাকে নষ্ট করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া তিনি রোগ দূর করিলেন। ইহার পর পশুপাখির রোগের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িল। খেয়ো জ্বরের উৎপাতে দেশের ছাগল গরু উজাড় হয় দেখিয়া তিনি সেই খেয়ো জ্বর দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খেয়ো জ্বরের জীবাণুর সন্ধান করিয়া তাহার উপর নানারূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। ইহার ফলে তিনি যে চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কার করিলেন, ডাক্তারমহলে এখনও তাহার জয়জয়কার চলিতেছে।

তিনি বলিলেন, রোগের বীজকে কাহিল করিয়া সেই বীজের টীকা দাও—তাহাতেই রোগ সারিবে। যাহার রোগ হইয়াছে তাহার দেহ হইতে জীবাণু সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে সাবধানে বাড়িতে দাও, তারপর অন্য প্রাণীর দেহে সেই জীবাণুর সাহায্যে রোগ প্রবেশ করাও। এই প্রাণীটি যখন রুগ্ন হইবে এবং তাহার দেহে লক্ষ

লক্ষ জীবাণু দেখা দিবে—তাহার শরীর হইতেই টীকার বীজ পাওয়া যাইবে।

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে মানুষের ‘জলাতঙ্ক’ রোগ হয়। এই ভয়ানক রোগের জীবাণুগুলি এতই ছোট যে, সেগুলি অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না। কিন্তু পাস্তুর বলিলেন, “চোখে দেখা যাউক আর নাই যাউক, জীবাণু আছেই।” সেই অদৃশ্য জীবাণুর দ্বারা তিনি অন্য প্রাণীর মধ্যে রোগ জন্মাইয়া, টীকাব বীজ প্রস্তুত করিলেন। একটি চাষার ছেলেকে নেক্‌ড়ে বাঘে কামড়াইয়াছিল—পাস্তুরের সর্বপ্রথম পরীক্ষা হইল তাহার উপরে। এই বালক যখন বাঁচিয়া গেল, তাহার পর হইতেই পাস্তুরের চিকিৎসাপ্রণালী ডাক্তার মহলে একেবারে পাকা হইয়া পড়িয়াছে। পারিস নগরে পাস্তুরের নামে যে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, তাহার সম্মুখে এই কৃষক বালকের একটি সুন্দর মূর্তি আছে।

এক সময়ে ডাক্তারেরা মানুষের দেহে একটু ছুরি চালাইতে হইলেই কত ব্যস্ত হইতেন, কিন্তু এখনকার অস্ত্রচিকিৎসক মানুষের হাত পা কাটিতেও আর ইতস্তত করেন না, কারণ তিনি জানেন, রোগের বীজ তাড়াইলেই আর ভয় নাই। তাই এত হাত ধোয়াধোয়ি, ফুটন্ত জলে ছুরি কাঁচি ডুবান, এত সাবান আর এত কার্বলিক এসিড, নির্দোষ তুলা ও ব্যান্ডেজের জন্য এত কড়াকড়ি—দুষ্ট জীবাণু যাহাতে কোন ফাঁকে ঢুকিতে না পারে। যুদ্ধের জায়গায় হাজার হাজার লোক আহত হইতেছে; তাহার শতকরা আশিজন বাঁচিয়া উঠিতেছে কেবল পাস্তুরের প্রসাদে। আজ বিশ বৎসর হইল পাস্তুর মারা গিয়াছেন; ফরাসি জাতি রাজসম্মানে তাঁহার সমাধি দিয়া সেই সমাধির উপর তাঁহারই নামে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; সেখানে এখনও নূতন নূতন আবিষ্কার চলিতেছে। পাস্তুরের শিষ্যেরা এখন পৃথিবীর চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এখনও কত লোক কত কীর্তি সঞ্চয় করিতেছে।

পাস্তুরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, “তুমি সারা জীবন ধরিয়া কি দেখিলে এবং কি শিখিলে?” পাস্তুর বলিলেন, “দেখিলাম, এ জগৎব্যাপারেব সকলই আশ্চর্য, সকলই অলৌকিক।”

পণ্ডিতের খেলা

সে প্রায় দেড়শত বৎসরের আগেকার কথা, একদিন এক ইংরাজ বুড়ি তাহার জানালা দিয়া দেখিতে পাইল যে, পাশের বাড়িতে বাগানে বসিয়া একজন বয়স্ক লোক সারাদিন কেবল বুদ্বুদ উড়াইতেছে। দুদিন চারদিন এইরকম দেখিয়া বুড়ি ভাবিল লোকটা নিশ্চয় পাগল—তা না হইলে, কাজ নাই কর্ম নাই, কেবল কচি খোকার মতো বুদ্বুদ লইয়া খেলা—এ আবার কোন দেশী আমোদ? বুড়ি তখন ব্যস্ত হইয়া থানায় গিয়া খবর দিল।

যে-লোকটি বুদ্বুদ উড়াইত, পুলিশে তাহার খবর লইতে গিয়া দেখিল, তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং সার আইজাক নিউটন—যাঁহার মতো অত বড় বিজ্ঞানবীর হাজার বৎসরে দুটি পাওয়া দুষ্কর। বুদ্বুদের গায়ে যে রামধনুর মতো জমকালো রং

দেখা যায়, নিউটন তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। নিউটনের পরেও ইয়ং প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা এই অনুসন্ধান লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে, আলোক জিনিসটা যে কি, এ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে।

মেঘের গায়ে রামধনুকের রং দেখিতে যে খুবই সুন্দর তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখিলে সকলেরই মনে কৌতূহল জাগে। শুধু মেঘের গায়ে নয়, আলোকের রঙিন খেলা স্ফটিক পাথর বা কাঁচের ঝাড়ে কেমন করিয়া ঝিকমিক করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেখায় আর পণ্ডিতের দেখায় অনেক তফাৎ। নিউটন সেই রঙের খেলাকে নানারকমে খেলাইয়া দেখিলেন, আসল ব্যাপার কি। তারপর সেই একই ব্যাপারের সন্ধান করিয়া কত পণ্ডিত যে কত নূতন তত্ত্ব বাহির করিলেন, তাহার আর অন্ত নাই। কিন্তু আজও তাঁহাদের কৌতূহল মিটে নাই। বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্রে সূর্যের আলোক দেখায় যেন রামধনুকের ফিতা। সেই ফিতার মধ্যে রঙের মালা কেমন করিয়া সাজান থাকে পণ্ডিতেরা হাজাররকম উপায়ে তাহার পরীক্ষা করিয়াছেন। এক একরকম আলোর এক একরকম রঙিন মালা। সূর্যের আলোক বর্ণবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে সূর্যের ভিতরকার গোলকটা যেমন গরম তাহার বাইরের আগুনটা সেরকম গরম নয়। সূর্যের আলোর রঙিন ছটায় তাঁহারা এক একটা চিহ্ন দেখেন আর মাপিয়া বলেন, "এটা লোহার জ্যোতি —এটা হাইড্রোজেনের আলো—এইটা গন্ধকের চিহ্ন, এইটা অঙ্গারের রেখা, এইটা ক্ষারের ধাতুর, এইটা চুনের ধাতুর—" ইত্যাদি। তারার আলোর রামধনু ফলাইয়া তাঁহারা বলিতে পারেন, এই তারাটা গ্যাসের পিণ্ড, এই তারাটা জমাট আগুন, এই তারাটা বাষ্পে ঢাকা। এই সমস্ত সংকেত শিখিবার মূলে ঐ রামধনুক দেখিবার কৌতূহল।

নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের সমুদ্রকূলে কতগুলা লোক প্রতিদিন ঘুড়ি উড়াইত, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়া থাকিত। সেখানকার নাবিকেরা এই 'নিষ্কর্মা' লোকেদের ছেলেখেলা দেখিয়া ঠাট্টা তামাশা করিত। তাহারা জানিত না যে ঐ নিষ্কর্মার সর্দারটির নাম মার্কনি—সেই মার্কনি, যিনি বিনা তারে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার কল বানাইয়াছেন। তারের সূতায় বাঁধা প্রকাণ্ড ঘুড়ি আকাশে উড়িত, আর একটা লোক সেই তারের সঙ্গে টেলিফোনের কল জুড়িয়া কান পাতিয়া পড়িয়া থাকিত। তারপর একদিন যখন সেই টেলিফোনের কলের মধ্যে টক্‌টক্ শব্দ শোনা গেল, তখন সকলের আনন্দ দেখে কে! তাহারা জানিত যে ঐ শব্দ আসিতেছে অতলান্তিক মহাসাগরের ওপার হইতে। এমনি করিয়া ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় বিনা তারে বিদ্যুতের খবর চলিতে আরম্ভ করিল।

ইংলণ্ডের যাঁহারা নামজাদা পণ্ডিত, তাঁহাদের মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের নাম বিশেষ স্মরণীয়। এক দপ্তরীর পুরাতন বইয়ের দোকানে কাজ করিয়া ফ্যারাডে অবসরমত দোকানে বইগুলা পড়িতেন। এমনি করিয়া তাঁহার মনে শিখিবার আগ্রহ জাগিয়াছিল। তারপর এক অজানা ভদ্রলোকের অনুগ্রহে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ভাল বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সেই কৌতূহল মিটাইতে গিয়া তিনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিদ্যুতের শক্তিতে কল চালাইবার সংকেত তিনিই আবিষ্কার করেন। বিদ্যুতের কল এখন পৃথিবীতে সর্বত্রই চলিতেছে—বিদ্যুৎ ছাড়া সভ্যদেশের কাজ চালাই অসম্ভব। অথচ ফ্যারাডে যখন সর্বপ্রথমে একটি ছোট চাকাকে বিদ্যুতের বলে ঘুরাইবার সংকেত দেখাইলেন, তখন অনেক লোকেই সেটাকে

নেহাৎ একটা তামাসার জিনিসমাত্র মনে করিয়াছিল। কেহ কেহ ফ্যারাডেকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে এইরকমের খেলনা বানাইয়া তাঁহার মতো পণ্ডিত লোকের লাভ কি? ফ্যারাডে হাসিয়া বলিতেন, "নূতন একটা জ্ঞান লাভ করিলাম, ইহাই ত যথেষ্ট লাভ। আর কোন লাভ যদি নাও হয় তাহাতেই বা দুঃখ কি?"

গ্রামোফোনের কথা জানে না, এমন শিক্ষিত লোক আজকাল পাওয়া কঠিন। কিন্তু শব্দকে যে যন্ত্রের সাহায্যে ধরিয়া রাখা যায়, একথাটা কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের কল্পনায় আসে নাই। এডিসন যখন ফনোগ্রাফের আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহার কর্মচারীরা কেহ কেহ ভয় পাইয়াছিল। ঘরে মানুষ নাই, তিনি কেবল একটা চোঙার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, তারপর চোঙার মুখে কান পাতিয়া কি যেন শুনিতেছেন—এইরকম ব্যাপার তাহারা সর্বদাই দেখিত! তারপর এডিসন যখন তাহাদের ডাকিয়া কলের আওয়াজ শুনাইলেন—তখন কলের মধ্যে বিকৃত গলায় মানুষের মতো শব্দ শুনিয়া তাহাদের ভয়টা ঘোচে নাই কিন্তু এইটুকু বুঝিয়াছিল যে ব্যাপারটা নেহাৎ পাগলের খেলা নয়।

বিলাতের পিলট ডাউন নামক স্থানে কতগুলা মজুর মাটি খুঁড়িতেছিল। মাটির মধ্যে মাঝে মাঝে পাথরের টুকরার মতো কিসব জিনিস বাহির হইত, একজন সাহেব সেইগুলা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইত। সেগুলা যে প্রাচীন মানুষের চিহ্ন মজুরেরা তাহা জানিত না। তাহারা পয়সার লোভে সেইসব সংগ্রহ করিয়া রাখিত, কিন্তু সাহেবটি পিছন ফিরিলেই তাহারা হাসাহাসি করিত, আর ইঙ্গিত করিয়া বলিত, "লোকটার মাথায় কিছু গোল আছে।" একদিন হঠাৎ খুলির হাড়ের মতো এক টুকরা জিনিস পাইয়া সেই সাহেবের উৎসাহ ভয়ানক চড়িয়া গেল—এবং কিছুদিন বাদে কোথা হইতে এক বুড়া আসিয়া সেই সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া মাটি ঘাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। একটার জায়গায় দুটা পাগলকে দেখিয়া মজুরদেরও আমোদ বাড়িয়া গেল, কারণ ইঁহাদের উৎসাহের কারণ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। দুজনের চেষ্টায় যাহার আবিষ্কার হইল বৈজ্ঞানিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন পিলট ডাউনের খুলি। ইহা অতি প্রাচীনকালের একটা মানুষের মাথার টুকরা। কেহ কেহ বলেন এত প্রাচীন মানুষের চিহ্ন আর পাওয়া যায় নাই। খুলিটার বয়স লইয়া পণ্ডিতমহলে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। ইহার জন্য সাহেব দুটি ছয় মাস ধরিয়া মাটিতে বসিয়া 'রাবিশ' ঘাঁটিয়াছিলেন!

বনচাঁড়ালের গাছের পাতা আপনা-আপনি কাঁপিতে থাকে। ইহা অনেক লোকেই দেখিয়াছে, কিন্তু আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কৌতূহল ইহাতেই জাগিয়া উঠিল। তিনি যে কতরকম কৌশল খাটাইয়া কতরকম পরীক্ষা করিয়া এই পাতাকে নাচাইয়া দেখিয়াছেন, তাহার যদি খবর লও, তবে বুঝিবে বৈজ্ঞানিকের 'দেখা' আর সাধারণ লোকের দেখায় তফাৎ কিরকম!

'সামান্য' ঘটনা

এক একটা সামান্য ঘটনা থেকে জগতে কত বড় বড় কান্ড, কত আবিষ্কার, কত মারামারি, কত যুদ্ধবিগ্রহের আরম্ভ হয়েছে, সে কথা ভাবতে গেলে এক-এক সময় ভারি আশ্চর্য লাগে। আমাদের দেশে পুরাণে এরকম ঘটনার অনেক গল্প আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৌরবদের মধ্যে যখন কেবল অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা আর কৃপাচার্য, এই তিনজন মাত্র বাকি রইলেন, তখন অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় শুয়ে অশ্বত্থামা দেখলেন, একটা পেঁচা এসে কতগুলো ঘুমন্ত কাককে অনায়াসে মেরে রেখে গেল! তাতেই অশ্বত্থামার মনে হঠাৎ এই ফন্দি জাগল যে, 'আমিও ত এমনি করে অন্ধকার রাত্রে পাণ্ডবশিবিরে ঢুকে যোদ্ধাদের মেরে ছারখার করে আসতে পারি।' যেমন মনে হওয়া, অমনি সেইমত কাজে লাগা। সেই রাত্রের ভয়ংকর ব্যাপারের কথা তোমরা মহাভারতে পড়েছ।

ছেলেবেলায় ইংরাজিতে রবার্ট ব্রুসের গল্প পড়েছিলাম। স্কটল্যাণ্ডের যোদ্ধা রাজা রবার্ট ব্রুস প্রবল শত্রুর কাছে বার বার পরাজিত হয়ে শেষটায় রাজ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছেন; এমন সময় তিনি দেখলেন একটা মাকড়সা একখানি সুতো ধরে বার বার গুহার মুখটাকে বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে আর বার বার পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু সে চেষ্টা ছাড়ছে না। অনেক চেষ্টার পর শেষে সে ঠিকমত উঠতে পারল। তা দেখে রাজা রবার্টের মনেও ভরসা এল—তিনি ভাবলেন, আর একবার চেষ্টা করে দেখি। সেই চেষ্টার ফলে তিনি জয়লাভ করে আবার তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন।

বিজ্ঞানবীর নিউটন তাঁর বাগানে বসে দেখলেন, গাছ থেকে একটা ফল মাটিতে পড়ল। ঘটনাটা নিতান্তই সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার ফলাফল বড় সামান্য নয়। নিউটন ভাবতে বসলেন, 'ফলটা মাটিতে পড়ল কেন?' জিনিসমাত্রই শূন্যে ছেড়ে দিলে মাটিতে পড়ে কেন? চারিদিক জুড়ে এত প্রকাণ্ড আকাশ পড়ে আছে, তা ছেড়ে এই পৃথিবীর মাটির উপরেই তার এত ঝোঁক কেন?' ভাবতে ভাবতে তিনি মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন। প্রথম, তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, পৃথিবীটা তার আশেপাশের সমস্ত টানে। কিন্তু শুধু পৃথিবীই কি টানে? চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এদেরও কি সে শক্তি নেই? আর শুধু কাছের জিনিসকেই পৃথিবী টানে, অনেক দূর পর্যন্ত কি সে টান পৌঁছায় না? ভাবতে ভাবতে সিদ্ধান্ত হল এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকটি জড়কণা অপর সমস্ত জড়কণার প্রত্যেকটিকে আকর্ষণ করে। যতদূরেই যাওয়া যায় সে আকর্ষণ ততই ক্ষীণ হয়ে আসে। এই পৃথিবী চন্দ্রকে টানছে, চন্দ্রও পৃথিবীকে টানছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি পাথর, প্রত্যেকটি মাটির ঢেলা, প্রত্যেকটি ধূলিকণা পর্যন্ত জগতের আর সমস্ত জিনিসকে আকর্ষণ করছে। নিউটন দেখালেন যে, এইভাবে গণনা করে দেখলে পৃথিবী এই উপগ্রহ প্রভৃতি সকলেরই চলাফিরার ঠিকমত হিসাব পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত বড় তত্ত্বের

আবিষ্কার আর দ্বিতীয় হয়নি বললেও চলে।

একটা মরা ব্যাঙের ঠ্যাঙের নাচন থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহের আবিষ্কার হয়। গ্যালভানি (Galvani) নামে এক ইটালিয়ান পণ্ডিত পরীক্ষার জন্য একটা ব্যাং কেটে একটা লোহার শলাকায় ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। খানিক পরে তাঁর স্ত্রী দেখেন, সেই মরা ব্যাঙের ঠ্যাংটা এক-একবার ঝুলে পড়ছে আর এক-একবার হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে। তিনি যদি এটাকে ভূতুড়ে ভেবে ভয়ে পালাতেন, তবে তাঁর আর বিদ্যুতের তত্ত্ব আবিষ্কার করা হত না। কিন্তু তিনি ভয় পেলেন না, বরং এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল। তখন দেখা গেল, এই ব্যাঙের পায়ের নীচে এক টুকরো তামা রয়েছে, তাতে যতবার পা ঠেকছে ততবার মরা ব্যাং নেচে উঠছে। গ্যালভানিও খবর পেয়ে দেখতে এলেন, আর পরীক্ষা করে দেখলেন যে, ওটা বিদ্যুতেরই কাণ্ড। এই যে এখন কত সহরে সহরে বিদ্যুতের কারখানা বসেছে, পাখা চলছে, আলো জ্বলছে, এর গোড়াকার ইতিহাস যদি লিখতে হয় তবে তার মধ্যে ঐ ব্যাঙের নাচনটারও উল্লেখ থাকবে।

ভেড়ার লোম কেটে যে পশম তৈরি হয়, তাকে কাজে লাগাবার আগে তার জট ছাড়িয়ে আঁশ আলগা করা দরকার। এই কাজ আগে হাতে করতে হত, পরে জট ছাড়াবার কলের সৃষ্টি হওয়াতে এখন কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। যাদের চেষ্টায় এই কলের সৃষ্টি ও উন্নতি হয়, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাইলম্যান নামে এক পশমওয়ালা। তিনি একদিন তাঁর মেয়েদের চুল আঁচড়ান দেখে, মনে ভাবলেন 'এইরকম করে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পশমের জট ছাড়ান হয় না কেন?' তিনি জট ছাড়াবার জন্য চিরুনির কল করলেন, তাতে পশমওয়ালাদের যে কত সুবিধা হয়ে গেল তা আর বলা যায় না। কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য হচ্ছে সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এলিয়াস্ হাউস্ আমেরিকার লোক; তাঁর বাল্যকালের শখ ছিল তিনি সেলাইয়ের কল বানাবেন। সে সময়ে সেলাইয়ের কাজ সমস্তই হাতে করতে হত, কিন্তু হাউস্ ভাবলেন, এতরকম কাজ কলে হচ্ছে, আর সেলাইটা হতে পারবে না কেন? তিনি বহুদিন ধরে এই বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু ছুঁচশুদ্ধ সুতোটাকে কাপড়ের ভিতর দিয়ে পারাপার করাতে গিয়ে তিনি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। নানারকম ফন্দি খাটিয়েও এই কাজটিকে তিনি কলে বাগাতে পারলেন না। তখন, একদিন রাত্রে তিনি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—এক অসভ্য রাজা তাঁকে বন্দী করে হুকুম দিয়েছে, এখনই আমাকে সেলাইয়ের কল বানিয়ে দাও, যদি না দাও ত তোমায় মেরে ফেলব। স্বপ্নের মধ্যে সেলাইয়ের কল বানানো গেল না, রাজা হুকুম দিলেন 'মার একে'। তখন কতগুলো লোক বল্লম দিয়ে তাঁকে মারতে এল, সেই বল্লমের মুখের ফলকের মাথায় ফুটো। তৎক্ষণাৎ হাউসের ঘুম ভেঙে গেল, তিনি উঠে বসতেই সব প্রথমে তার মনে হল 'বল্লমের মুখের কাছে ফুটো!' তিনি ভাবলেন 'এই ত ঠিক হয়েছে! কলের ছুঁচের পিছনে সুতো না দিয়ে, এইরকম মুখের কাছে সুতো দিলেই ত অনেকটা সহজ হয়ে আসে।' শেষকালে পরীক্ষায় তাই দেখা গেল—সেলাইয়ের কল করবার পক্ষে আর কোনো বাধাই রইল না। এই হল সেলাইয়ের কলের ইতিহাস।

এখানে সামান্য ঘটনাটি একটা স্বপ্ন মাত্র। এর পরে যখন সেলাইয়ের কল দেখবে, তখন এই কথাটি ভেবে দেখো যে, তার আদি জন্মের ইতিহাসের মূল হচ্ছে একটা স্বপ্ন।

জীবজন্তু

গরিলা

গরিলা থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে। গাছের ডালপালার ছায়ায় সে জঙ্গল দিনদুপুরেও অন্ধকার হয়ে থাকে; সেখানে ভাল করে বাতাস চলে না, জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নাই। পাখির গান হয়ত ক্বচিৎ কখন শোনা যায়। তারই মধ্যে গাছের ডালে বা গাছের তলায় লতাপাতার মাচা বেঁধে গরিলা ফলমূল খেয়ে দিন কাটায়। সে দেশের লোকে পারতপক্ষে সে জঙ্গলে ঢোকে না—কারণ গরিলার মেজাজের ত ঠিক নেই, সে যদি একবার ক্ষেপে দাঁড়ায়, তবে বাঘ ভালুক হাতি তার কাছে কেউই লাগে না। বড় বড় শিকারী, সিংহ বা গণ্ডার ধরা যাদের ব্যবসা, তারা পর্যন্ত গরিলার নাম শুনলে এগোতে চায় না।

পৃথিবীর প্রায় সবরকম জানোয়ারকেই মানুষে ধরে খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানায় আটকাতে পেরেছে—কিন্তু এ পর্যন্ত কোন বড় গরিলাকে মানুষে ধরতে পারেনি। মাঝে মাঝে দুটো একটা গরিলার ছানা ধরা পড়েছে কিন্তু তার কোনটাই বেশি দিন বাঁচেনি।

একবার এক সাহেব একটা গরিলার ছানা পুষবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটার বয়স ছিল দু-তিন বৎসর মাত্র। তিনি বলেন, তার চালচলন, মেজাজ দুষ্টুমি বুদ্ধি ঠিক মানুষের খোকার মতো। তাকে যখন ধরে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হত, তখন সে মুখ বেজার করে পিছন ফিরে বসে থাকত। যে জিনিস সে খেতে চায় না সেই জিনিস যদি তাকে খাওয়াতে যাও, তবে সে চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। একদিন তাকে জোর করে ওষুধ খাওয়াবার জন্য চারজন লোকের দরকার হয়েছিল। তাকে যখন জাহাজে করে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আনান হয়, তখন প্রায়ই জাহাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হত কিন্তু সে কোনদিন কারো অনিষ্ট করেনি। তবে জাহাজের খাবার ঘরের পাশে যে একটা আলমারি ছিল, যার মধ্যে চিনি থাকত আর নানারকম মিষ্টি আচার ইত্যাদি রাখা হত সেই আলমারিটার উপর তার ভারি লোভ ছিল। কিন্তু সে জানত যে ওটাতে হাত দেওয়া তার নিষেধ, কারণ দু-একবার ধরা পড়ে সে বেশ শাস্তি পেয়েছিল। তারপর থেকে যখন তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হত তখন সে কখনও সোজাসুজি আলমারির দিকে যেত না; প্রথমটা যেত ঠিক তার উল্টোদিকে, যেন কেউ কোনরকম সন্দেহ না করে! তারপর একটু আড়ালে গিয়েই এক দৌড়ে বারান্দা ঘুরে একেবারে আলমারির কাছে উপস্থিত!

একবার একটা গরিলার ছানাকে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। চিড়িয়াখানায় নানারকম অদ্ভুত জন্তু দেখতে তার খুব মজা লাগত—কোন কোনটার খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে তাদের চালচলন দেখত। একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ছিল, সে নানারকম কসরৎ জানত—সে যখন ডিগবাজি খেয়ে বা হুটোপাটি করে নানারকম তামাসা দেখাত, গরিলাটা ভারি খুশী হয়ে তার কাছে এসে বসত।

গরিলার চেহারাটা মোটেও শান্তশিষ্ট গোছের নয়—মানুষের মতো লম্বা, চওড়ায় তার দ্বিগুণ, গায়ের জোর তার দশটার মতো—তার উপর সে যখন রাগের চোটে চিৎকার

করে নিজের বুকে কিল মারতে মারতে এগোতে থাকে তখন তার সেই শব্দ আর মুখভঙ্গী আর রকমসকম দেখে খুব সাহসী লোক পর্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ দেখলেই গরিলা তেড়ে মারতে আসে না—বরং সে অনেকসময়ে মানুষকে এড়িয়েই চলতে চায়। কিন্তু তুমি একেবারে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হও ত সে কি করে বুঝতে পারে যে তোমার কোন দুষ্ট মতলব নাই? বিশেষত লোকে যখন লাঠিসোটা নিয়ে হৈ হৈ করে জঙ্গলে হাজির হয়, তাতে যদি গরিলা খুশী না হয়, তবেই কি তাকে হিংস্র বলতে হবে?

গরিলার লড়াই

যতরকম বনমানুষ আছে তার মধ্যে, বুদ্ধিতে না হোক, শরীরের বলে গরিলাই সেরা। হাত-পায়ের মাংসপেশীর বাঁধন থেকে তার দাঁড়াবার ধরন আর ভ্রূকুটিভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন খাঁ খাঁ করে তেড়ে বলছে, "খবরদার! কাছে এস না।"

মানুষের মধ্যে এত বড় পালোয়ান কেউ নেই যে এক মিনিটের জন্যেও একটা গরিলার রোখ সামলাতে পারে। কিন্তু গরিলায় গরিলায় যদি লড়াই লাগে, তাহলে সেটা দেখতে কেমন হয়? বড় বড় পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াই দেখতে কত মানুষ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে; সে লড়াই যতই ভীষণ হয়, হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি যতই বেশি হয়, মানুষের ততই উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু গরিলাদের মধ্যেও কি সেরকম লড়াই বা রেষারেষি লাগে? লাগে বৈকি! এমন গরিলা পাওয়া গিয়েছে যার দাঁত ভাঙা বা কানটা ছেঁড়া, অথবা গায়ে মাথায় অন্য গরিলার দাঁতের চিহ্ন রয়েছে। লড়াইয়ের সময় কোন মানুষ উপস্থিত থেকে তা দেখেছে, আজ পর্যন্ত এরকম শোনা যায়নি—কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম লড়াই যে হয়, নানারকম গর্জন আর হুংকার আর বুক চাপড়াবার গুম্ গুম্ শব্দে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গরিলা যখন ক্ষেপে, তখন রাগে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর আপনার বুকে দমাদম্ কিল মারতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে, তার কপালের লোম ফুলে ফুলে খাড়া হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে নাকের ফস্ ফস্ আর দাঁতের কড়মড় শব্দ চলতে থাকে। তার উপর সে যখন হুংকার ছাড়ে, তখন অতিবড় সাহসী জন্তুও পালাবার পথ খুঁজতে চায়। লোকে বলে, সে হুংকার নাকি সিংহের ডাকের চাইতেও ভয়ানক।

মনে কর, জঙ্গলের মধ্যে কোন গরিলাসুন্দরীর বিয়ের জন্য দুই মহাবীর পাত্র এসেছেন। দুজনেই তাকে ভালোবাসে, দুজনেই তাকে চায়, কেউ দাবি ছাড়তে রাজী নয়। এমন অবস্থায় পশুপাখির মধ্যে সর্বত্রই যা হয়ে থাকে, আর পুরাণের বড় বড় স্বয়ংবর সভাতেও যেমন হয়ে এসেছে, এখানেও ঠিক তাই হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দুই বীর আপন আপন তেজ দেখিয়ে লড়াই করতে লেগে যায়। সে ভীষণ লড়াই যে একটা দেখবার মতো ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ কি? গরিলার চড় আর গরিলার ঘুঁষি, যার একটি মারলে মানুষের ভুঁড়ি ফেঁসে যায়, মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে যায়, সে কেবল গরিলার গায়েই সয়। সেই চট্‌পট্ দুম্‌দুম্ কিল চড়ের সঙ্গে খাম্‌চা খাম্‌চি আর কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়িও নিশ্চয়ই চলে। এইরকমে যতক্ষণ না লড়াইয়ের মীমাংসা

হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এক পক্ষ হার মেনে চম্পট না দেয়, ততক্ষণ হয়ত গরিলাসুন্দরীর চোখের সামনেই এই ভীষণ কাণ্ড চলতে থাকে। সে বেচারা হয়ত চুপ করে তামাসা দেখে, কিংবা দুজনের মধ্যে কাউকে যদি তার বেশি পছন্দ হয়, তবে তার পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে একটু-আধটু যোগ দেওয়াও তার কিছু আশ্চর্য নয়।

বেবুন

যেসব বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মতো ঢিপি, তাদের নাম বেবুন। বেবুনের আসল বাড়ি আফ্রিকায়, কেউ কেউ এশিয়াতেও থাকেন। বেবুন বংশের অনেক শাখা—হলদে বেবুন, লালমুখো বেবুন, ঝুঁটিওয়ালা কালো বেবুন, চিত্রমুখ সং-বেবুন বা ম্যানড্রিল, চাকমা বেবুন, ড্রিল বেবুন ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গী চালচলন ও স্বভাব প্রায় একইরকম: উঁচু উঁচু ধারাল দাঁত, বদ্‌খত মেজাজ আর তার চাইতেও বদ্‌খত চেহারা। সমস্ত জানোয়ারদের মধ্যে বিদঘুটে চেহারা যদি কারও থাকে তবে সে ঐ ম্যানড্রিলের। টকটকে লাল নাক, খাঁজকাটা নীল গাল, ভেংচিকাটা ভ্রূকুটি মুখ, সব মিলে অপূর্ব চেহারাখানা হয়!

আফ্রিকার পাহাড়ে জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। ‘বল, বুদ্ধি, ভরসা’ এই তিন জিনিসের জোরে সে নীচের জমিতে নেমে এসে চাষার ক্ষেতের উপর অত্যাচার করে ফল শস্য খেয়ে পালায়। তাদের দল বাঁধবার কায়দা, আর পথঘাট পাহারা দেবার ব্যবস্থা এমন চমৎকার, আর এমন হঠাৎ এসে লুটপাট করে তারা ফস্‌ করে পালায় যে, চাষারা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। পালাবার সময় বেবুনেরা কখনও দলের কাউকে ফেলে যায় না—যদি একজন বিপদে পড়ে অমনি পালের গোদারা তাকে সাহায্য করবার জন্য তেড়ে আসে। একবার একটা বাচ্চা বেবুনকে কতগুলো কুকুরে ঘেরাও করে ফেলেছিল, কিন্তু একটা ধাড়ি বেবুন এসে সেই কুকুরের দলের মধ্যে ঢুকে, এমনি দু-তিন ভেংচি দিয়ে তাদের মুখের সামনে থেকেই সেই বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে গেল যে, কুকুরগুলো ভয়ে কিছুই করতে সাহস পেল না—দূরে শিকারীরা পর্যন্ত তার তেজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বিপদে পড়লে বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই নখ দিয়ে খাম্‌চে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে, তার পরেই প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে হাড়গোড় পর্যন্ত অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নখ দাঁতই হচ্ছে বেবুনের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হলে তারা পাথর ছুঁড়তেও জানে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে শত্রুর মাথায় ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ।

আলিপুরের বাগানে

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আমাদের একটি বন্ধু আছেন। আমরা যখনই আলিপুর যাই অন্তত একটিবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলি না। দেখা করবার সময় শুধু হাতে যাওয়াটা ভাল নয়, তাই বন্ধুর জন্য প্রায়ই কিছু উপহার নিয়ে যাই। তিনিও তাঁর সাধ্যমত নানারকম তামাসা কসরত ও মুখভঙ্গী দেখিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেন।

অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে গোড়া থেকেই বাঘের ঘরটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হন। সাপ, কুমির, উটপাখি, গণ্ডার আর হিপোপটেমাস—কেউ কেউ এঁদেরও খুব খাতির করে থাকেন। কিন্তু যে যাই বল, বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই আমাদের মনটা সকলের আগে বলতে থাকে, বন্ধুর বাড়ি চল্, বন্ধুর বাড়ি চল্। বন্ধুর সঙ্গে কেন যে আমাদের এত ভাব, তা যদি শুনতে চাও, তাহলে তাঁর নামের পরিচয়, গুণের পরিচয়, বিদ্যার পরিচয়, সব তোমাদের শুনতে হয়।

বন্ধুটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটান। আফ্রিকা নিবাসী, আলিপুর প্রবাসী। অমন অমায়িক চেহারা, অমন ঢিলাঢালা প্রশান্ত স্বভাব অমন ধীর গম্ভীর মেজাজী চাল, সমস্ত আলিপুর খুঁজে আর কোথাও দেখবে না।

কত যে ভাবনা আর কত যে হিসাবপত্র সর্বদা তাঁর মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তাঁর ঐ প্রকাণ্ড কপালজোড়া হিজিবিজি রেখাগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে। যখন তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে, মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে, পেট চুলকাতে থাকেন, আর তাঁর কালো কালো হ্যাংলা মতন চোখ-দুটি মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে থাকে, তখন যদি তাঁর মনের মধ্যে কান পেতে শুনতে পারতে, তাহলে শুনতে সেখানে অনর্গল হিসাব চলছে—'আর চারটে কলা, আর দু ঠোঙা বাদাম, আর কতগুলো বিস্কুট, আর ঐ নাম-জানি-না গোল-গোল-মতন অনেকখানি'—ইত্যাদি। যখন তিনি খাঁচার ছাত থেকে গরাদ ধরে অত্যন্ত ভালমানুষের মতো ঝুলতে থাকেন, আর দুলতে থাকেন—যেন সংসারের কোন কিছুতে তাঁর মন নেই—তখন যদি তাঁর মনের কথা শুনতে, তাহলে শুনতে পেতে, তিনি কেবলই ভাবছেন, কেবলই ভাবছেন 'এই লোকটার পাগড়ি না হয় ঐ লোকটার চাদর, না হয় এই সাহেবটার টুপি, না হয় ঐ বাবুটার ছাতা—নেবই নেব, নেবই নেব।'

একদিন আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি, ওরাংবাবু দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছেন। কোত্থেকে কি করে, কার একটা পাগড়ি তিনি আদায় করেছেন, আর সেইটাকে ছাতের গরাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে অপূর্ব দোলনা তৈরি হয়েছে। তিনি দুহাতে তার দুই মাথায় ধরে মনের আনন্দে দুলছেন। তাঁর মুখখানা যেন সদানন্দ শিশুর মতো, নিজের বাহাদুরি দেখে নিজেই অবাক।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, পাগড়ির একটা দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন মাথা চুলকোতে। অমনি পাগড়ির একটা মাথা ভারি হয়ে নেমে পড়ল, আর

আরেক মাথা আলগা পেয়ে সুড়ুৎ করে গরাদের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। ব্যাপারখানা বুঝবার আগেই ওরাংবাবু মেঝের উপর চিৎপাত। আর কেউ হলে অপ্রস্তুত হত, কিন্তু বন্ধু আমাদের অপ্রস্তুত হবার পাত্রই নন। তিনি পড়েই একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেন আর এমনভাবে ফিরে দাঁড়ালেন যেন আগাগোড়া তিনি ইচ্ছা করেই আমাদের তামাসা দেখাচ্ছিলেন। তারপর অনেকখানি ভেবে আর অনেক বুদ্ধি খরচ করে আবার তিনি দোলনা খাটালেন। কাপড়টাকে গরাদের উপর দিয়ে গলিয়ে তার দুটো মাথাকেই যে ধরে রাখতে হয়, এটা বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তিনি পাগড়িটাকে ঝুলিয়ে এক মাথা ধরে টানেন, আর হুস্ করে দোলনা খুলে আসে, তাতে প্রথমটা বেচারার ভারি ভাবনা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধুটির নানারকম বিদ্যা আছে। তিনি পান খেতে ভারি ভালোবাসেন। পানটা হাতে দিলে, আগে সেটাকে খুলে পরীক্ষা করে দেখেন, তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে টপ্ করে মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেন। যখন পান খেয়ে তাঁর মুখখানা লাল হয়, আর গাল বেয়ে পানের রস পড়তে থাকে, তখন তিনি মাটির মধ্যে থুতু ফেলেন, আর লাল রঙের থুতু দেখে খুশী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে অত্যন্ত লাজুক ছেলের মতো চুপচাপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখে তাঁর কি খেয়াল হল জানি না, তিনি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন। শুনেছি, তিনি নাকি লুকিয়ে সিগারেট খেতেও শিখেছেন, আর সুযোগ পেলে মালীদের হুঁকোতেও দু-এক টান দিতে ছাড়েন না।

বন্ধু গানবাজনার সমজদার কিনা, অথবা 'সন্দেশ' পড়তে পারেন কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু তিনি যে সুগন্ধ জিনিসের কদর বোঝেন, তার পরিচয় অনেক পেয়েছি। তুলোয় করে খানিকটা এসেন্স দিয়ে দেখেছি, সেই তুলোটুকু নাকে ঠেকিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরামে তাঁর দুই চোখ বুজে আসে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে, তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ শুঁকে শুঁকে তারপর তুলোটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দেন, আর থেকে থেকে ফিরে এসে তার গন্ধ শোঁকেন। একবার আমরা তামাসা দেখবার জন্য তুলোয় করে খানিকটা ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়া দিয়েছিলাম। সেটাকে শুঁকে যেরকম অদ্ভুত চোখমুখের ভঙ্গী তিনি করেছিলেন, আর যেরকম করে বারবার হাতে আর রেলিঙে নাক ঘষেছিলেন, সে কথা মনে হলে আজও আমাদের হাসি পায়। একবার শুঁকেও তাঁর কৌতূহল মেটেনি, খুব সাবধানে দূর থেকে আরও দু-চারবার তুলোটাকে শুঁকে, আর দু-চারবার চমৎকার মুখভঙ্গি করে, তিনি সেটাকে তাঁর প্রতিবেশী এক বেবুনের ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সেই হতভাগা বেবুনটাও, কথা নেই বার্তা নেই, তুলোটুকু নিয়েই ঝপ্ করে মুখে দিয়ে ফেলেছে। তারপর যদি তার দুরবস্থা দেখতে! অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাক রগড়িয়ে হাঁচতে হাঁচতে, আর হাঁ করে জিভের জল ফেলতে ফেলতে বেচারা অস্থির।

এই বেবুনটার সঙ্গে ওরাং ওটানের একটুও ভাব নেই। আরেকবার ওরাং আমাদের কাছ থেকে একটা লাঠি আদায় করেছিলেন। লাঠিটা পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাঁর নিশ্চিন্ত প্রতিবেশীর ঘাড়ের উপর এক খোঁচা। তখন যদি বেবুনের রাগ দেখতে! আমরা সেবার দুই খাঁচার মাঝখানে কলা গুঁজে দিয়ে, বেবুন আর ওরাঙের ঝগড়া দেখেছিলাম। বোকা বেবুনটা যতক্ষণে আঁচড় কামড় আর কিল ঘুঁষি চালাতে থাকে, ততক্ষণে ওরাংবাবু গম্ভীরভাবে ঘাড় গুঁজে কলাটুকু বার করে নেন। কলাটি নিয়ে মুখে দিয়ে তারপর তাঁর উল্লাস আর ভেংচি। বেবুনটা রাগে

যতই পাগলের মতো হয়ে উঠতে থাকে, বন্ধুর ততই ফুর্তি বাড়ে।

এসব কথা কিন্তু চুপিচুপি খালি তোমাদের কাছেই বললাম। তোমরা আলিপুরের কর্তাদের কাছে কক্ষনো এসব বল না; তাহলে আমাদের বাগানে যাওয়া মুশকিল হবে।

মানুষ মুখো

বাঁদরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মতো তা দেখলেই বোঝা যায়; বিশেষত ওরাং ওটান শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি বুদ্ধিমান বাঁদরদের চালচলন আর মুখের ভাব দেখলে মানুষের মতো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন বাঁদর আছে তাদের মাথার লোমগুলি দেখলে ঠিক টেরিকাটা মানুষের মাথার মতো মনে হয়, যেন কেউ চিরুনি দিয়ে চুল ফিরিয়ে সিঁথি কেটে দিয়েছে। এক ধরনের বাঁদরের যেরকম গোঁফের বাহার খুব কম মানুষেরই সেরকম আছে। তার বাড়ি আমেরিকায়। ছোট্ট আধ হাত উঁচু বাঁদরটি, কিন্তু ওই গোঁফের জন্যে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ভাব দেখা যায়। এদের রং কাল, হাতে লম্বা লম্বা নখ থাকে, তাই দিয়ে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে খাম্‌চিয়ে ওঠে। এই জাতীয় বাঁদরের নাম টামারিন্‌। এদের সকলের এরকম গোঁফ থাকে না; গুঁফো বাঁদরদের এম্পারার টামারিন্‌ অর্থাৎ সম্রাট টামারিন্‌ বলে। তা সম্রাটের মতো চেহারাই বটে। সম্রাটের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কলা। গুঁফো বাঁদরের পর দাড়িওয়ালা বাঁদর, তার নাম হচ্ছে কাল সাকী। তারও বাড়ি আমেরিকায়। সে দেশের লোকেরা এই বাঁদরকে শয়তান বাঁদর বলে। এরকম অন্যায় নাম দেবার কোনই কারণ পাওয়া যায় না, কারণ এদের মেজাজ যেমন ঠান্ডা, স্বভাবও তেমনি নিরীহ। দাড়ির বহর যতই হোক না কেন, আসলে এরা ভীতুর একশেষ। মানুষের কোন অনিষ্ট করা দূরে থাক, কাছে কোথাও মানুষ আছে জানতে পারলে এরা তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালায়। এদের কোনরকমে পোষ মানান যায় না; ধরে আনলে অতি অল্প দিনের মধ্যে মরে যায়। আর এক জাতের সাকী বাঁদর রয়েছে। তার গায়ের রং খুব হাল্‌কা তাই একে সাদা সাকী বলা হয়। তার চেহারা যেন আরো উদ্ভট গোছের। দাড়িও অন্য রকমের। এইরকমের গালপাট্টা দেওয়া চেহারা আর বিকট ধেব্‌ড়ান মুখ দেখে বুঝবার যো নেই যে, বেচারার স্বভাবটি মোটেও তার চেহারার মতো নয়।

বুড়ো-ধাড়ী সিন্ধুঘোটকদের চেহারাও অনেক সময় খুব মাতব্বর গোছের মানুষের মতো মনে হয়। গোঁফ দাড়ি, মাথায় টাক, সবই বেশ মানিয়ে যায়, কেবল হাতির মতো ওই প্রকান্ড দাঁত দুটোতেই সব মাটি করে দেয়।

পেকারি

'পেকারি' কি জান? দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম শুয়োর আছে তার নাম পেকারি! আমাদের দেশী এক একটা বড় বড় বরাহের কাছে পেকারি যেন কুকুরের পাশে ইঁদুরটা। বেশ বড় একটি পেকারি হয়ত একটি সাধারণ ছাগলের চাইতে বড় হবে না। কিন্তু পেকারিকে ভয় করে না, এমন জানোয়ার সে দেশে কম আছে। তার কারণ, পেকারিরা সব সময় বড় বড় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক একটা দলে এক-এক সময় চল্লিশ-পঞ্চাশটা পর্যন্ত পেকারি থাকতে দেখা যায়।

পেকারির প্রধান শত্রু 'জাগুয়ার'। যতরকম চিতে বাঘ আছে তার মধ্যে এই জাগুয়ারই সব চাইতে বড় আর ভয়ানক। কিন্তু পেকারির দল সামনে পড়লে জাগুয়ার পর্যন্ত মানে মানে পথ ছেড়ে পালায়। একবার একদল সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝোপের মধ্যে থেকে এমনি ভয়ানক ফোঁস্ ফোঁস্ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ আসতে লাগল যে, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে চট্‌পট্ গাছে উঠে পড়লেন। উঁচুতে উঠে তাঁরা দেখেন, একটা ভাঙা গাছের ডালের উপর এক জাগুয়ার চড়ে বসেছে—আর তার চারিদিকে পেকারির দল ভয়ানক গোল বাধিয়ে তুলেছে। জাগুয়ারটা যেখানে বসেছে, ততদূর পর্যন্ত তাদের নাগাল পৌঁছায় না, তাই তারা কেবল রাগের মাথায় ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। আর গাছের গোড়ায় ঢুঁ মারছে। মাঝে মাঝে এক একটা লাফ দিয়ে জাগুয়ারটাকে গুঁতো লাগাবার চেষ্টা করছে। কয়েকটা গাছে উঠতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরকম থেকে জাগুয়ারটার বোধহয় একটু পরিশ্রম হয়েছিল। সে যেই একটু নড়ে বসতে গেছে, অমনি তার একটা পা হড়কিয়ে ঝুলে পড়েছে। যেমন ঝোলা অমনি একটা পেকারি গিয়ে তার উপর তার দাঁত দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে। জাগুয়ারটাও একেবারে ক্ষেপে গিয়ে, এক লাফে পেকারিগুলোকে ডিঙিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু পড়ে আর তাকে উঠতে হল না, মাটিতে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে পেকারির পাল তার উপর পড়ে, তাকে মাড়িয়ে থেঁতলিয়ে গুঁতিয়ে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। জাগুয়ারটা যতক্ষণ বেঁচেছিল, ততক্ষণ সে ধস্তাধস্তি করতে ছাড়েনি। কিন্তু তার উপরে এতগুলো শুয়োর চেপেছিল যে, মাটিতে পড়বার পর আর তাকে চোখেই দেখা যায়নি। শুয়োরগুলি যদি তাকে আর কিছু নাও করত, তবু শুধু চাপের চোটেই মেরে ফেলতে পারত। জাগুয়ারটা মরে যাবার পরেও পেকারিদের রাগ থামেনি। তারা প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত, থেকে থেকে পাগলের মতো তার উপর তেড়ে যাচ্ছিল। তারপর যখন পেকারির দল চলে গেল তখন দেখা গেল এগারোটা পেকারি মরে পড়ে আছে, আর জাগুয়ারের রক্ত চামড়া মাংস আর হাড় চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে।

পেকারিরা যখন শত্রুর সামনে পড়ে, তখন তারা ধনুকের মতো গোল হয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। যদি শত্রু আপনা থেকে সরে পড়ে তবে ভালই; কিন্তু সে যদি

একটুও তেজ দেখাতে চেষ্টা করে, তবে আর রক্ষা নেই। দলকে দল তার উপর পড়ে তাকে আর আস্ত রাখবে না। সেইজন্যে জাগুয়ারেরা কখনও ইচ্ছা করে পেকারির দলকে ঘাঁটাতে চায় না; অথচ পেকারির মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। জাগুয়ার সাধারণত গাছের উপর পাতার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। যদি এক-আধটা পেকারি দল থেকে একটু এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়ে সে এক লাফে তার ঘাড় ভেঙে আবার দৌড়ে গাছের উপর উঠে বসে; সেই সঙ্গে পেকারির দলও একেবারে চিৎকার করতে করতে সেই গাছের চারিদিকে এসে জড়ো হয়। জাগুয়ার ততক্ষণে বেশ একটি উঁচু ডালের উপর হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে থাকে। পেকারির দল সারাদিন কেবল চিৎকার আর দাপাদাপি করুক, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন তারা চলে যাবে, তখন সেও সুযোগ বুঝে সেই আগের মারা পেকারিটাকে খেতে নামবে।

অনেক সময়ে নদীর ধারে কাদার মধ্যে গাছের গুঁড়ির উপর পেকারির দল হুড়োহুড়ি করে খেলে বেড়ায়। সেইখানে কাদামাখা কাঠের চেলার মতো কুমির হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে। সে আবার আমাদের দেশের কুমিরের চাইতেও চট্‌পটে—এই দেখছ মড়ার মতো, এর পরেই হয়ত দেখবে পাঁচ হাত লাফ দিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পেকারির দল এদিক ওদিক ঘুরে-টুরে যখন সেইদিকে আসে, কুমিরও ল্যাজটিকে টান করে ভাবে ‘এইবার সময় এসেছে’। যদি দৈবাৎ এক-আধটা পেকারি খেলতে খেলতে সেই ল্যাজের উপর উঠে পড়ে, তবে আর রক্ষা নেই। নিশ্চয় দেখবে, তার পরের মুহূর্তেই ল্যাজের এক ঝাপটায় পেকারি ভায়া ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠেছেন, তারপর, শূন্যে থাকতে থাকতেই সেই সাংঘাতিক ল্যাজ চাবুকের মতো ছুটে এসে, আবার এক বাড়িতে তাকে কাদার মধ্যে আছাড় মেরে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কি হল, দলের সবাই সেটা ভাল করে বুঝবার আগেই কুমির তার শিকার মুখে নিয়ে আচ্ছা করে ঝাঁকানি দিয়ে জলের মধ্যে নেমেছে। এদিকে পেকারির দল তেড়ে এসে দাঁত উঁচিয়ে তীরের কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটিবার কুমিরের চেহারাটি দেখেই একেবারে চার পা তুলে দে দৌড়। ওই একমাত্র জানোয়ার যার কাছে পেকারির দল ঘেঁষতে সাহস পায় না।

সে দেশের লোকেরা যে পেকারিকে খুব হিসাব করে চলে সহজেই বুঝতে পার। একলা পেলেও কেউ তাকে সহজে ঘাঁটাতে চায় না; কারণ কাছেই তার দলটি আছে কিনা জানবে কি করে? সুতরাং পেকারির সামনে যদি কখন পড়, তবে আর কিছু করবার আগে সুবিধামত একটি গাছের উপর চড়ে সবাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জানোয়ার এঞ্জিনিয়ার

পাখির মধ্যে কাক, আর পশুর মধ্যে শেয়াল—বুদ্ধির জন্য মানুষে ইহাদের প্রশংসা করে। কিন্তু এখন যে জন্তুটির কথা বলিব, তাহার বুদ্ধি শেয়ালের চাইতে বেশি কিনা, সেটা তোমরা বিচার করিয়া দেখ। এই জন্তুর বাড়ি উত্তরের শীতের দেশে—বিশেষত উত্তর আমেরিকায়। ল্যাজশুদ্ধ দুহাত লম্বা জন্তুটি, দেখিতে কতকটা

ইঁদুর বা 'গিনিপিগে'র মতো; তাহার চেহারায় বিশেষ কোন বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাজ যদি দেখ, তবে বুঝিবে সে কত বড় কারিকর। জানোয়ারের মধ্যে এত বড় 'এঞ্জিনিয়ার' আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম বীভার।

মৌমাছির চাক, মাকড়সার জাল, পিঁপড়ার বাসা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারের মধ্যে আমরা খুব কৌশলের পরিচয় পাই—কিন্তু বীভারের বুদ্ধি কৌশল আরও অদ্ভুত। ইহারা বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া নদীর স্রোত আটকাইয়া রাখে, জঙ্গলের বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলে এবং সেই গাছের 'লাকড়ি' বানাইয়া নানারকম কাজে লাগায়। খাল কাটিয়া এক জায়গার জল আরেক জায়গায় নিতেও ইহারা কম ওস্তাদ নয়। এই সমস্ত কাজে ইহাদের প্রধান অস্ত্র বাটালির মতো ধারাল চারটি দাঁত। বড় বড় গাছ, যাহা কোপাইয়া কাটিতে মানুষের রীতিমত পরিশ্রম লাগে, বীভার তাহার ঐ দাঁত দুটি দিয়া সেই গাছকে কুরিয়া মাটিতে ফেলে। যেখানে বীভারেরা পল্লী বাঁধিয়া দলেবলে বসতি করে, তাহার আশেপাশেই দেখা যায় যে অনেকগুলি গাছের গোড়ার দিকে, জমি হইতে হাতখানেক উপরে, খানিকটা কাঠ যেন খাবলাইয়া ফেলা হইয়াছে। এক একটা গাছ প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; আরেকটু কাটিলেই পড়িয়া যাইবে। এ সমস্তই বীভারের কান্ড। গাছটি যখন কাটা হইল তখন তাহাকে ছোট বড় নানারকম টুকরায় কাটিবার জন্য বীভারের দল ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠে। শীতকালে যখন বরফ জমিয়া যায়, যখন চলাফিরা করিয়া খাবার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন বীভারের প্রধান খাদ্য হয় গাছের ছাল। সেইজন্য শীত আসিবার পূর্বেই তাহাদের গাছ কাটিবার ধুম পড়িয়া যায়, এবং তাহারা গাছের নরম বাকল কাটিয়া বাসার মধ্যে জমাইতে থাকে।

বীভারের প্রধান আশ্চর্য কীর্তি নদীর বাঁধ; কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ইহাদের বাসা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জলের ধারে কাঠকুটা ও মাটির ঢিপি বানাইয়া তাহার মধ্যে বীভারেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। এই অদ্ভুত বাসায় ঢুকিবার দরজাটি থাকে জলের নীচে, একটা লম্বা প্যাঁচালো সুড়ঙ্গের মুখে। জলে ডুব মারিয়া ঐ সুড়ঙ্গের মুখটি বাহির করিতে না পারিলে বাসায় ঢুকিবার আর কোন উপায় নাই। বাসার উপরে যে ঢিপির মতো ছাদ থাকে তাহাও দু-তিন হাত বা তাহার চাইতে বেশি পুরু এবং খুবই মজবুত। এক একটা ঢিপি প্রায় পাঁচ, সাত বা দশ হাত উঁচু হয়।

শীত পড়িবার কিছু আগেই তাহারা বাসায় ঢুকিবার একটা নূতন সুড়ঙ্গপথ কাটিতে আরম্ভ করে। এই পথটা একেবারে সোজা আর খুব মোটা হয়—কারণ এইখান দিয়াই তাহারা গাছের ডালপালা আনিয়া শীতকালের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকে। এই সুড়ঙ্গেরও মুখটি থাকে জলের নীচে। প্রত্যেক পরিবারের লোকেরা আপন আপন বাসায় ঢুকিবার পথ জানে এবং প্রত্যেক পরিবার নিজের নিজের খাবার সংগ্রহ করে। কেবল বড় বড় বাঁধ বাঁধিবার সময়ে দুটি চারটি বা আট দশটি পরিবার একত্র হইয়া কাজ করে। মেজের উপর পাতিবার জন্য প্রত্যেক বাসায় কিছু কিছু নরম ঘাসও রাখা হয়। কোন কোন জায়গায় আবার বাসার মধ্যে দেয়াল তুলিয়া ছোটদের ঘর, বড়দের ঘর ইত্যাদি নানারকম আলগা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও দোতলা তিনতলা করিয়াও ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়। খাবার সংগ্রহ হইয়া গেলে অনেক সময়ে বড় সুড়ঙ্গটার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শীতকালে যখন জলের উপরে বরফ জমিয়া যায়, সেই সময়ে বাহির হইবার জন্যও একটা আলগা

সুড়ঙ্গের দরকার হয়। এই সুড়ঙ্গটা থাকে বাসার বাহিরে—ইহার এক মুখ জলের নীচে, আরেক মুখ উঁচু ডাঙার উপরে। জলের নীচে বাসার দরজা দিয়া বাহির হইয়া তারপর এই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকিয়া তবে বীভারেরা বাহিরে আসে।

বীভারের শরীরের গঠন দেখিলেই বোঝা যায় যে জলে থাকা অভ্যাস তাহার আছে। হাঁসের পায়ের মতো চ্যাটালো পা, নৌকার বৈঠার মতো চওড়া চ্যাপ্‌টা ল্যাজ, গায়ের নরম লোমের উপরে আবার লম্বা তেলতেলা লোমের ঢাকনি—এ সমস্তই জলজন্তুর উপযোগী ব্যবস্থা। বাসার কাছে জল না হইলে তাহাদের চলে না, সুতরাং সেখানে যাহাতে বারো মাস যথেষ্ট জল থাকে তাহার জন্য সে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া বড় বড় বিল জমাইয়া ফেলে। আর সেই বিলের ধারে বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। কোথাও বসতি করিবার আগে বীভারেরা দল বাঁধিয়া জায়গা দেখিতে বাহির হয়। যেখানে নদী আছে অথচ স্রোত বেশি নাই, অথবা জল খুব গভীর নয়, সেইরকম জায়গা তাহাদের খুব পছন্দ। জলের ধারে গাছ থাকা চাই আর জায়গাটা বেশ নির্জন চাই, তবেই তাহা ষোলো আনা মনের মতো হয়। দলের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ তাহারা প্রথমত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া জায়গা ঠিক করে; তারপর সকলে মিলিয়া নদীর ধারের আঠাল মাটি আর ছোট বড় লাক্‌ড়ি ফেলিয়া জলের মধ্যে বাঁধ বাঁধিতে থাকে। এক পরত মাটি দিয়া তাহার উপর এক সার লাক্‌ড়ি চাপায়; তাহার উপরে আবার মাটি ফেলিয়া, তাহার উপর ডালপালা শিকড় জড়াইয়া মজবুত করিয়া গাঁথিয়া তোলে। বাঁধ যতই উঁচু হইতে থাকে, নদীর স্রোত বাধা পাইয়া ততই দুইদিকে ছড়াইয়া পড়ে—আর বীভারেরাও সেই বুঝিয়া বাঁধটাকে ক্রমাগতই লম্বা করিতে থাকে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড বিল জমিয়া যায়। অনেক সময়ে জলের বেগ কমাইবার জন্য কাছে কাছে আরও দু-একটা ছোটখাট বাঁধ দেওয়ার দরকার হয়। এ কাজটিও বীভারেরা খুব হিসাবমত বুদ্ধি খাটাইয়া করে।

এ সমস্ত কাজ করিতে হইলে—জলের স্রোত কোনদিকে, কোথায় কতখানি জল ইত্যাদি অনেক বিষয় জানা দরকার। কানাডার এক এঞ্জিনিয়ার সাহেব একটা নদীতে তিন-চারটি বীভারের বাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার উপর ও কাজের ভার থাকিলে তিনি যেখানে যেখানে যেরকম ভাবে বাঁধ রাখা উচিত বোধ করিতেন বীভারেরাও ঠিক সেইসব জায়গায় তেমনিভাবে বাঁধ বসাইয়াছে। এইরকম এক একটি বাঁধ এক-এক সময়ে একশ বা দুইশ হাত লম্বা এবং পাঁচ হাত বা দশ হাত উঁচু হইতে দেখা যায়। একবার এক সাহেব তামাসা দেখিবার জন্য রাত্রে একটা বাঁধের খানিকটা কোদাল দিয়া ভাঙিয়া লুকাইয়া থাকেন। ভাঙা বাঁধের ফাঁক দিয়া হুড়্‌ হুড়্‌ করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল—তাহার শব্দে কোথা হইতে একটা বীভার বাহির হইয়া আসিল—তারপর দেখিতে দেখিতে ৮/১০টি বীভার অতি সাবধানে এদিক ওদিক কান পাতিয়া আস্তে আস্তে বাঁধের কাছে আসিল। তারপর সবাই মিলিয়া খানিকক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সকলে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া গেল এবং দু ঘণ্টার মধ্যেই কাঠ ও মাটি দিয়া বাঁধটাকে মেরামত করিয়া তুলিল। তারপর একটা বীভার তাহার ল্যাজ দিয়া জলের উপর চটাৎ করিয়া বাড়ি মারিতেই সকলে যে যার মতো কোথায় সরিয়া পড়িল আর সারারাত তাহাদের দেখাই গেল না। হঠাৎ ভয় পাইলে বা সকলকে সতর্ক করিতে হইলে বীভারেরা এইরূপ জলের উপর ল্যাজের বাড়ি মারিয়া শব্দ করে। নিস্তব্ধ রাত্রে এই শব্দ পিস্তলের

আওয়াজের মতো শুনায় এবং অনেক সময়ে একটা আওয়াজের পর সকলের জলে ঝাঁপ দিবার চটাপট্ শব্দ অনেক দূর হইতে পরিষ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁধ বাঁধিবার জন্য গাছের দরকার হয়। এই গাছ কাটিয়া বড় বড় লাক্ড়ি বানাইয়া তাহা বহিয়া লওয়া খুবই পরিশ্রমের কাজ। সেইজন্য বীভারেরা এমন জায়গায় বাসা খোঁজে যাহার কাছে যথেষ্ট গাছ আছে। সেই গাছগুলিকে তাহারা দাঁত দিয়া এমনভাবে কাটে যে গাছগুলি পড়িবার সময় ঠিক নদীমুখো হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া অল্প পরিশ্রমেই জলে ভাসাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু গাছগুলি যদি জল হইতে দূরে থাকে অথবা কাছের গাছগুলি যদি সব ফুরাইয়া যায় তাহা হইলে উপায় কি? তাহা হইলে বীভারেরা দস্তুরমত খাল কাটিয়া সেই গাছ আনিবার সুবিধা করিয়া লয়। তাহারা নদীর কিনারা হইতে গাছের গোড়া পর্যন্ত দু হাত চওড়া ও দু হাত গভীর একটি খাল কাটিয়া যায়। তারপর সেই খালে যখন নদীর জল আসিয়া পড়ে, তখন গাছের টুকরাগুলি তাহাতে ভাসাইয়া ঠেলিয়া লইতে আর কোনই মুশকিল হয় না।

এমন যে বুদ্ধিমান নিরীহ জন্তু, মানুষে তাহার উপরেও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, বীভারের গায়ের চামড়াটি বড়ই সুন্দর ও মোলায়েম—সৌখিন লোকের লোভ হইবার মতো জিনিস। সুতরাং এই জন্তুকে মারিয়া তাহার চামড়া বিক্রয় করিলে বেশ দু পয়সা লাভ করা যায়। এই চামড়ার লোভে বিস্তর শিকারী আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ইহাদের মারিয়া উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। মানুষের শখের জন্য কত লক্ষ লক্ষ বীভার যে প্রাণ দিয়াছে তাহার আর সংখ্যা হয় না। এখনও যে ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

গ্লাটন

বীভারের কথা বলিয়াছি কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের কথা বলিতে গেলে আর একটি জন্তুর কথা বলিতে হয় তাহার নাম গ্লাটন। চুরি-বিদ্যায় ফাঁকি-বিদ্যায় খাওয়া-বিদ্যায় এবং নানারকম ধূর্ত-বিদ্যায় ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। শীতের দেশে যাহারা নানারকম দামী চামড়া সংগ্রহের জন্য বীভার প্রভৃতি জন্তু মারিয়া ফেরে তাহারা এই গ্লাটনকে যেমন ভয় করে, এমন আর কাহাকেও নয়। এই গ্লাটন যেখানে দেখা দেয় সেখানে শিকারীর ব্যবসা মাটি। কত কৌশলে কত কষ্ট করিয়া শিকারীরা ফাঁদ পাতে আর গ্লাটন আসিয়া ফাঁদে পড়া জন্তুগুলিকে খাইয়া সব ফাঁদ নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে কখন ফাঁদে পড়িবে না, কিন্তু ফাঁদ নষ্ট করিতে তাহার মতো ওস্তাদ আর নাই। যখনি দেখা যায় ফাঁদগুলিকে টানিয়া ঘাঁটিয়া সব লণ্ডভণ্ড করা হইয়াছে, তখনি শিকারীরা বুঝিতে পারে গ্লাটন আসিয়াছে। এই গ্লাটনকে না মারা পর্যন্ত শিকারীর আর নিস্তার নাই। সে যতদিন থাকিবে ততদিন ফাঁদের সমস্ত শিকার কেবল তাহারই পেটে যাইবে। ফাঁদকে সে গ্রাহ্য করে না, কারণ ফাঁদের মর্ম সে ভাল করিয়াই জানে। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফাঁদ বাহির করে আর ফাঁদের সুতা কাটিয়া স্প্রিং সরাইয়া কাঠি নড়াইয়া তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া রাখে।

সুতরাং শিকারীরা অনেক সময়েই সে স্থান ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়া আবার নূতন করিয়া ফাঁদ পাতিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও সকল সময়ে নিস্তার নাই; কারণ শিকারীর ফাঁদ হইতে শিকার চুরি করিয়া খাইবার সহজ সুযোগটা ইহারা ছাড়িতে চায় না। তাই একবার কোন শিকারীর সন্ধান পাইলে ইহারা তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, গোপনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করে।

একবার একটা গ্লাটন প্রায় একমাস ধরিয়া এক শিকারীকে এইরকম জ্বালাতন করিয়াছিল। শিকারী প্রতিদিন পশমী নেউল ধরিবার জন্য ঝোপের মধ্যে দশ বিশটা করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখিত, আর প্রতিদিনই আসিয়া দেখিত চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ আর ফাঁদগুলি ভাঙা। তাহাতে দু-চারটি শিকার যাহা ধরা গিয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু টুকরা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। নানারকম কায়দা করিয়া নানারকম নূতন ফাঁদ বসাইয়াও সেই একইরকম ব্যাপার চলিতে লাগিল। তখন শিকারী নেউল ছাড়িয়া গ্লাটন ধরিবার ফাঁদ বসাইল। একটা ঝোপের মধ্যে দরজার মতো খানিকটা ফাঁক, তাহার পিছনে একটা কাঠির আগায় মাংস গাঁথা। সেই মাংস খাইতে গেলেই কাঠিতে টান পড়ে আর স্প্রিং ছুটিয়া আপনা হইতেই দরজা আটকাইয়া যায়। কিন্তু গ্লাটন তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয়। দরজাটি দেখিয়াই সে আর সে-মুখো হয় নাই—সে ঘুরিয়া ঝোপের পিছন দিক হইতে কাঠ সরাইয়া কাঠিশুদ্ধ মাংসটাকে বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর শিকারী খোলা বরফের উপর একটুকরা মাংস বসাইয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা সুতা দিয়া একটা বন্দুক এমন কৌশলে আটকাইয়া দিলেন যে মাংসটাকে খাইতে গেলেই সুতায় টান পড়িয়া বন্দুক ছুটিয়া যায়। বন্দুকটা একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকান। পরের দিন শিকারী গিয়া দেখে যে মাংসের চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ, কিন্তু সে মাংসটুকু ছোঁয় নাই। শিকারী আরো বেশি মাংস দিয়া ভাবিল, অমন পেটুক জন্তু কি আর মাংসের লোভ সামলাইতে পারে? পরদিন সকালে দেখা গেল মাংসও খাইয়াছে, বন্দুকও ছুটিয়াছে কিন্তু গ্লাটন মরে নাই। সে গাছের গুঁড়ির আড়ালে থাকিয়া সুতা টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। তাহাতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধহয় সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল কিন্তু পায়ের দাগ দেখিয়া বোঝা যায় যে সে পরে আবার আসিয়া মাংসটা খাইয়া গিয়াছে। তখন শিকারীর জেদ চড়িয়া গেল। সে ভাবিল যেমন করিয়া হউক এই হতভাগাটাকে মারিতেই হইবে। এই ভাবিয়া সে মাটিতে মাংস রাখিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে বন্দুক হাতে করিয়া একটা গাছের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু সে রাত্রে আর গ্লাটনের দেখাই পাওয়া গেল না। শীতের রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া শিকারী যখন তাহার কাঠের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে তাঁবুর জিনিসপত্র সব উলটপালট, আর অনেক জিনিস চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁবুর বাহিরে কেবল গ্লাটনের পায়ের দাগ। তারপর অনেক কষ্টে চারিদিকে নানা স্থান হইতে চোরাই জিনিস সব সংগ্রহ করিয়া শিকারী সেই যে সেখান হইতে একেবারে সরিয়া পড়িল, ত্রিশ মাইল পথ পার না হইয়া আর নূতন ফাঁদ পাতিল না।

গ্লাটনের নামে এই দুটি মস্ত অপবাদ—সে চোর এবং পেটুক। সে যে পেটুক তাহার আর অন্য প্রমাণ দরকার নাই—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে ইংরাজিতে 'গ্লাটন' (Glutton, কথাটার অর্থই হয় পেটুক। দেখিতে কতকটা শেয়ালের মতো, চেহারাটও তাহার চাইতে বড় নয়; কিন্তু সে যে পরিমাণ আহার করে তাহাতে একটা বাঘেরও বেশ পরিতোষ করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে। আর চোর হওয়ার কথাটা ত আগেই

শুনিয়াছ। সে যে কিরকম চোর তাহা চুরির নমুনাতেই বোঝা যায়। যে জিনিস সে খায় না, যাহার ব্যবহার সে জানে না এবং যে জিনিসে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন সব জিনিসও সে সুযোগ পাইলেই সরাইয়া ফেলে। ছাতা জুতা টুথব্রাশ কাগজ কলম হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি বা উনানের লোহার শিক পর্যন্ত চুরি করিতে সে ইতস্তত করে না।

গ্লাটনের আর একটি অভ্যাস আছে, সেও কম অদ্ভুত নয়। হঠাৎ মানুষ বা অপরিচিত জন্তুকে দেখিলে সে খাড়া হইয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া বসে এবং সামনের পা দুখানা চোখের উপরে এমনভাবে উঠাইয়া ধরে যে দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন ভাল করিয়া পরখ করিবার জন্য চোখটাকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরকম বুদ্ধি আর এইসব অদ্ভুত রকম-সকম দেখিয়া সে দেশের লোকে অনেক সময়ে ভয় পায়—তাহারা বলে এই জন্তুটার চালচলন কেমন ভূতের কাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

নরওয়ে দেশে ভালুক বা নেকড়ে বাঘ মারিতে পারিলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, গ্লাটন মারিলেও ঠিক সেই পুরস্কার। ইহাতে বুঝিতে পার যে এই ছোট জন্তুটির অত্যাচারকে মানুষে কিরকম ভয় করে।

ঘোড়ার জন্ম

তোমরা সকলেই জান যে এমন সময় ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু গাছপালা কোথাও কিছু ছিল না। তখন এই পৃথিবী তপ্ত কড়ার মতো গরম ছিল—বৃষ্টির জল তাহার উপর পড়িবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। তারপর যখন পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাহাতে অল্প অল্প গাছপালা জীবজন্তু দেখা দিতে লাগিল।

জীবজন্তু আসিবার অনেক হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষের কোন অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। আজকাল আমরা যে-সকল জানোয়ার সচরাচর দেখিতে পাই—এগুলিও সব 'আধুনিক' কালের—অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীনকালের জানোয়ারেরা সকলেই এখন লোপ পাইয়াছে। সকলে কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই; যদি পাইত তবে এখন পৃথিবীতে এসব জীবজন্তুর কিছুই দেখিতাম না। এখনকার এইসকল জানোয়ারগুলি সকলেই প্রাচীনকালের কোন না কোন জানোয়ারের বংশধর। এই যে অতি সভ্য অতি বুদ্ধিমান মানুষ, ইহার বংশের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই তবে এমন জায়গায় গিয়া পড়িব যেখানে মানুষকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার যো থাকিবে না।

এমনিভাবে প্রত্যেক জানোয়ারের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই—প্রাচীনকালের পাহাড়ের স্তরে তাহাদের যে-সকল কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়, সে সকল পরীক্ষা করিয়া দেখি—তবে প্রত্যেকের বেলায় এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে-সকল জানোয়ার ছিল, তাহারা সকলেই ত আর আপন আপন কঙ্কালচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—যে-সকল কঙ্কাল পাহাড়ের মধ্যে আজও জমিয়া আছে, তাহারও অতি অল্পই মানুষের চোখে পড়িয়াছে। সেইজন্য সকল জন্তুর পূর্বপুরুষের হিসাব এখনও ভাল করিয়া পাওয়া যায় নাই। দুটা একটা যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতেই কতকটা স্পষ্ট দেখা

যায়, কতকটা অনুমান করিয়া বুঝিতে হয়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সেই যুগের এক একটা জানোয়ার এই যুগের কুকুর বেড়াল গরু হরিণে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন কঙ্কাল হইতে যত জানোয়ার-বংশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঘোড়ার ইতিহাস আমরা যেমন জানি এমন আর কাহারও নহে। আমেরিকার 'রকি' পাহাড়ে অনেক জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়। কয়েকজন পণ্ডিত চৌদ্দ বৎসর ক্রমাগত সন্ধান করিয়া সেখানে নানা প্রাচীন যুগের প্রায় আটশত ঘোড়ার কঙ্কাল বাহির করিয়াছেন। 'ঘোড়া' বলিলাম বটে কিন্তু তাহার অনেকগুলিকেই সহজে ঘোড়া বলিয়া চিনিবার যো নাই।

সবচাইতে পুরাতন যেটি, তাহার নাম 'ইয়োহিপপাস' (Eohippus) বা 'আদি অশ্ব'। দেখিতে একটি ছোট ছাগলছানার চাইতে বড় হইবে না—পায়ে তার চারটি করিয়া আঙুল বা খুর—আর একটা পঞ্চম আঙুলের চিহ্ন প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। দেখিলে কে বলিবে যে এই জন্তুই ঘোড়ার পূর্বপুরুষ? কিন্তু সবগুলি কঙ্কাল মিলাইয়া যুগ হিসাবে পরপর সাজাইয়া দেখ, ঘোড়ার জন্মের ইতিহাস যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছাগলছানার মতো ছোট জন্তুটি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ ক্রমে বড় হইল, কেমন করিয়া ক্রমে তাহার চেহারা অল্পে অল্পে বদলাইয়া আসিল, কেমন করিয়া নিত্য নূতন অবস্থার মধ্যে তাহার শরীরের নিত্য নূতন পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে সেই যুগের 'আদি অশ্ব' এই যুগের আধুনিক ঘোড়ায় পরিণত হইল, তাহার জীবন্ত চিত্র পাথরের গায়ে কঙ্কালের লেখায় লিখিত রহিয়াছে।

বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের গড়ন মজবুত হইয়া আসিয়াছে—তাহার সমস্ত শরীরটা দ্রুত দৌড়িবার উপযোগী হইয়াছে। যে দৌড়াদৌড়ি করে, যাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। সুতরাং দেহের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ খাদ্য চিবাইবার উপযোগী দাঁত তাহার থাকা চাই। তাহার চোয়ালের হাড়ও ক্রমে সেইরূপ মজবুত হওয়া দরকার। এইসকল কঙ্কালের দাঁত ও মাথার হাড় পরীক্ষা করিলেও ঠিক এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সকলের চাইতে চমৎকার তাহার খুরের ইতিহাস। আদিকালের সেই পাঁচটি আঙুল কেমন করিয়া এই যুগে একটা ভোঁতা খুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাবে এইসকল কঙ্কালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আদি অশ্বের' সময়েই পাঁচ আঙুলের একটি প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছিল; তারপর ক্রমে আর একটি আঙুলও লোপ পাইল—বাকী রহিল মাত্র তিনটি। সংখ্যায় কমিল বটে, কিন্তু মাঝের আঙুলটি ক্রমে মোটা হইয়া লুপ্ত আঙুলগুলির অভাব দূর করিয়াছে। পাশের আঙুল দুটা ক্রমেই ছোট হইয়া অনেকদিন পর্যন্ত হাড়ের টুকরার মতো পায়ের দু পাশে লাগিয়াছিল। তারপর এখনকার ঘোড়ার পায়ে ওই একটা আঙুলই সবটুকু স্থান দখল করিয়াছে—তাহাকে আর এখন আঙুল বলা চলে না।

কোন সময় হইতে মানুষ ঘোড়াকে বশ মানিতে শিখাইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। অতি প্রাচীন যুগের আদিম মানুষ যাহারা বনে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে বাস করিত, তাহাদের শেষ চিহ্নের আশেপাশে লোমশ গণ্ডার, অতিকায় হস্তী, খড়্গদন্ত ব্যাঘ্র ও গুহা ভল্লুক প্রভৃতি জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন আজও পাওয়া যায়। ঘোড়ার ঐ তিন আঙুলওয়ালা পূর্বপুরুষদের কেহ যে মানুষের কাজে লাগে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

সেকালের বাঘ

সেকালে এমন সব জন্তু ছিল যা আজকাল আর দেখা যায় না—এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেকালের চার দাঁতওয়ালা হাতি, ত্রিশ হাত লম্বা কুমির বা হাঁসুলি-পরা তিন শিঙা গণ্ডার, এর কোনটাই আজকাল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে গুহা গহ্বরে পাহাড়ের গায়ে বা বরফের নীচে, তাদের কঙ্কালের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়—তা থেকেই পণ্ডিত লোকে বুঝতে পারেন যে, এক সময়ে এই-এইরকম জানোয়ার পৃথিবীতে ছিল। যাঁরা এইসকল জিনিসের চর্চা করেন, তাঁরা সামান্য একটুকরা দাঁত দেখে বলতে পারেন—এটা কি রকম জন্তুর দাঁত, সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, ইত্যাদি।

এবার যে জানোয়ারের কথা বলছি ইংরাজিতে তাকে বলে Sabre-toothed Tiger (অর্থাৎ খড়্গদন্ত বাঘ)। এর কঙ্কাল ইউরোপে, আমেরিকায়, আমাদের দেশে এবং আরও নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। এই খড়্গের মতো দাঁত দুটিতে তার কি কাজ হত, সে কথা বলা বড় শক্ত। অত লম্বা দাঁত দিয়ে কামড়াবার সুবিধা হয় না: তাছাড়া, এই বাঘের চোয়ালের হাড় আজকালকার বাঘের মতো মজবুত নয়, সুতরাং তার কামড়ের জোরও কম ছিল। দাঁত দুটি প্রায় ছয় ইঞ্চি করে লম্বা, তার গায়ে ছুরির মতো ধার—হয়ত তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শিকারের মাংস ছাড়াবার সুবিধা হত। যে জন্তু যে-রকম স্থানে যে-রকম অবস্থায় বাস করে সে অনুসারে তার চেহারা ও গায়ের রং কিছু না কিছু বদলিয়ে আসে। বাঘের গায়ে যে কালো কালো দাগ দেখতে পাও তাতেই বুঝতে পারা যায় যে, ঝোপ জঙ্গলে চলাফিরা তার অভ্যাস আছে- সেখানে বড় বড় ঘাসের ঝোপে যখন বাঘমশাই লুকিয়ে থাকেন তখন সেই খাড়া ঘাসের আলো-ছায়ার সঙ্গে বাঘের হলদে-কালোর ডোরাগুলি এমনিভাবে মিশিয়ে যায় যে হঠাৎ দেখলে বুঝবার যো নেই যে ওখানে ঝোপ ছাড়া আর কিছু আছে। কিন্তু যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয় আমাদের খড়্গদন্ত মহাশয় সিংহের মতো খোলা জায়গাতেই সাধারণত বাস করতেন—সুতরাং তাঁর গায়ে একালের বাঘের মতো দাগ না থাকাই সম্ভব বোধ হয়।

একালের বাঘের চাইতে খড়্গদন্তের মুখখানা অনেকটা লম্বাটে গোছের ছিল। তার লেজটিও সাধারণত একটু বেঁটে হত। শরীরের গড়নটা মোটের উপর আজকালকার বাঘেরই মতো, কিন্তু একটু ভারি গোছের—বিশেষত সামনের পায়ের দিকটা। সুতরাং তার পক্ষে খুব দৌড়ান বা লাফান বা চট্‌পট্ হাত পা নাড়া বড় সহজ ছিল না। নানান যুগের নানানরকম পাথরে এই বাঘের কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, এরা বহুকাল ধরে পৃথিবীতে নানা দেশে দৌরাত্ম্য করে তারপর কেন জানি না একেবারে লোপ পেয়েছে।

সেকালের বাদুড়

'সেকালের জন্তু'র কথা বলিলেই একটা কোন কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের চেহারা মনে আসে। যে-সকল জন্তু এখন দেখিতে পাই না, অথচ যাহার কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি যে সে এককালে পৃথিবীতে ছিল, তাহার চেহারা ও চালচলন সম্বন্ধে স্বভাবতই কেমন একটা কৌতূহল জাগে। তাহার উপর যদি তাহার মধ্যে কোন অদ্ভুত বিশেষত্বের পরিচয় পাই, তবে ত কথাই নাই।

সেকালের 'বাদুড়' লিখিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিলে সবসময় বাদুড় বলিয়া চিনিবে কিনা সন্দেহ। কারণ, সে সময়ের এক একটা জন্তুকে আজকালকার কোন নামে পরিচিত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। মনে কর একটা জন্তু, তার সাপের মতো গলা, কচ্ছপের মতো পিঠ, কুমিরের মতো দাঁত, তিমির মতো ডানা আর গিরগিটির মতো মাথা—তখন তাহাকে কি নাম দিবে? সেইজন্য বাদুড় বলিতে খুব সাবধানে বলা দরকার—যেন আজকালকার নিরীহ চামচিকা গোছের কিছু একটা মনে করিয়া না বস।

আজকাল যে-সকল বাদুড় দেখিতে পাও তাহাদের চেহারা ও চালচলনের মধ্যে কত তফাৎ! কোনটার কান খরগোশের মতো লম্বা, কোনটার কান ইঁদুরের মতো গোলপানা, কোনটার মুখ শেয়ালের মতো, কোনটার মুখ ভেংচিকাটা সঙের মতো, কারও নাক পদ্মফুলের মতো ছড়ান, কারও নাক নাই বলিলেও হয়। কিন্তু সেকালের যে জানোয়ারগুলাকে বাদুড় বলিতেছি তাহাদের মধ্যে আরও অদ্ভুত রকমারি দেখা যাইত। এক একটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বাদুড় পাখি আর কুমিরে মিলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছে। এগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় টেরোড্যাক্টাইল (Pterodactyl) অর্থাৎ যাহার আঙুলে পাখা।

পাহাড়ের গায়ে যেসব পাথরের স্তর থাকে তাহারা চিরকালই পাথর ছিল না। অনেক পাথর এক সময় মাটির মতন নরম ছিল। সেই নরম মাটিতে জানোয়ারের কঙ্কাল জমিয়া অনেক সময়ে একেবারে পাথর হইয়া থাকে—এইরকম পাথরকে এক কথায় জীবশিলা বলা যাইতে পারে। এক সময় ছিল যখন পৃথিবীতে পাখি বা বাদুড় কিছুই দেখা যায় নাই—তখন সরীসৃপের যুগ ছিল। অদ্ভুত কুমির বা গোসাপ তখন ভয়ংকর মূর্তি ধরিয়া পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করিত। সেই অতি প্রাচীন যুগের পাথরে এ সকল বাদুড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না—যা কিছু পাওয়া যায় সবই আরও আধুনিক যুগের। 'আধুনিক' বলাতে মনে করিও না যে মাত্র কয়েক শত বা সহস্র বৎসরের কথা বলিতেছি—সে 'আধুনিক' যুগ কয় লক্ষ বৎসর আগেকার তাহা আমি জানি না।

যতরকম 'বাদুড়' পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সব চাইতে পুরাতনটি যে মাংসাশী ছিলেন, ইঁহার দাঁতের মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছে 'ডাইমর্ফোডন' (Dimorphodon) অর্থাৎ দ্বিমূর্তিদন্তী।

সবগুলি বাদুড়ই যে প্রকাণ্ড বড় হইত তাহা নহে, কিন্তু সব চাইতে বড়গুলি

যে খুবই বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় যে-সকল বাদুড়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার এক একটি ডানা মিলিলে ২৫ ফুট চওড়া হয়। ইহাদের মাথার উপরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড শিং ছিল। এই শিংটা তাহার কি কাজে লাগিত তাহা জানি না, কিন্তু ইহাতে তাহার বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোন উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এত বড় জন্তুটা উড়িলে পরে তাহার ডানা ঝাপটাইবার শব্দ নিশ্চয়ই বহুদূর হইতে শোনা যাইত। ইহারা কোনরূপ শব্দ করিত কিনা বলিতে পারি না কিন্তু আওয়াজ করিলে সেটা খুব সুমিষ্ট হইত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহাদের মুখে নাকি দাঁত থাকিত না কিন্তু তাহাতেও আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না, কারণ ইহার যে ঠোঁট ছিল তাহাতে সাংঘাতিক ধার! সুতরাং তাহার ঠোকর দু-একটা খাইলে আর বেশি খাইবার দরকার হইত না। মোট কথা, এ জন্তুটা যে সেকালেই লোপ পাইয়াছে এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

তিমির খেয়াল

রুশিয়ার দুরন্ত শীতে মানুষ যখন নির্জন পথে চলাফিরা করে তখন অনেক সময় নেকড়ে বাঘের পাল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহারা যে বন্ধুভাবে চলে না, তা অবশ্য বুঝিতেই পার। তাহাদের দূরে রাখিবার জন্য মানুষে অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক লইয়া পথে বাহির হয় এবং পারতপক্ষে একলা কেহ সে সকল পথে যাওয়া আসা করিতে চায় না।

সমুদ্রের পথে যখন বড় বড় জাহাজ চলাফিরা করে তখনও অনেক সময় দেখা যায়, তাহাদের আশেপাশে নানা জাতীয় মাছ ও হাঙর ঘুরিয়া বেড়ায়। জাহাজ হইতে কত জিনিস কত সময়ে জলে ফেলা হয়, তাহার মধ্যে তরকারির খোসা, মাংসের বা হাড়ের টুকরা, নষ্ট খাবার প্রভৃতি কিছু জলে পড়িবামাত্র তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া সব খাইয়া ফেলে। ঐ খাবারের লোভেই তাহারা জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

কেবল মাছ কেন, কত পাখিকেও অনেক সময় দেখা যায় মাঝসমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল উড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের অনেকে আসে কেবল কৌতূহল মিটাইবার জন্য, অনেকে আসে খাইবার লোভে অথবা বিশ্রামের আশায়। কিন্তু খামখা বিনা কারণে কেহ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে না।

কিন্তু নিউজিল্যান্ডের উপকূলের কাছে এক জায়গায় ছোটখাট—অর্থাৎ মোটে বারো হাত লম্বা একটি তিমি আছে, তাহার বাড়ির কাছ দিয়া যত জাহাজ চলাফিরা করে সকলের সঙ্গেই সে আত্মীয়তা করিতে আসে। এইরকম সে কত বছর করিয়া আসিতেছে, কেন করে তাহা কেহ জানে না। জাহাজ হইতে যে-সকল খাবার জিনিস জলে ফেলা হয় তাহার কোনটাই তাহার খাদ্য নয়—জাহাজের লোকেদের দ্বারা তাহার কোনরকম উপকার হওয়াও সম্ভব নয়—অথচ সে প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে একবার খানিক দেখা না করিয়া ছাড়ে না। শুধু দেখা নয়, আধ ঘণ্টাখানেক অনায়াসে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে চলে যেন সে জাহাজকে পথ দেখাইয়া লইতে চায়। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে গা ঘষিয়া আর ঢেউয়ের ফেনায় ডিগবাজি খাইয়া সে নানারকমে

মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

সেখানকার নাবিকেরা সকলেই এই অদ্ভুত তিমির কথা জানে। তাহারা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছে 'পেলোরাস্ জ্যাক্'—'পেলোরাস্' ওই জায়গাটার নাম। এই তিমির সম্বন্ধে সে দেশে অনেকরকম অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। একবার নাকি কোন্ জাহাজ হইতে কে একজন লোক 'জ্যাক'কে গুলি করিয়াছিল—তারপর অনেকদিন তাহাকে দেখা যায় নাই। আবার সে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই জাহাজটার কাছে আর কখনও আসে নাই। নিউজিল্যান্ড মাওরিদের দেশ—তাহারা এই তিমিকে দেবতার মতো ভক্তি করে। এমনকি সে দেশের গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত ইস্তাহার দিয়া সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, কেহ যেন 'জ্যাকে'র কোনরকম অনিষ্ট না করে।

তিমির ব্যবসা

কথায় বলে 'ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়'। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জার্মানরা যখন পারিস সহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল তখন পারিসের লোকেরা খাবারের অভাবে ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হয়। তাহার আগে ইউরোপের লোকে ঘোড়ার মাংস খাইত না। কিন্তু এই সময় হইতে দেখা গেল যে ঘোড়ার মাংসটা খাইতে লাগে মন্দ নয়। এখন শুধু পারিসে নয়, ইউরোপের অন্যান্য বিস্তর সহরেও লোকে সখ করিয়া ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। তাহার জন্য আর 'ঠেলায় পড়িবার' দরকার হয় না।

এখন যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতেও খাদ্য সমস্যা একটা মস্ত সমস্যা। চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ লোক এক-এক দিকে যুদ্ধ করিতেছে, কেবল তাহাদের খাওয়া যোগাইলেই নিশ্চিন্ত হইবার যো নাই—সমস্ত দেশের লোক কি খাইবে, কি পরিবে, তাহার ভাবনাও প্রত্যেক দেশের শাসনকর্তাদের ভাবিতে হয়। ইউরোপের খাওয়া জোগাইবার ভার এখন অনেক পরিমাণে আমেরিকার উপরে পড়িয়াছে। ইউরোপের জাতিরা মাংসখোর জাতি, প্রতি বৎসর তাহারা লক্ষ লক্ষ মণ মাংস খাইয়া শেষ করে। এত মাংস চালান দেওয়া কি কম কথা? বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে যে সব খাবার জিনিস চালান আসে জার্মান জলদস্যু ডুবুরি জাহাজ সেইগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতেও কত খাবার সমুদ্রে ডুবিয়া নষ্ট হয়।

আমেরিকার বুদ্ধিমান লোকে এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন বড় চমৎকার। তাঁহারা তিমির মাংস প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যেই আমেরিকার নানা স্থানে এই মাংসের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে—তিমি ধরিয়া তাহার মাংস চালান দিবার জন্য বড় বড় কারখানা বসিয়াছে। তাহার একটিমাত্র কারখানা হইতে বছরে ৯০০০ মণ মাংস টিনে ভরিয়া চালান দেওয়া হয়। নূতন কোন খাওয়ার অভ্যাস মানুষ সহজে ধরিতে চায় না, সেইজন্য আমেরিকার একদল লোকে বক্তৃতা করিয়া, কাগজেপত্রে লিখিয়া, বায়োস্কোপে ছবি দেখাইয়া এ বিষয়ে মানুষের মনের বিরোধ ভাঙিতেছেন। আমেরিকার কোন কোন সহরে প্রকাশ্য বাজারে দশ আনা সেরে তিমির মাংস বিক্রয় হইতেছে।

গরু ঘোড়া শূকর কিছুতেই যাহাদের আপত্তি নাই তাহারা যে তিমি খাইতে বেশি দিন আপত্তি করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ইহার মধ্যেই ও জিনিসটা খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—চমৎকার মাংস! ইউরোপের বাজারে ইহাকে গো-মাংস বলিয়া চালাইলেও কেহ কোন তফাৎ বুঝিবে কিনা সন্দেহ।

সবরকম তিমির মাংস খাইতে ভাল নয়। যেগুলি বিশেষভাবে খাওয়ার উপযোগী সেগুলি সাধারণ ছোটখাট তিমি—অর্থাৎ মোটে ২০/২৫ হাত লম্বা! মোম তিমি বা sperm whale লম্বায় খুব বড় হয়—এক একটা ৬০ হাত পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। সব চাইতে বড় যে তিমি সেগুলি থাকে একেবারে উত্তরে, মেরু সমুদ্রের কাছে—তাহারা লম্বায় মোম তিমির সমান, কিন্তু অনেকখানি চওড়া ও মোটা এবং ওজনেও প্রায় দেড়া। এক একটি বড় তিমির ওজন চার হাজার মণেরও বেশি হয়—অর্থাৎ ত্রিশ চল্লিশটা বড় বড় হাতির সমান। এই সমস্ত অতিকায় তিমি আগে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দেখা যাইত, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ ক্রমে প্রায় উজাড় হইয়া আসিতেছে।

তিমি নানারকমের হয়—তাহাদের মোটের উপর দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের দাঁত নাই, আর এক দলের দাঁত আছে। যেগুলার দাঁত নাই তাহাদের মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড চিরুনির ঝালরের মতো একটা জিনিস থাকে, তাহাকে বলে কাচকড়া বা whale bone। এই জিনিসটা মানুষের অনেক সৌখিন কাজে লাগে এবং বাজারে বিক্রয় করিলে বেশ দামও পাওয়া যায়। তাছাড়া এক একটা তিমির গায়ে যে পরিমাণ তেল বা চর্বি থাকে তাহার দামও বড় সামান্য নয়। যে মোম তিমির কথা আগে বলিয়াছি তাহার মুখে কাচকড়া নাই কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভরা মোম থাকে! এই মোমের চমৎকার বাতি হয় এবং নানারকম মলম প্রভৃতি হয়। এই মোম চর্বি ও কাচকড়ার জন্য মানুষে সমুদ্রের নানা স্থানে বড় বড় তিমিগুলিকে নিঃশেষ করিয়া এখন ছোটখাট তিমির পিছনে লাগিয়াছে।

যেসব 'ছোটখাট' তিমির কথা বলা হইল, তাহাদের এক একটাকে মারিলে প্রায় তিন-চারশত মণ মাংস পাওয়া যায়। আজকাল তিমির ব্যবসা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু গত দুই বৎসরে কেবল উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলেই বার শতের বেশি তিমি মারা হইয়াছে। এখন এ ব্যবসায়ে আরও লাভ হইবার কথা, কারণ এখন হইতে তিমির হাড় মাংস চর্বি চামড়া সমস্তই কাজে লাগান চলিবে। এতকাল চর্বি ও কাচকড়া বাহির করিবার পর অত বড় প্রকাণ্ড দেহটাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তাহাতে কেবল হাজার হাজার জলজন্তুর খোরাক জুটিত। কিন্তু এখন সেই মাংসে মানুষের উদরপূর্তি হইবে। এইরূপ একটা তিমিকে মারিলে স্বচ্ছন্দে বিশ ত্রিশ হাজার লোকের ভোজের আয়োজন হইতে পারে। তারপর কঙ্কালটুকুও ফেলিবার জিনিস নয়—তাহাকে পোড়াইয়া চমৎকার জমির সার ও নানারকম ঔষধ তৈয়ারি হইবে। চামড়াটায় চর্বি ভরা বলিয়া তাহাকে অনেকদিন পর্যন্ত কাজে লাগাইবার সুবিধা হয় নাই—এখন তিমির ছাল কলে পিষিয়া চর্বি বাহির করিয়া চমৎকার মজবুত চামড়া তৈয়ারি হইতেছে। সুতরাং মানুষের মতো এ-হেন অত্যাচারী রাক্ষসের হাত এড়াইবার জন্য তিমি গভীর সমুদ্রে পলাইয়া হয়ত এখনও বাঁচিতে পারে—না হইলে তাহার বংশ লোপ হওয়ার খুবই আশঙ্কা আছে।

এত বড় প্রাণীটা, কিন্তু মোটের উপর তাহার স্বভাবটি বেশ নিরীহ বলিতে

হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় তিমির দল সমুদ্রের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে; তাহাদের একটাকে মারিলে বাকীগুলা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে। তখন একটার পর একটাকে বল্লমে গাঁথিয়া দলকে-দল মারিয়া ফেলা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সব তিমি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কোন কোন দাঁতওয়ালা তিমি আছে, তাহাদের মেজাজটা দস্তুরমত বদরাগী। এ বিষয়ে মোম তিমির দুর্নাম সব চাইতে বেশি। মাঝে মাঝে এক একটা দলছাড়া মোম তিমি দেখা যায়, তাহাদের ঘাঁটাইবার দরকার হয় না—জাহাজ দেখিলেই তাহারা তাড়া করিয়া যায়। তিমির তাড়া যে কেমন তাড়া, সে তাড়া যে খাইয়াছে সেই জানে। কখন সে ঢুঁ মারে, কখন সে হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে, কখন তাহার গায়ের ধাক্কায় জাহাজ চুরমার হয়—অথবা লেজের ঝাপটায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে, এই ভয়ে মাঝি-মাল্লা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যাহাদের 'নিরীহ তিমি' বলি, তাহারাও যখন মরিবার সময় সমুদ্র তোলপাড় করিয়া ছট্‌ফট্‌ করে তখন সেও একটা কম সাংঘাতিক ব্যাপার হয় না।

তিমির খাওয়ার মধ্যেও রকমারি দেখা যায়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারা সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক খাইয়া বেড়ায়। এক একবার হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁক শুদ্ধ সমুদ্রের জল মুখের ভিতর পুরিয়া লয়; তারপর সেই কাচকড়ার ঝালরের ভিতর দিয়া সেই জল ফুঁকিয়া বাহির করে—মাছগুলা সব এই অদ্ভুত ছাঁকনিতে আটকাইয়া থাকে। ইহাদের গলার ফুটা এত ছোট যে নিতান্ত পুঁটি বাটা ছাড়া কোন বড় মাছ গেলা ইহাদের সাধ্য নয়। কিন্তু দাঁতাল তিমিরা এরকম খুচরা খাইয়া সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা বড় বড় সমুদ্রের জন্তুকে মারিয়া খায়। মোম তিমিরা এক মাইল গভীর সমুদ্রে ডুব মারিয়া সেখানকার বড় বড় বিদ্‌ঘুটে জন্তুগুলাকে খাইতে ছাড়ে না। একবার একটা তিমির পেটে একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাসের কিছু কিছু টুকরা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার এক একটি পা হাতির পায়ের সমান মোটা! সে জন্তুটা যে আট দশটা হাতির সমান বড় ছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

'তিমি মাছ' যে আসলে মাছই নয়, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের এক একটি ছানা হয় ঘোড়ার মতো মস্ত; তাহারা জন্মিয়া মায়ের দুধ খায়। মাছ যেমন অনায়াসে জলের নীচে ডুবিয়া থাকে—তিমি সেরকম পারে না। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে বার বার জলের উপরে উঠিতে হয়। কখন কখন জোরে নিশ্বাস ছাড়িবার সময় তাহার নাক হইতে গরম বাতাসের ঝাপটা ছুটিয়া সমুদ্রের উপর জলের ফোয়ারা উঠিতে থাকে। তাহা দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে—ঐখানে তিমি।

রাক্ষুসে মাছ

বড় বড় কুমির হাঙর, তারাই জ্যান্ত মানুষ খায় আমরা ত এই জানি। এক হাত লম্বা নদীর মাছ, তারা যে আবার জানোয়ার দেখলে কামড়ে ধরে এমন কথা ত শুনিনি। আমাদের দেশের নদীতে ত এমন রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এমাজন নদীর আশেপাশে এরকম মাছ দেখতে পাওয়া যায়।

সে জায়গায় মানুষ যদি জলে নামে, তবে তাকে আধ মিনিটও জলে থাকতে হয় না, তার মধ্যেই মাছেরা তাকে কামড়িয়ে এমন রক্তারক্তি করে দেয় যে তাকে প্রাণের দায়ে জল ছেড়ে উঠে আসতে হয়। সে দেশের লোকে একে 'পিরাই' বলে।

বুলডগের মতো মুখ মাছটার, তার মধ্যে ছোট ছোট ছুঁচল দাঁত; একেবারে ক্ষুরের মতো ধারাল! তার উপর মেজাজখানাও চেহারারই উপযুক্ত—জলের মধ্যে থেকে এক হাত লাফিয়ে ডাঙার মানুষকে কামড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। আর যেখানে কামড়ে ধরে, সেখানের খানিকটা ছিঁড়ে না আসা পর্যন্ত সে কামড় ছাড়ে না! তার উপর এরা সব সময় দল বেঁধে ফেরে। হাঙর কুমির যেখানে থাকে সেখানেও নাকি মাছ থাকে, নানারকম জলজন্তু থাকে; কিন্তু 'পিরাই'এর আড্ডা যেখানে তার ত্রিসীমানার মধ্যে কোন প্রাণীর থাকবার যো নেই। সেখানকার জলে যদি গরু ঘোড়া নামে তবে তারা আর আস্ত ফেরে না। একবার একটা ষাঁড় ২০/২৫ হাত চওড়া একটা নদী পার হতে গিয়েছিল—কিন্তু বেচারার পার হওয়া হল না। তার আগেই রাক্ষুসে মাছেরা তাকে খেয়ে শেষ করে দিল। এরকম দুর্ঘটনা অনেক জানোয়ারের ভাগ্যেই ঘটে থাকে—তার মধ্যে মানুষও বাদ পড়েনি। হাজার মাছে একসঙ্গে কামড় দেয় আর এক-এক কামড়ে এক-এক খাবল মাংস উঠিয়ে আনে! দু-চাব মিনিটের মধ্যে এক একটা জানোয়ারকে খেয়ে শেষ করে দেয়।

কত সময় এমন হয় যে, লোকে নদীতে জল আনতে গেছে হঠাৎ কে তার হাত কেটে নিল! জানোয়ারেরা জল খেতে এসেছে—কট্ করে তার নাক কেটে গেল। সে দেশের লোকে জানে এ পিরাই মাছের কাণ্ড!

অদ্ভুত মাছ

নদীতে আর সমুদ্রে যতরকম মাছ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অদ্ভুত মাছের কোন অভাব নাই। কাহারও চেহারা অদ্ভুত, কাহারও চালচলন অদ্ভুত, কাহারও আহার বিহার বাসাবাড়ি সবই অদ্ভুত। বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন্‌টার কথা যে বলিব আর কোন্‌টা যে বাদ দিব তাহা ঠিক করাই কঠিন।

প্রথমে চারিচক্ষু মাছের কথা বলি। মাকড়সার নাকি আট দশটা চোখ থাকে কিন্তু পোকামাকড় ছাড়া আর কোন প্রাণীর যে দুইটার বেশি চোখ হয় একথা আর শুনিয়াছ কি? কোন কোন জানোয়ারের দেখা যায় কপালের কাছে একটা করিয়া চোখের মতো থাকে—কিন্তু 'চোখের মতো' হইলেও সেটা চোখ নয়, তাহাতে দেখার কাজ চলে না। কিন্তু এই মাছের যে দু-জোড়া চোখ, তাহার প্রত্যেকটিই সত্যিকারের চোখ। দুই দুইটা চোখ একসঙ্গে উপর-নীচ করিয়া বসান; মাছ যখন জলে ভাসে তখন উপরের একজোড়া চোখ থাকে জলের বাহিরে, আর নীচের জোড়া জলের তলায়! যে জোড়া জলের উপরে থাকে তাহার গড়ন ঠিক সাধারণ মাছের মতো নয়—তাহাতে জলের নীচে দেখিবার সুবিধা হয় না। আর নীচের জোড়া ঠিক সাধারণমত চোখ, তাহাতেও জলের বাহিরের কোন জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না। জলের ভিতর ও বাহির একসঙ্গে দেখিবার বিশেষ কোন দরকার ইহার ছিল কিনা জানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থাটায়

যে কাজের কতকটা সুবিধা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একরকম চশমা আছে তাহাকে ‘বাইফোক্যাল্’ বলে—সেই চশমার উপরের আধখানা একরকম কাচ, তাহাতে দূরের জিনিস দেখিবার সুবিধা হয়, আর নীচের আধখানা আরেকরকম—তাহাতে পড়াশুনার কাজ চলে। এই মাছের চোখটা ঠিক যেন ‘বাইফোক্যাল’ চোখ।

চোখের কথা বলিতে গেলে আরেকটি মাছের কথাও বলিতে হয়। সে মাছের একদিকে দুইটা চোখ, আর একদিকে চোখ নাই। এরকম একদিক কানা হইবার অর্থ কি জান? মাছটার স্বভাব এই যে, সে কাদার মধ্যে কাৎ হইয়া শুইয়া থাকে। যেদিকটা কাদার মধ্যে অন্ধকারে পড়িয়া থাকে, সেদিকটায় চোখ থাকা না থাকা সমান কথা—তাই তাহার দুইটা চোখই থাকে মুখের একপাশে—যে পাশটা আকাশের দিকে ফিরান সেই পাশে।

আফ্রিকার নীল নদীতে একরকম মাছ আছে সে চিৎ হইয়া চলে। চলার এরকম অদ্ভুত ভঙ্গী হইবার একমাত্র কারণ যাহা দেখা যায় তাহা এই যে, ইহাদের পেটের চাইতে পিঠের রংটা অনেক বেশি সাদা। সাদা পিঠটা আলোর দিকে থাকিলে চক্‌চক্ করে—তাহাতে মাছটার গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার সুবিধা হয় না। তাই সে কালো পেটটাকে উপর দিকে ধরিয়া আপনাকে জলের মধ্যে বেশ বেমালুম করিয়া রাখে।

জানোয়ারের মধ্যে মানুষ ক্যাঙারু প্রভৃতি জন্তু যেমন খাড়া হইয়া চলে, মাছেদের মধ্যেও এমন এক একজন আছেন যাঁহারা মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলেন। বিশেষত একজন আছেন, তিনি সমুদ্রে থাকেন, তিনি কেবল খাড়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হন না—তাঁহার মাথাটি আবার নীচের দিকে রাখা চাই। এই মাছের চেহারাটিও অদ্ভুত ছুঁচাল-রকমের, তাই ইংরাজিতে ইহার নাম Needle fish বা ছুঁচ মাছ। সমুদ্রে একরকম চাঁদা মাছ আছে, তাহারা রাগিলে বা ভয় পাইলে পেটটাকে ফুটবলের মতো ফুলাইয়া হঠাৎ চিৎ হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন ফোলা পেটটি জলের উপর বাহির হইয়া ভারি অদ্ভুত দেখায়। কোন কোন চাঁদা মাছের গায়ে আঁশের বদলে কাঁটা বসান থাকে—রাগের সময় সেগুলি শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হইয়া উঠে।

চেহারার কথা যদি বল, মাছের চেহারা যে কত অদ্ভুতরকমের হইতে পারে তাহার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হইতেছে। ‘থলে-গলা চাবুক-লেজ’ মাছের গলায় লম্বা থলি আর ল্যাজটি চাবুকের মতো; বঁড়শিবাজ মাছের নাকের উপর ছড়ি, তাহার আগায় টোপের মতো নোলক, আর যার যত বড় গা তত বড় হাঁ; শয়তান মাছের চেহারাটা মুখোশপরা সঙের মতো। আমেরিকার রাক্ষুসে মাছের সাংঘাতিক দাঁতের কামড়ে গোরু ঘোড়া পর্যন্ত প্রাণ হারায়—তাহারও চেহারাটি নেহাৎ ভদ্রমতন নয়।

কিন্তু বাস্তবিক উদ্ভট বিদ্‌ঘুটে মাছের খোঁজ করিতে হইলে সমুদ্রের গভীর জলে যেসব মাছ থাকে, তাহাদের সংবাদ লইতে হয়। সেদিন এইরূপ কতকগুলি মাছের চমৎকার বর্ণনা পড়িয়াছি! তাহার দু-একটি নমুনা শুন। একটি মাছ, তাহার কপালের উপর দুইটা শিং—সেই শিঙের আগায় তাহার চোখ। শিং দুটাকে সে ইচ্ছামত এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে। তাহার গায়ে আবার সারি সারি আলো বসান—গভীর অন্ধকার সমুদ্রে সেগুলি আপনা হইতেই জ্বলিতে থাকে। আর একটা মাছ, তাহার মুখে লম্বা দাড়ি—দেখিতে অনেকটা গাছের পাতার মতো; তাহার উপর মুখভরা বড় বড় গজালের মতো দাঁত। অন্ধকারে সমস্তটা দাড়ি জ্বলিতে থাকে। আরেকটি মাছ তাহার চোখ দুইটা ঠোঁটের কোণায়, মনে হয় হাঁ করিলেই চোখ দুইটা গিলিয়া যাইবে। ইহার নাকটা জুতার গোড়ালির মতো উঁচু আর হাঁ করিলেই মুখের ভিতরে আলো জ্বলিয়া উঠে

—শিকার ধরিবার ভারি সুবিধা। আর একটি মাছ আছে, তাহার সমস্ত শরীরটি লাল-কালো চিত্রবিচিত্র করা। তাহার চোখ দুইটা এত বড় যে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে সমস্ত মাথাভরাই চোখ।

ইহারা সকলেই প্রায় শিকারী মাছ। নিজেদের বাতি দিয়া ইহারা শিকার খোঁজে। কেহ কেহ সমুদ্রের নীচে বাতি জ্বালাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে; সেই বাতি দেখিয়া যেসব শিকার তামাসা দেখিতে আসে, তাহাদের খপ্ করিয়া গিলিয়া খায়। কোন কোন মাছ আছে, তাহারা শিকারকে বাগাইবার জন্য নানারকম অস্ত্রকৌশল খাটাইয়া থাকে। কাহারও বিষাক্ত ল্যাজ চাবুকের মতো শিকারের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, কেহ বিদ্যুৎ চালাইয়া শিকারকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে, কেহ জোঁকের মতো তাহার রক্ত চুষিয়া ধরে আর কেহ পিচকারি মারিয়া ডাঙার শিকারকে জলে পাড়িয়া আনে। টিকটিকির শিকার ধরা দেখিয়াছ? কোন কোন মাছ আছে তাহারাও ঠিক সেইরকম কায়দায় শিকার ধরে। আস্তে আস্তে চুপি চুপি শিকারের পিছনে গিয়া তারপর হঠাৎ, টিকটিকির জিভের মতো, তাহাদের মুখটা সরু লম্বা হইয়া শিকারের ঘাড়ে ছুটিয়া পড়ে।

এইবারে একটা মাছের কথা বলিব আমরা তাহার নাম দিয়াছি গেছো মাছ। কোন কোন মাছ আছে, তাহারা জলের বাহিরে আসিয়াও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। কই মাছ যে অনেকদূর পর্যন্ত মাটির উপর 'কাতরাইয়া' চলিতে পারে, তাহা বোধহয় সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু মাছ যে আবার সখ করিয়া জল ছাড়িয়া ডাঙায় ওঠে আর রীতিমত গাছে চড়িতে পারে, ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই মাছ আফ্রিকাতেই বেশি পাওয়া যায়। ইহার দুপাশের ডানা দুইটি দেখিতে কতকটা আঙুল-জোড়া পায়ের মতো। সেই ডানার উপর ভর করিয়া মাছগুলি অনায়াসে ডাঙায় উঠিয়া গাছে চড়িয়া বসে। ইহাদের মুখ প্রায়ই ব্যাঙের মতো কদাকার হয়—চোখ দুটিও সেইরকম ড্যাব্‌ডেবে। এ মাছ খাইতে এমন বিস্বাদ যে মানুষ ত দূরের কথা—ডাঙার কোন জন্তু বা আকাশের পাখিরা পর্যন্ত ইহাকে ছোঁয় না। কিন্তু জলের বড় বড় মাছগুলি ইহাদের দেখিলে টপাটপ্ খাইয়া ফেলে। সেইজন্য ইহারা জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিবার জন্য এক-এক সময়ে এমন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

মাছের বিদ্যার কথা অনেক বলা হইল—এইবার আরেকটি বিদ্যার কথা বলিয়াই শেষ করি। সেটি আর কিছু নয়—সংগীতবিদ্যা! অবশ্য সংগীত বলিতে মনে করিও না যে তাহারা রীতিমত সা-রে-গা-মা সুর করিয়া রাগ-রাগিণীর চর্চা করে। কোন কোন মাছ আছে তাহারা একটু আধটু শব্দ করিতে জানে। কেহ ইঁদুরের মতো কুট্‌কুট্ শব্দ করে, কেহ অদ্ভুতরকম ঘ্যাঁং ঘ্যাঁং শব্দ করে, আর কেহ বা ডুর্ ডুর্ করিয়া ঢাকের মতো আওয়াজ করে। কিন্তু সকলের চাইতে ওস্তাদ যে মাছ, সে দলে-বলে সমুদ্রের তীরে পড়িয়া মোটা কান্নার মতো একরকম অদ্ভুত সুর করিতে থাকে। খানিক দূর হইতে শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যেন মানুষের কোলাহলের সুর।

বিদ্যুৎ মৎস্য

এক-একরকম জানোয়ারের এক-একরকম অস্ত্র। কেউ শিং দিয়ে গুঁতায়, কেউ নখ দিয়ে আঁচড়ায়, কেউ দেয় দাঁতের কামড়, কেউ মারে হুলের খোঁচা। ক্যাঙারুর ল্যাজের ঝাপ্‌টা, ঈগলের ধারাল ঠোঁট, অস্ত্র হিসাবে এগুলিও বড় কম নয়। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য অস্ত্র আছে একরকম বান্ মাছের গায়ে। তোমরা কেউ 'ব্যাটারির' 'শক্' খেয়েছ কি? কিংবা খোলা বিদ্যুতের তারে ভুলে হাত দিয়েছ কি? এই মাছকে ধরতে গেলে গায়ের মধ্যে ঠিক তেমনি ধাক্কা লাগে।

এই অদ্ভুত মাছকে ইংরাজিতে বলে Electric Eel অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক ঈল'। বান মাছের মতো চেহারা, সাপের মতো লম্বা, ধারাল দাঁত—এক একটি ঈল পাঁচ ছয় হাত পর্যন্ত বড় হয়। এই জাতীয় মাছ পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু যেগুলিতে বিদ্যুতের তেজ দেখা যায় সেগুলি থাকে কেবল আমেরিকার বড় বড় নদীর ধারে-কাছে। এক একটা ঈলের এমন আশ্চর্য তেজ, তারা বিদ্যুৎ চালিয়ে অন্য মাছদের ত মেরে ফেলেই, এমনকি, বড় বড় জানোয়ারগুলোকেও এক-এক সময় তারা অস্থির করে তোলে। গোরু, ঘোড়া পর্যন্ত কত সময়ে জল খেতে নেমে ঈলের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণায় লাফালাফি করতে থাকে। সে দেশের লোকেরা রীতিমত বর্শা বল্লম নিয়ে এই মাছ শিকার করে, কারণ, কোনরকমে তার গায়ে গা ঠেকলেই বড় বড় জোয়ান মানুষকেও বাপ্‌রে মারে করে চেঁচাতে হয়। একবার কতগুলো ঘোড়া বিলের মধ্যে জল খেতে গিয়েছিল। সেখানে প্রায় ৪০/৫০টা বড় বড় ঈল এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। ঘোড়াগুলো তার মাঝখানে পড়েই চিৎকার করে লাথি ছুঁড়ে ডাঙায় পালিয়ে আসল। কিন্তু একটা ঘোড়া তার মধ্যে একটু বেশি কাহিল হয়েছিল, সেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের ধারে আধমরা অবস্থায় পড়েছিল। ঈলগুলোও অবশ্য লাথির চোটে সেখানে বেশিক্ষণ টিঁকতে পারেনি।

এই সাংঘাতিক অস্ত্র এরা কেমন করে ব্যবহার করে, আর কেমন করে তাদের শরীরের মধ্যে এতখানি বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়, তা এখনও পণ্ডিতেরা খুব স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। মাছটাকে ধরে চিরলে পরে দেখা যায়, তার শিরদাঁড়ার দুই পাশে পিঠ থেকে ল্যাজ পর্যন্ত ছোট ছোট কোষ, তার মধ্যে একরকম আঠাল রস; এইটিই তার বৈদ্যুতিক অস্ত্র। অস্ত্রের ব্যবহার করতে হলে সে কেবল তার শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে ল্যাজ আর মাথা শত্রুর গায়ে ঠেকিয়ে দেয়।

কয়েকবার ক্রমাগত অস্ত্রের ব্যবহার করলে মাছটা আপনা থেকেই কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে—তখন আর তার বিদ্যুতের তেজ থাকে না। কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলে আবার তার তেজ ফিরে আসে। সব সময়ে যে ইচ্ছা করে সে খামখা অস্ত্র ব্যবহার করে, তা নয়; কোনরকম ভয় পেলে বা চমকালেও তার গায়ে বিদ্যুৎ খেলে।

এরকম বৈদ্যুতিক শক্তি আরও কোন কোন মাছের ও অন্য জলজন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। আফ্রিকায় মাগুর জাতীয় একরকম মাছ আছে, তারও তেজ বড় কম নয়।

তার সমস্ত শরীরটাই যেন বিদ্যুতের কোষে ঢাকা। একটা চৌবাচ্চায় অন্যান্য মাছের সঙ্গে একে রাখলে তবে এর মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। দুদিন না যেতেই দেখবে যে আর সব মাছকে মেরে সে সাবাড় করেছে। আফ্রিকার আরবেরা এর নাম বলে 'রাদ্' অর্থাৎ বজ্র মাছ।

সমুদ্রের ঘোড়া

সমুদ্রের ঘোড়া বলতে হঠাৎ যেন সিন্ধুঘোটক মনে করে বসো না। সিন্ধুঘোটক থাকে সমুদ্রের ধারে, কিন্তু তাকে ঘোটক বলা হয় কেন তা জানি না। তার চালচলন চেহারা বা শরীরের গড়ন কিছুই ঘোড়ার মতো নয়—ঘোড়ার সঙ্গে তার খুব দূর সম্পর্কেও কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না—অথচ তাকে বলি 'সিন্ধুঘোটক'। হিপ্পোপটেমাসকে বাংলায় অনেক সময় 'জলহস্তী' লেখা হয়। তারও কিন্তু প্রকাণ্ড নাদুসনুদুস চেহারাটি ছাড়া হাতির সঙ্গে আর কোনরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাকে শুয়োরের সঙ্গে সমতুলনা করলে তার পরিচয়টা অনেকটা ঠিক হয়।

এখানে যাকে সমুদ্রের ঘোড়া বলছি, তাকে বর্মধারী মাছ বললেই তার ঠিক মত পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তার ঐ অদ্ভুত ঘাড় বাঁকান চেহারা আর খাড়া হয়ে চলাফিরা—এই দেখেই ইংরেজিতে তার নাম দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের ঘোড়া (Sea Horse)। চেহারার বর্ণনা হিসাবে নামটি যে চমৎকার হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই জন্তুর ল্যাজের দিকটা একেবারেই মাছের মতো নয়—তার উপর গায়ের চামড়াটিও চিংড়িমাছের খোলার মতো শক্ত। ল্যাজটি থাকাতে তার ভারি সুবিধা। যখন ইচ্ছা জলের নীচে শেওলা গাছে ল্যাজটি জড়িয়ে সে বেশ আরাম করে বিশ্রাম করে। যখন জলের নীচে মাথা উঁচিয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এরা চলে ফিরে, তখন তেজী ঘোড়ার টগ্‌বগ্ করে ছুটবার ধরনটাও মনে পড়ে। আসলে এরা যে 'নল' মাছের জাতভাই, সেটা এদের চোঙের মতো মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

নলমাছের চেহারাটা ঠিক তার নামেরই মতো। নলমাছের মুখখানা এমনভাবে তৈরি যে সে হাঁ করতে পারে না। ঐ চোঙার আগায় একটু ফুটো আছে, তাই দিয়ে সে সুড়সুড় করে খাবার টেনে খায়। সমুদ্রের ঘোড়ার মুখখানিও ঠিক এই ধরনের।

এই অদ্ভুত জন্তুগুলির এক একটা আবার ত্রিভঙ্গ ঘোড়ার মতো চেহারা করেও সন্তুষ্ট নয়। তারা নানারকম সাজ করে রংবেরঙের ঝালর ঝুলিয়ে কেমন কিম্ভূত কিমাকার মূর্তি করে থাকে। ঝালরের সাজগুলো বাস্তবিক তার গায়ের চামড়া। ইংরাজিতে এদের বলে সমুদ্রের 'ড্র্যাগন' (Sea dragon) বা রাক্ষস। নামটি ভয়ংকর হলেও জন্তুটি ঠিক সমুদ্রের ঘোড়ার মতোই নিরীহ। তার ঐ রংচঙে পোশাকের বাহারটা কেবল শত্রুর চোখে ধোঁকা দেবার জন্য। সমুদ্রের নীচে যেসব অদ্ভুত রঙিন বাগান থাকে, তারই মধ্যে ফুল পাতার সঙ্গে রং মিশিয়ে এরা বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে থাকে। নানারকম হিংস্র জন্তু আর মাছ সেখানে ঘোরে ফিরে। তারা এর চেহারা দেখে হঠাৎ বুঝতেই পারে না যে এটাও একটা জানোয়ার।

এদের আর একটি বড় মজার অভ্যাস আছে—এরা সব সময় ছানার দল সঙ্গে

নিয়ে ফেরে। ক্যাঙারুর পেটে যেমন থলি থাকে, তার মধ্যে ছোট ছোট ছানাগুলো দরকার হলেই ঢুকে পড়ে—তেমনি ওদেরও কারও বুকে, কারও পেটে ছোট ছোট থলির মতো থাকে। ছানারা ভয় পেলে ছুটে তার মধ্যে লুকোয়।

কুমিরের জাতভাই

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, তক্ষক, গোসাপ এঁরা সকলে হলেন কুমিরের জ্ঞাতি-বর্গ। পৃথিবীর যে-কোন দেশে যাও, এঁদের কোন না কোনটির সাক্ষাৎ পাবেই। কিন্তু সাক্ষাৎ পেলেই যে সব সময়ে তাদের চিনতে পারবে, তা মনে করো না। অস্ট্রেলিয়ার সেই কাঁটাওয়ালা ভীষণমূর্তি জানোয়ার যে নিতান্ত নিরীহ গিরগিটি মাত্র, এ কথা আগে থেকে না জানলে কি কেউ বুঝতে পারবে? কেবল চেহারা দেখে যদি এর সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে হয়, তাহলে অনেকেই হয়ত বেচারির উপর অবিচার করবে। সমস্ত শরীরটি এর অস্ত্রে আর বর্মে ঢাকা, কিন্তু মেজাজটি যারপরনাই ঠাণ্ডা। দুপুরের রোদে শুকনো বালির উপর এরা পড়ে থাকে, ভয় পেলে তাড়াতাড়ি বালির মধ্যে ঢুকে যায়। অন্য জন্তুর অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, সামান্য একটা পাখি দেখলেই এরা পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়। এদের প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে। সব চাইতে আশ্চর্য এই যে, এক বাটি জলের মধ্যে যদি এই গিরগিটিকে ছেড়ে দাও, তবে দেখতে দেখতে এর গায়ের চামড়া সমস্ত জল শুষে নেবে। শুকনো বালিতে থাকে কিনা, সব সময়ে ত স্নানের সুবিধা হয় না, তাই একবার স্নান করলেই সে অনেকদিনের মতো জল বোঝাই করে নেয়।

একটি সবুজ রঙের জন্তু রয়েছে—মাদাগাস্কারের টিকটিকি। এর বিশেষত্বের মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি আর গায়ে রঙের বাহার। তাছাড়া রয়েছে বহুরূপী। বহুরূপীর গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। তার সমস্ত গায়ের রং তারা চট্‌পট্ বদলাতে পারে। চোখে চেয়ে দেখছ তার দিব্যি ঘাসের মতো সবুজ রং, হয়ত এক মিনিট বাদেই দেখবে ফ্যাকাসে! তারপর ঘুরে এসে দেখ, শুকনো পাতার রং কিংবা সীসার মতো ময়লা। বহুরূপীর চালচলন ভারি অদ্ভুত। এক পা নড়তে হলে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে পা ফেলে; হয়ত একটা পা অর্ধেকখানা তুলে পাঁচমিনিট চুপ করেই রইল। দেখে মনে হয় যেন পা ফেলবে কি না ফেলবে এর জন্যে তার কত হিসাব আর কত ভাবনা চিন্তা করতে হচ্ছে। এক সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল—অন্তত বিলাতে শিক্ষিত লোকেও এ কথা বিশ্বাস করত যে বহুরূপীরা শুধু হাওয়া খেয়ে থাকে। এরকম বিশ্বাসের কারণ এই যে, বহুরূপী একে ত খায় খুবই কম, তার উপর খাওয়া কাজটি তার চক্ষের নিমেষে এমন চট্‌পট্ শেষ হয়ে যায় যে, একটু ঠাওর করে না দেখলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। যতটুকু প্রাণী, জিভটি প্রায় ততখানি লম্বা; সেই জিভটি তীরের মতো ছট্‌কিয়ে পোকামাকড়ের উপরে পড়ে আর পরক্ষণেই টপ্ করে মুখের ভিতর ফিরে যায়। এর মধ্যে যে শিকার ধরা, শিকার মারা এবং খাওয়া, এই তিন কাজ শেষ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে অনেক সময় দেরি লাগে।

বহুরূপীর আর একটি অদ্ভুত জিনিস তার চোখ দুটি। বড় বড় চোখ দুটি এমনভাবে তৈরি যে একবার চোখ পাকালেই উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ডাঙা এবং আকাশের প্রায় সবখানিই বেশ দেখে নিতে পারে। তার উপর দুইটি চোখ একেবারে আল্‌গাভাবে গাঁথা; একটা যখন সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে, আর একটা হয়ত ততক্ষণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে ঘর বাড়ি গাছপালা সব তদ্‌বির করছে!

আর আছে বৃদ্ধ জরদ্গবের মতো এক জন্তু—আমেরিকার গেছো-গিরগিটি; গিরগিটি বললাম বটে কিন্তু গোসাপ বললেও চলত, কারণ এর এক একটি নাকি প্রায় সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। গলায় গলকম্বল, পিঠে সাংঘাতিক কাঁটা, তার উপর কোন কোনটার গায়ে মাথায় বড় বড় আঁচিল, তাতে চেহারাটা কেমন কিম্ভূতকিমাকার হয় তা সহজেই কল্পনা করতে পার।

খাঁটি গোসাপ-জাতীয় জন্তু আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। 'হিংস্র' বলতে যা বোঝায় গোসাপেরা ঠিক তা নয় কিন্তু একবার গোঁ ধরলে সেও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে কথায় বলে 'কচ্ছপের কামড়', সাহেবেরা বলেন 'বুলডগের কামড়'—কিন্তু গোসাপ খেপলে পরে তার কামড় ছাড়ানও কম শক্ত নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে যে, গিরগিটিটাকে খুব বড় করতে পারলেই বুঝি ঠিক গোসাপ হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু বাস্তবিক গিরগিটি আর গোসাপের গড়নে কিছু তফাৎ আছে। গোসাপের ঘাড়টা অনেকটা লম্বা গোছের, আর তার জিভটা সাপের মতো চেরা, চলতে ফিরতে লক্‌লক্‌ করে। গোসাপেরা আমিষখোর, সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাং, পাখি, এইসব খেয়ে থাকে—তাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য নাকি কুমিরের ডিম। আমাদের দেশে গোসাপ ডাঙায়ও থাকে জলেও নামে, তাই সাঁতারের সুবিধার জন্য তাদের ল্যাজগুলি চ্যাটাল হয়। যেসব গোসাপ কেবল শুকনো ডাঙায় বা গাছে থাকে, তাদের ল্যাজ হয় চাবুকের মতো গোল।

আরেকরকমের জন্তু রয়েছে যার গায়ে চক্র চক্র দাগ, সেটি হচ্ছে মেক্সিকোর 'বীভৎস গিলা' (gila monster) বা বিষধর গিরগিটি। ছোট ছোট পা, তাতে শরীরটা মাটি থেকে আলগাই হয় না—তাকে সাপের মতো এঁকে বেঁকে মাটি ঘষে চলতে হয়। ছোট্ট দুটি চোখ, মুখভরা দাগের মধ্যে চট করে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। দুম্বা ভেড়ার মতো ল্যাজটি চর্বিতে ভরা। যখন খাবার জোটে না, তখন ঐ ল্যাজটা শুকিয়ে আসে, ল্যাজের চর্বি সমস্ত শরীরে শুষে গিয়ে শরীরটাকে তাজা রাখে। কিন্তু আসল দেখবার জিনিস ওর মুখের মধ্যে। সেখানে যদি খোঁজ কর তবে দেখবে, ঠিক সাপের মতো তার বিষদাঁত রয়েছে। সে বিষে ছোটখাট জন্তু বা পাখি ত মরেই, মানুষ পর্যন্ত মারা গেছে বলে শোনা যায়।

একরকমের অদ্ভুত গিরগিটি আছে যে মনে হয় রাগে একেবারে ফুলে উঠেছে। তার গলায় যে রঙিন ছাতার মতো রয়েছে, সেটা অন্য সময়ে গুটিয়ে গলার চারদিকে পর্দার মতো ঝুলান থাকে, কিন্তু ভয় বা রাগের সময় খাড়া হয়ে ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার মুখের চেহারাটিও ভয়ানক হয়ে ওঠে। লাল ছাতার নীচে আগুনের মতো চোখ, তার উপর ঐরকম ধারালো দাঁত আর টক্‌টকে জিভ—আর সেই সঙ্গে ফেঁস ফেঁস শব্দ করে লাফিয়ে ওঠা—এতে বাস্তবিক ভয় হবারই কথা। এই গিরগিটি দু পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বেশ রীতিমত ছুটতে পারে। ল্যাজশুদ্ধ এক একটা প্রায় দুহাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই জন্তুর বাড়ি অস্ট্রেলিয়ায়।

মালয়দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে আর একরকম গিরগিটি আছে, তাকে

'উড়ুক্কু গিরগিটি' বলা যেতে পারে। এদের পাঁজরের কয়েকখানা হাড় বুকের চামড়া ফুটো করে দুপাশে বেরিয়ে থাকে, সেগুলো পাতলা পর্দার মতো চামড়া দিয়ে ঢাকা। পর্দাটাকে পাখার মতো ছড়িয়ে এরা এক গাছ থেকে আর এক গাছ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। ছোটখাট পোকা বা ফড়িং গাছের কাছ দিয়ে গেলে এরা চট্ করে তাদের উপর উড়ে পড়ে। এ ওড়া অবশ্য পাখির মতো ওড়া নয়, কারণ এরা রীতিমত বাতাস ঠেলে উড়তে পারে না—লাফিয়ে বাতাসে ভর করে খানিকটা ভেসে যায় মাত্র। এরা থাকে বড় বড় গাছের আগায়, ক্বচিৎ কখনও নীচে নামে। এক গাছ থেকে আর এক গাছে যেতে হলে এরা শূন্যে দিয়েই যাতায়াত করে। এ পর্যন্ত প্রায় কুড়িরকমের উড়ুক্কু গিরগিটি পাওয়া গিয়েছে—তাদের সবগুলোরই রং অতি চমৎকার—কোন ফুল বা প্রজাপতির রঙও তার চাইতে সুন্দর বা উজ্জ্বল হয় না। সমস্ত গায়ে যেন রামধনুর নকশা করা। এরাও কিন্তু বেশ রাগতে জানে, আর রাগলে পরে এদের গলাটি ফুলে তাতে নীল লাল নানারকম রঙের খেলা দেখা যায়।

এ ছাড়াও আরো কতরকমের গিরগিটি আছে, তাদের কথা বলবার আর জায়গা নেই। দাড়িওয়ালা গিরগিটি, শিংওয়ালা গিরগিটি, সাপের মতো গিরগিটি, মাছের মতো গিরগিটি, কত যে তাদের রকমারি তার আর অন্ত নেই। একটা আছে, তার কোন্ দিকটা ল্যাজ আর কোন্ দিকটা মাথা হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না। আর একটার হাত-পাগুলো লম্বা লম্বা কাঠির মতো। ল্যাজটা গোড়ায় সরু মাঝখানে মোটা আবার আগায় ছুঁচাল—ঠিক যেন কাঁচা লঙ্কাটি। এদের অনেকে আবার রং বদলাতে জানে—কেউ কেউ এ বিষয়ে বহুরূপীর চাইতেও ওস্তাদ। কেউ ডিম পাড়ে, কারও বা একেবারে ছানা হয়। আবার কেউ বা এমন ঠুনকো যে, ধরামাত্র তার হাড়গোড় ভেঙে যায়।

অদ্ভুত কাঁকড়া

রাক্ষুসে কাঁকড়ার চেহারাটি তেমন কিছু ভীষণ নয়, গায়ের রংটিও বেশ সুন্দরই বলতে হবে—তবে একে রাক্ষুসে বলা হচ্ছে কেন? 'রাক্ষুসে' বলার একমাত্র কারণ হচ্ছে তার দেহের আয়তনটি। খুব বড় একটি রাক্ষুসে কাঁকড়ার বড় দুটি দাঁড়া ফাঁক করিয়ে তার এক আগা থেকে আর এক আগা পর্যন্ত মাপ নিয়ে দেখা গেছে, দশ বার হাত লম্বা! এটা হল কর্তা-কাঁকড়ার কথা—তাঁর গিন্নী যে কাঁকড়ি, তাঁকে ত আর যখন তখন লড়াই করতে হয় না, কাজেই তাঁর অত বড় দাঁড়াও নেই।

এই কাঁকড়া থাকে জাপান দেশে সমুদ্রের জলে। সেইখানে কূলের কাছে সমুদ্রের শেওলা-ধরা পাথরের মধ্যে রাক্ষুসে কাঁকড়া গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। নামটি রাক্ষুসে হলেও এদের স্বভাবটি মোটেও রাক্ষসের মতো নয়—সেইজন্য নানা জাতীয় মাছ, আর অক্টোপাস প্রভৃতি জলজন্তু এদের দেখতে পেলেই তেড়ে খেতে আসে। নানারকম শেওলা প্রবাল আর 'স্পঞ্জ' তার গায়ের উপর বাসা করে তার আসল চেহারাটিকে এমন বেমালুম ঢেকে রাখে যে, খুব কাছে গেলেও অনেক সময় তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়।

আরও কতগুলি কাঁকড়া রয়েছে, যেগুলিকে গেছো কাঁকড়া বলা যায়। এরা

সত্যি সত্যি গাছে চড়ে কিনা তা নিয়ে আগে নানারকম তর্ক শোনা যেত, কিন্তু এখন এটা একেবারে সত্য বলে প্রমাণ হয়েছে। তবে এরা যে নারকেল গাছের আগায় চড়ে ডাব পেড়ে আনে, এ কথাটা অনেক সময় শোনা গেলেও এর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা হোক, অল্পেই উঠুক আর বেশিই উঠুক, ডাব পাড়ুক আর নাই পাড়ুক, গাছে চড়া আর নারকেল খাওয়া এই দুই বিদ্যাতেই এর বেশ বাহাদুরি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কতগুলি ছোট ছোট দ্বীপে এই কাঁকড়ার বাড়ি। সেখানে নারকেল গাছের অভাব নেই, নারকেল মাটিতে পড়লেই গেছো কাঁকড়া তাকে আক্রমণ করে। প্রথমত সে নারকেলটার ছোব্‌ড়া ছাড়িয়ে নেয়—এই ছোব্‌ড়া তাদের গর্তে বিছাবার জন্য দরকার হয়। তারপর যেদিকে নারকেলের 'চোখ' থাকে, সেইদিকে দাঁড়া দিয়ে ঠুকে গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে দাঁড়া ঢুকিয়ে খুব মজা করে খায়। আস্ত নারকেলটিকে যে দাঁড়া দিয়ে ভাঙতে পারে—তার দাঁড়ার একটি চাপটে যে মানুষের হাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয় সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু তবু মানুষ তাকে ধরতে ছাড়ে না—কারণ এ কাঁকড়া খেতে নাকি অতি চমৎকার! তার পায়ে এত চর্বি যে সেই চর্বি গলিয়ে সে দেশের লোকেরা তেল বার করে রাখে। তার উপর সে দেশের বুনো শুয়োরগুলোরও কেমন বদভ্যাস—তারা গর্ত খুঁড়ে এই কাঁকড়াদের বার করে খেয়ে ফেলে।

রাক্ষুসে কাঁকড়ার মতো বড় না হলেও, এগুলিও নেহাৎ ছোট নয়। একবার এইরকম একটা কাঁকড়াকে একটা মজবুত টিনের বাক্সে বন্ধ করে বাক্সটাকে তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল যে, কাঁকড়াটা বাক্সের ধার মুচড়িয়ে ফাঁক করে তা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

শামুক ঝিনুক

আমাদের শরীরের ভিতরকার শক্ত কাঠামোটিকে আমরা কঙ্কাল বলি। কঙ্কালটা ভিতরে থাকে আর এই রক্ত মাংসের শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখে—এইরূপই আমরা সচরাচর দেখি। কিন্তু এমন জীবও আছে যাহার কঙ্কালটা থাকে শরীরের বাহিরে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেহ দেখিয়াছ কি? বোধহয় সকলেই দেখিয়াছ; কারণ, আমি কোন অসাধারণ বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা বলিতেছি না—এই নিতান্ত সাধারণ শামুক ঝিনুক প্রভৃতির কথাই বলিতেছি।

শামুক ঝিনুকের মতো নিতান্ত সামান্য জিনিসের মধ্যে যে কত আশ্চর্য ব্যাপার লুকান থাকে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তোমরা গেঁড়ি দেখিয়াছ? বাগানে পুকুরের কাছে স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় ছোট ছোট জীবন্ত শামুকগুলি যারপরনাই অলসভাবে আস্তে আস্তে চলাফিরা করে—তাহাদের নাম গেঁড়ি। ঝিনুকের মধ্যে যে জীবন্ত প্রাণীটি বাস করে, তাহার চালচলনটিও কম অদ্ভুত নয়। তাহাদের অনেকেই সারা জন্ম মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ এমন গোঁয়ার, তাহারা ক্রমাগত পাথর ফুঁড়িয়া তাহার ভিতর ঢুকিতে চায়। দুই-একজন আছে তাহারা লাফান বিদ্যাটি বেশ অভ্যাস করিয়াছে, কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ তড়াক করিয়া এক একটা লাফ দেয়।

আর সমুদ্রের নীচে শুক্তিগুলো যে আপনাদের খোলার ভিতরে ছোট বড় নানারকম মুক্তা জমাইয়া রাখে, তাহার কথাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। একরকম পোকার জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝিনুকের গায়ে রস গড়ায় আর সেই রস জমিয়া মুক্তা হয়।

শামুক বা ঝিনুকের যখন জন্ম হয় তখন তাহাদের খোলাটি থাকে না, তাহার জায়গায় একটা পুরু চামড়ার মতো থাকে; সেই চামড়াটি শক্ত হইয়া ক্রমে মজবুত খোলা তৈরি হয়। যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, সেই ডিমগুলি দেখিতে বড়ই অদ্ভুত। কতগুলি ছোট ছোট পোঁটলা একসঙ্গে মালার মতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পোঁটলার মধ্যে কতগুলি ডিম। এক একটি শামুক অনেকগুলি ডিম পাড়ে—একশ দেড়শ হইতে দশ বিশ হাজার। কিন্তু এ-বিষয়ে এক একটা ঝিনুকের ওস্তাদি অনেক বেশি। সমুদ্র বা নদীর জলে এমন সব ঝিনুক দেখা যায় যাহারা একেবারে দশ বিশ লাখ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের খাইবার জন্য নানারকম জীবজন্তু চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসে, কারণ খোলা জমিবার আগে এই নরম অবস্থাতেই এগুলিকে খাইবার সুবিধা। বাস্তবিক, অল্প বয়সেই ইহারা যদি এরূপভাবে উজাড় না হইত, তবে শামুক ঝিনুকের অত্যাচারে পৃথিবীতে বাস করাই দায় হইত। যে প্রাণী এক একবারে হাজার হাজার জন্মিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি যদি বড় হইতে পায়, আর প্রত্যেকের হাজার হাজার করিয়া ছানা হয়, আর এইরকম বছরের পর বছর চলিতে থাকে, তবে অবস্থাটা নিতান্তই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় বৈকি। এরূপভাবে বাড়িতে পারিলে একটিমাত্র শামুকের বংশধরেরা পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত কলিকাতা সহরটিকে একেবারে বেমালুম ঢাকিয়া দিতে পারিত।

বলিতে গেলে এক সময় এই পৃথিবীতে ইহাদেরই রাজত্ব ছিল। সেকালের হিসাবেও ইহা খুবই পুরাতন সময়ের কথা। তখন আর কোন জীবজন্তু ছিল না, কেবল নানারকম শঙ্খ আর অদ্ভুত জলজন্তুরা এই দুনিয়ার পরিচয় লইয়া ফিরিত। আজও তাহাদের কঙ্কাল জমিয়া কত মাটির নীচে কত সমুদ্রের বুকে বড় বড় স্তর বাঁধিয়া আছে।

গেঁড়ির কথা বলিতে গেলে সব চাইতে বড় যে আফ্রিকার রাক্ষুসে গেঁড়ি তাহার কথাও বলা উচিত। সেগুলি কতখানি বড় তাহা পুরাপুরি দেখাইতে গেলে সন্দেশের পৃষ্ঠায় কুলাইবে না। ইহারা একটি করিয়া লম্বা গোছের ডিম পাড়ে—ঠিক পাখির ডিমের মতো শক্ত আর সাদা।

কিন্তু সমুদ্রের শঙ্খজাতীয় জন্তুদের মধ্যে ইহার চাইতে অনেক বড় জীবও বিস্তর দেখা যায়। তাহাদের এক একটির খোলা এমন প্রকাণ্ড হয় যে, একটি ছোটখাট ছেলেকে তাহার মধ্যে অনায়াসে শোয়াইয়া রাখা যায়।

শামুকেরা খায় কি? নরম ঘাস, কচি পাতা, জলের পানা—এইগুলি অনেকেরই প্রধান খাদ্য। আবার কেহ কেহ আছেন, তাঁহাদের নিরামিষে রুচি নাই, তাঁহারা নানারকম পোকামাকড়, জলের কীট এই সকল খাইয়া থাকেন। ঝিনুকেরও খাওয়া এইরকমই, তবে তাহারা এক জায়গায় পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহাদের আহার জুটিবার সুযোগ কিছু কম। ঝিনুকের খোলার দুটি করিয়া পাট থাকে, সে দুটিকে তাহারা ইচ্ছামত কব্‌জা ঘুরাইয়া খুলিতে ও জুড়িয়া দিতে পারে। খাবারের দরকার হইলে তাহারা সেই দরজা ফাঁক করিয়া রাখে; চলিতে চলিতে অথবা স্রোতে ভাসিয়া যে-সকল কীট সেই হাঁ-করা মুখের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহাদের সে চট্‌পট্‌ খাইয়া ফেলে। শামুক আর ঝিনুকের খাওয়ার মধ্যে আর একটি তফাৎ এই যে, ঝিনুকের

দাঁত নাই কিন্তু শামুকের দাঁত আছে। দাঁত বলিতে মানুষের দাঁতের মতো কিছু একটা মনে করিও না। এই দাঁতগুলি তাহাদের জিভের গায়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সাজান থাকে; এক একটা শামুকের প্রায় দুই চারশ বা হাজার দেড় হাজার দাঁত। উখার মতো ধারাল এই জিভটিকে সে তাহার খাবারের ভিতরে, উপরে, আশেপাশে ঘ্যাঁশ্ ঘ্যাঁশ্ করিয়া চালাইতে থাকে। তাহাতেই খাবার জিনিস সব টুকরা টুকরা হইয়া থ্যাঁৎলাইয়া কাদার মতো নরম হইয়া যায়। এক একটার জিভের আগা পর্যন্ত সাংঘাতিক ধারাল; সেই জিভ দিয়া তাহারা অন্য জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া দেয়, নিরীহ ঝিনুকগুলির খোলা ফুঁড়িয়া তাহাদের চুষিয়া খায়।

তারপর শামুক ঝিনুকের চেহারার বাহার যদি বর্ণনা করিতে বসি, তবে ত শেষ করাই মুশকিল হইবে। কত হাজাররকমের শঙ্খ, তাহার কতরকম আকার, কত রকম রং। তার এক একটার যে কি আশ্চর্য সুন্দর গড়ন শুধু কথায় তাহা আর কত বোঝান যায়।

সিন্ধু ঈগল

সমুদ্রের ধারে যেখানে ঢেউয়ের ভিতর থেকে পাহাড়গুলো দেয়ালের মতো খাড়া হয়ে বেরোয়, আর সারা বছর তার সঙ্গে লড়াই করে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে ওঠে, তারই উপরে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় সিন্ধু ঈগলের বাসা। সেখানে আর কোন পাখি যেতে সাহস পায় না—তারা সবাই নীচে পাহাড়ের গায়ে ফাটলে ফোকরে বসবাস করে। পাহাড়ের উপরে কেবল সিন্ধু ঈগল—তারা স্বামী-স্ত্রীতে বাসা বেঁধে থাকে।

ঈগলবংশ রাজবংশ—পাখির মধ্যে সেরা। সিন্ধু ঈগলের চেহারাটি তার বংশেরই উপযুক্ত—মেজাজটিও রাজারই মতো। সিংহকে আমরা পশুরাজ বলি—সুতরাং ঈগলকেও পক্ষীরাজ বলা উচিত; কিন্তু তা আর বলবার যো নেই কারণ রূপকথার আজগুবি গল্পে লেখে, পক্ষীরাজ নাকি একরকম ঘোড়া! যাহোক—শুনতে পাই রাজারা নাকি মৃগয়া করতে ভালবাসেন। তাহলে সে হিসাবেও সিন্ধু ঈগলের চালের কোন অভাব নেই। চিল কাক সাঁচান শকুন সবাই মরা মাংস খায়—কাজেই সেরকম খাওয়া যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ তাদের আর শিকার করা দরকার হয় না। কিন্তু সিন্ধু ঈগলের স্বভাবটি ঠিক তার উল্টো—যতক্ষণ শিকার জোটে ততক্ষণ সে মরা জানোয়ার পেলেও তা ছোঁয় না। কিন্তু একটি তার বদভ্যাস আছে, সেটাকে ঠিক রাজার মতো বলা যায় না; সেটি হচ্ছে অন্যের শিকার কেড়ে খাওয়া!

সমুদ্রের ধারে ছোট বড় কতরকম পাখি—তারা সবাই মাছ ধরে খায়। নিতান্ত ছোট যারা তারা ধরে ছোট ছোট মাছ—সেসব মাছের উপর সিন্ধু ঈগলের কোন লোভ নাই। কিন্তু বড় বড় গাংচিল আর মেছো চিলগুলো যেসব বড় বড় মাছ জল থেকে টেনে তোলে তার দু-চারটা যে মাঝে মাঝে সিন্ধু ঈগলের পেটে যায় না, এমন নয়। সমুদ্রের ধারে শিকারের অভাব কি? মাছ খেয়ে যদি অরুচি ধরে, তবে এক-আধটা পাখি মেরে নিলেই হয়। তাছাড়া একটু ডাঙার দিকে ইঁদুর খরগোস এমনকি ছাগল-ছানাটা পর্যন্ত মিলতে পারে। কিন্তু তবু সে অন্যের শিকারে জবরদখল জাহির করতে

ছাড়ে না। এই যে ডাকাতি করে কেড়ে খাওয়া, এ বিদ্যায় সিন্ধু ঈগলের বেশ একটু কেরামতি আছে। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ডাকাতি করে। সারাদিন তারা আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে কোথায় গিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সে মেঘের রাজ্যে চলে গিয়েছে, পৃথিবীর উপর বুঝি তার কোন দৃষ্টি নেই। কিন্তু ঈগলের চোখ বড় ভয়ানক চোখ। ঐ উঁচুতে থেকেই সে সমস্ত দেখছে—কিছুই তার চোখ এড়াবার যো নাই। ঐ যে কত পাখি জলের ধারে খেলছে আর মাছ ধরছে, তার মধ্যে একটা মেছো-চিল ঘুরে ঘুরে শিকার খুঁজছে—ঈগল পাখির চোখ রয়েছে তারই উপর।

জলের নীচে একটা মাছ বারবার উঠছে আর নামছে, চিল কেবল তাই দেখছে—মাথার উপরে যে ঈগলরাজ টহল ফিরছেন সেদিকে তার খেয়ালই নাই। একবার মাছটা যেই ভেসে উঠেছে, আর অমনি ছোঁ করে মেছো-চিল জলের উপর পড়েছে। তারপর মাছ শুদ্ধ টেনে তুলতে কতক্ষণ লাগে! চিল ভাবছে এখন একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ভোজনে বসবে, এমন সময়, চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হীঁ—ভূতের হাসির মতো বিকট চীৎকার করে কি একটা প্রকাণ্ড ছায়া তার ঘাড়ের উপর ঝড়ের মতো তেড়ে নামল! সে আর কিছু নয়, সিন্ধু ঈগল; ঐ মাছটার উপর তার নিতান্তই লোভ পড়েছে। তাড়া খেয়ে চিলের বাছা পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পলাবে কোথায়? দুদিক থেকে দুইটা ঈগল ক্রমাগত তেড়ে তেড়ে ছোবল মারছে, তার একটি ছোবল গায়ে লাগলে হাড়ে মাংসে আলগা হয়ে যায়। তার উপর সেই বিকট আওয়াজ যখন কানের কাছ দিয়ে হেঁকে যায় তখন বুদ্ধিশুদ্ধি আপনা হতেই ঘুলিয়ে আসে। কাজেই মেছো-চিলের মাছ খাওয়া এবারে আর হল না। সে বারকয়েক ঈগলের ঝাপ্‌টা এড়িয়ে তারপর প্রাণের ভয়ে মাছটাছ ফেলে পালাল।

সিন্ধু ঈগল অনেক সময় সমুদ্র ছেড়ে বড় বড় নদীর ধারে গাছের উপর বাসা বাঁধে। সে বাসাও একটি দেখবার মতো জিনিস। এক একটা বাসা ৫/৭ হাত চওড়া; বছরের পর বছর সেটাকে তারা ক্রমাগতই উঁচু করে একটা রীতিমত সিংহাসন বানিয়ে তোলে। এই বাসা বানানো ব্যাপারটা নাকি দেখতে ভারি মজার। একটা ঈগল অনেক কষ্ট করে কতগুলো ডাল সংগ্রহ করে আনল—আর একটা হয়ত সেগুলো পছন্দই কবল না। এমনি করে যত ডালপালা জোগাড় হয় তার অধিকাংশই খামখা নেড়ে-চেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন তা নিয়ে তাদের মধ্যে ভারি একটা ঝগড়া লেগে যায়; তারা বাসা বানানো বন্ধ রেখে মুখ ভার করে বসে থাকে। আবার হঠাৎ খানিক বাদেই তারা আপসে ভাব করে বাসা বানাতে লেগে যাবে।

এরা সাধারণত মানুষকে কিছু বলে না—বরং তাড়া করলে বাসাটাসা ফেলে পালায়। তবে, বাসায় যদি ছানা থাকে, তাহলে তাড়াতে গেলে অনেক সময়ে উল্টে তেড়ে আসে। তখন দেখা যায় তাদের তেজ কেমন সাংঘাতিক। একবার এক সাহেবের চাকর তামাসা দেখবার জন্য গাছে উঠে ঈগলের বাসায় উঁকি মারতে গিয়েছিল। তাতে ঈগলেরা তাকে তেড়ে এসে এমনি সাজা দিয়েছিল যে সাহেব বন্দুক নিয়ে ছুটে না আসলে সেদিন তার তামাসা দেখবার শখ একেবারে জন্মের মতো ঘুচে যেত।

ধনঞ্জয়

এ পাখির ইংরাজি নাম হর্নবিল্ (Hornbill) অর্থাৎ শৃঙ্গচঞ্চু কিন্তু তার আসল বাংলা নামটি যে কি, তা আর খুঁজে পেলাম না। লোকে তাকে ধনঞ্জয় বা ধনেশ পাখি বলে কিন্তু অভিধান খুঁজতে গিয়ে দেখি, ও নামে কোন পাখিই নেই। ওর কাছাকাছি একটা আছে, তার নাম ধনচ্চু—'হাড়গিলার আকার-বিশিষ্ট পক্ষীবিশেষ, করেটু পক্ষী'। 'করেটু' মানে 'কর্করেটু পক্ষী'—'কর্করেটু' মানে 'করাটিয়া পক্ষী'। আবার 'করাটিয়া'র মানে দেখতে গেলে আরও কত নাম বেরুতে পারে, সেই ভয়ে আর দেখা হল না। যা হোক, নাম দিয়ে যদি কেউ চিনতে না পারে, তবে চেহারাটা দেখলে তার পরিচয় পেতে বোধহয় দেরি হবে না—কারণ, এ চেহারা একবার দেখলে আর সহজে ভুলবার যো নেই।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যত অদ্ভুত পাখি আছে, তার মধ্যে 'ফার্স্ট প্রাইজ' কাউকে দিতে হলে বোধ হয় একেই দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেবেলায় যখন এই পাখিকে প্রথম দেখি তখন তার নাম দিয়েছিলাম 'দুই-ঠোঁটওয়ালা পাখি'। বাস্তবিক কিন্তু এর একটা মাত্রই ঠোঁট। উপরেরটা শিং বলতে পার—সেটার সঙ্গে তার মুখ বা ঠোঁটের কোন সম্পর্কই নেই। অত বড় একটা জমকালো শিং দিয়ে তার কি যে কাজ হয়, তা দেখতে পাই না। অত্যন্ত নিরীহ পাখি, কারও সঙ্গে গুঁতাগুঁতি করবার সাহস তার আছে কিনা সন্দেহ। চেহারা দেখলে মনে হয়—'বাপরে! এই ঠোঁটের একটি ঠোকর খেলেই ত গেছি'। কিন্তু নিতান্ত ঠেকা না পড়লে গুঁতা মারার অভ্যাসটিও তার নেই বললেই হয়।

এত বড় ঠোঁট তার উপর এমনধারা শিং, এই বিষম বোঝা বয়ে বয়ে পাখিটার মাথাও কি ধরে না? চলতে ফিরতে উড়তে গিয়ে সে কি উলটেও পড়ে না? আসল কথা কি জান? তার ঠোঁটটি আর শিংটি আগাগোড়াই ফাঁপা, কাঁকড়ার খোলার মতো হালকা। তাই তার ঠোঁট নিয়ে বড় বড় গাছের আগডালের উপরে সে লাফিয়ে বেড়ায় —খাবার দেখলে ঝুপ করে উড়ে এসে পড়ে। কেবল তাই নয়, তার দিকে খাবারের টুক্‌রো ছুঁড়ে দেখ দেখি, সে কেমন চট্‌পট্ ঘাড় ফিরিয়ে তার বিশাল ঠোঁটের মধ্যে খাবার লুফে নেবে। এ বিষয়ে তার মতো ওস্তাদ আর বোধহয় দ্বিতীয় নেই; আর এমন খানেওয়ালাও বোধহয় আর একটি পাওয়া দুষ্কর।

এক সাহেবের এক পোষা ধনঞ্জয় ছিল—সে আমাদের দেশে নয়, বোর্নিও দ্বীপে। সে দেশে এই পাখি অনেকেই পুষে থাকে। সাহেব বলেন, এমন সর্বনেশে পেটুক জীব আর কোথাও মেলে না। সেই এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই তাকে খাইয়ে খাইয়েও মানুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারত না। এইমাত্র খাইয়ে গেলে, আবার পাঁচ মিনিট পরেই দেখবে হতভাগা ল্যাজের উপর ভর দিয়ে পা মুড়ে বসে বসে প্রকাণ্ড হাঁ করে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে বিকট কান্না লাগিয়েছে। তারপর একটু বয়স হলে তখন তার

অত্যাচারে বাড়িতে টেঁকা দায় হয়ে উঠল। খাবার সময় তার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তাকে আটকে রাখতে হত, তা নইলে সে পাতের খাবারে, ভাতের হাঁড়িতে, ব্যঞ্জনের বাটিতে, দুধের কড়ায় যেখানে সেখানে মুখ দিয়ে সকলকে অস্থির করে করে তুলত। মাছমাংস, ডালভাত, রুটিবিস্কুট, ময়দার ডেলা, যা দাও তাতেই সে খুশী কিন্তু পেট ভরে দেওয়া চাই। পেটটি ভরলেই সে উড়ে গিয়ে গাছের আগায় বিশ্রাম করবে, রোদ পোহাবে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নতুন করে সাংঘাতিক খিদে ডেকে আনবে।

ধনঞ্জয় পাখির চালচলন স্বভাব যাঁরা লক্ষ করেছেন তাঁরা বলেন, এই পাখির বাসা বাঁধবার ধরনটি তার চেহারার চাইতে কম অদ্ভুত নয়। যখন ছানা হবার সময় হয় তখন মা-পাখিটা একটা গাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আর বাবা-পাখি সেই কোটরের মুখটাকে কাদামাটি শেওলা দিয়ে বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দেয়—কেবল একটুখানি ফোকর রাখে, তা না হলে বাইরে থেকে খাবার দেবে কি করে? সেই কোটরের মধ্যে ডিম পেড়ে মা-পাখি দিনের পর দিন তার উপর বসে বসে তা দেয়। আর বাবা-পাখি বাইরে থেকে পাহারা দেয়, আর ফোকরের ভিতর দিয়ে সারাদিন খাবার চালান করে। এমনি করে যখন ডিম ফুটে ছানা বেরোয়, আর সেই ছানাগুলো যখন একটু বড় হয়, তখন বাসা ভেঙে মা-পাখি বেরিয়ে আসে। এতদিন বদ্ধ জায়গায় বসে বসে তার পা এমন আড়ষ্ট হয়ে যায় যে কোটর থেকে বেরোবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে উড়তে পারে না, ভাল করে চলতে ফিরতেও পারে না। এই বাসা গড়া ও ভাঙার সময় ধনঞ্জয়ের লম্বা ঠোঁট আর শিং এ দুটোই বোধহয় বেশ কাজে লাগে।

ধনঞ্জয় পাখি আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নানা জায়গায় বাস করে এবং তার নানারকম চেহারা দেখা যায়। উড়িষ্যা দেশে এ পাখির নাম 'কুচিলাখাই'। 'কুচিলাখাই'য়ের গায়ের রং কালো, তার উপর ঠোঁট আর শিঙের চক্‌চকে লালচে হলুদ দেখতে বেশ মানায়। নেপালের লাল ধনঞ্জয়ের শিং নেই বললেই হয়, কিন্তু তার মুখে মাথায় খুব গম্ভীর গোছের কেশর আছে আর ঠোঁটদুটো করাতের মতো দাঁতাল। সুমাত্রা দ্বীপের ধনঞ্জয়ের শিং একেবারেই নেই, কিন্তু তার জমকালো কেশরটি অতি চমৎকার ধবধবে সাদা। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের শিংও আছে, কেশরও আছে। শিঙের রকমারিও অনেক দেখা যায়—কারও শিং খড়্গের মতো বাঁকা, কারও কিরিচের মতো সোজা, আবার একজন আছেন তাঁর শিংটি শশার মতো গোল, তার উপরে ঝুঁটি।

ধনঞ্জয়ের চেহারাটি যেমন বিকট তার গলার আওয়াজটিও তেমনি কট্‌কটে। বনের মধ্যে হঠাৎ তার গলা শুনলে পাখিরা ত ভয় পায়ই, বাঁদর বা বনবেড়াল পর্যন্ত ভয়ে পালায় এমনও দেখা যায়। তা ছাড়া তার মাংস নাকি এমন বিস্বাদ যে কুকুরেও খেতে চায় না।

ধনঞ্জয়ের কথা বলতে গেলে আর-এক পাখির কথা বলতে হয়—তার নাম টুকান (Toucan) এই পাখির বাসা আমেরিকায়। এদের গায়ে অনেক সময়ে খুব জমকালো রঙের বাহার দেখা যায়—কিন্তু আসল দেখবার জিনিস এদের সাংঘাতিক লম্বা ঠোঁট দুখানি। দেখলে মনে হয় যত বড় পাখি প্রায় তত বড় ঠোঁট—যেন 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'। তাতে চেহারাটি কেমন খোলে, তার আর বেশি বর্ণনা করবার দরকার নেই। দেখতে অনেকটা ধনঞ্জয়ের মতো হলেও আসলে এরা ধনঞ্জয় নয়—আর ধনঞ্জয়ের মতো অত বড়ও হয় না।

পাখির বাসা

মানুষ যেমন নানারকম জিনিস দিয়ে নানা কায়দায় নিজেদের বাড়ি বানায়—কেউ ইঁট, কেউ পাথর, কেউ বাঁশ-কাদা, কেউ মাটি; কারো এক-চালা, কারো দো-চালা—পাখিরাও সেরকম নানা জিনিস দিয়ে নানান কায়দায় নিজেদের বাসা বানায়। কেউ বানায় কাদা দিয়ে, কেউ বানায় ডাল-পালা দিয়ে, কেউ বানায় পালক দিয়ে, কেউ বানায় ঘাস দিয়ে; তার গড়নই বা কতরকমের—কারো বাসা কেবল একটি ঝুড়ির মতো, কারো বাসা গোল, কারো বাসা লম্বা চোঙার মতো। এক একটা পাখির বাসা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, তাতে বুদ্ধিই বা কত খরচ করেছে, আর মেহনতই বা করেছে কত! পাখির বাসা তোমরা অনেকেই দেখেছ বোধহয়। কেমন সুন্দর করে শুকনো ঘাস দিয়ে বুনে তার বাসাটি সে তৈরি করে। পাছে কোন জন্তু বা সাপ বাসা আক্রমণ করে, সেজন্য বাসায় ঢুকবার রাস্তা তলার দিকে। শত্রুকে জব্দ করবার আর একটা উপায় তারা করেছে—অনেক সময় বাসার গায়ে আর একটা গর্তের মতো মুখ তৈরি করে রাখে, সেটা কেবল ঠকাবারই জন্যে, তার ভিতর দিয়ে বাসার মধ্যে ঢোকা যায় না।

টুনটুনি পাখি তার বাসা তৈরি করার আগে দুটি কি তিনটি পাতা সেলাই করে একটা বাটির মতো তৈরি করে; তার মধ্যে নরম ঘাস পাতা দিয়ে সে তার বাসাটি বানায়। সেলাইয়ের সুতো সাধারণত রেশমেরই ব্যবহার করে; কাছে রেশম না থাকলে যে সুতো পায় তাই দিয়ে করে। সেলাইয়ের ছুঁচ হল তার সরু ঠোঁট-জোড়া। বাসাটা অনেকটা দোলনার মতো ঝুলতে থাকে। খুব ছোট জাতের পাখিরা হিংস্র জন্তু আর সাপ গিরগিটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায়ই ঐরকম দোলনার মতো বাসা তৈরি করে থাকে। অনেক জাতের পাখি আবার মাটিতেই বাসা করে; গাছে বাসা তারা পছন্দই করে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাসা তৈরিই করে না। নিজেরা গাছের আড়ালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। মোরগ, তিতির, পেরু এরা সবই এই জাতের। আবার কোন কোন পাখি সুন্দর করে লতা পাতা দিয়ে কুঞ্জবনের মতো বানায়। অস্ট্রেলিয়া দেশের 'কুঞ্জ-পাখি' (Bower bird) তার বাসার সামনে খুব সুন্দর লতা-কুঞ্জ তৈরি করে। পাখিটি আকারে ছোট বটে, কিন্তু কুঞ্জটি কিছু ছোট হয় না। এদের আবার রংচঙে জিনিসের বড় সখ; ভাঙা কাচ, পাথর, রঙিন জিনিস, যা সামনে পাবে সব এনে বাসার চারিদিকে সাজিয়ে রাখবে।

কোন কোন পাখি থুতু দিয়ে বাসা তৈরি করে। তালচোঁচ পাখি এই জাতের। পালক, ঘাস এসব জিনিস থুতু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তার বাসা তৈরি হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে এক জাতের তালচোঁচ আছে, তারা কেবলই থুতু দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। চীন দেশে এ বাসার খুব আদর; তারা এর ঝোল বানিয়ে খায়। এইজন্য সে দেশে এর দামও খুব বেশি।

অনেক জাতের পাখি কাদা দিয়েও তাদের বাসা বানায়। আফ্রিকার ফ্লামিঙ্গোর বাসা কাদার তৈরি। একটা ঢিপির মতো কাদা সাজিয়ে তার মাঝে একটা গর্ত করে ফ্লামিঙ্গো ডিম পাড়ে। আরো অনেক জাতের পাখিও কাদার বাসা বানায়; তাদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

তোমরা অনেকেই বোধহয় কাঠ-ঠোকরা দেখেছ। এরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে গাছের গায়ে গর্ত করে তার ভিতর বাসা বানায়। দুষ্টু ছেলেরা ছানা চুরি করার লোভে কাঠ-ঠোকরার বাসার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সাপের কামড় খায়, কারণ সাপেরা কাঠ-ঠোকরার বাসা ডাকাতি করে অধিকার করতে বড় পটু।

মাছি

আমার সামনে টেবিলের উপর এক টুকরা চিনি পড়িয়াছিল। একটা মাছি খুব মন দিয়া সেইটাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিনির কাছে মুখ রাখিয়া সে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া আছে, মনে হয় সে একটা ভারি ভাবনায় পড়িয়া হঠাৎ যেন গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে সে এখন আহারে ব্যস্ত। তাহার মুখের তলায় শুঁড়ের মতো কি একটা জিনিস বারবার ওঠানামা করিতেছে। একবার চকিতে চিনির উপর ঠেকিয়া আবার মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ঢুকিয়া যাইতেছে। কাজটা এত চট্‌পট্‌ তাড়াতাড়ি চলিতেছে যে ভাল করিয়া না দেখিলে চোখে ধরাই পড়ে না।

ভাবিলাম এই বেলা মাছিটাকে ধরিয়া ফেলি। কিন্তু মাছিটা আমার চাইতেও অনেকখানি চট্‌পটে, আমার হাত একটু নড়িতেই সে ব্যস্ত হইয়া উড়িয়া গেল। বাস্তবিক, মাছির চোখ এড়ান খুবই শক্ত। ঐ যে তাহার লালমত মাথাটি দেখিতে পাও ঐ সমস্ত মাথাটি তাহার চোখ। একটি নয়, দুটি নয়, হাজার হাজার চোখ। অনুবীক্ষণ দিয়া বেশ বড় করিয়া দেখিলে মনে হয়, মাথাটি যেন অতি সূক্ষ্ম জাল দিয়া মোড়া। আরো বড় করিয়া দেখিলে দেখা যায় সেই জালের প্রত্যেকটি ফোকর এক একটি আস্ত চোখ। প্রত্যেকটি চোখের ভিতর একটি পর্দা—প্রত্যেকটি পর্দার উপর বাহিরের জিনিসের এক একটি অতি ক্ষুদ্র ছায়া পড়ে। এইরকম হাজার হাজার চক্ষু, মেলিয়া না জানি সে জগৎটাকে কিরকম দেখে।

অনুবীক্ষণ দিয়া মাটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানে দেখিবে সেখানেই সূক্ষ্ম কৌশলের অদ্ভুত কান্ড। ঐ যে শুঁড়ের মতো তাহার জিভটি, সেও একটা কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাখার মতো ছড়ানো জিনিসটি তাহার জিভের আগা। শিরার মতো জিনিসগুলির প্রত্যেকটি এক একটি নল। সেই নল দিয়া সে খাবার জিনিস চুষিয়া খায়। নলগুলি সমস্তে মিলিয়া গোড়ার দিকে মোটা চোঙার মতো হইয়াছে, সেই চোঙার ভিতর দিয়া খাবার জিনিস তাহার মুখের মধ্যে ঢুকিতে পায়। যদি আরও সূক্ষ্মভাবে খুব ভালো অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ, দেখিবে প্রত্যেকটি নলের মধ্যে আবার আরও কত সূক্ষ্ম কারিকরি। এক একটি নল যেন অসংখ্য আংটির মালা—আংটির উপর আংটি বসান, তাহাতে অসম্ভবরকম পাতলা চামড়ার ছাউনি। ঐ নলগুলার গায়ে

দুপাশে যে দুইটি কালো দাঁড়ার মতো দেখিতেছ, ঐ দুইটি গুটাইলে সমস্ত জিভটা ছাতার মতো গুটাইয়া যায়। জিভটা যখন মুখের ভিতর থাকে তখন তাহাকে এমনিভাবে গুটাইয়া মুড়িয়া রাখিতে হয়, আবার আহারের সময় দাঁড়া দুটি নাড়া দিলেই নলগুলি মুহূর্তের মধ্যে ছড়াইয়া ঝাড়ের মতো ঝুলিয়া বাহির হয়। গরু বা ঘোড়ার গায়ে একরকম বড় মাছি বসে, তাহাদের ডাঁশ বলে। ডাঁশেরা রক্তপায়ী, সুতরাং তাহাদের জিভের সংগে একজোড়া করিয়া হুল থাকে। জিভটাও মাছির জিভের চাইতে অনেকখানি সরু—দেখিতে কতকটা বোতলের মতো। হুলের খোঁচায় জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া সেই ফুটার মধ্যে ইহারা জিভের আগাটুকু ঢুকাইয়া রক্তপান করে।

তারপর দেখ মাছির চরণখানি। ইহার মধ্যেও দেখিবার মতো জিনিস অনেক আছে। প্রথমেই চোখে পড়ে ঐ শিঙের মতো অদ্ভুত জিনিস দুইটি। কিন্তু বাস্তবিক দেখিবার মতো জিনিস চাও ত পায়ের ঐ উঁচু ঢিবলি দুইটিকে দেখ। ঐ দুইটি নরম তেলোর উপর ভর দিয়া মাছি আমাদের খাবারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। খাবার জিনিসে যে পা ঠেকাইতে নাই, অন্তত পা-টাকে যে ভাল করিয়া সাবান দিয়া ধোয়া উচিত, সে খেয়াল ত মাছির নাই। সে অখাদ্য ময়লা জিনিসের উপর তিন জোড়া চরণ চাপাইয়া সেই চরণের ধূলি আবার আমাদের খাবারের উপর ঝাড়িয়া যায়। তাহার সংগে কত যে রোগের বীজ চলিয়া আসে, তাহা ভাবিলেও ভয় করে। ঐ পায়ের তেলোটিকে অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে অনেক সময় দেখা যায় উহাতে সাংঘাতিক রোগের বীজ কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। সেইজন্য লোকে বলে যে মাছিকে খাবারের উপর বসিতে দিয়ো না। পায়ের তেলোটি আগাগোড়া বোলতার চাকের মতো অসমান—তাহার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র—সেই ফুটা দিয়া সে যে-কোন জিনিসকে চুষিয়া ধরিতে পারে। তাই কাচের মতো পালিশ জিনিসের উপরেও চলাফিরা করিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় না। দরকার হইলে ঐ ফুটাগুলির ভিতর হইতে সে একরকম আঠাল রস বাহির করিতে পারে, তাহাতে পা আরও মজবুতভাবে আঁটিয়া বসাইবার সাহায্য হয়।

মাছি উড়িবার সময় প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ছয়শত বার ডানা ঝাপটায়। খুব ব্যস্ত হইলে এক সেকেন্ডে সে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত উড়িয়া যাইতে পারে। অতটুকু প্রাণীর পক্ষে ইহা বড় সামান্য কথা নয়। মাছিটাকে যদি একটা ঘোড়ার মতো কল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহার দৌড়টি হয় যেন কামানের গোলার মতো।

বাতাস ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচে না—মাছিরও তেমনি নিশ্বাস না লইলে চলে না। আমরা নিশ্বাস লই ফুসফুসে বাতাস পাইবার জন্য। আমাদের বুকের দুপাশে দুটি হাপরের মতো যন্ত্র আছে, তাহারই নাম ফুসফুস বা Lungs। ঐ ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়া শরীরের রক্তকে তাজা করিয়া তোলে। মাছির সমস্ত শরীরটাই যেন একটা প্রকান্ড ফুসফুস। তাহার শরীরের দুপাশে ছোট ছোট ফুটা থাকে—সেইগুলিই তাহার নিশ্বাস লইবার ছিদ্র বা নাক। শরীরের ভিতরে সরু সরু শিরার মতো অসংখ্য প্যাঁচান নল তাহার গায়ের রক্তের মধ্যে ডুবান রহিয়াছে। সেই নলের ভিতর দিয়া বাতাস চলে আর রক্ত তাজা হইয়া উঠে।

আমাদের যেমন অসুখ-বিসুখ আছে, মাছিরও তেমনি। এই এখন আমকাঁঠালের সময় এত মাছি দেখিতেছ, আর কিছুদিন পরেই তাহারা কমিতে আরম্ভ করিবে। একরকম ছাতাপড়া ব্যারামে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মাছি মারা যায়।

মাছির কথা বলিতে গেলে তাহার জন্মের কথাও বলিতে হয়। আঁস্তাকুড়ের

ময়লার মধ্যে বা গোবরের গাদার মধ্যে মাছিরা ডিম পাড়িয়া যায়। খুব ছোট সাদা সাদা চালের মতো ডিমগুলি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে একরকম পোকা বাহির হয়। সপ্তাহখানেক ধরিয়া এই পোকাগুলি অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে আর বারবার খোলস বদলায়। তারপর পোকাটা শুকাইয়া কেমন গুটি পাকাইয়া যায়—তাহাতে তামাটে রং ধরিয়া আসে। এইভাবে আরও কয়েকদিন থাকিলেই সেই গুটির ভিতর হইতে আস্ত মাছিটা বাহির হইয়া আসে। তারপর তাহার চেহারার আর কোনও পরিবর্তন হয় না। জন্মিবার সময় তার শরীরটি যতটুকু থাকে মরিবার সময়ও ঠিক ততটুকু। সাধারণত আমরা যেসব মাছি দেখি, তাহাদের ডিমগুলি দেখিতে নিতান্তই সাদাসিধা—তাহার গায়ে কোন কারিকরি নাই। কিন্তু এক একরকম মাছি আছে তাহারা অতি আশ্চর্যরকমের সুন্দর ডিম পাড়ে।

ছারপোকা এবং মশা কামড়াইতে জানে, মাছির সে বিদ্যা নাই। সেইজন্য মানুষে ছারপোকা ও মশা তাড়াইতে যত ব্যস্ত হয়, মাছির ভয়ে ততটা ব্যস্ত হয় না। কিন্তু উৎপাত হিসাবে মাছিকে কাহারও চাইতে কম বলা চলে না। মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজদের সহিত তুর্কীদের লড়াই চলিতেছে সেখানে গ্রীষ্মকাল আসিলেই মাছির উপদ্রব এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠে যে, কেবল মাছি মারিবার জন্যই হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া নানারকম কল-কৌশল খাটাইতে হয়। মাছি যেখানে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানে কেবল হাতে মারিয়া তাহাদের কত শেষ করিবে? নানারকম ফাঁদ পাতিয়া বিষাক্ত খাবারের লোভ দেখাইয়া একেবারে দলে দলে তাহাদের বংশকে বংশ উজাড় করিতে হয়। তা না হইলে সে দেশে মানুষের তিষ্ঠান দায় হয়।

ফড়িং

ফড়িং পাওয়া যায় না, এমন দেশ খুব কমই আছে। যে-দেশে লতাপাতা আছে আর সবুজ মাঠ আছে, সে দেশেই ফড়িং পাওয়া যাবে। নানান দেশে নানানরকমের ফড়িং, তাদের রং এবং চেহারাও নানানরকমের, কিন্তু একটি বিষয়ে সবারই মধ্যে খুব মিল দেখা যায়; সেটি হচ্ছে লাফ দিয়ে চলা। এই বিদ্যায় ফড়িঙের একটু বিশেষরকম বাহাদুরি দেখা যায়, কারণ অন্যান্য অনেক পোকার তুলনায় ফড়িঙের চেহারাটি বেশ বড়ই বলতে হবে। আরও অনেক বড় পোকা আছে, যেমন আরশুলা, যারা একটু-আধটু লাফাতে পারে; কিন্তু তাদের লাফানির চাইতে উড়বার ঝোঁকটাই বেশি। ফড়িঙের যদিও ডানা আছে, কিন্তু সেটা সে ঠিক উড়বার জন্য—অর্থাৎ বাতাস ঠেলে উঠবার জন্য—ব্যবহার করে না। তাতে কেবল লাফ দিবার সময় বাতাসে ভর করে শরীরটাকে কিছু হালকা করার সুবিধা হয় মাত্র। ফড়িঙের শরীরটা দেখলেই বোঝা যায় যে, ঐরকম লাফ দিবার আয়োজন করেই তাকে গড়া হয়েছে। তার শরীরের ভিতরটা বাতাসে পোরা বললেও হয়—অন্য কোন পোকার মধ্যে এতগুলা ফাঁপা নল প্রায়ই দেখা যায় না। শরীরটা হালকা হওয়ায় যে লাফাবার সুবিধা হয় তা সহজেই বুঝতে পার। তার উপর ফড়িঙের পা দুটিতেও একটু বিশেষরকমের কেরামতি আছে। পায়ের আগাটি যেন বঁড়শির মতো বাঁকান। লাফাবার সময় সে ঐ বঁড়শি দিয়ে সুবিধামত

গাছের ডালপালা কিছু একটা বেশ করে আঁকড়িয়ে ধরে। তারপর পা-টাকে জোর করে গুটিয়ে হঠাৎ টান ছেড়ে দেয়, আর সেইসঙ্গে সমস্ত শরীরটা ধনুকের ছিলার মতো ছিট্‌কিয়ে যায়। এরকম সাংঘাতিকভাবে লাফাতে গিয়ে যাতে হাত পা জখম না হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থা, তার ডানা দুটি। লাফ দিয়ে পড়বার সময় ঐ ডানার উপর ভর দিয়ে সে লাফানির ঝুঁকিটা সামলিয়ে নেয়। তারপর সামনের পা-গুলোর আগায় যে পুঁটুলি রয়েছে ঐগুলোতে পড়বার চোট্ কমিয়ে দেয়। ফড়িঙের ইংরাজি নামটিতেও তার ঐ লাফানির পরিচয় পাওয়া যায়। (Grass hopper অর্থাৎ "যিনি ঘাসের উপর লাফিয়ে বেড়ান")।

মাঠের মধ্যে ফড়িঙের 'চির্-চির্' শব্দ অনেক সময়ে খুব স্পষ্ট শোনা যায়। এই আওয়াজটি তার গলা থেকে বেরোয় না—তার যন্ত্রটি থাকে ডানার মধ্যে। ডানা দুটির গোড়ার 'উকা'র মতো খড়্‌খড়ে দুটি সরু তাঁতের উপর একটি পাতলা 'চামড়া'র ছাউনি। ঐ তাঁতের ঘষাঘষিতে আওয়াজ হয় আর ওই পাতলা চামড়াটিতে সেই আওয়াজটাকে বাড়িয়ে তোলে। এইরকম আওয়াজ করে তাদের কি লাভ হয়? একটা লাভ হয় এই যে তারা এমনি করে পরস্পরকে ডাকতে পারে। ভাল খাবার পেলে বা খুব ফর্তি হলেও তারা এইরকম করে ডাকে; ভয় পেলে চুপ করে থাকে। আশ্চর্য এই যে, স্ত্রী ফড়িংদের আওয়াজ নাই; কিন্তু তাদের 'কান' খুব ভাল।

'কান' বললাম বটে, কিন্তু একটা ফড়িং ধরে যদি তার কান খুঁজতে যাও, হয়ত খুঁজেই পাবে না; কারণ কানটি থাকে তার হাঁটুর কাছে না হয় পিঠের উপর! কানেরও আবার নানান রকম বেরকম আছে। কোনটা একেবারে খোলা দুটো পাতলা চামড়ার খোলা, কোনটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে বসান—কোনটার মুখে রীতিমত ঢাকনি দেওয়া।

বর্মধারী জীব

কচ্ছপ কুমির আর সজারু, এই তিন বর্মধারী জন্তুকে বোধহয় তোমরা সকলেই দেখেছ। এদের তিন জনের বর্ম তিনরকমের। কচ্ছপের খোলাটা যেন তার জ্যান্ত বাসা—তার মধ্যে মুখ হাত পা গুটিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখন দুর্গের মতো বর্মটাকেই দেখতে পাই—বর্মধারী যিনি, তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কুমিরের বর্মটা যথার্থই বর্ম, অন্য জন্তুর নখ দাঁতের অস্ত্র থেকে কেবল শরীরটাকে বাঁচানই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সজারুর বর্ম কেবল বর্ম নয়, সেটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্রও বটে।

কচ্ছপ আর কুমিরের কথা তোমরা অনেক শুনেছ, কিন্তু তাদের আশ্চর্য বয়সের কথা অনেকেই জানে না। হাতির বয়সের কথা শুনতে পাই, তারা নাকি অনেক বৎসর বাঁচে। কিন্তু এই দুই জন্তু দুশ আড়াইশ বৎসর যে বাঁচে তাতে কোন সন্দেহ নেই, চার-পাঁচশ বৎসর পর্যন্ত তাদের বয়স হয়—এ কথা প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করে থাকেন। এক ধরনের কচ্ছপকে বলে Giant Tortoise অর্থাৎ রাক্ষুসে কচ্ছপ। এরা এক একটি তিন, সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আগে পৃথিবীর নানা জায়গায় এরকমের কচ্ছপ পাওয়া যেত, কিন্তু পেটুক মানুষের অত্যাচারে তাদের

বংশ এমনভাবে লোপ পেয়ে এসেছে যে, এখন দু-একটি সমুদ্রের দ্বীপ ছাড়া এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এইরকম আর একটি রাক্ষুসে কচ্ছপকে মরিশাস্ দ্বীপে রাখা হয়েছে। সেই সময়ে তার বয়স যে খুব কম হলেও পঞ্চাশ বৎসর ছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই—সুতরাং এখন তার দুশ বৎসর পার হয়ে গেছে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা থুড়থুড়ে বুড়ো কচ্ছপ কয়েক বৎসর হল মারা গিয়েছে—তার বয়স আরও অনেক বেশি হয়েছিল—কেউ কেউ বলেন ৪০০ বৎসরেরও বেশি। কুমিরও অনেকদিন বাঁচে—বয়স নিয়ে কচ্ছপের সঙ্গে তার রেষারেষি হলে কে হারে কে জেতে সে কথা বলা শক্ত।

কুমিরের বর্মটি কতকগুলি চামড়ার চাক্তি মাত্র। চামড়ার মধ্যে মোটা মোটা কড়া জমিয়ে বর্মটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু কচ্ছপের খোলাটি শুধু চামড়া নয়—মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাঁজরের হাড় আর গায়ের চামড়া একসঙ্গে জুবড়িয়ে তাকে শিঙের মতো মজবুত করে বর্মের এই অদ্ভুত সৃষ্টি হয়েছে। আর সজারুর বর্মটি তৈরি হয়েছে তার লোম দিয়ে। লোমের গুচ্ছ মোটা আর মজবুত আর ধারাল হয়ে সাংঘাতিক কাঁটার বর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সজারুরা নিশাচর জন্তু। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে আর রাত্তিরে বেরিয়ে ফল-মূল গাছের পাতা খেয়ে বেড়ায়। গর্তের মধ্যে নরম ঘাস আর কচি পাতা দিয়ে তারা বাসা বানায়। সজারুর যখন ছানা হয় তখন ছানার কাঁটাগুলো থাকে ঘাসের মতো নরম, কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলো বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। সজারুর ল্যাজটা যেন একটা কাঁটার তোড়া, চলবার সময় তাতে খড়্মড় করে শব্দ হতে থাকে। কোন কোন সজারু খুব চট্পট্ গাছে চড়তে পারে, তাদের ল্যাজ প্রায়ই খুব লম্বা হয়। আবার কোন কোনটার কাঁটা বড় বড় লোমে ঢাকা।

কাঁটাওয়ালা জন্তু আরও অনেক আছে, কিন্তু সজারুর মতো এমন কাঁটার বাহার আর কারও নেই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার একিড্না (Echidna) জন্তুটির একটুখানি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, এমন অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে নিতান্তই অন্যায় হবে। সাধারণ একিড্নাগুলি বেড়ালের চাইতে বড় হয় না; কিন্তু 'ধাড়ি একিড্না' বা Proechidna আরও অনেকখানি বড় হয়—বেশ একটি ছোটখাট ভালুকের মতো। অস্ট্রেলিয়ার প্লেটিপাস (Platypus) বা হংসচঞ্চুর মতো এরাও স্তন্যপায়ী অথচ ডিম পাড়ে—ডিম ফুটে যে ছানা বেরোয় তারা মায়ের দুধ খায়। এই জন্তুর শরীরটি ছোট ছোট কাঁটায় ভরা—ছোট ছোট কিন্তু খুব শক্ত আর ধারাল। মুখখান' ওরকম অদ্ভুত ছুঁচ্‌ল হবার কারণ এই যে, এরা পিঁপড়ে-খোর। চোঙার মতো মুখ, তার মধ্যে একটিও দাঁত নেই—আছে খালি একটি প্রকাণ্ড সরু জিভ—তাই দিয়ে লক্‌লক্ করে পিঁপড়ে চেটে খায়। সজারুর মতো এরাও নিশাচর—তাই দিনের বেলায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে।

পিঁপড়ে-খোর জন্তুদের অনেকেরই মুখ ঐ চোঙার মতো কিন্তু সকলের গায়ে বর্ম নেই। যাদের গায়ে বর্ম আছে, তাদের নাম প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। এই জন্তুর বর্মের গড়ন ভারি অদ্ভুত; শিঙের মতো মজবুত চাকতি, সমস্তটি গায়ের উপর মাছের আঁশের মতো সাজান। পায়ের নখগুলি সাংঘাতিক মজবুত—তাই দিয়ে আঁচড়িয়ে তারা উইয়ের ঢিপি আর পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ফাঁক করে ফেলে। তারপর জিভ দিয়ে টপাটপ্ উই পিঁপড়ে চেটে খায়। হঠাৎ তাড়া করলে বা ভয় পেলে এরা ডিগবাজি খেয়ে ফুটবলের মতো গোল পাকিয়ে যায়। এদের গায়ের ধারাল আঁশগুলি তখন

চারিদিকে খাড়া হয়ে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্‌মাডিলো এ বিষয়ে আরো ওস্তাদ! সে যখন হাত পা গুটিয়ে শরীরটিকে লাড়ু পাকিয়ে ফেলে তখন কোথায় মুখ কোথায় হাত পা, কিছুই বুঝবার যো থাকে না। তার বর্মের গড়নটি মাছের আঁশের মতো নয়—চিংড়ি মাছের খোলার মতো।

বর্মধারী জীবের কথা বলতে গেলে আরও অনেক জন্তুরই নাম করতে হয়। শামুক ঝিনুক প্রবাল হতে আরম্ভ করে কাঁকড়া চিংড়ি বিচ্ছু, এমনকি মাছ গিরগিটি পর্যন্ত প্রাণের দায়ে কত দেশে কতরকম বর্ম এঁটে ফেরে তার আর সীমা সংখ্যা নেই। হাজাররকম জীবজন্তু, তারা সবাই যখন বাঁচতে চায় তখন বাঁচবার উপায়ও তাদের করতে হয়। বাঁচবার উপায় তিন রকম। এক হচ্ছে গায়ের জোরে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রবল হয়ে শত্রুকে মেরে বাঁচা; আর এক হচ্ছে দৌড়ের জোরে বা কলা-কৌশলে পালিয়ে আর লুকিয়ে বাঁচা; আর তৃতীয়টি হচ্ছে শরীরটিকে এমন জবরদস্ত করা যে, মারধর অত্যাচারের চোট সে সয়ে থাকতে পারে। বর্মধারী জীবেরা এই শেষ উপায়টিকে বাগাবার চেষ্টায় আছেন। এতে এক-একজন যে অনেকখানি ওস্তাদি দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ কি?

লড়াইবাজ জানোয়ার

এক-একজন মানুষ থাকে—কেবল সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধান হচ্ছে তাদের স্বভাব। কথায় কথায় যেমন তাদের মুখ চলে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলে। জানোয়ারদের মধ্যেও এইরকম বদমেজাজী জীবের অভাব নেই। যেসব বড় বড় জন্তুরা পেটের দায়ে অন্য জন্তু শিকার করে বেড়ায়, আমরা তাদের বলি শ্বাপদ জন্তু হিংস্র জন্তু। কিন্তু মানুষ যখন নিরীহ ছাগল ভেড়া বা হাঁস মোরগের গলায় ছুরি মেরে তাদের মাংস কেটে খায় তখন আমাদের মনেই হয় না যে আমরাও ঐ হিংস্র জন্তুর দলে। জানোয়ারদের মতো সাংঘাতিক নখ দাঁত বা শিং আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু তার বদলে যেসব ধারাল অস্ত্র আমরা ব্যবহার করি তাতে আমাদের হিংসা-বৃত্তির পরিচয়টা খুব ভালরকমেই পাওয়া যায়।

জানোয়ারদের মধ্যে যারা আমিষভোজী, অন্য জন্তুর মাংস না খেলে যাদের চলে না তারাই যে কেবল হিংস্র হয় তাও নয়। যারা নিরামিষ খায় যেমন হাতি, গণ্ডার, বুনো মহিষ বা বরাহ—তাদের মেজাজও সব সময় নিরীহ তপস্বীদের মতো হয় না। আর সে মেজাজ বিগড়ালে বেশ বোঝা যায় যে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে তারাও কম ওস্তাদ নয়। মহিষের শিং, বরাহের দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ অস্ত্র হিসাবে এগুলি কোনটাই বড় কম নয়। হাতিরও দাঁত আছে—কিন্তু তার চাইতে তার ঐ গোদা পায়ের চাপুনিটাই বোধহয় বেশি মারাত্মক।

ছোটখাট জন্তুদের আমরা হিংস্র জন্তু বলে বড় একটা গ্রাহ্য করি না, কারণ তাদের দিয়ে আমাদের বিশেষ কোনও অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাদের সমান জন্তুদের কাছে তারাও বড় কম ভয়ানক নয়। এমন যে নিরীহ কাঠবেড়ালী যে সারাদিন অন্য জন্তুর ভয়ে ভয়ে থাকে, কোথাও একটু শব্দ পেলেই চমকিয়ে ছুটে পালায়

ছোট ছোট পাখির বাসায় ডিমের সন্ধান পেলে সেও একজন রীতিমত অত্যাচারী হয়ে উঠতে জানে। হঠাৎ তাড়া খেলে বা ভয় পেলে ইঁদুর বা ছুঁচোর মতো ছোট জন্তুও বেশ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেরকম অবস্থায় তারা মানুষকেও কামড়াতে ছাড়ে না। আর সে কামড়ও বড় সামান্য নয়। ছুঁচোর কামড় খেয়ে মানুষকে কখন কখন মাসের পর মাস জ্বরে ভুগতে দেখা গিয়েছে।

কিছুদিন আগে এক সাহেব সাইকেল চড়ে বিলাতের এক পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার সময় পথের মাঝে নেমে তিনি সাইকেলের আলো জ্বালাচ্ছেন, এমন সময় ছোট্ট একটা বিলাতী বেজি ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। সাহেবের কি খেয়াল হল, তিনি রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে বেজিটার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই বেজিটা অদ্ভুত কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ করে উঠল; আর তাই শুনে কোত্থেকে বারো চোদ্দটা বেজি এসে একসঙ্গে সাহেবকে আক্রমণ করে বসল। তারা ক্রমাগত লাফ দিয়ে সাহেবের গলার টুঁটি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব একটুক্ষণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তারপর প্রাণের ভয়ে সাইকেল চড়ে সেখান থেকে চম্পট দিলেন। বেজিগুলো তবু প্রায় দেড়মাইল পথ সাইকেলের পিছন পিছন তাড়া করে এসেছিল। হঠাৎ কি করে যে বেজিদের এতখানি তেজ আর সাহস হয়ে উঠল তার কোনও কারণ পাওয়া যায় না; কারণ, সাধারণত তারা মানুষের শব্দ পেলেই ছুটে পালায়।

বেজিগুলো ইচ্ছা করলে খুব সহজেই সাহেবের পা কামড়াতে পারত, কিন্তু তা না করে তারা গলায় টুঁটির দিকেই বারবার তেড়ে উঠছিল; যেন তারা জানে যে ঐখানে কামড়ালে জখমটা হবে সাংঘাতিক। এরকম প্রায়ই দেখা যায় যে শিকারী জন্তুরা অন্য জন্তু মারবার সময় তাকে এমনভাবে মারে যাতে সে সহজেই কাবু হয়। 'হেজহগ্‌' (Hedgehog) বা কাঁটাচুয়ার সারা গায়ে কাঁটা, তার গায়ে কোথাও কামড় দেবার যো নেই; কিন্তু তার গলার নীচটাতে কাঁটা নেই, সেখানে কামড় দিলে বেচারা আর আত্মরক্ষা করতে পারে না। ইঁদুরেরা তাই সুযোগ বুঝে তার গলায় কামড় বসাবার চেষ্টা করে; ভুলেও কখন পিঠের উপর কামড় দিতে যায় না। বেজি যখন সাপের সঙ্গে লড়াই করে তখন তার দৃষ্টি থাকে সাপের ঘাড়ের কাছে, ঠিক ফণাটির পিছনে; সেখানে কামড় দিয়ে ধরলে সাপ আর উলটে ছোবল মারতে পারে না।

ছোট ছোট পোকামাকড়েরা পর্যন্ত এইসব সংকেত জানে। তোমরা বোল্‌তা আর মাকড়সার লড়াই দেখেছ? সে এক অদ্ভুত জিনিস। মাকড়সা জানে যে বোল্‌তার একটি কামড় খেলে তার আর রক্ষা নেই, তাই সে কেবলই জালের আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সেই জালের ভিতর থেকে সবগুলি পা একসঙ্গে বার করে সে বোল্‌তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কখন তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায় না। বোল্‌তাও বারবার ভন্‌ভন্‌ করে জালের কাছে পর্যন্ত তেড়ে এসে আবার পালিয়ে যায়, কারণ সেও জানে যে ওই জালের মধ্যে একবার আটকা পড়লে তার আর বের হবার উপায় নেই।

কেবল যে অন্য জন্তুদের সঙ্গেই জানোয়ারদের লড়াই বাধে, তা নয়। ছাগলের লড়াই, বেড়ালের ঝগড়া কিংবা কুকুরের কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি তোমরা সকলেই দেখেছ। কাগে কাগে কিংবা চড়াইয়ে চড়াইয়ে ঝগড়াও সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের ঘরে একটা ধাড়ি টিকটিকি আছে, সন্ধ্যার পর দেয়ালের বাতির কাছে যেসব পোকা বসে সে তাদের ধরে ধরে খায়। অন্য টিকটিকিকে ঘরের ত্রিসীমার মধ্যে আসতে দেখলে সে

তাকে তাড়া করে যায়, পাছে সে এসে তার খাবারে ভাগ বসায়। খাবারের জন্যে জানোয়ারদের মধ্যে রেষারেষি ত চলেই, বিয়ের জন্যেও রেষারেষি চলে। মনে কর, জঙ্গলে একজন পরমাসুন্দরী গণ্ডারনী আছেন আর দুটি ছোকরা গণ্ডার আছে, তাদের দুজনেরই তাঁকে ভারি পছন্দ। এখন উপায়? উপায় হচ্ছে দস্তুরমত লড়াই করে এর মীমাংসা করে নেওয়া। এরকম লড়াই হরিণদের মধ্যেও চলে, অন্যান্য অনেক জন্তুদের মধ্যেও চলে। পাখিদের মধ্যেও খুবই চলে।

এ ছাড়া এমন অনেক জন্তু আছে যারা কেবল লড়াইয়ের খাতিরেই লড়ে। যেসব দলছাড়া হাতি একলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা অনেক সময়েই এইরকম হয়। বুনো বরাহদের স্বভাবটাও নাকি অনেকটা এই ধরনের। আর, একরকম ভিমরুলের কথা আমি জানি, সে থাকে খাসিয়া পাহাড়ে, তার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ; তাকে কিছু না বললেও সে তেড়ে এসে বঁড়শির মতো হুল দিয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। আমার মাথায় ভাল করে কামড়াতে পারেনি, তবু তিনদিন ব্যথার চোটে আমার ঘুমান মুশ্কিল হয়েছিল।

নিশাচর

নিশাচর বলে তাদের যারা রাত জেগে চলাফেরা করে, অর্থাৎ আহার খোঁজে। নিশাচর জন্তুদের মধ্যে একটির নাম তোমরা সকলেই বলতে পারবে, সেটি হচ্ছে ‘প্যাঁচা’।

নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন? তার নানা কারণ আছে। প্রথমত যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোতে বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিয়ে চলবার সুবিধা হয়। যেমন আফ্রিকার ‘কাকাপো’ অথবা ‘প্যাঁচাটিয়া’। এদের ডানা ছোট বলে ভাল করে উড়তে পারে না; দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখিরা ঠুকরিয়ে অস্থির করে তোলে। ইঁদুর জাতীয় নানারকম নিরীহ জন্তু আছে, তারাও এরকম শত্রুর ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়।

কোন কোন জন্তু আছে তাদের শরীরের গঠন এমন যে তারা দিনের আলো, রোদ বা গরম সইতে পারে না। প্যাঁচার চোখ এমন অদ্ভুত যে সে আলোর দিকে ভাল করে তাকাতেই পারে না, সহজেই চোখ ঝলসে যায়। সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি যেসব জন্তুর রক্ত ঠাণ্ডা, তারা রোদে বেরোলে শরীরের রস শুকিয়ে যায়। তাই তারা সারাদিন ঝোপে জঙ্গলে ছায়ার মধ্যে থাকতে চায়।

আর একদল নিশাচর আছে, যারা রাত্রে বেরোয় ভালরকম শিকার জোটে বলে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড় বড় মাংসখোর জন্তুরা এই কারণেই অনেক সময় নিশাচর হয়। সন্ধ্যার পর নানারকম পোকামাকড় বেরোয় তাই পোকা-খোর জন্তুরাও ঐ সময়ই খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় যে চামচিকারা বা ‘নাকাটি’ পাখিরা ব্যস্ত হয়ে আকাশময় ছুটাছুটি করে, সেটাও তাদের ভোজের আনন্দ। ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় যে তারা উড়তে উড়তে পোকা ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছে।

‘লেমার’ বা ক্ষুদে বানরদেরও অনেকেই এই দলের মধ্যে পড়ে। তারাও রাত হলেই পোকামাকড় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে আলোর কাছে টিকটিকির পোকা শিকারের

উৎসাহ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। রাত্রে আলো দেখে যত পোকা এসে জড়ো হয় দিনের বেলায় একসংগে তত পোকা পাওয়া শক্ত। টিকটিকির ভোজটাও তাই সন্ধ্যার পরে জমে ভাল।

নিশাচর জন্তুদের প্রায় সকলের মধ্যেই একটি অভ্যাস দেখা যায়—সেটি হচ্ছে নিঃশব্দে চলা। প্যাঁচার শরীরটি ত নেহাৎ ছোট নয়, সে উড়তেও পারে বেশ; অথচ উড়বার সময় তার ডানা ঝাপ্‌টার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। রাত্রে অন্ধকারে দেখতে হয় বলে তাদের চোখ দুটোও তেমনি করে তৈরি। প্রায়ই দেখা যায় নিশাচর জন্তুদের চোখ প্যাঁচার মতো বড় আর গোল গোল হয়। সেইজন্যে অনেক সময় তাদের দেখতেও অদ্ভুত দেখায়। যেসব ক্ষুদে বানরদের কথা আগে বলেছি, তাদেরও চোখ মুখ আর চলাফেরা এমন অদ্ভুত গোছের হয় যে দেখলে অনেক সময় ভয় হয়। আরেকরকম বানর আছে, তার নাম 'টার্সীয়ের'। যে-দেশে এর বাড়ি সেখানকার লোকেরা একে 'ভূত বানর' বলে। এর সমস্ত কপালজোড়া বড় বড় চোখ, আর রোগা রোগা কাঠির মতো হাত পা। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি মেরেই রবারের মতো নিঃশব্দে লাফ দিয়ে আবার দশ হাত দূর থেকে উঁকি মারা—এই হচ্ছে এর চালচলনের ধরন। কারও কোন অনিষ্ট করে না, কেবল পোকামাকড় খেয়ে থাকে অথচ লোকে মিছামিছি তাকে ভূতের মতো ভয় করে। তার একটা কারণ সে নিশাচর।

আমাদের পুরাণে রাক্ষসদের নামও নিশাচর। তারাও নাকি দিনের আলোর চাইতে রাত্রের অন্ধকারটাই বেশি পছন্দ করে। আর চোর ডাকাত যারা পরের বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত মানুষের সর্বনাশ করে, তাদেরও 'শিকার' করবার সুবিধা হয় রাত্রে। আজকালকার সভ্য মানুষ রাতকে দিন করে রাখে। রাত্রেও হাজার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার কলকারখানা, রেল, স্টিমার চালাতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে ভদ্র মানুষকেও কাজকর্মের জন্য নিশাচর হতে হয়। ভোরবেলা যে খবরের কাগজটি পড় তার জন্যে যে কত লোকের রাত জেগে খাটতে হয় তা কখন ভেবে দেখেছ কি ? আর রেলে স্টিমারে ড্রাইভার গার্ড প্রভৃতি কতজনকে যে দিনের পর দিন রাতমজুরি খাটতে হয়, তারাও একরকম নিশাচর বৈকি !

নাকের বাহার

মানুষের নাকের প্রশংসা করতে হলে তিল ফুলের সংগে, টিয়া পাখির ঠোঁটের সংগে গরুড়ের নাকের সংগে তার তুলনা করে। কেউ কেউ আবার বলেন শুনেছি, 'বাঁশির মতো নাক'। কিন্তু মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে, সকলের নাকেরই মোটামুটি ছাঁদটি সেই একঘেয়েরকমের; দো-নলা সুরংগের মতো। কারো নলদুটি সরু, কারো বা মোটা, কারো চ্যাপটা, কারো উঁচু—কারো মাঝখানে ঢালু, কারো আগাগোড়াই ঢিপি—এইরকম সামান্য উনিশ-বিশ যা একটু তফাৎ হয়। কারো কারো নাক যদি হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা হত কি গণ্ডারের মতো খড়্গধারী হত, অথবা আর কোন উদ্ভট জানোয়ারের মতো হত, তাহলে বেশ একটু রকমারি হতে পারত।

হাতির শুঁড়টাই যে তার নাক এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। হাতির পরেই

যে জন্তুটির নাম করা যায়, তার নাম টেপির; এর নাকটিও শুঁড় হতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। তার পরেই মনে পড়ে পিঁপড়ে-খোরের কথা, এরও একটা শুঁড় আছে কিন্তু সেটা শুধু নাক নয়, নাকমুখ দুই মিলে লম্বা হয়ে ওরকম হয়ে গেছে। কুমিরেরও ঠিক তাই। আর একটি আছে চোঙামুখ, তার পরিচয়ও তোমরা সন্দেশে পেয়েছ ('সমুদ্রের ঘোড়া')। তারপর দুরকমের ছুঁচো আছে, তার একটির বেশ স্পষ্টরকম শুঁড় গজিয়েছে, আর একটি কেবল শুঁড়ে সন্তুষ্ট নয়, তার নাকের আগাটি হয়েছে ঠিক ফুলের মতো। এই সৌখিন ছুঁচোটির গায়ের গন্ধ কিন্তু ফুলের মতো একেবারেই নয়। তার চেয়ে জমকালো নাকের কথা যদি বলতে হয় তবে পুষ্পনাসা বাদুড়ের কথাটা নিতান্তই বলা উচিত। পর্দার পর পর্দা গোলাপফুলের পাপড়ির মতো সাজিয়ে তার উপরে যেন তিলক চন্দন এঁকে নাকটিকে তৈরি করা হয়েছে। এত ঘটা করে নাকের বাহার ফোটাবার উদ্দেশ্যটা কি, মুখের 'সৌন্দর্য' বাড়ান না শত্রুকে ভয় দেখান, তা আমি জানি না।

পুষ্পনাসার পরে আসে হংসচঞ্চু, তার নাকমুখ হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপটা। আর রয়েছে ম্যান্‌ড্রিল বাঁদর। এর রংটাই হচ্ছে এর আসল বাহার। টক্‌টকে লাল নাক, তার দু-পাশে নীলরঙের ঢিব্‌লি, তার উপর চমৎকার কারুকার্য— যারা কলকাতায় আছ তারা চিড়িয়াখানায় গেলেই একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে পার। ম্যান্‌ড্রিলের সঙ্গে মনে পড়ে নাকেশ্বর বানর। এর নাক সম্বন্ধে আর বেশি কথা বলবার দরকার নেই, ছোটখাট বেগুনের মতো নাকটি। বাঁদরের খাঁদা নাকের দুর্নাম সকলেই করে, কিন্তু এই নাকটি খাঁদা না হলেও তাতে তার সুনাম বাড়বে কিনা সন্দেহ।

ব্যাং যখন হাতির উপর রাগ করে বলেছিল "বড় যে ডিঙোলি মোরে"—তখন হাতি তাকে "থ্যাব্‌ড়ানাকী" বলে গাল দিয়েছিল। হাতির গালটা খুব লাগসই হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাঙের বংশেও যে সকলেরই থ্যাব্‌ড়া নাক, তা নয়। এমন ব্যাংও আছে যাদের নাকটি চড়াই পাখির ঠোঁটের মতো দিব্যি চোখাল।

কোন কোন জন্তু আবার শুধু নাকটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা নাকের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র জুড়ে বেড়ায়। গণ্ডারের খড়্গটি থাকে তার নাকের উপরে। আফ্রিকায় একরকম বরাহ আছে তার নাম বাবিরুসা, তার নাকের দুপাশে চামড়া ফুঁড়ে দুই জোড়া দাঁত শিঙের মতো উঁচু হয়ে থাকে। তলোয়ার মাছের নাকের ডগায় যে অস্ত্রটি বসান থাকে তাতে বাস্তবিকই তলোয়ারের কাজ হয়। করাতি মাছের তলোয়ারটির গায়ে আবার করাতের মতো দাঁত কাটা থাকে। বঁড়শিবাজ মাছের কথা শুনেছ—তারা নাকের আগায় বাঁকা ছিপের মতো লম্বা নোলক ঝুলিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য, অন্য মাছকে ভুলিয়ে এনে তার ঘাড় ভেঙে খাওয়া।

কোন কোন জন্তুর নাকটা যে কোথায় সেটা হঠাৎ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। তিমি মাছের মাথার উপর যেখানে তার চোখ থাকবার সম্ভাবনা মনে হয় সেখানে তার নাক থাকে। কাঁটাল গিরগিটির গা-ভরা উবড়ো খাবড়ো শিঙের মতো কাঁটার ঝোপ—তার মধ্যে তার নাক মুখ চোখ অনেক সময়েই বেমালুম লুকিয়ে থাকে। আর হাতুড়ি-মুখো হাঙরের চেহারা ত আগাগোড়াই উলটারকম। একটা দুমুখো হাতুড়ির মতো তার মাথা, সেই হাতুড়ির দুই মাথায় দুটি চোখ। আর নাকটা হচ্ছে হাতুড়ির মাঝামাঝি—হাতুড়ির ডাণ্ডাটা যেখানে বসান থাকে সেইখানে।

এখন তোমরা বল, এর মধ্যে কার নাকের বাহার বেশি।

জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা

গ্রীষ্ম আসিতেছে-- তোমরা কতজনে হয়ত এখন হইতেই তাহার কথা ভাবিতেছ। কবে ছুটি হইবে, তারপর কে কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া সময় কাটাইবে ইত্যাদি কত কথা। গ্রীষ্মের সময়ে যে দেশে গরম কম সেই দেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাই লোকে সিমলা যায় দার্জিলিং যায় শিলং যায়। এরকমে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার ইচ্ছা কেবল যে আমাদেরই হয় তাহা নয়, পশুপক্ষী সকলেরই মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়।

শীতের দেশের পাখি যাহারা হিমালয়ের উত্তরে সারা বছর কাটায়, তাহারা প্রতি বছর শীতকালে আমাদেরই গরম দেশে হাওয়া খাইতে আসে। কোথায় হিমালয় আর কোথায় এই বাংলাদেশের দক্ষিণ; অথচ বছরের পর বছর কত হাঁস কত বক এই লম্বা পথ পার হইয়া আসে, আবার শীতের শেষে ঠিক নিয়মমত সময়ে হিমালয় ডিঙাইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। কোথা হইতে যে তাহারা এ দেশের সন্ধান পায়, আর কেমন করিয়াই বা এতখানি পথ চিনিয়া আসে, তাহা কে বলিতে পারে? এরকম যাওয়া-আসা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। গরম দেশের পাখি গ্রীষ্মের ভয়ে ঠাণ্ডা দেশে চলিয়াছে; আবার ঠাণ্ডা দেশের পাখি শীতের তাড়ায় গরম দেশে শীতকাল কাটাইতেছে। আশ্চর্য এই যে, এ সকল পাখি এমন ভরসার সঙ্গে হিসাবমত চলাফিরা করে যে, মনে হয় যেন পথঘাট সবই তার জানা আছে। যেখানে পথঘাটের কোন চিহ্ন নাই, রাস্তা চিনিবার কোন উপায়ও নাই, সেই অকূল সমুদ্রের মধ্যে দিয়াও তাহারা নির্ভয়ে পথ বুঝিয়া চলে। মেঘ বৃষ্টি কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুতেই তাহারা পথ ভুলে না। এইরূপে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখি মাস ঋতুর হিসাব রাখিয়া আকাশে পাড়ি দিয়া ফিরে।

এ ত গেল পাখির কথা। বড় বড় ডাঙার জন্তুও যে এইরূপে দল বাঁধিয়া প্রবাস যাত্রা করে, এরকম ত কত সময়েই দেখা যায়! জেব্রা জিরাফ হাতি হরিণ বুনো মহিষ ইহারা সকলেই সময়মত এ-বন ও-বন ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার বাইসনগুলি যখন শীতের সময় বড় বড় দেশ পার হইয়া সবুজ বন আর তাজা ঘাসের সন্ধানে যাত্রা করে, তখন তাহারা একেবারে মাইলকে মাইল পথ জুড়িয়া চলে। এক সময়ে এই বাইসনের চলাফেরা আমেরিকায় সহজেই দেখা যাইত কিন্তু নানা কারণে এখন বাইসনের সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষের অত্যাচার খুব একটা বড় কারণ বলিতে হইবে। যখন বড় বড় দল গোঁ-ভরে নদীজল ভাঙিয়া মাঠ ঘাট পার হইতে থাকে তখন যাহারা দুর্বল, যাহারা চলিতে পারে না, তাহাদের অনেকে পিছে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে নানারকম মাংসাশী জন্তু আসিয়া তাহাদের মারিয়া শেষ করে। কিন্তু তবু মানুষে অত্যাচার না করিলে এখনও তাহারা লাখে লাখে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত! মানুষ কয় বৎসর সেখানে বসবাস না করিতেই পঞ্চাশ লক্ষ বাইসন খাইয়া হজম করিয়াছে। এক-এক দল লোক এক-এক বারে দশ বিশ হাজার বাইসন মারিয়া তবে ছাড়ে।

হাতিরা দল বাঁধিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় কিন্তু সেটা কেবল খাবার সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। দেশ ছাড়িয়া লম্বা দৌড় দেওয়ার অভ্যাসটা তাহার নাই। অর্থাৎ আজকাল নাই। হাতির যাহারা পূর্বপুরুষ, তাহারা যে দেশ-বিদেশ বিচরণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই, তাহার ঢের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ড বল, আমেরিকা বল, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা বল আর শীতপ্রধান সাইবেরিয়া বল, সকল স্থানেই জীবন্ত হাতি না পাও, হস্তীজাতীয় জন্তুর কঙ্কাল-চিহ্ন পাইবে। আফ্রিকার উত্তরদিকে ইজিপ্টের মধ্যে বহু পুরাতন একটা শূকরের মতো জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন সেই নাকি হাতির একজন পূর্বপুরুষ। বিদেশ ভ্রমণ কাহাকে বলে তাহা এই জানোয়ারের বংশধরেরা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া গিয়াছে। হাতির কথা বলিতে গেলে আপনা হইতেই ঘোড়ার কথা মনে আসে। হাতির মতো ঘোড়াও, অর্থাৎ তাহার পূর্বপুরুষও এক সময়ে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সে ঘোড়া আর আজকালকার মানুষের পোষা ঘোড়ায় আকাশ-পাতাল তফাৎ—ঠিক যেমন নেকড়ে বাঘ আর সৌখিন কুকুরের প্রভেদ।

হরিণের দল বাঁধিয়া চলার কথা বোধহয় সকলেই জান। বড় বড় শিংওয়ালা হরিণগুলি যখন প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া নদী পার হইতে থাকে, সে নাকি এক চমৎকার দৃশ্য। নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত কেবল হরিণের মাথা আর হরিণের শিং। মনে হয় যেন জীবন্ত সাঁকো ফেলিয়া নদীর জলে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ দশ হাজার হরিণ এইরূপে একসঙ্গে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায় তাহারা এমন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে যে, শিকারীরা আগে হইতে আন্দাজ করিয়া সময়মত ঠিক জায়গায় খাপ পাতিয়া বসিয়া থাকে।

কিন্তু জানোয়ারের বিদেশযাত্রার কথা বলিতে গিয়া যদি কেবল বড় বড় জানোয়ারের কথাই বলি, তবে আসল কথাটাই বাদ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে যত আশ্চর্য কথা শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে লেমিঙের কথা।

পাহাড়ের ধারে যেখানে সবুজ গাছ আর কচি পাতার অভাব নাই, সেইখানে গর্ত করিয়া লেমিং বাস করে। দেখিতে তাহারা ইঁদুরের চাইতে বড় নয়, চেহারাও সেইরকম—কেবল লেজ নাই বলিলেই হয়। আর বিশেষ আশ্চর্য তাহাদের বংশবৃদ্ধি। যেখানে আজ দেখিবে ক্বচিৎ দু-দশটা লেমিং দেখা যায়, বৎসরেক বাদে গিয়া দেখিবে লেমিঙের বংশে পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে। সংখ্যায় যত বাড়ে, তত তাহারা গাছপালা খাইয়া শেষ করে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে, আর সবজি জোটে না। পাহাড়কে পাহাড় একেবারে নেড়া হইয়া যায়। তখন ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন চলিয়াছে, যেন তাহারা কোনরূপে পরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছে না। তারপর একদিন কি ভাবিয়া তাহারা একেবারে দলেবলে পাগলের মতো দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে।

সে এক দেখিবার মতো জিনিস। লক্ষ লক্ষ ইঁদুর একেবারে পাহাড় কালো করিয়া নামিতে থাকে। কোথায় যাইবে, কোথায় খাবার মিলিবে সে খবর কেহ জানে না অথচ একেবারে নিরুদ্দেশ অন্ধের মতো সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হয়। বাধা মানে না, বিপদ মানে না, সব হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ঠেলাঠেলিতে পায়ের চাপে কত হাজার হাজার মারা পড়ে, অনাহারে পথের ধারে আরও কত হাজার মরিয়া থাকে। আর নদীর স্রোতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে কত যে প্রাণ হারায়, বুঝি তাহার

আর সংখ্যা হয় না। যত রাজ্যের মাংসাশী শিকারী পাখি তখন চারিদিক হইতে আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া অজস্র লেমিং বিনষ্ট হইবার পর যে-কয়টি অবশিষ্ট থাকে, তাহারাই আবার আর কোনখানে নূতন করিয়া বংশসৃষ্টির সূত্রপাত করে। ক্রমে আবার সেই সংখ্যাবৃদ্ধি, সেই দুর্ভিক্ষ আর সেই প্রলয়কাণ্ড!

ছোটর কথা বলিলাম, এখন আরও ছোটর কথা বলিয়া শেষ করি। পিঁপড়ারা যে বাসা ছাড়িয়া নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হয়, ইহা সকল দেশেই দেখা যায়। এ বিষয়ে সকলের চাইতে ওস্তাদ যে পিঁপড়া তাহার নাম ড্রাইভার পিঁপড়া। আফ্রিকার জঙ্গলে ইহারা যখন ঠিক সৈন্যদলের মতো পরিষ্কার সার বাঁধিয়া চলিতে থাকে, তখন জানোয়ার মাত্রেই তাহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া পালায়।

আর পঙ্গপালের কথা কে না জানে? যে দেশের উপর দিয়া পঙ্গপাল যায়, সে দেশের চাষারা মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে থাকে। সে দেশে শস্য আর গাছের পাতা বড় বেশি অবশিষ্ট থাকে না। দশ বিশ মাইল লম্বা পঙ্গপালের দল ত সচরাচরই দেখা যায়; এক একটা দল এত বড় থাকে যে মাথার উপর দিয়া সপ্তাহখানেক উড়িয়াও তাহার শেষ হয় না। আফ্রিকায় এইরকম বড় বড় কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেখানে পঙ্গপালের চাপে পড়িয়া টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া পড়ে, পুকুর বুজিয়া যায়, ড্রেন আটকাইয়া যায়, এমনকি রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া যায়, এমনও দেখা গিয়াছে।

জানোয়ারের ঘুম

এক একজন মানুষের ঘুমাইবার ধরন দেখি এক একরকম। কেউ চুপচাপ নিরীহভাবে জড়োসড়ো হইয়া ঘুমায়, কেউ ঘুমের মধ্যে হাত পা ছুঁড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিয়া অস্থির হয়, কেউ বা তুমুল নাসিকাগর্জনে রীতিমত যুদ্ধের কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে এক একজন লোক দেখি, তাহাদের আর কোন ক্ষমতা থাক বা নাই থাক ঘুমাইবার শক্তিটা খুব অসাধারণ। যেখানে সেখানে উঠিতে-বসিতে তাহারা বেশ একটু ঘুমাইয়া লয়। পাখা-কুলি পাখা টানিতে টানিতে ঘুমাইয়া পড়ে, পণ্ডিতমহাশয় পড়াইতে পড়াইতে ঢুলিতে থাকেন, আর ছোট ছোট ছেলেরা গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমের ঘোরেই হুঁ হুঁ করিতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত কয়েকদিন রাত জাগিয়া এবং হয়রান হইয়া সৈন্যেরা যখন শিবিরে ফিরে, তখন অনেক সময়ে দেখা যায় তাহারা চলিতে চলিতেই ঘুমের ঘোরে মাতালের মতো টলিতেছে।

গল্পে শুনিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিষ্যবাড়ি গিয়াছিলেন—শীতের সময়ে। সেখানে পাড়াগাঁয়ে শীতটা কিরকম হয় তাঁহার জানা ছিল না। তাই শিষ্য যখন লেপ দিতে চাহিল তখন তিনি বারণ করিয়া বলিলেন "আমার শীত-টিত কিছু লাগে না।" কিন্তু 'লাগেনা' বলিলেই ত আর শীত দূর হয় না; কাজেই রাত্রে যখন ঠাণ্ডা বাড়িয়াই চলিল তখন ঠাকুর মহাশয়ের দুরবস্থা কেমন হইয়াছিল, শিষ্য তাহার বর্ণনা দিয়াছেন অতি চমৎকার—

"প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টংকার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি।"

প্রথমে ঢেঁকির মতো সটান সোজা, তারপর ক্রমে ধনুকের মতো বাঁকান, তারপর কুকুরের মতো হাত পা গুটাইয়া জড়োসড়ো, তারপর শীতে তাল পাকাইয়া একেবারেই পুঁটুলির মতো গোল।

জানোয়ারদের ঘুমের কায়দা যদি দেখ, তবে ইহার চাইতেও অনেক বেশি রকমারি পাইবে। কেউ চোখ চাহিয়া ঘুমাইয়া থাকে। কেহ দিনে জাগিয়া রাত্রে ঘুমায়, কেহ প্যাঁচার মতো নিশাচর হইয়া সারারাত জাগিয়া কাটায়। আস্তাবলে ঘোড়াগুলি খাড়া দাঁড়াইয়া ঘুম দেয় কিন্তু মহিষ বা গণ্ডার কাদা জলে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া আরাম করিয়া ঘুমায়। চিড়িয়াখানায় কতগুলি বাঁদর দেখিয়াছি তাহারা দল বাঁধিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া একসঙ্গে বসিয়া ঘুমাইতেছে, আবার কোন কোনটা দেখি ঠিক মানুষের মতো শুইয়া হাত পা এলাইয়া ঘুমায়। একটা ওরাংওটান দেখিয়াছিলাম, সে একটি দোলনার উপর পেটের ভর দিয়া হাত পা ঝুলাইয়া ঘুমাইতেছিল। ইহাতে তাহার যে কিছুমাত্র অসুবিধা হইতেছে এরূপ বোধ হইল না। অনেক জন্তুই ঘুমাইবার সময় ঠাণ্ডা ছায়া খোঁজে, কিন্তু নদীর ধারের কুমিরগুলি দুপুর রোদে চড়ায় পড়িয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইয়া থাকে। আবার কত জন্তু আছে, তাহারা শীতকালটা বা গ্রীষ্মের গরমটা কুম্ভকর্ণের মতো লম্বা ঘুম দিয়া কাটায়। ভল্লুক সাপ ব্যাং গেঁড়ি প্রভৃতি কোন কোন জন্তু এ বিদ্যায় বেশ পাকা ওস্তাদ; পরিষ্কার দিন হইলেই কাঠবিড়ালিগুলি রোদে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, কিন্তু ঠাণ্ডা মেঘলা দিন দেখিলে তাহারা অনেকেই গাছের ফাটলে কোটরে ঢুকিয়া ঘুমাইতে থাকে– আবার পরিষ্কার রোদ না হওয়া পর্যন্ত সে ঘুম ভাঙিতে চায় না। যে-সকল জন্তু এইরকম লম্বা লম্বা ঘুম দেয়, ঘুমের সময় তাহারা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ না খাইয়া কাটায়। এই সময়ে তাহাদের শরীরটা প্রায় অসাড় ও নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে—এমনকি নিশ্বাস প্রশ্বাসও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে। এইরকম লম্বা ঘুমের পর তাহারা যখন আবার বাহির হয় তখন দেখা যায় যে শরীরের চর্বি শুকাইয়া তাহাদের চেহারা অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।

পাখিরা কেমন করিয়া ঘুম যায় দেখিয়াছ ত? কাকাতুয়া যেমন দাঁড়ে বসিয়া ঘুমায়, সেইরকম অনেক পাখিই গাছের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমায়। কেহ কেহ বা পা মুড়িয়া মাটির উপর চাপিয়া বসে। বক যে এক ঠ্যাঙে দাঁড়াইয়া চমৎকার ঘুমাইতে পারে তাহা সকলেই জান। প্যাঁচা প্রভৃতি কোন কোন পাখি ঘুমাইবার সময়ে গায়ের পালক ফুলাইয়া আপনাদের শরীরটা প্রায় দ্বিগুণ বড় করিয়া তোলে। একরকম চন্দনা আছে তাহারা ঠিক বাদুড়ের মতো গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া ঘুমায়। বাদুড় কেমন করিয়া ঘুমায় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ—তাহারা মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ডানা মুড়িয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের ডাল হইতে ঝুলিয়া থাকে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। শীতের সময়ে কলিকাতার ইডেন গার্ডেন্‌সে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক দেখিয়াছি। বাদুড়েরা নাকি দিনের বেলায় ঘুমায়, কিন্তু এগুলি যেরকম ক্যাট্‌ ক্যাট্‌ শব্দ আর ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল তাহাই যদি ঘুমের নমুনা হয়, তবে না জানি সে কিরকমের ঘুম। ঘুমাইবার পূর্বে বাদুড়েরা যেরকম ঘটা করিয়া ঘুমের আয়োজন

করে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই হাসি পায়। লম্বকর্ণ বাদুড় বা চামচিকা ঘুমাইবার সময় প্রথমেই গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া পড়েন তারপর ডানা দুইটি দু-চারবার ঝাড়িয়া খুব সাবধানে ভাঁজ করিয়া বন্ধ করেন। তারপর ফট্ করিয়া একটি প্রকাণ্ড কান মুড়িয়া যায়; খানিক বাদে সে আর একটি কানও ঠিক ঐরকম হঠাৎ গুটাইয়া লয়—তখন আর তাহাকে চিনিবাব যো থাকে না। বাদুড়ের কথা বলিতে গিয়া আরেকটা জন্তুর কথা মনে হয়, সে আপনাকে রীতিমত 'বেনের পুঁটুলি' পাকাইয়া ঘুমায়। তখন তাহাকে দেখিলে হঠাৎ জানোয়ার বলিয়া চিনিতে পারাই অসম্ভব। মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড ফল বা মৌচাক ঝুলিয়া আছে। এই জন্তুর নাম কোবেগো। দেখিতে কতকটা বাদুড়ের মতো হইলেও এটি বাদুড় নয় এবং ইহার ডানাটাও বাদুড়ের ডানার মতো ছড়ান নয়। বাদুড়ের মতো উড়িতে না পারিলেও ইহারা এই ডানায় ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়া ১০০/১৫০ হাত পার হইয়া যায়। ইহাদের ছানাগুলি বাঁদরের ছানার মতো সবসময়ে মায়ের বুক আঁকড়াইয়া থাকে। এইরকম পুঁটুলি পাকাইবার অভ্যাসটা 'বর্মধারী' বা 'আর্মাডিলো' প্রভৃতি আরও কোন কোন জন্তুরও দেখা যায়।

মাথা ঝুলাইয়া ঘুমান যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের মধ্যে আর একজনের কথা বলিয়া শেষ করি। ইহার ইংরাজি নাম 'স্লথ' অর্থাৎ অলস। বাস্তবিক এমন ঢিলা স্বভাবের অলস জন্তু আর বড় দেখা যায় না। গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া আর অকাতরে ঘুমাইয়া ইহারা সারাবছর কাটাইয়া দেয়। চিৎ হইয়া মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকান, মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা খাওয়া, আর যখন তখন ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমান—ইহাই যেন ইহাদের জীবনের কাজ। যখন এক ডালের পাতা ফুরাইয়া গেল, তখন আর এক ডালে যাওয়াটা যেন ইহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ভুঁড়ি দুলাইয়া, আস্তে আস্তে হাত পা বাড়াইয়া আধ মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় সারিতে না সারিতে ইহারা আবার পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। বাস্তবিক ইহারা এমন অলস যে অনেক সময়ে ইহাদের মাথায় একরকমের শেওলা গজাইয়া সবুজ রঙের স্যাঁৎলা পড়িয়া যায়। পুরাণে বলে, বাল্মীকি, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিরা ধ্যানে বসিলে তাঁহাদের গায়ে উইয়ের ঢিপি গজাইয়াছিল। ইনি সারাদিন চিৎপাত হইয়া যে কিসের ধ্যান করেন তাহা জানি না—কিন্তু মাথায় শেওলা না গজাইয়া আরেকটু বুদ্ধি গজাইলে বোধহয় কতকটা সুবিধা হইত।

গোখুরা শিকার

এক সাহেবের আস্তাবলে ইঁদুরে বাসা বেঁধেছিল। তারা আস্তাবলের মেজের নীচে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে ঝাঁঝরার মতো করে ফেলেছিল। ইঁদুরের উৎপাতে সবাই ব্যতিব্যস্ত; কতদিন কল পেতে কত ইঁদুর ধরা পড়ল, তবু ইঁদুর আর ফুরায় না। তখন সাহেব ভাবলেন ইঁদুর মারবার বিষবড়ি না বানালে আর চলছে না। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ একদিন দেখা গেল, আস্তাবলের সব ইঁদুর কোথায় পালিয়েছে! সবাই বলল "ব্যাপারখানা কি?" দুদিন না যেতেই বোঝা গেল, ব্যাপার বড় গুরুতর—

ইঁদুরের গর্তে প্রকাণ্ড দুই গোখুরো সাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। আস্তাবলে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল, সহিস কোচম্যান সব চলতে-ফিরতে সাবধানে থাকে, রাত্রে গাড়ি জুততে হলে লোকজন, লাঠি, মশাল নানারকম হাঙ্গামার দরকার হয়, তা নইলে কেউ ঘরে ঢুকতেই চায় না। সাহেব দেখলেন মহা মুশকিল, এর চাইতে ইঁদুরই ছিল ভাল।

সাহেবের যে চাপরাসী, সে লোকটি ভারি সেয়ানা—সে বললে, "হুজুর, আমি সাপ তাড়াবার ফন্দি জানি। আমায় চার আনা পয়সা দিন, আমি এখুনি তার সরঞ্জাম কিনে আনছি।" পরের দিন চাপরাসী সেই চার আনার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির—একটা বঁড়শি আর ছিপ আর একটা ঠোঙার মধ্যে জ্যান্ত একটা ব্যাং! দেখে সবাই হাসতে লাগল আর চাপরাসীকে ঠাট্টা করতে লাগল। সাহেব বললেন, "বেঅকুফ! তোকে সাপ মারতে বললাম, আর তুই মাছ ধরবার সরঞ্জাম এনে হাজির করলি!" চাপরাসী সেসব কথায় কান না দিয়ে ব্যাংটাকে বঁড়শিতে গেঁথে আস্তাবলের দিকে চলল; তামাসা দেখবার জন সবাই তার পিছন পিছন চলল। তারপর সেই ছিপে-গাঁথা ব্যাংটাকে গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চাপরাসী শক্ত করে ছিপের গোড়ায় ধরে বসে রইল। খানিক পরে ছিপে টান পড়তেই অমনি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর চাপরাসী সেই আধ-গেলা ব্যাং শুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড সাপকে গর্তের মধ্যে থেকে হিড়হিড় করে টেনে বার করল। সাপেরা যখন খায় তখন তারা ক্রমাগত গিলতেই থাকে, যা একবার গলার মধ্যে ঢোকে তাকে আর ঠেলে বার করতে পারে না। কাজেই ছিপের আগায় বঁড়শি, বঁড়শিতে গাঁথা ব্যাং আর ব্যাঙের সঙ্গে সাপ; এমনি করে গোখুরোমশাই চার আনার সরঞ্জামে ধরা পড়লেন। তারপর লাঠিপেটা করে তাকে সাবাড় করতে কতক্ষণ?

একটা সাপ মারা পড়তেই আরেকটাকে ধরবার জন্য সকলের ভারি উৎসাহ দেখা গেল। কিন্তু একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ গেল, তবু সাপ আর ধরা দেয় না। সবাই হয়রান হয়ে পড়ল। সাহেব যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় একটা চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল—সাপ ধরা পড়েছে। সাহেব ছুটে দেখতে গেলেন, গিয়ে দেখেন সাপ তখনও গর্ত থেকে বেরোয়নি। চাপরাসী ছিপ নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর টানতে টানতে ক্রমে সাপের খানিকটা গর্তের বাইরে এসেছে, এমন সময় চাপরাসীর টানে ব্যাংটা তার গলা থেকে পিছলিয়ে বেরিয়ে এল। আর সাপটাও ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে ছুটে আস্তাবলের বাইরে চলল। তখন সবাই তার পিছনে ছুটে লাঠি দিয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে শেষ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য, লাঠিপেটা করতেই তার পেটের মধ্যে থেকে কতগুলো ব্যাং বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে দু-একটা তখনও বেঁচে ছিল—একটা ত একটু বাদেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। সাহেব ত এ কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক। সাপের পেটে গিয়েও যে কোন জন্তু বেঁচে থাকতে পারে, এটা তাঁর জানাই ছিল না। কিন্তু সাহেবের জানা না থাকলেও এটা কিছু নতুন খবর নয়। আমেরিকার 'শিংওয়ালা' সাপের সম্বন্ধেও এইরকম গল্প শোনা যায়। সেই সাপগুলো এমন পেটুকের মতো খায় যে খাবার পরে আর তাদের নড়বার শক্তি থাকে না, তখন তারা যেখানে সেখানে মড়ার মতো পড়ে থাকে। সেখানকার প্রাচীন 'রেড ইণ্ডিয়ান' জাতির লোক এই সময়ে তাকে দেখতে পেলে তার মাথায় ডাণ্ডা-পেটা করতে থাকে। তার ফলে অনেক সময়েই তার পেট থেকে আস্ত-গেলা জন্তুগুলো সব বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে প্রায়ই দু-একটাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়।

যাহোক, সাহেব ত সাপ মারলেন। কিন্তু তখন আবার দেখা গেল যে, আস্তাবলের মেজের নীচে সাপের ছোট ছোট বাচ্চায় একেবারে ভরতি হয়ে গেছে। এখন উপায়

কি? দুটো সাপ মারতেই এত হাঙ্গাম, তবে এতগুলো যখন বড় হবে তখন কি হবে। আবার চাপরাসীর ডাক পড়ল। চাপরাসী বলল, "হুজুর! আমি এরও উপায় জানি।" এবারের উপায়টি আরও আশ্চর্য। এবার প্রকাণ্ড বড় বড় কোলা ব্যাং এনে আস্তাবলে ছেড়ে দেওয়া হল। তারা মহা ফুর্তি করে পেট ভরে খেয়ে খেয়ে সাপের বংশ সাবাড় করে দিল। সাপকে দিয়ে ব্যাং খাইয়ে, তারপর ব্যাংকে দিয়ে সাপ গেলানো! চমৎকার শিকার, না?

সিংহ শিকার

আফ্রিকা হল সিংহের দেশ, ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় শিকারীরা সেখানে বন্দুক নিয়ে দলেবলে সিংহ শিকার করতে যান। তাঁরা মনে করেন, যতরকম শিকার আছে তার মধ্যে সিংহ শিকার খুব একটা বড় ব্যাপার; কারণ তাতে শিকারীর সাহস এবং বাহাদুরির পরিচয়টা ভাল করেই পাওয়া যায়। যে শিকারী সিংহ মেরেছে লোকে তাকে ওস্তাদ শিকারী বলে মানে। সিংহ শিকারের বিপদ খুব বেশি। আজকাল বন্দুকের এত যে উন্নতি হয়েছে, তবুও এখনও কত শিকারী সিংহের হাতে প্রাণ হারান। তিন-চারটা সাংঘাতিক গুলি খাবার পরেও একশ গজ দৌড়ে এসে সিংহ তার শিকারীকে শিকার করেছে, এমন ঘটনার কথাও শোনা যায়। তার মধ্যে একটি গুলি সিংহের হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু মরবার আগে সে তার মরণ-কামড়টি না দিয়ে ছাড়েনি! তাহলে ভাব সিংহ কি জিনিস!

এমন যে সিংহ, তাকে আফ্রিকার 'মাসাই' ও 'নান্দি' জাতের নিগ্রোরা বল্লম দিয়ে শিকার করে থাকে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং অসাধারণ মনস্বী লোক বলে সকল দেশে পরিচিত, কিন্তু শিকারী হিসাবেও তাঁর প্রতিপত্তি বড় কম নয়। তিনি নান্দিদের সিংহ শিকার স্বচক্ষে দেখে তার যে বর্ণনা লিখে গিয়েছেন, তা পড়লে অবাক হতে হয়।

নান্দিদের শিকার দেখবার জন্য তিনি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে দলেবলে সিংহের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল, সিংহ পাওয়া গেলে নান্দিরা শিকার করবে; সাহেবরা কেউ সে শিকারে যোগ দেবেন না, কিছু বলতে পারবেন না; তাঁরা কেবল দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবেন। ঝোপ জঙ্গল ঘেঁটে অনেক খোঁজার পর প্রকাণ্ড এক সিংহ পাওয়া গেল। তেমন সিংহ সচরাচর মেলে না। রুজভেল্ট লিখেছেন, সিংহটাকে দেখে তাঁদের শিকার করবার লোভ জেগে উঠেছিল, কিন্তু তাহলে তাঁদের কথা রক্ষা হয় না, আর নান্দিদের শিকারটাও দেখা হয় না; তাই তাঁরা দলেবলে সিংহটাকে ঘিরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নান্দিরা একটু পিছনে পড়েছিল, দেখতে দেখতে তারা এসে হাজির হল। এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঢাল—বিশাল দেহটি যেন কালো পাথরে তৈরী, মুখে দয়ামায়া দ্বিধা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সিংহ পাওয়া গিয়েছে শুনে তাদের আনন্দ দেখে কে? তারা এক-এক পা চলে আর এক একটি বিরাট লাফ দেয়। দেখতে দেখতে সিংহের ঝোপটিকে তারা নিঃশব্দে ঘেরাও করে ফেলল।

সিংহটাও এতক্ষণ চুপ করে ছিল না। সে ঝোপের আড়ালে বসে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেখল কতগুলো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সব ঢালের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বল্লম বাগিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক একটি ঢালের উপর দিয়ে এক-এক জোড়া কালো চোখ যমের ভ্রূকুটির মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বেশ বুঝল যে তার জন্যই এত সব আয়োজন, তার ঘাড়ের কেশর খাড়া হয়ে দাঁড়াল, তার মুখখানা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেল, তার ল্যাজের বাড়িতে সমস্ত ঝোপটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে একবার এপাশ ফিরল একবার ওপাশ ফিরল, ডাইনে তাকাল বাঁয়ে তাকাল, কোন্‌দিকে লোক কম দেখে তারপর তীরের মতো সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটি লোকও সেদিক থেকে সরল না। সব ঢাল বাগিয়ে বল্লম তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। দুপাশ থেকে শিকারীরা বল্লম হাতে দৌড়ে এল, দলের যে নেতা সে লাফ দিয়ে দৌড়ে সকলের সামনে গিয়ে পড়ল। তার হাত থেকে বল্লমখানি বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে সিংহের গায়ের মধ্যে বিঁধে গেল। সিংহটাও আঘাত লাগামাত্র তার সামনে যাকে পেল তাকেই আক্রমণ করে ধরল। সে লোকটাও তার জন্য প্রস্তুত ছিল, তার বল্লমের এক ঘায়ে সে চক্ষের নিমেষে সিংহটাকে একেবারে এপার ওপার ফুঁড়ে ফেলল—একদিকের ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে বল্লমের আগাটা অন্য দিকে পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিংহটা তার ঢালের উপর দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবা মেরে, তার ঘাড়ের মধ্যে নখ দাঁত বসিয়ে, মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আর অমনি চারদিক থেকে বল্লমের পর বল্লম আগুনের ঝলকের মতো ছুটে এসে সিংহটাকে একেবারে অস্ত্রে অস্ত্রে গেঁথে ফেলল। এর মধ্যেও কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আরও একটি শিকারীকে জখম করতে ছাড়েনি। মরবার সময় একটা বল্লমকে সে এমন জোরে কামড়িয়ে ধরেছিল যে, লোহার বল্লমটা উল্টে মুচড়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গিয়েছিল। তারপর নান্দিদের উল্লাস দেখে কে! খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিংহের চারিদিকে তাদের চিৎকার আর বিজয় নৃত্যের ঘটা চলল। সুখের বিষয়, আহত শিকারী দুজনেই বেঁচে উঠেছিল।

সিংহের তেড়ে-আসা থেকে এত কাণ্ড শেষ হওয়া পর্যন্ত দশ সেকেণ্ডও সময় লাগেনি। সিংহের আক্রমণ, শিকারীর অস্ত্র বৃষ্টি, আঁচড় কামড় হুড়োহুড়ি আঘাত যন্ত্রণা ও মৃত্যু, ওর মধ্যেই সব এক ঝাপটায় শেষ! সিংহটা যখন পড়ল, তখন তার অবস্থাটি হয়েছিল ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার মতো।

সেকালের লড়াই

'সন্দেশে' তোমরা নানারকম জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা পড়েছ। কিন্তু বাস্তবিক লড়াইয়েব মতো লড়াই কাকে বলে যদি জানতে চাও তবে সেকালের জানোয়ারদের খোঁজ নিতে হয়। যে কালের কথা বলছি সে সময়ে মানুষের জন্ম হয়নি—সে প্রায় লাখ লাখ বছরের কথা। সে সময়কার জন্তুরা ত এখন বেঁচে নেই, তাদের খোঁজ নেবে কি করে? খোঁজ নেবার উপায় আছে।

যে-সকল পণ্ডিতেরা নানারকম জানোয়ারের শরীর পরীক্ষা করে থাকেন তাঁরা

এক একটা জানোয়ারের সামান্য দু-একটা হাড়, দাঁত বা শরীরের কোন টুক্‌রা দেখে সেই জানোয়ার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলে দিতে পারেন যে শুনলে অবাক হতে হয়। সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, জলে থাকে কি ডাঙায় থাকে, দু পায়ে চলে না চার পায়ে চলে, সে কোন জাতীয় জন্তু, এসব কথা শুধু খানিকটা কঙ্কাল পরীক্ষা করে চট্‌ করে বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পাহাড় কাটতে বা মাটি খুঁড়তে গিয়ে এমন সব হাড় পাওয়া যায় যেটা আমাদের জানা কোন জন্তুর হাড় হতেই পারে না। মনে কর, একটা পায়ের টুক্‌রা পাওয়া গেল প্রায় পাঁচ হাত লম্বা আর একটা হাতির পায়ের চেয়েও মোটা। সে হাড় আর এখন হাড় নেই, সে কোন্‌কালে পাথর হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার চেহারাটা সেইরকমই আছে। এইসব হাড় পরীক্ষা করে সেকালের অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা গিয়েছে।

মনে কর, একটা পাথর কাটতে গিয়ে তার মধ্যে একটা জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেল—সে পাথর এক সময়ে নরম মাটি ছিল—জানোয়ারটা তার মধ্যে মারা যায়। ক্রমে সেই নরম মাটি জমে সেই হাড়গোড়শুদ্ধ পাথর হয়ে গেছে। মাটি জমে পাথর হতে হয়ত কত লাখ বৎসর লেগেছে, তারপরে কত হাজার বৎসর কেউ তার কথা জানতে পারেনি। এতদিন পরে মানুষ আবার জানোয়ারের সন্ধান পেল! পণ্ডিতেরা সেই পাথর পরীক্ষা করে হয়ত বলবেন এটা অমুক যুগের পাথর। তারপর হাড় পরীক্ষা করে জানোয়ারটার সম্বন্ধেও নানা কথা বলবেন। যদি অনেকগুলা হাড় পাওয়া যায় তবে হয়ত জানোয়ারটার একটা মোটামুটি চেহারাও খাড়া করতে পারবেন।

এইরকম করে কত অদ্ভুত জানোয়ারের যে খবর পাওয়া গেছে সে কথা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। প্লীসিও সরাস (অর্থাৎ 'প্রায় কুমির জাতীয়') জানোয়ারটির গলা সরু আর লম্বা ছিল আর লম্বায় প্রায় ২৫/৩০ হাত হলেও মোটের উপর নিরীহ ছিল। আরেকটা ছিল ইকথিয়োসরাস ('মাছ কুমির')। আর দুটো জানোয়ার ছিল মেগালোসরাস আর ইগুয়ানোডন; ইগুয়ানোডন দেখতে ভয়ানক বটে, কিন্তু নিরামিষ-ভোজী, মেগালোসরাস আমিষভোজী। এরা দুজনেই হাতির চেয়ে বড় ছিল।

সেকালের কুমিরদের পিছনের পা দুটার গড়ন সাংঘাতিকরকম মজবুত—লড়ায়ের সময় পিছনের পা দুটাই আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করত। এদের নাম টিরানোসরাস অর্থাৎ অত্যাচারী কুমির। এরাও হাতির চেয়ে বড় ছিল।

এরকম আরও কত জানোয়ার সেকালে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা যদি তখন বেঁচে থাকতাম তাহলে কি মুশকিল হত বল দেখি? এতগুলো হাতির চেয়ে বড় হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে আমাদের দশাটা কেমন হত একবার ভেবে দেখ। কয়েক বৎসর আগে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার জঙ্গলে সেকালের জন্তু এখনও আছে। একজন সাহেব অনেক লোকজন নিয়ে খুঁজতে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের দেখা পেলেন না।

খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু

বনের জন্তুকে ধরে যখন খাঁচায় পোরা হয় তখন তার যে কিরকম দুরবস্থা হয়, সেটা বেশ সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু খাঁচার জন্তু যখন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে পড়ে তখন তার দুরবস্থাটিও এক-এক সময়ে বড় কম হয় না।

লণ্ডনের এক চিড়িয়াখানার একটা রেলিং দেওয়া বাগান-করা জমির মধ্যে কতগুলি হরিণ থাকত। সেই ছোট্ট জমিটুকুর মধ্যে নতুন ঘর তৈরি হবে, তাই মজুরেরা সেখানে কাঠের তক্তা এনে ফেলেছিল। একদিন একটা হরিণ সেই রাশি-করা কাঠের উপর চড়ে হঠাৎ কেমন করে এক লাফ দিয়ে রেলিঙের বাইরে গিয়ে পড়েছে। হরিণ পালাচ্ছে দেখে চিড়িয়াখানার লোকেরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল, কিন্তু হরিণ বেচারা ব্যস্ত হল তাদের চাইতে আরও অনেকখানি বেশি। যখন সে বুঝতে পারল যে রেলিঙের মধ্যে ফিরে যাবার আর কোনও উপায় নেই, তখন সে কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে পাগলের মতো চিড়িয়াখানার বাগানময় কেবল ছুটোছুটি করতে লাগল। হরিণের দৌড় দেখে বাগানের যত জন্তু সবাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাঘ সিংহ উঠে দাঁড়াল, হরিণেরা বড় বড় চোখ মেলে যে যার ঘরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আর বাঁদরগুলো রেলিঙে চোখ ঠেকিয়ে চেঁচাতে লাগল আর রেলিং ধরে বাঁকাতে লাগল। অনেক হাঙ্গামের পর, শেষটায় সেই ঘেরা জমির দরজাটা খুলে দিয়ে হরিণটাকে সেইদিকে তাড়া করে নিতে তখন সে নিজের পরিচিত আশ্রয়ে ঢুকে তারপর শান্ত হল।

এক টিয়াপাখির গল্প পড়েছিলাম; এক বাজিওয়ালার কাছে সে নানারকমের বোলচাল শিখেছিল। যখন তামাসা দেখবার জন্যে দলে দলে লোক এসে বাজিওয়ালার তাঁবুর ধারে ভিড় করত আর ঢুকবার জন্য ঠেলাঠেলি করত, তখন টিয়াপাখিটা চিৎকার করে বলত—"আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" একদিন টিয়াপাখির কি দুর্মতি হল, সে খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে পালাল। কিন্তু পালাবে আর কোথায়? একে ত বেচারার উড়বার অভ্যাস নেই, তার উপর খাঁচায় থেকে খাঁচাটার উপরেও কেমন মায়া হয়ে গেছে। তাই দু-একদিন এদিক ওদিক লুকিয়ে থেকে সে আবার ঘুরে ফিরে সেই তাঁবুর কাছেই একটা গাছে এসে বসল। বাজিওয়ালা ততক্ষণে তাকে খুঁজে খুঁজে শেষটায় তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছে। এমন সময়ে উপরে ভারি একটা হৈ চৈ গোলমাল শুনে বাজিওয়ালা বেরিয়ে এসে দেখল যে গাছের উপর টিয়াপাখি বসে আছে আর যত রাজ্যের পাখি এসে তার চারদিকে গোলমাল করে, তাকে ঠুকরিয়ে আর পালক ছিঁড়ে অস্থির করে তুলেছে। টিয়াপাখি বেচারা ব্যাপার দেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, আর ক্রমাগত বলছে—"আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" তখন বাজিওয়ালা খাঁচাটা এনে খুলে ধরতেই বেচারা তাড়াতাড়ি তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাখি বা হরিণ বা কোন নিরীহ জন্তু না হয়ে যদি বাঘ বা সিংহের মতো হিংস্র জন্তু এইরকম ভাবে ছাড়া পেত, তাহলে ব্যাপারটা কিরকম হত? হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত

শহরে একবার একটা সিংহ সার্কাসওয়ালার খাঁচা থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়েছিল। সিংহ বেরিয়ে পড়েছে দেখে সার্কাসের লোকেরা হৈ চৈ করে গোলমাল করে উঠতেই সিংহ বেচারা থতমত খেয়ে একেবারে সার্কাসের জমি পার হয়ে, সড়ক পার হয়ে, পাঁচিল টপ্‌কিয়ে এক খোলা ময়দানের মধ্যে গিয়ে হাজির। সেটা ছিল ছেলেদের খেলার মাঠ—তারা সেখানে বল খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, হুড়োহুড়ি করছে। সিংহ বেচারার ত চক্ষুস্থির, সে এরকম কাণ্ড আর কখনও দেখেনি। কোথায় আর যায়, সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপচাপ সরে পড়বার চেষ্টা করছে এমন সময়ে পাঁচিল টপকিয়ে সিংহ-ওয়ালা স্বয়ং এসে হাজির। সিংহ তখন ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ দেখে আশ্বস্ত হল, আর পোষা বেড়ালটির মতো তার মালিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে খাঁচায় ফিরে চলল।

আর একবার আমেরিকার জানোয়ারওয়ালা বোস্টক সাহেবের এক সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। শহরের রাস্তায় বেরিয়েই সে দেখে চারদিকে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া চলাচল করছে, নিরিবিলি বসবার জায়গা কোথাও নেই। তাই দেখে পশুরাজের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে, তিনি গোঁসা করে এক পুরান ড্রেনের মধ্যে গিয়ে যে ঢুকলেন আর কিছুতেই বেরোতে চান না। কুকুর লেলিয়ে, বন্দুক ছুটিয়ে, নানারকমে খোঁচাখুঁচি করেও কিছুতেই তাকে হটান গেল না। এমন সময়ে হঠাৎ কার হাত থেকে একটা টিনের বালতি ঝন্‌ঝন্ করে গিয়েছে ড্রেনের মধ্যে পড়ে। সেই শব্দ শুনে চমকে উঠে পশুরাজ এক দৌড়ে একেবারে তাঁর খাঁচার মধ্যে! কারণ, খাঁচার মতো নিরাপদ জায়গা আর নেই।

জানোয়ারওয়ালা

এক সার্কাসওয়ালার ছেলে—বয়স তার ষোলো বৎসর—সে স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সেখানে সে রোজ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত আর দেখত সিংহকে কেমন করে খেলা শেখায়। যে লোকটা সিংহের খেলা দেখাত, সে একটা সিংহের উপরে ভারি অত্যাচার করত—সিংহটাকে না খাইয়ে, মারধোর করে, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে সে নানারকমে কষ্ট দিত। দেখে ছেলেটির ভয়ানক রাগ হল; সে তার বাবার কাছে গিয়ে সেই লোকটার নামে নালিশ করল। কিন্তু তার বাবা সে কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন; বললেন, "ওরকম না করলে সিংহ কি পোষ মানে?" তারপর, অনেকদিন এই অত্যাচার সয়ে সয়ে একদিন সিংহটা সত্যি সত্যিই ক্ষেপে গিয়ে সেই দুষ্টু খেলোয়াড়কে সাংঘাতিকরকম জখম করে দিল।

তখন সেই ছেলে তার বাবাকে বলল, "কাল থেকে আমি সিংহের খেলা দেখাব।" তার বাবা এ কথা শুনে তাকে দুই ধমক দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলেরও জেদ কম নয়, পরদিন সকালে দেখা গেল সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহের খাঁচায় ঢুকে বসে আছে! প্রথমটা সকলে খুবই ভয় পেয়েছিল কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, সিংহের সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেছে যে ভয়ের কোন কারণ নেই। এই ছেলে এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'জানোয়ারওয়ালা'। এঁর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোস্টক।

একটি সিংহ নিয়ে আরম্ভ করে এখন প্রায় চল্লিশটিতে দাঁড়িয়েছে। এক-এক

সময়ে পঁচিশ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটি সিংহকে একসঙ্গে জড়ো করে তামাসা দেখান হয়। অবশ্য সিংহগুলি সবই পোষা, কিন্তু তা হলে কি হবে—তবু ত সিংহ। সিংহ কি বাঘ হাজার পোষ মানলেও তাকে ভয় করে চলতে হয়। সামান্য একটু কারণে হঠাৎ একটু ভয় পেলে বা চমকে উঠলে তারা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলতে পারে। একবার একজন খেলোয়াড় একটা নতুনরকমের পোশাক পরে খাঁচায় ঢুকেছিল বলে তার সিংহটা তাকে তেড়ে কামড়াতে গিয়েছিল—খেলোয়াড় তখন পোশাক বদলিয়ে পুরান পোশাক পরে এসে তারপর খাঁচায় ঢুকতে পেল। আর একবার এক মেমসাহেব একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা সিংহের খেলা দেখাতে গিয়ে এইরকম বিপদে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর হাতে একটা ফুলের তোড়া ছিল, একটা সিংহ তাই দেখে বোধহয় মাংস না কি মনে করে হঠাৎ তার উপর থাবা মেরে বসেছে। এই একটি থাবায় মেমসাহেবের গালের আর হাতের মাংস শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়েছে আর অমনি চক্ষের নিমেষে সবক'টা সিংহ একেবারে হাঁ হাঁ করে ফুলের তোড়াটার দিকে তেড়ে এসেছে। মেমসাহেবটি তখন বুদ্ধি করে তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাই রক্ষা, তা নইলে অতগুলো সিংহের হুড়াহুড়ির মধ্যে পড়ে তাঁকে আর বাঁচতে হত না! যাহোক, ফুলটা মাটিতে পড়তেই সিংহগুলো তাকে নেড়ে শুঁকে নাক সিঁটকিয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে গেল!

একবার বার্মিংহাম শহরে বোস্টক সাহেবের একটা সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়ে শহরের রাস্তায় এসে হাজির হয়েছিল। শহরের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল, রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। দোকানীরাও তাদের দোকানপাট খুলতে চায় না। সিংহটা এদিক ওদিক ঘুরে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড ড্রেনের নর্দমায় গিয়ে ঢুকে বসল, আর সেখান থেকে সে বেরোতে চায় না। সেই নর্দমার ভিতর দিয়ে সে রাস্তার নীচে চলাফিরা করে আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ে। রাত দুপুরে মাটির নীচ থেকে ঐরকম গুরুগম্ভীর আওয়াজ—অবস্থাখানা কিরকম বুঝতেই পার। শেষটা নর্দমার মুখে একটা খাঁচা বসিয়ে সিংহটাকে তাড়িয়ে সেটার মধ্যে নেবার কথা হল। কিন্তু অনেক তাড়া করেও সিংহটাকে নড়ান গেল না। সকলের চিৎকার, বড় বড় পাথরের আঘাত আর লম্বা লম্বা বাঁশের খোঁচা সেসব সহ্য করে সে চুপচাপ বসে রইল। তারপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল, বোস্টক সাহেব নিজে তার নাকের আগায় এক ঘা জুতো মেরে আসলেন কিন্তু সিংহ সেখান থেকে নড়ে না। সকলে যখন হয়রান হয়ে পড়েছে এমন সময় একজন লোকের হাত থেকে একটা বালতি কেমন করে ফস্‌কে গিয়ে গড়গড় শব্দ করে নর্দমার মধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে। সেই আওয়াজ শুনে সিংহমশাই এক দৌড়ে ল্যাজ গুটিয়ে একেবারে খাঁচার মধ্যে।

আর একবার একটা পলাতক সিংহকে পটকা ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢোকান হয়েছিল। সুতরাং সিংহের যেমন একদিকে খুব সাহস, আর একদিকে তেমনি ভয়ও আছে বলতে হবে। বোস্টক সাহেব বলেন, মানুষের যেমন নানারকমের মেজাজ থাকে—কেউ ঠাণ্ডা কেউ চটা, কেউ হাবাগোছের কেউ চট্‌পটে—এইসব জানোয়ারদেরও তেমনি। এক একটা সিংহের চালচলন বুদ্ধিশুদ্ধি এক-এক রকমের। কোনটা পোষ মানে একেবারে কুকুরের মতো—কোনটা হয়ত কোনকালেই ঠিকমত পোষ মানে না—তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হয়। সিংহ পশুরাজ, তাই তার কথাই বেশি করে বললাম, কিন্তু জানোয়ারের মধ্যে হাতির সম্মানও বড় কম নয়; বিশেষত বিলাতে ও আমেরিকায়—যেখানে হাতি সর্বদা দেখা যায় না—সেখানে লোকে হাতিকে খুবই

খাতির করে। বোস্টক সাহেবের কতগুলো হাতি আছে, তাদের তোয়াজ করবার জন্য অনেকগুলি চাকর সর্বদা লেগে আছে। আমাদের দেশে হাতিগুলো রোজ স্নান করবার সময় অনেকক্ষণ জলে কাদায় মাটিতে গড়াগড়ি করতে ভালোবাসে—তাতে নাকি তাদের গায়ের চামড়া খুব ভাল থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশে সব সময় সেরকম স্নানের সুবিধা না থাকায় তাদের চামড়া শুকিয়ে কড়া হয়ে ফেটে যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে তাদের রীতিমত ভালোরকম স্নানের বন্দোবস্ত করে দিতে হয়। হাতির পক্ষে 'রীতিমত স্নান' কাকে বলে, তার একটু নমুনা শোন। প্রথম কোন পুকুর বা বড় চৌবাচ্চার জলে হাতিটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কয়েক ঘণ্টা থাকলে পর তাকে ডাঙায় এনে কড়া ব্রুশ দিয়ে তার গায়ে কয়েক ঘণ্টা খুব করে সাবান ঘষে তাকে আবার জলে নামান হয়। তারপর আবার সাবান ঘষা, আবার জলে নামান। এইরকম তিন-চারবার করা হয়—তাতে প্রায়ই দু-চার দিন সময় লাগে, আর সাবান খরচ হয় প্রায় ২৫ সের। তারপর চামড়াটাকে আগাগোড়া একরকম ঝামা দিয়ে ঘষে কয়েকদিন ধরে তাতে বেশ করে তেল লাগান হয়—এক পিপে জলপাইয়ের তেল। এতেও তার সখ মেটে না—এর পরে তার নখগুলি একটি একটি করে উকা দিয়ে ঘষে পালিশ করে তাকে ফিটফাট করে দিতে হয়। এইরকমে একটি হাতির পিছনে এক সপ্তাহ ধরে পাঁচ-সাতটি লোককে রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এরকম সাংঘাতিক স্নান সব সময় দরকার হয় না—বছরে দু-চারবার করলে যথেষ্ট।

বোস্টক সাহেবের লোক পৃথিবীর চারিদিকে জানোয়ারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। একবার একটা গরিলার ছানা বিলাতে আনা হয়েছিল—বোস্টক সাহেব অনেক দর-দস্তুরের পর প্রায় ষোল হাজার টাকায় সেটাকে কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। তার চাইতে শিম্পাঞ্জির খেলা দেখিয়ে তিনি অনেক বেশি নাম করেছেন। তাঁরই পোষা শিম্পাঞ্জি 'কন্‌সাল' বিলাতের বড় বড় থিয়েটারে তামাসা দেখিয়ে লোকের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। 'কন্‌সাল'কে বোস্টকের লোকেরা ঠিক মানুষের মতো খাতির করত। তার নিজের চাকর, নিজের থাকবার ঘর, টেবিল চেয়ার, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র সব ছিল। তাকে যখন তামাসা দেখাবার জন্য বড় শহরে নেওয়া হত তখন তার জন্য রীতিমত হোটেলের ঘর ভাড়া করা হত—আলাদা শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি। তার আদব-কায়দা খুব দুরস্ত। তার বাড়িতে যদি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও, সে রীতিমত চেয়ার থেকে উঠে তোমার সঙ্গে 'হ্যান্ডশেক' করবে, তোমাকে টুপি রাখবার জায়গা দেখিয়ে দেবে—তারপর হয়ত পেয়ালা এনে তোমার জন্যে গম্ভীরভাবে চা ঢালতে বসবে। প্রথম যে শিম্পাঞ্জিকে বোস্টক সাহেব এইসব শিখিয়েছিলেন তারই নাম ছিল কন্‌সাল, সে অনেকদিন হল মারা গিয়েছে—কিন্তু তার জায়গায় অন্য শিম্পাঞ্জিকে শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে- তারও নাম দেওয়া হয়েছে কন্‌সাল।

প্রাচীনকালের শিকার

মানুষকে যদি কেবল জন্তু হিসাবে শরীরের গঠন দেখিয়ে বিচার করা যায়, তবে তাহাকে নিতান্তই আনাড়ি জানোয়ার বলিতে হয়। সে না পারে ঘোড়ার মতো দৌড়াইতে, না জানে ক্যাঙারুর মতো লাফাইতে; দেহের শক্তি বল, অথবা নখ দাঁত প্রভৃতি যে কোন অস্ত্রের কথা বল, সব বিষয়েই সে অন্যান্য অনেক জানোয়ারের কাছে হার মানিতে বাধ্য। অথচ এই মানুষই এখন আর সব জানোয়ারের উপর টেক্কা দিয়া এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। এখনকার যুগের মানুষ ত আত্মরক্ষার জন্য সহস্ররকম উপায় করিয়া রাখিয়াছে—শহর বাড়ি লোকালয় বানাইয়া সে বনের জন্তুর কাছ হইতে আশ্রয় পাইবার নানাপ্রকার ব্যবস্থাও করিয়াছে। কিন্তু সেই আদিমকালের মানুষ, যার ঘরও ছিল না বাড়িও ছিল না—সে বন্দুক চালাইতে শিখে নাই, এমনকি তলোয়ার বল্লম পর্যন্ত বানাইতে পারিত না—সে কেমন করিয়া এতরকম হিংস্র জন্তুর সঙ্গে রেষারেষি করিয়া টিঁকিয়া রহিল, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে।

সে যুগের মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ গুহাগহ্বরে, কেহ গাছের ডালে বাসা লইয়া বনের পশুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিত। চলিতে ফিরিতে কতরকম হিংস্র জন্তু আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত—তাহাদের কোন কোনটা এ যুগের জানোয়ারগুলির চাইতেও ভয়ানক। যেখানেই সেই প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পাও—তাহারই আশেপাশে সেইসব পাথরের স্তরের মধ্যেই দেখিবে আরও কতরকম জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন। এমন অবস্থায় সেকালের মানুষ যে আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে আরম্ভ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

সেকাল কথাটা খুবই অস্পষ্ট। প্রবীণ লোকেরা নিজেদের বাল্যকালের কথা বলিবার সময় বলেন 'সেকালে' এইরূপ হইত। কোন প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিবার সময় ইতিহাসে বলে—'সেকালে' এইরূপ হইত। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর লুপ্ত ইতিহাস লইয়া চর্চা করেন, তাঁহাদের কাছে এ-সমস্ত নিতান্তই 'একাল'। ইতিহাস যাহার কথা লেখে না—যে সময়ে ইতিহাস ত দূরের কথা, লিখিত ভাষারই সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই যথার্থ 'সেকাল'। কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেকালের মানুষ ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কবে কেমন করিয়া সে অস্ত্র গড়িতে শিখিল, কত ঝগড়া কত লড়াইয়ের মধ্যে কেমন করিয়া অল্পে অল্পে তাহার বুদ্ধি খুলিতে লাগিল তাহার একটু আধটু সাক্ষ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহারই পরিচয় সংগ্রহ করিতে আজও কত পণ্ডিতের সারাটা জীবন কাটিয়া যায়।

কত যুগের কত দেশের কতরকম মানুষ। তাহারা পৃথিবীর কতদিকে চলাফিরা করিয়াছে, আর নদীর গর্ভে পাহাড়ের স্তরে তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস করিয়া যে-মানুষ কাঁচা মাংস খাইত; ভ্রূকুটি-কপাল চ্যাটাল-চোয়াল যে-মানুষ দল বাঁধিয়া নরমাংস ভোজন করিত; গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া যে-মানুষ আপন পরিবার লইয়া লুকাইয়া থাকিত; চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া তাহার মধ্যে

যে-মানুষ দলেবলে রাত কাটাইত; পাথরে পাথর শানাইয়া যে-মানুষ অস্ত্রেশস্ত্রে পোশাকে-পরিচ্ছদে সভ্য হইয়া উঠিতেছিল; বড় বড় পাথরের স্তূপচক্র গড়িয়া যে মানুষ না জানি কোন্ দেবতার পূজা করিত; তাহাদের কেহই এখন বাঁচিয়া নাই—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সংবাদ এই যুগের পণ্ডিতেরা তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন।

একবার ভাবিয়া দেখ, সেই গুহাবাসীদের কথা; যাহাদের ঘরের পাশে সেকালের প্রকাণ্ড ভালুকগুলি অহরহই ঘুরিয়া বেড়াইত—প্রতিদিন চলিতে ফিরিতে যাহারা নানা জানোয়ারের প্রচণ্ড তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত, অস্ত্র বলিতে পাথর ছাড়া যাহাদের আর কিছুই ছিল না, তাহারা যে নিতান্ত শখ করিয়া শিকার করিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। হয় শত্রুকে মারা না হয় শত্রুর হাতে মরা, ইহা ছাড়া তাহার কাছে আর তৃতীয় কোন পথ ছিল না। 'ম্যামথ্' বা অতিকায় হস্তীর মতো অত বড় একটা জানোয়ারকে কাবু করা অথবা গুহা-ভল্লুক প্রভৃতি সাংঘাতিক জন্তুগুলির সহিত লড়াই করা একলা মানুষের সাধ্য নয়—সুতরাং শিকার কাজটা তাহাদের দল বাঁধিয়াই করিতে হইত। এই শিকার ব্যাপারের মধ্যে মানুষের প্রধান সম্বল যেটি ছিল, সেটি অস্ত্রও নয় শস্ত্রও নয়—সেটি তার বুদ্ধি। দশ জনে মিলিয়া আগে হইতে পরামর্শ করিয়া শত্রুকে বেকায়দায় মারিবার চেষ্টাতেই মানুষের বুদ্ধিটা খুলিত ভাল।

প্রথমত যেমন-তেমন একটা পাথর পাইলেই সে মনে করিত ভারি একটা অস্ত্র পাইলাম। ক্রমে পাথর ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ত এটা লক্ষ করিয়া থাকিবে যে, হাতের কাছে ছোট পাথর না থাকিলে বড় পাথর ভাঙিয়া তাহাকে ছুঁড়িবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। তারপর যখন হইতে সে বিবেচনাপূর্বক পাথর ভাঙিতে অভ্যাস করিল তখন হইতেই ক্রমে অস্ত্র গড়িবার নানারকম কায়দা দেখা দিল—ঠ্যাঙাইবার অস্ত্র, গুঁতাইবার অস্ত্র, ছুঁড়িয়া বিঁধাইবার অস্ত্র, কোপাইয়া কাটিবার অস্ত্র, ভারি ভারি ভোঁতা অস্ত্র পাথরে-খোদাই ধারাল অস্ত্র। যেদিন মানুষ আগুনকে কাজে লাগাইতে শিখিল, আর যেদিন সে নানারকম ধাতুর ব্যবহার শিখিল, সেইদিন মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। সেইদিন হইতে মানুষ যথার্থরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে, জগতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই।

বিবিধ

সূক্ষ্ম হিসাব

একজন লোককে তাহার বয়স জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ কাগজ পেন্সিল লইয়া হিসাব করিয়া বলিল, "আঠার বৎসর তিন মাস ষোল দিন চার ঘণ্টা—কত মিনিট ঠিক বলতে পারলাম না।" যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি ত উত্তর শুনিয়া চটিয়াই লাল। বাস্তবিক, আমাদের সকল কাজের যদি এরকম চুলচেরা সূক্ষ্ম হিসাব রাখিতে হয়, তবে হিসাবের খবর লইতেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়া যাইত।

মনে কর বাহিরে ভয়ানক ঝড় বহিতেছে। একজন বলিল, "উঃ, ভয়ানক জোরে হাওয়া দিচ্ছে।" যিনি সূক্ষ্ম হিসাব চান তিনি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিবেন "ভয়ানক জোরটা কিরকম জোর? ঘণ্টায় কত মাইল বেগে বাতাস চলছে? একদিকেই যাচ্ছে, না দিক বদলাচ্ছে? কিরকমভাবে বাড়ে কমে?" ইত্যাদি। যাঁহারা মেঘ বৃষ্টি বাতাস লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা এইরকম সব খবর সংগ্রহ করিবার জন্য নানারকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কল ব্যবহার করেন। বাহিরে খুব এক চোট বৃষ্টি হইয়া গেল। লোকে দেখিয়া বলিল, "বাস্‌রে, কি ঝমাঝম্ বৃষ্টি।" কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম হিসাবী পণ্ডিতরা হয়ত বলিবেন, "এই বৃষ্টিকে যদি সমানভাবে মাটির উপর ধরিয়া রাখা যাইত তবে ঠিক এক ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি জল দাঁড়াইত।"

শীত গ্রীষ্ম বুঝাইবার জন্য আমরা কতখানি ঠাণ্ডা বা কতখানি গরম তাহাও ভাষায় কতবার বলিতে চেষ্টা করি—যেমন, 'শীতে হাড় জমে গেল; বড্ড শীত; বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে; একটু যেন গরম; বেশ গরম; ভয়ানক গ্রীষ্ম; উঃ, গরমে গা ঝলসে গেল' ইত্যাদি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি চট্ করিয়া বলিয়া দিবেন "আর এত 'ডিগ্রী' ঠাণ্ডা হইলেই বরফের মতো ঠাণ্ডা হইবে" বা "আর এত 'ডিগ্রী' গরম বাড়িলে ফুটন্ত জলের মতো গরম হইবে।" এক ঘটি ঠাণ্ডা জল রহিয়াছে, তুমি তাহাতে এক ফোঁটা গরম জল ফেলিয়া দাও,—কোন তফাৎ বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু এমন যন্ত্র আছে যাহা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিতে পারিবেন, "এই জলটা একটু গরম হইল।' এখান হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে একটা বাতি জ্বালিয়া রাখ আর এখানে বসিয়া যন্ত্রের মুখ তাহার দিকে ফিরাইয়া দাও। অমনি দেখিবে, কলের মধ্যে সূক্ষ্ম কাঁটা সেই গরমেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

একটি কাগজের ঠোঙায় খানিকটা চাল রহিয়াছে তুমি হয়ত দাঁড়িপাল্লা দিয়া মাপিয়া বলিলে "আধসের চাল।" বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি তাঁহার চমৎকার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া বলিবেন "না, ঠিক আধসের হয়নি। আরও প্রায় দেড়খানা চাল দিলে তবে ঠিক আধসের হবে!"

আমরা কথায় বলি 'চুল চেরা' হিসাব আর মনে করি চুলকে চিরিতে গেলে বুঝি হিসাবটা নিতান্তই সূক্ষ্মরকম হয়। কিন্তু যাহারা অনুবীক্ষণ লইয়া কাজ করেন তাঁহারা বলিবেন "চুলটা ত একটা দস্তুরমত মোটা জিনিস। একটা চুলকে হাজার বার চিরলে তবে বলি—"হ্যাঁ, হিসাবটা কতকটা সূক্ষ্ম বটে।" অনুবীক্ষণের সাহায্যে

পণ্ডিতেরা যে সকল সূক্ষ্ম জিনিসের খবর রাখেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এতই সূক্ষ্ম যে তাদের একটার কাছে একটা ছোট পিঁপড়া যেন ছারপোকার পাশে হাতীর মতো দেখায়! এক ইঞ্চিকে একশ ভাগ, হাজার ভাগ, লক্ষ ভাগে চিরিয়াও পণ্ডিতদের হিসাবের পক্ষে যথেষ্ট সূক্ষ্ম হয় না। এক চৌবাচ্চা জলের মধ্যে যতটুকু চিনি থাকে তাহার চাইতেও অল্প পরিমাণ জিনিস পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা সেইসব জিনিস সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর সংগ্রহ করিয়াছেন।

খুব তাড়াতাড়ি 'কাট্' বলিতে চেষ্টা করত। কতক্ষণ সময় লাগে? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে কথাটা শেষ হইতে প্রায় এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। একটা দ্রুত চলন্ত ট্রেন ততক্ষণে পাঁচ ছয় হাত চলিয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবীর কাছে সময়ের এ-হিসাবটা খুবই মোটা। ট্রেনটা এক চুল পরিমাণ নড়িতে যতটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে যাহা ঘটিতেছে বৈজ্ঞানিক তাহার সন্ধানও রাখিয়া থাকেন। এইখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বালিয়া দেখ; আলোক ছুটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং তৎক্ষণাৎ লোকে দেখিবে 'এই আলো জ্বলিল?' 'তৎক্ষণাৎ' বলিলাম, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিবেন "তৎক্ষণাৎ নয়, একটু পরে। ওই অনেক দূরে যারা রয়েছেন তাদের কাছে আলো পৌঁছিতে কিছু সময় চাই ত।" যদি জিজ্ঞাসা কর "কতখানি সময় লাগে" তিনি বলিবেন "ট্রেনটা যতক্ষণ এক ইঞ্চি যাবে, আলো ততক্ষণে কলকাতা থেকে ছুটে গিয়ে মধুপুরে হাজির হবে!"

শিকারী গাছ

উপযুক্তরকম জল মাটি বাতাস আর সূর্যের আলো পাইলেই গাছেরা বেশ খুশী থাকে, আর তাহাতেই তাহাদের রীতিমত শরীর পুষ্টি হয় আমরা ত বরাবর এইরকমই দেখি এবং শুনি। তাহারা যে আবার পোকা মাকড় খাইতে চায়, শিকার ধরিবার জন্য নানারকম অদ্ভুত ফাঁদ খাটাইয়া রাখে এবং বাগে পাইলে পাখিটা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করিয়া ফেলে, এ কথাটা চট্ করিয়া বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা জাতীয় গাছ এই শিকারী বিদ্যা শিখিয়াছে। তাহারা যে সখ করিয়া পোকা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছে তাহা নয়, ঠেলায় পড়িয়াই ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেক শিকারী গাছের বাস এমন স্যাঁৎসেতে জায়গায় এবং সেই সকল জায়গা গাছের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর যে সেখানে তাহারা তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী মাল-মসলা ভাল করিয়া জোগাড় করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায়, দু একটা পোকা, মাছি বা ফড়িং যদি তাহারা খাইতে না পারিত তবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকাই মুস্কিল হইত।

আগেই বলিয়াছি, শিকারী গাছ নানারকমের আছে। ইহাদের শিকার ধরিবার জায়গাও নানারকম। কোন কোন গাছের পাতায় মাছি বা পোকা বসিলে পাতাগুলি আস্তে আস্তে গুটাইয়া যায়। মাছি বেচারা কিছুই জানে না, নিশ্চিন্ত মনে পাতার রস খাইতেছিল, হঠাৎ দেখে চারিদিকে ঘেরা, তাহার মধ্যে সে বন্দী! পাতার গায়ে লোমের মতো সরু সরু কাঁটা, তাহারই মুখে আঠার মতো রস লাগান থাকে; সেই রসে আটকাইয়া শিকারের পালাইবার আরও অসুবিধা হয়। শুধু তাহাই নহে, পাতা

গুটাইয়া গেলে পরে সেই সকল কাঁটার মুখ হইতে একরকম তীব্র হজমি রস বাহির হয়, তখন পোকাটা যতই ছট্‌ফট্‌ করে, ততই আরও বেশি করিয়া রস বাহির হয়। তাহাতেই শিকার মরিয়া শেষে হজম হইয়া যায়। তারপর আপনা হইতেই আবার পাতা খুলিয়া যায়। জলের মধ্যে একরকম গাছ থাকে, তাহার সাদা ফুল; জলের ধারে একটা খুব রংচঙে গাছ থাকে, তাহার পাতাগুলির চেহারা কতকটা কদম ফুল গোছের। আর একরকমের গাছ থাকে তাহাতে ঠিক যেন মোচার খোলের মতো পাতা সাজান। এই সবগুলিই এক প্রকারের শিকারী গাছ এবং ইহাদের শিকার ধরিবার কায়দাও প্রায় একরকম। মনে কর, একটা মস্ত পোকা ওই কদম ফুলের মতো গাছটিতে উঠিয়াছে। আর একটু পরেই গাছের পাতাগুলি গুটাইয়া মাঝখানে আসিয়া মিলিবে—একটি ফুটন্ত ফুল মুড়িয়া আবার কুঁড়ি হইয়া গেলে যেমন হয়, সেইরূপ! তখন পোকা বেচারার আর পলাইবার পথ থাকিবে না।

আর একরকমের অদ্ভুত গাছ আছে, এক একটা পাতার আগায় গোলাপী রঙের কি একটা জিনিস, তার চারদিকে কাঁটা। এই জিনিসগুলি Fly-trap (মাছি-মারা ফাঁদ)। এক একটা ফাঁদ যেন মাঝখানে কব্জা দিয়া আটকান, বইয়ের মতো খোলে আবার বন্ধ হয়। কোন পোকা হয়ত পাতায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন বিপদের চিহ্নও নাই; ঘুরিতে ঘুরিতে সে ওই ফাঁদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। হয়ত দূরে থাকিয়া তাহার ঐ রংটা খুব পছন্দ হইয়াছিল—তাই সে দেখিতে আসিল ব্যাপারখানা কি। কিন্তু সে ত জানে না যে ফাঁদের গায়ে সরু সুতার মতো কি লাগান রহিয়াছে, তাহাতে ছুঁইলেই ফাঁদ বন্ধ হইয়া যায়! সে যেমন একটি সুতায় পা অথবা ডানা লাগাইয়াছে অমনি—খট্‌! ফাঁদ ছুটিয়া একেবারে বেমালুম বন্ধ হইয়া গেল। এখানে আর আঠার দরকার নাই, কারণ ফাঁদটি রীতিমত মজবুত এবং খুব চট্‌পট্‌ কাজ সারে। আর একরকম শিকারী গাছ আছে, তাহাদের শিকার ধরিবার জন্য থলি বা চোঙা থাকে। এই থলি বা চোঙার মধ্যে পোকা বেশ সহজেই ঢুকিতে পারে কিন্তু বাহির হওয়া তত সহজ নয়। ইহাদের ভিতর সরু সরু কাঁটা থাকে—সেগুলির মুখ সব নীচের দিকে, আর তার গায়ে মোমের মতো একরকম কি মাখান থাকে, তাহাতে পোকাগুলি বেশ সহজেই সুড়্‌ সুড়্‌ করিয়া পিছলাইয়া নামিতে পারে। কিন্তু উপরে উঠিবার সময় ত আর পিছলাইয়া উঠা যায় না—তা ছাড়া কাঁটার খোঁচাও যথেষ্ট খাইতে হয়। এইসকল থলির তলায় প্রায়ই জল জমিয়া থাকে, পোকা যখন বার বার পালাইবার চেষ্টা করিয়া হয়রান হইয়া পড়ে, তখন সে ওই জলের মধ্যে পড়িয়া মারা যায়। এইসকল গাছে পোকাকে ফাঁকি দিবার এতরকম উপায় থাকে যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। কোনটার মুখে ঢাকনি থাকে; সে ঢাকনির উপর হইতে চাপ দিলে খুলিয়া যায়! কিন্তু ভিতর হইতে ঠেলিলে খোলে না। প্রায় সবগুলিরই মুখের কাছে খুব সুন্দর রঙিন কাজ আর তার চারিদিকে মধু। সেই মধু খাইতে খাইতে পোকা ভিতরের দিকে ঢুকিতে থাকে—যত খায় তত মিষ্টি! শেষে এক জায়গায় গিয়া দেখে তাহার পরে আর মধু নাই—তখন সে ফিরিতে চায়! কিন্তু ফিরিতে আর পারে না। কোন কোন থলির ভিতরে খানিকটা জায়গা স্বচ্ছ মতন—ঠিক যেন সার্‌সি। পোকাগুলি মনে করে এই পলাইবার পথ—আর ক্রমাগত সেই সারসির গায়ে উড়িয়া উড়িয়া হয়রান হইয়া পড়ে। কখন কখন এমনও হয় কোন ছোট পাখি বা ইঁদুর হয়ত জল খাইতে আসিয়া ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং আর বাহির হইতে না পারিয়া প্রাণ হারায়!

কাগজ

এমন সময় ছিল যখন মানুষ লিখিতে শিখিয়াছে, কিন্তু কাগজ বানাইতে শিখে নাই। কোন কোন দেশে তখন পাথরে খোদাই করিয়া লিখিবার রীতি ছিল। কেহবা নরম মাটিতে লিখিয়া সেই মাটি পরে পোড়াইয়া ইঁটের টালি বানাইয়া লইত। সেই ইঁটেতেই তাহাদের কাগজের কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু এইরূপ ইঁটের টালি নিয়া লেখাপড়া করা যে বিশেষ অসুবিধার কথা তাহা সহজেই বুঝিতে পার। মনে কর কোন ছাত্র পাঠশালায় যাইতেছে। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিন ঝুড়ি ইঁটের পুঁথি চলিল—আর লিখিবার জন্য এক তাল কাদা। সামান্য কয়েকখানা চিঠি পাঠাইতে হইলেই প্রাণান্ত পরিশ্রম—মাটি আনরে, জল আনরে, ঠাসিয়া কাদা কররে, চৌকস কররে, টালি বানাওরে, তবে তাহাতে অক্ষর লেখরে, পোড়াওরে, ঠান্ডা কররে, মুটে ডাকরে—হাঙ্গামের আর অন্ত নাই।

ইহার চাইতে আমাদের দেশে যে গাছের পাতায় লেখার রীতি অনেকদিন চলিয়া আসিয়াছে সেটা অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক। ৬০০০ বছর আগে ইজিপ্টে ‘পেপিরাস’ গাছের কচি ছাল পিটিয়া থ্যাৎলাইয়া কাগজের মতো একরকম জিনিস তৈয়ার করিত। এই পেপিরাস কথা হইতেই ইংরাজি পেপার (Paper) শব্দটা আসিয়াছে। কিন্তু এই পেপিরাস জিনিসটাকেও ঠিক কাগজ বলা যায় না। কাগজ তৈয়ারির উপায় প্রথম বাহির হইয়াছিল চীনদেশে; কিন্তু চীনারা এই বিদ্যা আর কাহাকেও শিখাইত না। প্রায় বার শত বৎসর হইল কতকগুলি চীনা কারিকর আরবীদের সঙ্গে যুদ্ধে ধরা পড়ে। তাহাদের কাছে আরবের কারিকরেরা কাগজ বানাইতে শিখিয়া লইল, এবং সেইসময় হইতেই এই বিদ্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আরব হইতে ইজিপ্ট, ইজিপ্ট হইতে আফ্রিকার অন্যান্য যায়গায় হয়।

তারপর স্পেন, জার্মানি, ইংলন্ডে সকল জায়গায়ই ক্রমে ক্রমে কাগজের কারখানা দেখা দিল। সে সময়ে ছেঁড়া নেকড়া দিয়া সমস্ত কাগজ তৈয়ারি হইত এবং সেটা আগাগোড়াই হাতে হইত। পরিস্কার নেকড়াকে ভিজাইয়া একটা দাঁতাল জিনিস দিয়া ঠেঙান হইত; তাহাতে নেকড়াটা ছিঁড়িয়া সুতার আঁশের মতো টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। তাহাতে জল মিশাইয়া আরও অনেকক্ষণ পিটিলে কতকটা পাৎলা মণ্ডের মতো একটা জিনিস হয়। এই নেকড়ার মণ্ডকে চালনিতে চালিয়া নানারকমে ছাঁকিয়া ঝাঁকাইয়া, লুচির মতো বেলিয়া তবে কাগজ তৈয়ারি হইত। সে সময়ে লোক কাগজটাকে খুব একটা সৌখীন জিনিস বলিয়াই মনে করিত, কিন্তু ক্রমে কাগজের দাম কমিয়া আসিল, কাগজ বানাইবার নানারকম কল বাহির হইল আর কাগজের কাটতি এত বাড়িয়া গেল যে কাগজওয়ালারা দেখিল এত ছেঁড়া নেকড়াই জোগাড় করা সম্ভব নয়। তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল, আর কি জিনিস হইতে কাগজ করা যাইতে পারে। প্রথমত স্পেন দেশের এস্পার্টো ঘাসে খুব কাগজ হইত, তারপর ক্রমে দেখা গেল তাহাতেও কুলায় না। সেই হইতে কাগজ বানাইবার জন্য কত জিনিস লইয়া যে পরীক্ষা

হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আখের ছিব্‌ড়া, কলার খোসা, পাট, খড়, ঘাস, বাঁশ, কাঠ—সুতার মতো আঁশওয়ালা, আখের মতো ছিব্‌ড়াওয়ালা যতরকম জিনিস আছে তার কোনটিই বাকী নাই। মোটের উপর বলা যাইতে পারে কাঠ, এস্পার্টো ঘাস আর পুরাতন নেকড়া ও কাগজ হইতেই আজকাল কাগজ প্রস্তুত হয়।

বোলতা যে চাক বানায় তাহার মধ্যে একটা জিনিস থাকে সেটা ঠিক কাগজের মতো। বোলতারা গাছের শাঁস খায় এবং সেই শাঁসকে চিবাইয়া হজম করিয়া এই কাগজ বাহির করে। আজকাল কাগজের কলেও সেইরূপে কাঠ ঘাস প্রভৃতি জিনিস হইতে নানারকম কাগজ তৈয়ারি হয়। অবশ্য কাগজওয়ালাদের ঐসব জিনিস বোলতার মতো চিবাইতে হয় না; এ সব কাজই কলে হয়।

যে কাঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয় সেই কাঠ আসে আমেরিকা ও নরওয়ের জঙ্গল হইতে। জঙ্গলওয়ালারা বড় বড় গাছের গুঁড়ি কাটিয়া কলের মুখে ফেলিয়া দেয়—আর কলের আর এক মাথায় কাঠ কুচি হইয়া বাহির হয়। সেই কুচিকে গুঁড়াইয়া, সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিতে হয়, তারপর সেই ক্ষীরের মতো নরম কাঠকে চাপ দিয়া পাতলা পাতলা পাটালি বানান হয়- এবং সেই পাটালি কাগজওয়ালাদের কাছে চালান দেওয়া হয়।

কাগজওয়ালারা এই পাটালিকে আবার জলে ঘুঁটিয়া মণ্ড তৈয়ারি করেন, সেই মণ্ডকে সিদ্ধ করিয়া ঝোলের মতো করেন। এই ঝোল লোহার নলে করিয়া কাগজের কলের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। কল একদিকে কাঠ, ঘাস বা নেকড়ার ঝোল খাইতে থাকে আর একদিকে ৪/৫ মাইল লম্বা কাগজের থান বাহির করিতে থাকে। সমস্ত দিন রাত কল চলিলে বারো হাত চওড়া আড়াই মাইল লম্বা একখানা কাগজের থান বাহির হয়। তাহার পরে গরম জলের চৌবাচ্চার মধ্যে সেই মণ্ড গুলিয়া ঝোল তৈয়ারি হয়।

ঝোলটা যখন কলের মধ্যে চালান হয় তখন সেটা একটা লম্বা চলন্ত ছাঁক্‌নির উপর পড়ে। ছাঁক্‌নিটা চলিতে থাকে আর মাঝে মাঝে কেমন একটা ঝাঁকানি দেয়, তাহাতে জল ঝরিয়া যায় এবং ঝোল ক্রমে চাপ বাঁধিয়া আসে। এমনিভাবে চলিতে চলিতে ঝোলটা কলের আরেক মাথায় আসিয়া পড়ে—সেখানে লুচি বেলিবার বেলুনের মতো অনেকগুলা 'রোলার' খাটান থাকে। ছাঁক্‌নিটা এইখানে আসিয়া ঝোলটাকে একটা রোলারের গায়ে ছিটকাইয়া দেয়। কিন্তু সে ঝোল আর এখন ঝোল নাই; এখন তাহার চেহারা অনেকটা ভিজা ব্লটিং কাগজের মতো। এতক্ষণে তাহাকে ঠিক কাগজ বলা চলে।

রোলারের গায়ে কাগজ লাগিবামাত্র রোলার তাহাকে টানিতে থাকে। তারপর সেই টানে কাগজও অনেকগুলি রোলারের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে থাকে। এমনি করিয়া কাগজকে ক্রমাগত চাপ দিতে হয়, লুচির মতো বেলিতে হয়, ঘষিতে ও পালিশ করিতে হয়, তাহাতেই কাগজ ক্রমে পাতলা ও মোলায়েম হইয়া আসে।

অবশ্য এই সমস্ত কাজই কলে আপনা-আপনি হইতে থাকে। দু-একজন লোক থাকে তারা কেবল দেখে সমস্ত কল ঠিকমত চলিতেছে কিনা। চব্বিশ ঘণ্টা সমান হিসাবে কাজ চলে; কলের এক মাথায় অনবরত ঝোল আসিয়া পড়িতেছে—সেই ঝোল-শুদ্ধ ছাঁক্‌নি কেবলই ছুটিতেছে, ছাঁক্‌নি হইতে জমাটবাঁধা কাগজ ক্রমাগতই রোলারের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, বোলারেরও বিশ্রাম নাই, সেও কাগজ টানিতেছে আর ঠেলিয়া বাহির করিতেছে।

লুপ্ত সহর

'লুপ্ত সহর' লিখিলাম বটে—কিন্তু আসলে সে সহর এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। সহরের পথঘাট, দোকানপাট এমনকি ঘরের আসবাব পর্যন্ত অনেক জায়গায় ঠিক রহিয়াছে অথচ সে সহর আর এখন সহর নাই—সেখানে লোক থাকে না, কোন কাজ চলে না—মাঝে মাঝে নানা দেশ হইতে লোক আসে কিন্তু সেও কেবল 'তামাসা' দেখিবার জন্য।

পম্পেয়াই—আড়াই হাজার বৎসরের পুরাতন সহর, ইটালির পাগলা পাহাড় ভিসুভিয়াস তাহাতে ছাই চাপা দিয়া আগুন ঢালিয়া একেবারে সহরকে সহর বুজাইয়া দিয়াছিল। প্রায় আঠার শত বৎসর এমনিভাবে সহর চাপা পড়িয়াছিল—সেখানে যে সহর ছিল সেই কথাই লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল—কারণ বাহির হইতে সহরের চিহ্নমাত্র দেখা যাইত না। চাষারা নিশ্চিন্তে চাষ করিত, লোকে স্বচ্ছন্দে চলা-ফিরা করিত, কাহারও মনে হয় নাই যে এই মাটি খুঁড়িলেই প্রকাণ্ড সহর বাহির হইয়া পড়িবে। তারপর, সে প্রায় একশত বৎসরের কথা, সেই মাটির নিচ হইতে মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জিনিস বাহির হইতে লাগিল। বাড়ির টুকরা, পাথরের বেদী, বাঁধান রাস্তা এই-সকল দেখিয়া তখন লোকের মনে পড়িল দু হাজার বৎসর আগে এইখানে প্রকাণ্ড সহর ছিল।

পম্পেয়াই বড় যেমন-তেমন সহর ছিল না—সেকালের ইতিহাসে লেখে, তিন লক্ষ লোক সে সহরে বাস করিত। জায়গাটা সমুদ্রের ধারে আর খুব স্বাস্থ্যকর, তাই বড় বড় রোমান ধনীরা অনেকে সেখানে থাকিতেন। খুব জমকালো সহর বলিয়া সে সময় পম্পেয়াই-এর খুব নাম ছিল। তাহার বাড়িঘর, পথঘাট, বাগান, সাজসজ্জা বড়লোকের সহরেরই মতো ছিল। ভিসুভিয়াসের যে কোনরকম দুষ্ট মতলব আছে তাহা কেহ তখন জানিত না তাই একেবারে পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া সহর বসান হইয়াছিল।

সহর ধ্বংস হয় ৭৯ খৃষ্টাব্দে। তখন রোমান ধনীরা তাঁহাদের সুন্দর সহরকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আরামে আলস্যে দিন কাটাইতেছেন—পম্পেয়াই সহর বাবুয়ানায় মত্ত। কোন বিপদের চিহ্ন নাই, তখন বলিতে গেলে পৃথিবীময় রোমান রাজ্য—রোমের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, রোমানদের সঙ্গে শত্রুতা করে কার সাধ্য! লোকে নিশ্চিন্ত আছে কোথাও ভয় নাই! মাঝে মাঝে একটু আধটু ভূমিকম্প হইত, পাহাড়ের ভিতরে গুর গুর শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু তাহাতেও লোকের বিশেষ কোন ভয় নাই। কিছুদিন দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই সেসব অভ্যাস হইয়া গেল। তারপর একদিন হঠাৎ পাহাড়ের চূড়া ভাঙিয়া কালো ধোঁয়া দম্‌কা হাওয়ার মতো চারিদিকে ছুটিয়া বাহির হইল। সেই ধোঁয়ায় পঞ্চাশ মাইল পথ এমন অন্ধকার হইয়া গেল যে মাটি আর আকাশ তফাৎ করা যায় না। তারপরে খানিকক্ষণ গরম ধূলার তুফান চলিল। ইহার মধ্যে যাহারা সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল তাহাদের অনেকে বাঁচিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সহরের মধ্যে একজন লোকও বাঁচে নাই। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকাইতে

লাগিল, ক্রমাগত ভয়ানক বাজ পড়িতে লাগিল। ভূমিকম্প আরম্ভ হইল, বাড়িঘর ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, ভিসুভিয়াস সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া শেষটায় ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া গেল। পাহাড়ের ভিতর হইতে লক্ষ লক্ষ মণ জ্বলন্ত পাথর ছিটকাইয়া চারিদিকে আগুন বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহার পরেও হয়ত অনেক লোক বাঁচিতে পারিত কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ হইল না। ভিসুভিয়াসের ভিতরকার পাথর গরমে গলিয়া ভাঙা পাহাড়ের ফাটল দিয়া সহরের উপর গড়াইয়া পড়িল, সমস্ত সহরটা যেন টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। অনেকে আগুনের ভয়ে সমুদ্রের দিকে পলাইয়াছিল কিন্তু সেখানেও রক্ষা নাই। এই প্রলয় কাণ্ডের মধ্যে সমুদ্র কি স্থির থাকিতে পারে? সে প্রথমটা তীর হইতে পিছাইয়া গেল। দেখিয়া বোধ হইল যেন সমুদ্র আগুনের ভয়ে হটিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের জন্তুগুলি শুকনা ডাঙায় পড়িয়া কত যে মারা গেল তাহার ঠিক নাই। কিন্তু সমুদ্র যাইবে কোথায়? একটু পরেই ভূমিকম্পের একটা ধাক্কার সঙ্গে সে আবার আসিয়া পড়িল, এবং নৌকা ঘরবাড়ি পথঘাট যাহা ছিল সমস্ত ভাঙিয়া ভাসাইয়া প্রমাণ করিয়া দিল যে, 'আমিও বড় কম নই।' জল, মাটি, আকাশ—এই তিনের রেষারেষির মধ্যে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেশটার চেহারা বদলাইয়া গেল। ভিসুভিয়াসের উপরটা আগে ছাদের মতো সমান ছিল—সেই জায়গাটা বাটির মতো গর্ত হইয়া গেল—সেই বাটির মধ্যে আবার একটা নূতন ছুঁচাল চূড়া বাহির হইল। আর পম্পেয়াই?—পম্পেয়াই যেখানে ছিল সেখানে প্রায় ত্রিশ হাত উঁচু পাথর মাটি আর ছাই!

সেই পম্পেয়াইকে আবার এতদিন পরে মানুষে কত যত্নে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতেছে। দু হাজার বৎসর আগে মানুষেরা কি খাইত. তাহাদের ঘর বাড়ির বন্দোবস্ত কিরকম ছিল, তাহাদের হাট বাজার সরাইখানা সভাঘর মন্দির কিরূপ ছিল এখন আমরা চোখের সামনে দেখিতে পাই। ভিসুভিয়াস একদিকে যেমন সহরকে নষ্ট করিয়াছে আর একদিকে আবার সেই ভাঙা সহরকে ছাই চাপা দিয়া এতকাল আশ্চর্যরকম রক্ষা করিয়াছে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে কত মানুষের মৃতদেহ পাওয়া যায়—সেগুলি সমস্তই জমিয়া পাথর হইয়া রহিয়াছে। কোন জায়গায় দু-একটি, কোথাও অনেকগুলি লোক একত্র মরিয়া আছে। কোথাও মা অন্ধকারে তাঁহার শিশুকে খুঁজিতে গিয়া মারা পড়িয়াছেন। কাহারও হাতে টাকার থলি, কাহারও হাতে গহনার বাক্স।

চারিদিকে ভয়ের ছবি; লোকে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে পলাইয়াছে—অন্ধকারে পথ হারাইয়া দিক্‌বিদিক ভুলিয়া পাগলের মতো ছুটিয়াছে। এই গোলমাল ব্যস্ততার ঠিক মধ্যেই এক রোমান প্রহরী ফটকে পাহারা দিতেছিল। আশ্চর্য তাহার সাহস, সে তাহার জায়গা ছাড়িয়া এক পা-ও নড়ে নাই, পালাইবার চেষ্টাও করে নাই। ফটকে থাকিতে হইবে এই তাহার কর্তব্য—সুতরাং 'যো হুকুম!' সে ফটকের সামনে খাড়া থাকিয়াই মারা গেল এবং এইরূপ অবস্থাতেই অস্ত্রশস্ত্র বর্মশুদ্ধ তাহার দেহ পাওয়া গিয়াছে। কর্তব্য-নিষ্ঠার এরূপ আশ্চর্য পরিচয় জগতে খুব কমই পাওয়া যায়।

এখন সেই সহরের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে কেমন অদ্ভুত লাগে। অনেক জায়গায় দু হাজার বৎসর আগে যে জিনিসটি যেখানে ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে—এক জায়গায় একটা টেবিলে খাওয়া-দাওয়া চলিতেছিল হঠাৎ লোকে খাওয়া ফেলিয়া পালাইয়াছে—সেই টেবিল সেই খাওয়া তেমনি রহিয়াছে—রুটিটা জমিয়া পাথরের মতো হইয়া গিয়াছে—ছিপি-আঁটা মাটির বোতলে মদ ছিল, সেই মদ পর্যন্ত ঠিক রহিয়াছে! এক জায়গায় হাঁড়িতে কি যেন জ্বাল হইতেছিল—সেই হাঁড়ি এখনও

চুল্লির উপর সেইভাবে বসান রহিয়াছে! কোন জায়গায় বাড়ির ইঁট পুড়িয়া ঝামা হইয়া গিয়াছে; আবার কোথাও সাদা টালি, লাল কালো নানারকম পাথরের কাজ, সমস্তই পরিষ্কার রহিয়াছে। একটা দেয়ালের গায়ে বিজ্ঞাপন লেখা আছে—

"আসেলিনাস্ ও স্মাইরিনে বলিতেছেন—ফস্কাস্‌কে তোমাদের অলডারম্যান পদে নিযুক্ত কর।" ফস্কাস্ বেচারা এই সম্মান পাইয়াছিল কি না তাহা জানিবার আর কোন উপায় নাই।

ডুবুরি জাহাজ

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে একজন ফরাসি লেখক একটা গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এক অদ্ভুত জাহাজের কথা ছিল। সে জাহাজকে মাছের মতো জলের উপর বা নিচ দিয়া যেমন ইচ্ছা চালান যাইত। সে সময়ে লোকের কাছে গল্পটা খুবই অসম্ভব গোছের শুনাইয়াছিল এবং অনেকে গল্পলেখকের 'আজগুবি কল্পনার' খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর এরূপ গল্পে লোকের আশ্চর্য হইবার কথা নয়,—কারণ, বাস্তবিকই ঐরকম জাহাজ এখন অনেকগুলি তৈয়ার হইয়াছে। শুধু ইংলণ্ডেই এখন অন্তত পঁচাশিটা এইরূপ জাহাজ আছে।

জাহাজটা যতক্ষণ জলের উপরে থাকে ততক্ষণ তাহার পিঠে নানারকম মাস্তুল, দড়ি, কলকব্জা ইত্যাদি দেখা যায় কিন্তু জাহাজ ডুব মারিবার আগে এ সমস্ত গুটাইয়া লওয়া হয়। তখন কেবল দুটি চোঙা আর একটি টুপির মতো ঢাকনি জাহাজের উপরে থাকে। ঢাকনিটার গায়ে পুরু কাঁচের সারসি দেওয়া থাকে, তাহার ভিতর দিয়া জাহাজের কাপ্তান বাহিরের সমস্ত দেখিতে পান। জাহাজটা যতক্ষণ আধ-ডোবা অবস্থায় থাকে ততক্ষণ এইভাবে দেখার কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আর কয়েক হাত ডুবিলেই সে পথ বন্ধ। তখন ঐ চোঙা দুটিই চোখের কাজ করে—চোঙার আগায় আয়না ও কাচ শুদ্ধ একটি যন্ত্র বসান থাকে, যন্ত্রটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকে—আর জাহাজের কাপ্তান নিচে বসিয়া সেই আয়নার সাহায্যে বাহিরের সমস্ত অবস্থা দেখিতে পান। দশ হাতের নিচে গেলে এই 'দিকবীক্ষণ' যন্ত্রও ডুবিয়া যায়, তখন কেবল আন্দাজে আর কম্পাস্ দেখিয়া জাহাজ চালাইতে হয়।

জাহাজের মধ্যে একটা লোহার চৌবাচ্চা থাকে—চৌবাচ্চাটা খালি থাকিলে জাহাজ জলের উপরে ভাসে কিন্তু চৌবাচ্চাটার মধ্যে জল ভরিলে জাহাজ ভারি হইয়া ক্রমে ডুবিয়া যায়। এইরকমে জল বাড়াইয়া বা কমাইয়া জাহাজকে অল্প বা বেশি ডুবান যায়। তাড়াতাড়ি জল ভরিবার বা খালি করিবার জন্য জাহাজের মধ্যে বড় বড় 'পাম্প'-কল রাখা হয়—তাহার সাহায্যে এক মিনিটের মধ্যে জাহাজকে পঞ্চাশ হাত জলের নিচে ডুবাইয়া দেওয়া যায়। জাহজের দুই পাশে ও পিছনে মাছের ডানা ও লেজের মতো হাল বসান থাকে, সেইগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জাহাজের মুখ ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে যেমন ইচ্ছা ফিরান যায়। পিছন দিকে দুইটা পাখার মতো ইস্ক্রুপ ঘুরিতে থাকে তাহাই জল কাটিয়া জাহাজকে চালায়। জাহাজের ভিতরে বড় বড় লোহার বোতলে চাপ দিয়া বাতাস ভরিয়া রাখা হয়। তাহাতে জাহাজের বাতাস অনেকক্ষণ

পরিষ্কার রাখিবার সুবিধা হয় এবং অন্যান্য কাজও চালান যায়। ক্রমাগত চব্বিশ ঘণ্টা জলের নিচে থাকিলেও জাহাজের লোকেরা কোনরকম অসুবিধা বোধ করে না। জাহাজে এরূপ বন্দোবস্ত করা যায় যাহাতে একটা জাহাজ কোথাও না থামিয়া চার হাজার মাইল স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারে।

মনে কর আমরা এইরূপ একটা জাহাজের মধ্যে ঢুকিয়াছি—ঢুকিয়াই সকলের আগে চোখে পড়ে—জাহাজের এক মাথা হইতে আর এক মাথা পর্যন্ত কেবল চাকা আর লোহা আর কলকব্জা। চেয়ার টেবিল আসবাবপত্র নাই বলিলেই হয়। সমস্ত জাহাজটা যেন একটা প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কারখানা; সেই বিদ্যুতে জাহাজ চলে এবং জাহাজের বাতি জ্বালা রান্না করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ হয়। জাহাজের কাপ্তান কোথায়? ঐ যে তিনি জাহাজের 'টুপি'র নিচে বসিয়া দিকবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া চারিদিক দেখিতেছেন।

কাপ্তান উপর হইতে হুকুম করিতেছেন আর অন্য একটি কর্মচারী নাবিকদিগের দ্বারা সেই হুকুম তামিল করাইতেছেন। প্রত্যেক লোক তাহার নিজের নিজের জায়গায় প্রস্তুত হইয়া আছে—কখন কি হুকুম আসে! কাপ্তান বলিলেন 'জাহাজ ডাইনে ফিরাও', অমনি একটা চাকা ঘুরাইবা মাত্র জাহাজ ডাইনে ফিরিয়া গেল। 'থাম! টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও।' টর্পিডো কেন? শত্রুপক্ষের জাহাজ দেখা গিয়াছে। টর্পিডো বড় সাংঘাতিক অস্ত্র। একবার বিপক্ষের জাহাজে ভালমত টর্পিডো দাগিতে পারিলে আর দ্বিতীয়বার মারিবার দরকার হয় না। একটা প্রকাণ্ড ছুঁচোবাজির মতো তার চেহারা—তার ভিতরে বারুদ আর অদ্ভুত কল-কারখানা। ডুবুরি জাহাজের সামনেই টর্পিডোর কলখানা—সেই কলের চাবি টিপিলেই টর্পিডো ঘণ্টায় ৪০০ মাইল বেগে ছুটিয়া বাহির হয় এবং বিপক্ষের জাহাজে বা অন্য কোন শক্ত জিনিসে ঠেকিয়া বাধা পাইবামাত্র ভয়ানক শব্দে ফাটিয়া ও জাহাজ ফাটাইয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। বড় ডুবুরি জাহাজে ৩/৪টি পর্যন্ত টর্পিডো কল থাকে। 'টর্পিডোওয়ালা, প্রস্তুত হও!' হুকুম আসিবা মাত্র তাহারা প্রস্তুত! সকলেই জানিয়াছে বিপক্ষের জাহাজ আসিতেছে—কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই। জাহাজের মধ্যে কেবল কলের বন্ বন্ শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নাই।

হুকুম আসিল '৪০ হাত নামাও'—বলিতে বলিতে জাহাজ ডুবিতে লাগিল। একটা কলের কাঁটা আস্তে আস্তে সরিয়া যাইতে লাগিল—২০ হাত, ২৫ হাত, ৩০ হাত। ৪০-এর দাগে কাঁটা নামিল। এখন আর বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। কাপ্তান এখন ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছেন। বিপক্ষের জাহাজটি ঠিক কোনদিকে এবং কত দূরে তিনি খুব ভাল করিয়া তাহার হিসাব লইয়াছেন—তাঁহার জাহাজ কিরকম জোরে চলিতেছে তাহাও তিনি জানেন—সুতরাং তিনি ঠিক বলিতে পারেন কোন্ মুহূর্তে দুই জাহাজে কতখানি তফাৎ থাকিবে। নিঃশব্দে জলের নিচে জাহাজ চলিতেছে—শত্রুজাহাজ কিন্তু তাহার কিছুই জানে না। 'জাহাজ উঠিতে দাও'—আবার কলের কাঁটা নড়িয়া উঠিল—'ত্রিশ হাত, বিশ হাত, দশ হাত—বাস!'—'সম্মুখের টর্পিডো হুঁশিয়ার হও!' এতক্ষণে দিকবীক্ষণ যন্ত্র ভাসিয়া উঠিয়াছে—আবার সব দেখা যাইতেছে। আধ মাইল দূরে শত্রুর জাহাজ—প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ। প্রায় ২০টা ডুবুরির সমান। কাপ্তান একমনে হিসাব করিতেছেন জাহাজটা আরেকটু সামনে সরুক, আরেকটু, আরেকটু—বাস! 'ছাড়'! একটা ভয়ানক ধাক্কা লাগিল—ডুবুরি জাহাজ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় কাৎ হইয়া গেল—হালের নাবিক তাড়াতাড়ি তাহাকে সামলাইয়া লইল। কিন্তু বিপক্ষের জাহাজে যে টর্পিডো লাগিল সে আর তাহা সামলাইতে পারিল না।

জাহাজের গায়ে বিশ হাত গর্ত—জাহাজটা মাতালের মতো টলিতে টলিতে গব্ গব্ করিয়া জল খাইতে লাগিল, তারপর মাথা নিচু করিয়া ডিগবাজী খাইয়া দেখিতে দেখিতে এত বড় জাহাজটা ডুবিয়া গেল।

ডুবুরি কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে নাই—সে একেবারে ডুব মারিয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছে। যতক্ষণ সে তাহার ‘চোখ’টুকু মাত্র বাহির করিয়া চোরের মতো আসিতেছিল শত্রুরা তাহাকে দেখিতে পারে নাই, কিন্তু টর্পিডো ছাড়িবামাত্র জল তোলপাড় হইয়া উঠিল—আর সকলেই বুঝিতে পারিল ‘ঐ ডুবুরি’। বিপক্ষের কামান হইতে একটি গোলা যদি ডুবুরির ঘাড়ে পড়ে তবে আর তার রক্ষা নাই। শুধু যে যুদ্ধের সময়েই ডুবুরি জাহাজের বিপদের ভয় থাকে তাহা নয়। জলের পথে চলা-ফিরা করিতে গিয়া তাহার যে কত সময় কতরকম দুর্ঘটনা ঘটে ভাবিলেও ভয় হয়। জলের নিচ হইতে উঠিতে গিয়া হয়ত কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। হয়ত কোনখানে এতটুকু ফাঁক, কোথায় কলের কব্জা এতটুকু বেঠিক বসিয়াছে—আর অমনি জাহাজ বিগড়াইয়া একেবারে পাথরের মতো ডুবিয়া গেল—শত চেষ্টায়ও আর তাহাকে উঠান গেল না। এরকম কতবার ঘটিয়াছে এবং কত লোক তাহাতে মারা গিয়াছে! জাহাজ ডুবিয়া গেল; ডুবুরি নামাইয়া দেখা গেল ভিতরে মানুষ বাঁচিয়া আছে, ঠক্ ঠক্ শব্দ করিলে তাহারা ভিতর হইতে সাড়া দেয়, অথচ তাহাদের বাঁচাইবার কোন উপায় নাই। যাহাতে এরকম দুর্ঘটনা না হয়, তাহার জন্য প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন বন্দোবস্ত করা হইতেছে এবং জাহাজ ডুবিলেও যাহাতে ভিতরের লোকেরা পালাইয়া আসিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।

পাতালপুরী

পাতাল দেশটা কোথায় তাহা আমি জানি না। অনেকে বলেন আমেরিকার নামই পাতাল! সে যাহাই হউক, মোটের উপর পাতাল বলিতে আমরা বুঝি যে, আমাদের নিচে একটা কোন জায়গা—আমরা এই যে মাটির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তার উপরে যেন স্বর্গ আর নিচে যেন পাতাল!

এখানে যে জায়গার কথা বলিতেছি সেটাকে পাতালপুরী বলা হইল এইজন্য যে সেটা মাটির নিচে। মাটির নিচে ঘরবাড়ি, মাটির নিচে রেলগাড়ি, মাটির নিচে হোটেল সরাই গির্জা—সমস্ত সহরটাই মাটির নিচে। সহরটা কিসের তৈয়ারি জান? নুনের! আসলে সেটা একটা নুনের খনি। অস্ট্রিয়ার কাছে—মাটির নিচে এই অদ্ভুত সহর। হাজার হাজার বৎসর লোকে এই খনিতে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া লবণ তুলিয়াছে। এখনও প্রতি বৎসর এই খনি হইতে প্রায় বিশ লক্ষ মণ লবণ বাহির হয়—কিন্তু তবু লবণ ফুরাইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। মাটির নিচে পঁচিশ মাইল চওড়া ৫০০ মাইল লম্বা লবণের মাঠ। খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে এক হাজার ফুটের নিচেও লবণ।

খনির মধ্যে খানিকটা জায়গায় বড় সুরঙ্গ কাটিয়া পথঘাট করা হইয়াছে তাহার মাঝে মাঝে এক-একটা বড় ঘরের মতো। খনিটা ঠিক যেন একটা সাততালা পুরী,

তার নিচের চারতালায় কুলিরা কাজ করে, উপরের তিনতালায় লবণ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে—সেখানে এখন লোকে তামাসা দেখিতে আসে।

খনির মুখে ঢুকিলেই লবণের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি বাহিয়া লোকে নিচে নামে—কিংবা যদি ইচ্ছা হয় নিচে নামিবার যে কল আছে সেখানে পয়সা দিলেই কলে চড়িয়া নিচে নামা যায়।

প্রথমতালায় অর্থাৎ উপরের তালায়, একটা প্রকাণ্ড সভাঘর। চারিদিকে লবণের দেয়াল, লবণের থাম, লবণের কারিকুরি, তার মধ্যে লবণের ঝাড়লণ্ঠন। এই ঘর দেড়শত বৎসর আগে তৈয়ারি হইয়াছিল। কত বড় বড় লোকে, রাজা-রাজড়া পর্যন্ত, এই সভায় বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া গিয়াছেন। সভার এক মাথায় একটা সিংহাসন। একখানা আস্ত লবণের টুকরা হইতে এই সিংহাসন কাটা হইয়াছে।

ঘরের মধ্যে যখন আলো জ্বালান হয়, তখন সমস্ত ঘরটি স্ফটিকের মতো জ্বলিতে থাকে। লাল নীল সাদা কতরকম রঙের খেলায় চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। লবণ জিনিসটা যে কতদূর সুন্দর হইতে পারে শুধু খানিকটা নুনের গুঁড়া বা কর্‌কচের টুকরা দেখিয়া তাহার ধারণাই করা যায় না।

সভাঘরের খুব কাছেই সেণ্ট আণ্টনির মন্দির। মন্দিরের মধ্যে আলো বেশি নাই, লবণের থামগুলি আধা-আলো আধা-ছায়ায় আর স্ফটিকের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করে না; এক-এক জায়গায় সাদা মার্বেল পাথরের মতো দেখায়। মন্দিরের ভিতরটায় জাঁকজমক বেশি নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ—সভাঘরের হৈ চৈ গোলমাল এখানে একেবারেই পেঁছয় না।

এখান হইতে দ্বিতীয় তালায় নামিবার জন্য আবার সিঁড়ি—সিঁড়িটা একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে নামিয়াছে। ঘরের ছাদটা একটা গম্বুজের মতো। চারিদিকে বড় বড় কাঠের ঠেকা দেওয়া হইয়াছে তা না হইলে ছাদ ভাঙিয়া পড়িতে পারে। ঘরটা এত উঁচু যে তাহার মধ্যে আমাদের গড়ের মাঠের মনুমেণ্টটিকে অনায়াসে খাড়া করিয়া বসান যায়। ঘরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লবণের ঝাড়লণ্ডন, তাহার মধ্যে তিনশত মোমবাতি জ্বালান হয়—কিন্তু তাতেও এত বড় ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।

দেড় শত বৎসর আগে এই ঘরেই খনির আড্ডা ছিল। লবণ খুঁড়িতে খুঁড়িতে খনিতে বড় বড় ফাঁক হইয়া যায়। এই ঘরটিও সেইরকম একটি ফাঁক মাত্র। লোকে উপর হইতে লবণ তুলিতে আরম্ভ করে—ক্রমে যতই লবণ ফুরাইয়া আসিতে থাকে তাহারা একতালা দোতালা করিয়া ততই নিচে নামিতে থাকে।

তৃতীয় তালায় নামিয়া কতগুলি ছোটখাট ঘর ও নানা লোকের কীর্তিস্তম্ভ দেখিয়া লবণের পোল পার হইতে হয়। তার পরেই হোটেল রেলওয়ে স্টেশন ইত্যাদি। সেগুলিও দেখিবার মতো জিনিস।

মাটির সাত শত ফিট নিচে একটা লোনা হ্রদ আছে, এমন লোনা জল বোধহয় আর কোথাও নাই। অন্ধকার গুহা, তার মধ্যে ঠাণ্ডা কালো জল—কোথাও একটু কিছু শব্দ হইলে চারিদিকে গম্‌গম্‌ করিয়া প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। সেই জলের উপর লোকে যখন নৌকা চালায় তখন জলের ছুপ্‌ছুপ্‌ শব্দ চারিদিক হইতে অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্‌ করিতে থাকে—যেন পাতালপুরীর হাজার ভূতে কানে কানে কথা বলে।

উঁচু বাড়ি

লোকে বলে—'মনুমেণ্টের মতো উঁচু!' সেরকম উঁচু বাড়ি দেখলে আমরা বলি 'ইস্! বড্ড উঁচু বাড়ি।' কিন্তু একটিবার আমেরিকায় ঘুরে এস, তারপরে সেই বাড়িই তোমার চোখে নিতান্তই ছোট ঠেকবে। মনুমেণ্টের মাথায় অমন আরও দু-চারটা মনুমেণ্ট চাপাও, তবে আমেরিকার লোকে বলবে 'হ্যাঁ, কতকটা উঁচু বটে!' নিউ ইয়র্কের একটি বাড়ি পঞ্চান্ন তলা—সাড়ে সাতশ ফুট উঁচু! একটা সাধারণ তিনতলা বাড়ি প্রায় ৪০ ফুট উঁচু—এইরকম উনিশটা বাড়ি একটার মাথায় আরেকটা চাপালে তবে ৭৫০ ফুট উঁচু হয়! আমেরিকার এক একটা সহরে বিশতলা ত্রিশতলা চল্লিশতলা বাড়ির ছড়াছড়ি!—ভাবতে গেলে আমাদের মাথা ঘুলিয়ে যায়।

এক একটি বাড়ি যেন এক একটি সহর। তার মধ্যে কত অফিস কত দোকান কত হোটেল গির্জা ইস্কুল থিয়েটার বায়স্কোপ ডাকঘর সভাসমিতি! বাড়ির এক-এক জায়গায় সারি সারি খাঁচার মতো ঘর—তাতে চড়ে লোকে উঠছে নামছে, বিশ পঁচিশ তলা সিঁড়ি ভেঙে কষ্ট করে উঠতে হয় না। বাড়ির মধ্যে ত্রিশ হাজার লোক—সকলেই ব্যস্ত, চারিদিকে ছুটাছুটি অথচ কোন গোলমাল নেই। বন্দোবস্ত এমন সুন্দর যে কিছু একটা দরকার হলে তার জন্যে হাঁ করে বসে থাকতে হয় না বা বিশ মাইল দূরে ছুটতে হয় না। বাড়িতেই সবরকম দোকান—ঘরে বসে টেলিফোন কর, যা চাও দু মিনিটের মধ্যে ঘরে এসে হাজির!

বাড়িতে ঢুকলে দেখবে শুধু যে মাথার উপরে এতখানি দালান আছে তা নয়—মাটির নিচেও দশ বিশ তলা! সেখানে সূর্যের আলো যাবার উপায় নাই—সারাদিন আলো জেবলে কাজ চলে। ওইসব নিচের তলাগুলোতে নানারকম কলকারখানা—ইলেকট্রিক কোম্পানির বড় বড় চাকাওয়ালা কল, বাড়ি গরম রাখবার জন্য বড় বড় 'বয়লার'—বড় বড় ছাপাখানা তাতে সকাল সন্ধ্যা খববের কাগজ ছাপা হয়।

কোন কোন রাস্তার দুধারে এইরকম দশ বিশ তলা বাড়ির সার চলেছে—তার ছায়ায় রাস্তা যেন অন্ধকার—সেখানে সূর্যের মুখ দেখা যায় না—আকাশ দেখতে হলে ঘাড় বাঁকিয়ে উপরে তাকাতে হয়। কিন্তু যারা একেবারে উপরে ত্রিশতলা বা চল্লিশতলায় থাকে তাদের আলো বাতাসের কোন অভাব হয় না। রাস্তার ধুলো সহরের কুয়াশা অত উঁচুতে পেঁছায় না—কাজেই সেখানকার হাওয়া অতি পরিষ্কার।

বাড়িগুলো দেখতে যেমন আশ্চর্য, এগুলি তৈরি করার কায়দাও তেমনি অদ্ভুত। বাড়ি তুলবার আগে প্রায় ১০০/১৫০ হাত গর্ত কেটে ভিৎ খুঁড়তে হয়। যেখানে বাড়ি হবে, তার চারদিকে খুব মজবুত আর খুব উঁচু 'কপিকল' বসায়। সেই কলে বড় বড় লোহার থাম চাপিয়ে থামগুলোকে হিসাবমত ঠিক ঠিক জায়গায় বসান হয়। তারপর থামের গায় লোহার কড়ি বরগা বসিয়ে সেগুলোকে পেরেক স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেয়। এমনি করে সমস্ত বাড়িটার একটা কঙ্কাল আগে খাড়া করা হয়। তারপর ঢালাই-

করা পাথরের মাটির দেওয়াল দিয়ে কঙ্কালটিকে ভরাট করে তাতে দরজা জানালা বসালে পর তখন সেটা বাড়ির মতো দেখতে হয়। যারা এইসকল কাজ করে তাদের যে অনেকখানি সাহস দরকার তা বুঝতেই পার। মাটি থেকে ৪০০ হাত উপরে লোহার বরগার উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করা—তার উপরে বসে কাজ কর্ম করা, কখন বা উপর নিচ ওঠা নামা—এসব যেমন তেমন লোকের কাজ নয়।

রাবণের চিতা

লোকে বলে রাবণের চিতায় যে আগন দেওয়া হয়েছিল সে আগুন নাকি এখনও নিভান হয়নি—এখনও তা জ্বলছে। কোথায় গেলে সে আগুন দেখা যায় তা আমি জানি না—কিন্তু এমন আগুন দেখা গেছে যা বছরের পর বছর ক্রমাগতই জ্বলছে; মানুষ তাতে জল ঢেলে মাটি চাপা দিয়ে নানারকমে চেষ্টা করেও তাকে নিভাতে পারেনি।

খনি থেকে কয়লা এনে সেই কয়লা দিয়ে লোকে আগুন জ্বালায়। কিন্তু তা না করে যদি একেবারে খনির মধ্যেই আগুন ধরিয়ে খনিকে খনি জ্বালিয়ে দেওয়া যায় তবে কিরকম হয়? বাস্তবিকই এমন সব কয়লার খনি আছে যার আশেপাশে বারো মাসই আগুন জ্বলে। সেসব খনির লোকেরা সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকে—কখন সে আগুন খনির মধ্যে এসে পড়ে। কোনদিকে যদি খনির দেয়াল একটু গরম হয় কিংবা খনির কাছে কোন জায়গা যদি বসে-যাবার মতো হয়, তবেই হৈচৈ লেগে যায়—'আগুন আসছে, আগুন আসছে'। খনির একদল লোক আছে তাদের কাজ কেবল আগুন তাড়ান। যেদিক দিয়ে আগুন আসছে বোধ হয়, তারা সেইদিকে ইঁট পাথরের দেয়াল তুলে আগুনের পথ বন্ধ করে দেয়। আগুন তখন বাধ্য হয়ে আর কোন দিক ঠেলে তার পথ করে নেয়। কেমন করে কোথা হতে আগুন আসে তা সব সময়ে বলা যায় না। মাটির নিচে হয়ত বিশ পঁচিশ মাইল জায়গা জুড়ে কয়লার স্তর রয়েছে—কোথাও ১০০ হাত, কোথাও হয়ত পাঁচ হাত মাত্র পুরু। তারই কোনখানে যদি কোন গতিকে আগুন ধরে আর তার আশেপাশে পাহাড়ের ফাটলে যদি বাতাস যথেষ্ট থাকে—তবে সে আগুন একেবারে 'রাবণের চিতা' হয়ে দাঁড়ায়।

খোলা বাতাসে কয়লা যেমন ধু ধু করে জ্বলে যায়, মাটির নিচে তেমন হয় না—সেখানে আগুন যেন শামুকের মতো আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। যেদিকে তার পথ খোলা, যেদিকে একটু কয়লা আর বাতাস—আগুন একদিনে হোক এক বছরে হোক সেদিকটা দখল করবেই। অনেক দিন আগে একবার ইংলণ্ডের একটা গির্জা হঠাৎ বসে যেতে আরম্ভ করল—তার দেয়াল মেঝে সব দেখতে দেখতে হাঁ করে উঠল। এঞ্জিনিয়ার এসে মাটি খুঁড়ে দেখেন ১২ হাত নিচেই কয়লার স্তর আর তাতে আগুন লেগেছে—কয়লা যতই পুড়ে যাচ্ছে, উপরের মাটিও ততই ধসে পড়ছে। তখন পরামর্শ করে সকলে গির্জার মেঝেটা খুঁড়ে প্রকান্ড একটা ফুটো করলেন। সেই ফুটোর মধ্যে প্রায় এক পুকুর জল ঢেলে দেওয়া হল—তারপর মাটি খুঁড়ে লোহার শিক বসিয়ে তার নিচে দেয়ালের গায়ে দেয়াল তুলে সবাই ভাবল, 'এবারে আগুন জব্দ হয়েছে।' কিন্তু সাতাশ বৎসর পরে আবার সেই আগুন কয়লা পুড়িয়ে পুড়িয়ে

তিন দিক ঘুরে গির্জার পিছনে এসে হাজির।

অনেকদিন আগে লিভারপুলের কাছে টড্ নদীর ধারে এক কয়লার খনি ছিল। হঠাৎ কেমন করে সেই খনির এক কোণে আগুন লেগে যায়। খনিশুদ্ধ লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন সে আগুন নিভান গেল না, তখন খনির কর্তারা খাল কাটিয়ে টড্ নদীকে খনির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তাতে তখনকার মতো আগুন চাপা পড়ল বটে কিন্তু জলের স্রোত খনির এমন দুরবস্থা করল যে কর্তারা ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর যখন কিছুদিন না যেতেই আগুন আবার আর একদিকে এসে উঁকি মারল তখন সকলেই বললেন আগুন নিভাবার চেষ্টা বৃথা—ওকে কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখ। যেদিকে আগুন আসবার ভয় সেদিকের কয়লা সরিয়ে ফেল, বড় বড় খাল কেটে দেয়াল তুলে, পথ বন্ধ কর। তাহলেই আগুন আর ছড়াতে পারবে না—ক-দিন বাদে আপনি নিভে যাবে। এইরকমে ছাব্বিশ বছর আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ চলল। একদল লোক কেবল ওই কাজেই দিন রাত লেগে রইল; যারা ছোট ছিল তারা প্রায় বুড়ো হয়ে এল; খনির পাশে দেয়ালের পর দেয়াল উঠল, আগুনের উপর নিচে চারদিকে ঘেরাও হয়ে গেল—কিন্তু আগুন কি থামতে চায়! দেয়াল ভেঙে, পাথর ফাটিয়ে আগুনের শিখা বারবার দেখা দিতে লাগল; আগুন বেড়েই চলল।

একদিকে যেমন আগুন, আর একদিকে জল! পাহাড়ের ফাটল দিয়ে টড্ নদীর জল এসে খনির মধ্যে দিনরাত পড়ত—সেই জল পাম্পকল দিয়ে ক্রমাগত বাইরে ফেলে দিতে হয়। একদিন টড্ নদীতে জোয়ার লেগে উপরের মাটি ধসে গিয়ে কবেকার পুরান এক সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে খনির ভিতরে হুহু করে জল ঢুকল। ভাগ্যিস তখন খনির মধ্যে লোক ছিল না, গোলমাল শুনে তারা সকলে খনির মুখের কাছে দৌড়ে এল। ব্যাপারটা কি বুঝতে কারও বাকী রইল না; সকলেই বলতে লাগল এই জল যদি আগুনে গিয়ে পড়ে, তবে কি হবে? আগুনে জলে যখন দেখা হল তখন কয়েক মিনিট ধরে একটা ভয়ানক গর্জন আর যুদ্ধ চলল—ফুটন্ত জল ফোয়াবার মতো দুশ হাত উঁচু হয়ে এমন জোরে ছুটে বেরুল যে তার ধাক্কায় খনির মুখের কলকব্জা সব কোথায় উড়ে গেল। তারপর দেখতে দেখতে সব চুপচাপ! আগুন ঠাণ্ডা হল আর সঙ্গে সঙ্গে খনির দফাও ঠাণ্ডা।

গিরিধির কাছে একটা কয়লার স্তরে আজ ক-বছর হল আগুন ধরেছে। গরমে মাটি ফাটিয়ে পাহাড় তাতিয়ে সে আগুন এখনও জ্বলছে!

ডুবুরী

জলের তলায় ডুব দিয়ে যাদের কাজ করতে হয় তাদের বলে ডুবুরী। লোকে যে-সকল দামী মুক্তা দিয়ে গহনা বানায় সেই মুক্তাগুলি জন্মায় সমুদ্রের নিচে এক জাতীয় ঝিনুকের মধ্যে। ঝিনুক থেকে একরকম রস বেরিয়ে খোলার মধ্যে ফোড়ার মতো হয়ে জমে থাকে—তাকে আমরা বলি ‘মুক্তা’। সবচেয়ে বড় আর ভাল যেসব মুক্তা, সেগুলি জন্মায় একরকম পোকার উৎপাতে। সেই পোকার কেমন বদ অভ্যাস, সে সুবিধা পেলেই ঝিনুকের খোলার মধ্যে ঢুকে ঝিনুক বেচারাকে অস্থির করে তোলে।

ঝিনুকও তখন বেশ করে রস ঢেলে দিয়ে তাকে জীয়ন্ত কবর দিয়ে রাখে। সেই পোকার কবরগুলিকে ডুবুরীরা সমুদ্রের তলা থেকে কুড়িয়ে আনে, আর সৌখিন লোকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে সেগুলি কিনে যত্ন করে তুলে রাখে।

যেসব মুক্তা অল্প জলে থাকে ডুবুরীরা কেবল সেইগুলিকেই আনতে পারে—কারণ বড়জোর দেড়শ হাতের বেশি এ-পর্যন্ত কোন ডুবুরীই নামতে পারেনি। এমন অনেক ডুবুরী আছে যারা শুধু একটা পাথর-বাঁধা দড়ি নিয়ে দম বন্ধ করে প্রায় দেড় মিনিট কি দু-মিনিট ৩০/৪০ হাত জলের নিচে থাকতে পারে। কিন্তু আজকালকার ডুবুরীরা একরকম অদ্ভুত পোশাক পরে জলে নামে। ডুবুরীর পিঠে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, তাই টেনে ডুবুরী উপরের লেকদের ইশারা করে আর তারা তাকে উঠায় নামায়। ডুবুরীর মাথায় একটা লোহার মুখোশ—তাতে পুরু কাচের জানালা বসান, তাই দিয়ে সে দেখতে পায়—আর টুপির আগায় একটা নল তা দিয়ে উপর থেকে বাতাস আসে, তবে সে নিশ্বাস ফেলতে পারে। পোশাকটি এমন যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনখান দিয়ে এক ফোঁটাও জল ঢুকতে পারে না। ডুবুরীদের পায়ে প্রকাণ্ড ভারি সীসার জুতো আর পিঠেও সীসার বোঝা। জলের নিচে কাজ করার বিপদ অনেকরকম! প্রথম ভয় এই যে যদি পোশাকের মধ্যে কোনরকমে জল ঢুকতে পারে তবে ডুবুরীকে পিষে থ্যাঁৎলা করে ফেলবে। পোশাকটিকে সমস্তক্ষণ বাতাস দিয়ে ফুটবলের মতো পাম্প করে রাখতে হয়—তাহলেই ডুবুরী আর জলের চাপ টের পায় না। ঐ জোরে পাম্প-করা বাতাস যখন পোশাকের মধ্যে ঢোকে তখন ডুবুরীর গায়ের সমস্ত রক্ত আর রস বোতলে-পোরা সোডা ওয়াটারের মতো সেই বাতাস শুষে নেয়। এ অবস্থায় যদি তাকে হঠাৎ উপরে টেনে তোল, তবে সোডার বোতল খুললে যা হয় তার শরীরের মধ্যে তেমনি একটা কাণ্ড চলতে থাকে। এইরকমে কত লোক মারা গেছে। সেইজন্য তুলবার সময়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে দড়ি টানতে হয় আর মাঝে মাঝে থামাতে হয়। যদি পোশাকটি ভাল করে এ'টে পরা না হয়, আর সীসার বোঝাটি কোনরকম খুলে যায় তবে ডুবুরী তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মতো ছিট্‌কিয়ে উপরে ভেসে উঠবে; তাতেও তার হাড়গোড় চুরমার হয়ে যেতে পারে। এসব ছাড়া হাঙর বা অন্য জলজন্তুর ভয় ত আছেই। ডুবুরীরা হাঙরের চাইতেও ভয় করে 'অক্টোপাস'কে। পিটার স্নেল একজন নামজাদা ডুবুরী ছিল। সে একবার জলে নামতেই একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাস শুঁড়ের মতো আট পা বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। ভয়ে স্নেল পাগলের মতো ছুরি চালাতে চালাতে তার দড়ি ধরে প্রাণপণে টানতে লাগল। অনেক টানাটানির পর যখন তাকে প্রায় আধমরা অবস্থায় উপরে তোলা হল, তখনও জানোয়ারটার কয়েকটা কাটা পা তার গায় লেগে ছিল! তার ওজন প্রায় আধ মণ।

আর একটি জিনিস আছে যাকে ডুবুরী দিয়ে কুড়িয়ে এনে লোকে তার ব্যবসা করে। তাকে আমরা বলি 'স্পঞ্জ' (sponge) —সেই যে ফুটোওয়ালা নরম জিনিস যাতে জল শুষে নেয় আবার চাপ দিলে জল বেরিয়ে যায়। স্পঞ্জ জিনিসটা একরকম অদ্ভুত জলজন্তুর খোলস বা কঙ্কাল বা বাসা—যা ইচ্ছা বলতে পার। সমুদ্রের তলায় স্পঞ্জের দল সার বেঁধে মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে থাকে, ডুবুরীরা তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনে।

রাউল নামে একজন লোক স্পঞ্জ তুলবার জন্য একরকম ডুবুরী গাড়ি তৈরি করেছেন। দুজন ডুবুরী তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। স্পঞ্জ দেখবার জন্য গাড়ির সামনে একটা উজ্জ্বল আলো থাকে। গাড়ির নিচে চাকা আর পিছনে দুটা দাঁড়,

তাতেই তার চলা-ফিরা চলে। আর সামনে ডাণ্ডার আগায় একটা হাঁ-করা মতন জিনিস আছে—ঐটা দিয়ে স্পঞ্জ আঁকড়ে আনে।

আজকাল ডুবুরীর পোশাকের নানারকম উন্নতি হয়েছে—কোনটার পিঠে বাতাসের বন্দোবস্ত, তার আলাদা নল লাগে না; কোনটার মধ্যে টেলিফোনের কল, উপরের সঙ্গে কথাবার্তা চলে—আর কোনটার এমন সুবিধা আছে যে ডুবুরী ইচ্ছা করলে কারও সাহায্য ছাড়াই উপরে উঠতে পারে।

পার্লামেন্টের ঘড়ি

বিলাতের যে শাসন-সভা, যেখানে সে দেশের খরচপত্র আইনকানুন ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি নানা ব্যাপারের আলোচনা ও ব্যবস্থা করা হয়—তার নাম পার্লামেন্ট। পার্লামেন্টের বাড়ির দুই মাথায় দুই চূড়া—তারই একটার গায়ে মাটি হইতে প্রায় ১২৫ হাত উঁচুতে পার্লামেন্টের ঘড়ি বসান। ঘড়িটা এত বড় যে রাস্তার লোকে এক মাইল দূর হইতে সেই ঘড়ি দেখিয়া অনায়াসে সময় ঠিক করিতে পারে।

রাস্তা হইতেই প্রকাণ্ড ঘড়িটা চোখে পড়ে, কিন্তু বাস্তবিক ঘড়িটা যে কত বড় তাহা বুঝিতে হইলে একটিবার তাহার ভিতরে ঢোকা দরকার। একটি লোহার প্যাঁচান সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘড়ির কামরায় ঢুকিতে হয়। ঘড়ির চারিদিকে চারিটি মুখ, এক একটি মুখে এক একটি ঘর, তাতে দোতালা বাড়ির মতো উঁচু ঘষা কাচের জানালা। জানালার বাহিরে ঘড়ির কাঁটা—এক একটা সাড়ে সাত হাত লম্বা। রাত্রে সেই ঘরগুলির মধ্যে জানালার পিছনে অনেকগুলি বড় বড় গ্যাসের বাতি জ্বালাইয়া রাখে, তাহাতে ঘড়ির সমস্ত মুখটা আলো হইয়া উঠে। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে ঘড়ির কলকব্জা কিছুই দেখা যায় না। ঘড়ির যে ঘণ্টা বাজে তাহাও এখান হইতে দেখিবার যো নাই—সে সমস্ত ভিতরের আর-একটা ঘরের মধ্যে। ঘণ্টাটি একটি দেখিবার জিনিস। গম্বুজের মতো প্রকাণ্ড কাঁসার ঘণ্টা, তার ওজন সাড়ে তিনশত মণেরও বেশি। প্রথম যখন ঘণ্টাটি তৈয়ারি হইয়াছিল তখন কিছুকাল ব্যবহারের পর সেটা ফাটিয়া যায়; তখন সেটাকে আবার ঢালাই করিয়া নূতন করিয়া গড়া হইল। কিছুদিন পরে নূতন ঘণ্টাতেও ফাটল দেখা দিল। তারপর বছর তিনেক ঘণ্টা বাজান বন্ধ ছিল; পরে হাতুড়িটা বদলাইয়া একটা হালকা, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ মণ ওজনের হাতুড়ি দেওয়ায় আর ফাটল বাড়িতে পারে নাই। এই বড় ঘণ্টাটি ছাড়া আরও চারিটি ছোট ছোট ঘণ্টা আছে, সেগুলি পনেরো মিনিট অন্তর টুং টাং করিয়া বাজে। 'ছোট' বলিলাম বটে কিন্তু এগুলির এক একটির ওজন ৩০ হইতে ১০০ মণ। ঘড়ির পেণ্ডুলামটি প্রায় সাড়ে আট হাত লম্বা, দোলকটির ওজন প্রায় ৪ মণ।

ঘড়িতে দম দেওয়া এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রতি সোম বুধ ও শুক্রবার দুইজন লোককে ক্রমাগত কয় ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই কাজটি করিতে হয়। ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি যতক্ষণ বাজিতে থাকে, সেই ফাঁকে তাহারা একটু বিশ্রাম করিয়া নেয়, আবার মিনিট পনের চাবি ঘুরায়—এইরকম করিয়া সারাটা বিকাল ধরিয়া দম দেওয়া হয়। এই সমস্ত কলকারখানার উপরে, একেবারে চূড়ার আগায় একটা প্রকাণ্ড বাতি। এই

বাতি যখন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন লোকে বুঝিতে পারে, পার্লামেণ্টের সভা বসিয়াছে। চূড়ার কাছে উঠিলে আর একটা আশ্চর্য জিনিস দেখা যায়—ঘড়ির কলকব্জার অনেক নিচে একটা জায়গায় দিনরাত একটা প্রকাণ্ড চুল্লি জ্বলিতেছে। চুল্লির আঁচে ঘড়ির ভিতরটা সকল সময় সমানভাবে গরম থাকে; কোথাও এলোমেলো ঠাণ্ডা লাগিয়া কলকব্জা বিগড়াইতে পারে না।

এত বড় ঘড়ি, ইহার জন্য খরচও হইয়াছে কম নয়। ঘড়ির চারটি মুখের জানালায় লেখা কাঁটা ইত্যাদি শুদ্ধ প্রায় আশি হাজার টাকা লাগিয়াছে। ঘণ্টাগুলির দাম প্রায় লাখ টাকা—কলকব্জায় ষাট হাজার টাকা। সমস্ত ঘড়িটার মোট দাম প্রায় সওয়া তিন লাখ টাকা।

রেলগাড়ির কথা

এমন কত জিনিস আছে যা আমরা সর্বদাই দেখে থাকি এবং তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্যবোধ করি না। অথচ, সেই সব জিনিসই যখন প্রথম লোকে দেখেছিল, তখন খুব একটা হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে বেচারা ছাতা মাথায় দিয়ে ইংলণ্ডের রাস্তায় বেরিয়েছিল, তাকে সবাই মিলে ঢিল ছুঁড়ে এমনি তাড়াহুড়ো করেছিল যে, বেচারার প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

সার ওয়াল্টার র‍্যালে যখন বিলাতে আলু আর তামাকের প্রচলন করলেন, তখনও তাঁকে রীতিমত নাকাল হতে হয়েছিল। শোনা যায়, তিনি একদিন খুব আরাম করে নিজের ঘরে বসে 'পাইপ' মুখে দিয়ে তামাক টানছিলেন, এমন সময় তাঁর চাকর এসে সেই ব্যাপার দেখে, মনিবের মুখে আগুন লেগেছে মনে করে, একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। কি করবে কিছু বুঝতে না পেরে সে এক বালতি জল নিয়ে সার ওয়াল্টারের মাথায় ঢেলে দিল। আলু খেতেও প্রথমটা লোকে কম আপত্তি করেনি। "আলু ভয়ানক বিষাক্ত জিনিস," "আলু খেয়ে লোক মরে যাচ্ছে", এইরকম সব অদ্ভুত গুজব চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে বহুদিন পর্যন্ত লোকের মনে ভয় জন্মিয়ে রেখেছিল।

কলকাতায় হাওড়ার পোল যখন তৈরি হয়নি, তখন একজন সাহেব বলেন যে নৌকার উপর খিলান ভাসিয়ে এইরকম পোল তৈরি হতে পারে। এ কথাটা সে সময়ে লোকের কাছে এমনই অদ্ভুত ঠেকেছিল যে খবরের কাগজে পর্যন্ত সেই বেচারার নামে নানারকম ঠাট্টা-তামাসা বেরিয়েছিল। অথচ এখন হাজার হাজার লোকে প্রতিদিন পোলের উপর যাওয়া-আসা করছে—সেটা বাস্তবিক একটা অদ্ভুত ব্যাপার কিনা, কেউ সে কথা ভেবে দেখবার অবসর পায় না।

রেলগাড়ির প্রচলনও এমনি করেই হয়েছিল। প্রায় একশ বৎসর আগে জর্জ স্টিফেনসন বাষ্পের জোরে গাড়ি চালিয়ে তাতে লোকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করবার প্রস্তাব করেন। তখন সে প্রস্তাবে এতরকম আপত্তি উঠেছিল যে, ক্রমে তর্কটা পার্লামেণ্ট পর্যন্ত গড়ায়। শেষটায় অনেক ঝগড়াঝাটি গণ্ডগোলের পর, স্টিফেনসনকে নানারকম জেরা করে তারপর অনুমতি দেওয়া হল—"আচ্ছা, তোমার রেলগাড়িটা না হয় একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক!" স্টিফেনসন সহজে জেদ ছাড়বার লোক ছিলেন না—তাই

তিনি শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে ছাড়েননি।

এই জর্জ স্টিফেনসনের জীবনের কথা অতি অদ্ভুত। নিতান্ত গরীবের ঘরে যার জন্ম, যে লেখাপড়ার কোনরকম সুযোগ পায়নি এবং ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত কেবল কয়লার খনিতে সামান্য কাজ করেই জীবন কাটিয়েছে, তার মনে এমন আশ্চর্য শক্তি আসে কোথা হতে, ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। স্টিফেনসনেরা ছয় ভাইবোন। বাপ মা অত্যন্ত গরীব, কাজেই ছেলেবেলা থেকেই সব ক-টি ভাইকে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করতে হত। তারা নানান কাজ করে একেকজন দিনে প্রায় দু আনা রোজগার করত। খনিতে নানারকম কল-কারখানা থাকে, সেইগুলার উপর জর্জের ভারি নজর ছিল। সুযোগ পেলেই সে সেগুলোকে নেড়েচেড়ে তার ভিতরের কলকব্জা খুলে দেখত। বইটই কিছুমাত্র না পড়েও কেবল নিজে দেখেশুনে এ-সকল বিষয়ে তার আশ্চর্য দখল জন্মেছিল। সে সময়ে কয়লার খনিতে যে-সকল এঞ্জিন ব্যবহার হত তাদের 'খাড়া এঞ্জিন' বলা যায়—অর্থাৎ সে এঞ্জিন এক জায়গায় খাটান থাকে; তার চাকার সঙ্গে দড়ি, শিকল বা লোহার হাতল জুড়ে গাড়ি টানা, মোট বওয়া, জিনিসপত্র উঠান-নামান প্রভৃতি নানারকম কাজ চালান হয়। সেই সময় হতেই চাকায়-বসান চলন্ত এঞ্জিন গড়বার খেয়াল স্টিফেনসনের মাথায় চেপেছিল।

যাহোক ক্রমে স্টিফেনসনের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তার সপ্তাহে ১২ শিলিং (নয় টাকা) মাইনে হল—তার উপর জুতা সেলাই করে আর ঘড়ি মেরামত করেও সে কিছু কিছু উপার্জন করতে লাগল। সকলে বলল "জর্জ মস্ত রোজগেরে হয়েছে।" এইভাবে প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটে গেল, এর মধ্যেই পাকা এঞ্জিনিয়ার বলে স্টিফেনসনের বেশ একটু নাম হয়েছে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর বয়সে এক খনির মালিককে রাজি করিয়ে স্টিফেনসন তাঁর প্রথম চলন্ত এঞ্জিনের পরীক্ষা করেন। এই এঞ্জিনের সঙ্গে কয়লার গাড়ি জুড়ে দেখা গেল যে ৫০০ মণ কয়লা উঁচু রাস্তায় ঘণ্টায় চার মাইল করে নেওয়া যায়। আগে ট্রামের লাইন বসিয়ে তার উপর লোকেরা গাড়ি ঠেলে নিত, সেই লাইনের উপরই এঞ্জিন বসিয়ে কয়লা চালান হতে লাগল। তারপর বছর খানেকের মধ্যে আরো ভাল দুটি এঞ্জিন তৈয়ারি হল। ক্রমে আশেপাশে আরও কত কয়লার খনিতে স্টিফেনসনের এঞ্জিন চলতে লাগল। এমনি করে আট-দশ বৎসর কেটে গেল।

তখন স্টকটন হতে ডার্লিংটন পর্যন্ত কয়েক মাইল ট্রামের লাইন বসিয়ে ঘোড়ার ট্রাম করবার কথা হচ্ছিল। স্টিফেনসন প্রস্তাব করলেন, ঐ লাইনের উপর এঞ্জিনের গাড়ি চালান হোক। অনেক কথাবার্তা হাঁটাহাঁটির পর, ট্রামের কর্তারা রাজি হলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই লাইন যেদিন খোলা হল তখন 'স্টিফেনসনের লোহার ঘোড়া' দেখবার জন্য ভিড় জমে গিয়েছিল। কয়লা আর ময়দায় বোঝাই হয়ে একগাড়ি যাত্রী নিয়ে স্টিফেনসনের এঞ্জিন স্টকটন হতে রওনা হল; স্টিফেনসন নিজে তার ড্রাইভার। গাড়ির আগে আগে কোম্পানির লোক ঘোড়ায় চড়ে নিশান নিয়ে ছুটল! কিন্তু স্টিফেনসন তাঁর এঞ্জিনে পুরো দম দিয়ে এমন ছুটিয়ে দিলেন যে, সে লোকটির আর সঙ্গে যাওয়া হল না। ডার্লিংটনে সমস্ত মালপত্র নামিয়ে সমস্ত ট্রেনটিকে পঙ্গপালের মতো লোক-বোঝাই করে স্টিফেনসন স্টকটনে ফিরে এলেন। না জানি সে সময়ে লোকের মনে কিরকম উৎসাহ হয়েছিল।

কিন্তু এতেও গোলমাল মিটল না। এরপর যখন মানচেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত রেল করবার কথা হল, তখন আবার তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হল। রেলগাড়ি

জিনিসটাতেই অনেকের আপত্তি; কেউ কেউ তাকে 'শয়তানের যন্ত্র' বলে গাল দিতেও ছাড়েনি। এর মধ্যে আবার অন্য কয়েকটি এঞ্জিনওয়ালা এসে বললেন "আমরা আরো ভাল এঞ্জিন বানিয়েছি—আমাদের উপর ভার দাও।" কেউ বললেন "স্টিফেনসন আবার কোথাকার কে? নাম জানি না, ধাম জানি না—এত বড় কাজের ভার কি যার তার উপর দেওয়া যায়?" তখন চারিদিক থেকে পার্লামেণ্টের কাছে দরখাস্ত যেতে লাগল। পার্লামেণ্টের হুকুমে সব এঞ্জিন এক জায়গায় আনিয়ে তার পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষায় স্টিফেনসনের এঞ্জিন আর সবকটাকে একেবারে পিছনে ফেলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছুটে সকলের মনে এমন তাক লাগিয়ে দিল যে, যারা ঝগড়া করতে এসেছিল তাদের আর কথাটি কইবার মুখ রইল না। এঞ্জিনওয়ালারা তাদের এঞ্জিনের ঝ্যাক্‌ঝ্যাকানি বন্ধ করে লজ্জায় বাড়ি চলে গেল।

এমনি করে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রীতিমত রেলের চলাচল আরম্ভ হল। তারপর কত এঞ্জিন তৈরি হল, কত দিকে কত রেলের লাইন বসে গেল, গরীবের ছেলে স্টিফেনসন মস্ত ধনীলোক হয়ে গেলেন। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সাদাসিধা চালচলন আর সহজ সরল ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্টিফেনসনের একমাত্র ছেলে রবার্টও কালে একজন নামজাদা এঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন; রেলের পোল তৈরি বিষয়ে তাঁর বিশেষরকম সুনাম ছিল।

সূর্যের কথা

সূর্যটা একটা গোল আগুনের পিণ্ড, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গোল, সেটা চোখেই দেখতে পারি—আর 'আগুন' কিনা তা একটিবার দুপুর রোদে দাঁড়ালেই আর বুঝতে দেরি লাগে না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই পৃথিবীটার মতো তেরো লক্ষ পিণ্ডের তাল পাকালে তবে এই সূর্যের সমান বড় হয়। তাঁরা কেমন করে জানলেন? যাঁরা জরিপ করেন তাঁরা জানেন, খুব দূরের জিনিসকে নানারকমে পরখ করে এমন হিসাব পাওয়া যায় যা থেকে চট্ করে বলা যায় যে জিনিসটা কতখানি দূরে! এই কৌশলটি পণ্ডিতেরা সূর্যের উপর খাটিয়েছেন। পৃথিবীর দুই জায়গায় দুইজন লোক বসে সূর্যটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন্ সময়ে সেটাকে আকাশের ঠিক কোন্ জায়গায় দেখা যায়—এবং দুজনের হিসাব মিলিয়ে অঙ্ক কষে বলেছেন যে সূর্যটা এখান থেকে নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে। সে যে কতদূর তা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। একটা এঞ্জিন যদি ঘণ্টায় ৬০ মাইল করে ক্রমাগত ছুটে আজ সূর্যের দিকে রওয়ানা হয়, সে ১৭৭ বছর পরে (২০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) সূর্যে গিয়ে পৌঁছাবে। পণ্ডিতেরা এইসকল মাপ নিয়ে বলছেন যে ঐ সূর্যের পাশে পৃথিবীটাকে বসালে সেটা দেখাবে যেন একটি তরমুজের পাশে একটি মুসুরির ডাল।

সূর্যটা কিসের তৈরি? সূর্যের আলোক পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবীটা যা দিয়ে তৈরি সূর্যটাও ঠিক তাই দিয়েই তৈরি। তবে, সেইসব মাল-মসলা জমে এখানে যেমন জল মাটি পাথর হয়েছে সেখানে তা হবার যো নেই—কারণ, সেখানকার সর্বনেশে গরমে সব জিনিস সত্য সত্যই আগুন হয়ে উঠে। লোহা শুধু

গলে যায় তা নয়, ফুটন্ত জলের মতো টগ্‌বগ্‌ করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এই ফুটন্ত আগুন আর জ্বলন্ত বাষ্প সূর্যের চারিদিক ঘিরে লক্‌লক্‌ করতে থাকে। শুধু চোখে মনে হয় সূর্যটা বেশ একটি মোলায়েম গোল জিনিস, তার গায়ে কোথাও আঁচড়ের দাগটি পর্যন্ত নেই। কিন্তু আসলে তা নয়। ভাল দূরবীন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, তার সমস্ত গা ভরে আগুনের চিক্‌মিকি খেলছে—আগুনের সমুদ্রে আগুনের ঢেউ, তার মধ্যে বড় বড় আগুনের ডেলা পাগলের মতো ডুবছে আর ভাসছে। তাছাড়া সূর্যের গায়ে প্রায়ই ছোট বড় ফোসকা দেখা যায়—ফোসকাগুলি তত উজ্জ্বল নয়, তাই দেখতে হঠাৎ কালো দেখায়। জলের মধ্যে যেমন বুদবুদ ওঠে সূর্যের গায়ে তেমনি আগুনের ফোসকা ওঠে আর ফেটে পড়ে। এক একটি বুদবুদ মাঝে মাঝে এত বড় হয় যে, কালো কাচ দিয়ে দেখলে সেগুলোকে শুধু চোখেই দেখতে পার। ঐরকম এক একটা বুদবুদের মধ্যে ইচ্ছে করলে, দু-দশটা পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে পুরে রাখা যায়। ঐ ফোসকাগুলি এক একটি আগুনের ঘূর্ণিচক্র, তার চারিদিকে দম্‌কা আগুন ঠেলে উঠছে।

সূর্যের তেজ এত বেশি যে তার চারিদিকে যে আগুনের শিখা ঝড়ের মতো উঠছে আর পড়ছে, সেগুলি আমরা দেখতেই পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণগ্রহণ হয়, চাঁদটা মাঝে পড়ে তার চক্‌চকে শরীরটিকে আড়াল করে ফেলে, তখন তাদের চেহারা দেখা যায় আগুনের লক্‌লকে জিভের মতো। শিখাগুলি হাজার হাজার মাইল জুড়ে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলতে থাকে, কখন আগুনের ঝাপটা দিয়ে মিনিটে ছয় হাজার মাইল ছুটে যায়, কখন শান্ত মেঘের মতো সূর্যের গায়ে ভেসে বেড়ায়। এক একটাকে দেখে মনে হয় যেন আগুনের ফোয়ারা উঠছে। তার মধ্যে যদি আমাদের এই পৃথিবীটিকে ছেড়ে দেও, একটি চক্ষের নিমেষে গলে বাষ্প হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে যাবে সে আর খুঁজেই পাবে না। সূর্যের চারিদিকের এই অগ্নিমেঘের স্তরটিকে দিনের আলোতে দেখবার জন্য পণ্ডিতেরা আশ্চর্যরকম উপায় বার করেছেন, তার জন্য তাঁদের এখন আর গ্রহণের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না।

কিন্তু সূর্যের চারিদিকে আর একটি জিনিস আছে যেটিকে গ্রহণ ছাড়া দেখবার যো নেই—সেটিকে সূর্যের কিরীট (Corona) বলা যায়। পৃথিবীর চারিদিকে যেমন বাতাসের আবরণ সূর্যের চারিদিকেও তেমনি বহুদূর পর্যন্ত এই কিরীটের ঢাকনি। যাঁরা সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখেছেন তাঁরা বলেন, এমন আশ্চর্য অদ্ভুত দৃশ্য আর কিছু নেই। যখন গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চাঁদের কালো ছায়া যখন চোখের সামনে পাহাড় সমুদ্র সব গ্রাস করে ফেলতে থাকে, আকাশের অদ্ভুত ফ্যাকাসে রং আর পৃথিবীর অন্ধকার দেখে, পশু পাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়; সেই সময়ে সূর্যের তেজ চাপা পড়ে তার আশ্চর্য কিরীটের শোভা দেখা যায়। শুধু এই কিরীটের সুন্দর স্নিগ্ধ আলো দেখবার জন্যই কত লোকে পয়সাকড়ি খরচ করে হাজার হাজার মাইল পার হয়ে গ্রহণ দেখতে যায়। এই কিরীটের চেহারা সব সময়ে এক রকমের থাকে না—কখন সেটা চারিদিকে বেশ সমান ভাবে গোল হয়ে থাকে, কখন তার মধ্যে ভয়ানক ঝড় ঝাপটার লক্ষণ দেখা যায়—কখন তা থেকে লম্বা লম্বা ছটা বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। মোটের উপর বলা যায়, যে সময়ে সূর্যের গায়ে ফোসকা বেশি দেখা যায় সেই সময়ে তার আগুনের শিখাগুলিরও অত্যাচার বাড়ে, আর সেই অত্যাচারে তার কিরীটটিকেও ঘাঁটিয়ে তোলপাড় করে তোলে। আমরা জানি যে পৃথিবীটা ২৪ ঘণ্টায় একবার পাক খায়, তাতেই আমাদের দিনরাত হয়। সূর্যটাকে পরীক্ষা করে

দেখা গেছে যে সেও ভয়ংকর বেগে লাট্টুর মতো ক্রমাগত পাক খাচ্ছে—কিন্তু একটি পাক খেতে তার ছাব্বিশ দিন সময় লাগে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, সূর্যটা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে—আর পৃথিবী গ্রহ চন্দ্র সবাই মিলে ঘুরতে ঘুরতে তার চারিদিক প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু আসলে তা নয়—বিশ্বজগতে কারও স্থির হয়ে বসে থাকবার হুকুম নেই। আমাদের এই পৃথিবী এবং আর সমস্ত গ্রহকে নিয়ে সূর্য ভয়ানক বেগে শূন্যে ছুটে চলেছে। সে কোন্‌দিকে কিরকম বেগে চলছে, তাও পণ্ডিতেরা হিসাব করে ঠিক করেছেন। এই হিসাবে সূর্য ঘণ্টায় প্রায় কুড়ি হাজার মাইল পথ ছুটি চলেছে।

শুনলে হঠাৎ হয়তো মনে হতে পারে, এমন সাংঘাতিকভাবে চলতে গিয়ে হয়ত কোন্‌দিন কোন্ তারার সঙ্গে তার ঠুং লেগে যাবে—কিন্তু সেরকম ভয়ের কোন কারণ নেই। এইসব তারাগুলি এক একটি এত দূরে যে সূর্যটা দশ লক্ষ বৎসর এইভাবে ছুটলেও কোন তারার কাছে পৌঁছাবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা হিসাব করে দেখ—এক ঘণ্টায় যদি ২০০০০ মাইল যাওয়া যায় তাহলে দশ লক্ষ বৎসরে কত মাইল? ২০০০০ × ২৪ × ৩৬৫ × ১০০০০০০। তাহলে এক একটি তারা কতখানি দূরে একবার ভাবতে চেষ্টা কর।

ডাকঘরের কথা

সন্দেশের ধাঁধার উত্তরের চিঠিগুলি সেদিন দেখছিলাম। কেউ আধ মাইল দূর থেকে লিখেছে চিঠি, কেউ লিখেছে ১৫০০ মাইল দূর থেকে—কিন্তু ১ পয়সার পোস্টকার্ডে প্রায় সকলেই লিখেছে। ১ পয়সা খরচে ১৫০০ মাইল চিঠি পাঠান, একি কম সস্তা হল? হঠাৎ মনে হতে পারে অত কম মাশুলে এতদূর চিঠি পাঠাতে ডাকঘরের বুঝি লোকসান হয়; কিন্তু তারা কি ২/১ খানা চিঠি পাঠায়? প্রতিদিন লাখে লাখে চিঠি আর পার্সেল তারা পাঠায়; তাতেই তাদের খরচে পুষিয়ে যায়। ডাকঘরের বন্দোবস্তই বা কি কম আশ্চর্যরকম! তুমি হয়ত কলকাতায় বসে একটা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে সেটাকে ফেলে দিলে। কিছুক্ষণ পরে ডাকঘরের লোক এসে ডাকবাক্সের চাবি খুলে চিঠিগুলো ডাকঘরে নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলি লোকে মিলে চিঠির উপরে ডাকঘরের ছাপ মারে, আর এক একটা থলিতে এক একটা রেলে পাঠাবার চিঠিগুলি ভরে ফেলে—যেমন দার্জিলিং মেলে দার্জিলিং, খরসান, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, এইসব জায়গার চিঠি; পঞ্জাব মেলে বর্ধমান, মধুপুর, পাটনা, বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, দিল্লী, এইসব জায়গার চিঠি। তারপর সব ছোট ডাকঘর থেকে বড় ডাকঘরে থলেগুলি পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে স্টেশনে চলে যায়। রেলের গাড়ির মধ্যে আবার ডাকঘরের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে থলিগুলো খুলে প্রত্যেক জায়গাকার চিঠি আলাদা করে এক একটা খোপে ভরে রাখে। তারপর সব চিঠি বাছা হয়ে গেলে এক-এক জায়গার চিঠি এক একটা আলগা থলিতে ভরে ফেলে। সেখানে যখন রেল পৌঁছায় তখন রেলের ডাকঘর থেকে সেই সেই জায়গার চিঠিগুলো নামিয়ে দেয়। তারপর আবার ডাকঘরে সেই থলি নিয়ে গিয়ে, তার থেকে

চিঠি বের করে, বেছে, পিয়ন দিয়ে বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এত হাঙ্গামার পরেও চিঠি যে ঠিকমত গিয়ে পেঁছায় এই আশ্চর্য—ক্বচিৎ ডাকঘরের কোন লোকের দোষে হারাতে পারে। পৃথিবীর যে-কোন জায়গার একজন লোকের ঠিকানা খুঁজে বের করে তার ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে দাও; তারপর বাস্, তোমাকে আর ভাবতে হবে না—সেটা ঠিক সেই লোকের কাছে হাজির হবে।

সব সময়ই যে রেলে ডাক যায় তা নয়। রেলে যায়, জাহাজে যায়, ছোট স্টিমারে যায়, নৌকায় যায়, গাড়িতে যায়, মানুষের পিঠে যায়, কুকুরে-টানা গাড়িতে যায়—এমনকি এরোপ্লেনে করে আকাশ দিয়েও যায়। এমন জায়গাও ত আছে যেখানে ডাকঘর নেই। সেখানের ঠিকানাতে চিঠি লিখলেও চিঠি ঠিকই পেঁছায়। তবে সেখানে চিঠি যেতে কিছু দেরি লাগে। ইউরোপে যেসব সৈন্য যুদ্ধ করছে তাদের কাছেও চিঠি যাবার উপায় আছে। সে যেখানেই থাকুক না কেন তার নাম আর তার সৈন্যদলের নাম, এইটুকু জানলেই লড়াইয়ের ডাকঘরওয়ালারা ঠিক তার কাছে চিঠি কিংবা পার্সেল পেঁছে দেবে। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় 'রানার'-এর ডাকের বন্দোবস্ত আছে। একজন লোক কাঁধে করে চিঠির থলি নিয়ে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে পেঁছে দেয়। হাজারিবাগে আগে ঐরকম বন্দোবস্ত ছিল। তখন অনেক 'রানার' বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক সময় দুষ্টু লোকে নির্জন রাস্তায় পেয়ে 'রানার'কে মেরে চিঠিপত্র খুলে টাকাকড়ি নিয়ে চলে যায়।

প্রায় ৭০ বৎসর আগে কোন দেশে পোস্টকার্ড অথবা টিকিট ব্যবহারের নিয়ম ছিল না। তখন চিঠিপত্র পাঠাতে অত্যন্ত বেশি খরচ হত। ইংলণ্ডের সার রোল্যাণ্ড হিল প্রথমে টিকিট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। সে সময়ে চিঠির মাশুল এত বেশি ছিল যে গরীব লোকের পক্ষে চিঠি পাওয়া বড় মুশকিলের কথা ছিল। যার কাছে চিঠি যাবে তাকেই মাশুল দিতে হত; আর অনেক সময় মাশুল দিতে না পারায় অনেক গরীব লোককে দরকারি চিঠিও ফিরত দিতে হত। লণ্ডন থেকে মাত্র ৪ মাইল দূরে একটা জায়গায় একটা চিঠি পাঠাতে ১৲ টাকারও বেশি খরচ হত। পার্লামেণ্ট সভার সভ্যেরা বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতে পারতেন—চিঠির উপর তাঁর একটা নাম সই থাকলেই হল। তাঁরা অনেক সময় তাঁদের বন্ধুদের চিঠির উপরও সই করে দিতেন আর বন্ধুরা সব বিনা পয়সায় চিঠি পাঠাতেন। কেবল চিঠি নয়, অনেক বড় বড় জিনিসও তাঁরা ঐরকম সই করে বিনা পয়সায় পাঠাতেন। গরীব লোকেরই বড় মুশকিল হত। তারা নিরুপায় হয়ে শেষে নানারকম ফাঁকি দিতে আরম্ভ করল। একজন তার বোনকে বলল যে সে যখন তাকে চিঠি লিখবে তার উপরের ঠিকানার পাশে কতকগুলি চিহ্ন থাকবে;' সেই চিহ্ন দেখে বোঝা যাবে সে ভালো আছে কি অসুস্থ হয়েছে। বোনও সেইরকম চিহ্ন দিয়ে তার ভাইকে চিঠি লিখত। চিঠির ভিতরে কিন্তু কেবল সাদা কাগজ। চিঠি যখন পেঁছাত তখন তার উপরের চিহ্নগুলি দেখে নিয়ে তারা চিঠিটা ফেরত দিত আর বলত, "অত মাশুল দিয়ে চিঠি নেবার ক্ষমতা আমার নেই।" এইরকম আরও কত উপায়ে লোকেরা ডাকঘরকে ঠকাত।

রোল্যাণ্ড হিল যখন টিকেট ব্যবহারের প্রস্তাব করেন তখন বিলাতের পার্লামেণ্ট সভায় ভয়ানক আপত্তি হয়। কিন্তু অনেক খবরের কাগজওয়ালা তাঁর প্রস্তাবের সপক্ষে লেখেন আর সাধারণ লোকেও অনেক সভা সমিতি করে তাঁর হয়ে বলেন। রোল্যাণ্ড হিল ছেলেবেলায় গরীব লোক ছিলেন; তিনি গরীবের কষ্ট ভাল করে বুঝতেন আর তাদের জন্যে খাটতেও সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মনে ছিল, ছেলেবেলায় একদিন

তাঁকে একটা চিঠির মাশুল জোগাড় করার জন্য রাস্তায় ঘুরে ছেঁড়া কাপড় বিক্রি করতে হয়েছিল। তিনি চিঠি পাঠাবার খরচ সম্বন্ধে অনেক হিসাব করে বললেন, "চিঠি পাঠাবার খরচ অত্যন্ত সামান্য; বেশি খরচ ডাকঘরেরই হয়। আর অনেক চিঠি লোকে নেয় না বলে ডাকঘরের বিস্তর টাকা লোকসান হয়। বড় লোকেরা ত বিনা পয়সায়ই অনেক চিঠি পাঠান। এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত হয় যদি নিয়ম করা যায় যে, চিঠি পাঠাবার আগে মাশুল দিতে হবে। আর মাশুল দেওয়া হয়েছে কিনা বুঝবার জন্য চিঠির উপর একটা টিকিট লাগিয়ে দিলেই হবে। কত মাশুল দেওয়া হল তা টিকিটেই লেখা থাকবে।" অনেক আপত্তির পর পার্লামেণ্ট একবার এ উপায়টা পরীক্ষা করতে রাজী হলেন। রোল্যান্ড হিলের উপরেই সব বন্দোবস্তের ভার পড়ল। কয়েক বৎসর পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, এই ডাকটিকিটের বন্দোবস্ত এত সুবিধাজনক যে এর বিরুদ্ধে আর কোন আপত্তিই টেঁকে না। তখন থেকে বিলাতে টিকিটের চল আরম্ভ হল আর দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবীময় টিকিটের ব্যবহার আরম্ভ হল। ডাকঘরের বন্দোবস্তও রোল্যান্ড হিলের বুদ্ধিতেই অনেকটা হয়েছে।

অসুরের দেশ

যে-জাতি শিল্পে বাণিজ্যে বেশ অগ্রসর, যাহারা লেখাপড়ার চর্চা করে, হিসাব করিয়া পাকা দালান ইমারৎ গাঁথিতে জানে এবং নানারূপ ধাতু ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত, মোটের উপর তাহাকে সভ্য জাতি বলা যায়। ইতিহাসের প্রাচীন যুগে যে সকল সভ্য জাতির নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটা জাতির কথা শুনি যাহার নাম অসুর বা আশুর। ইংরাজিতে তাহাকে বলে আসিরিয়া (Assyria)। এই অসুর দেশের নাম প্রাচীন বাইবেল প্রভৃতি পুরাতন পুঁথিতে অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং একশত বৎসর আগে এই দেশের সঙ্গে মানুষের এইটুকু মাত্র পরিচয় ছিল। মানুষ অসুরের দেশ ও তাহার রাজধানী নিনেভের কাহিনী কেবল পুঁথিতেই পড়িয়া আসিত কিন্তু তাহার চেহারা কেহ চোখে দেখে নাই। কারণ, যেখানে সহর ছিল সে স্থানে খোঁজ করিতে গেলে কেবল মাটির ঢিপি আর প্রকাণ্ড ময়দান ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই অসুরের সঙ্গে আমাদের পুরাণের অসুরদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা আমি জানি না। এখন মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজের সহিত তুর্কির লড়াই চলিতেছে তাহার প্রায় তিনশত মাইল উত্তরে প্রাচীন অসুরের দেশ ছিল। ইহা কেবল আন্দাজের কথা নয়—বাস্তবিকই সেখানে ময়দান খুঁড়িয়া মানুষে সেই পুরাতন লুপ্ত সহরকে বাহির করিয়াছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসরের পুরাতন সহর, সেখানে এই অসুর জাতি দু হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে যুদ্ধ-বিগ্রহে একেবারে ধ্বংস পায়। সেও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা—তখনও বুদ্ধের জন্ম হয় নাই!

কথায় বলে 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।' এক একজন লোক থাকে তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, সংসারে বিশেষ কোন দুঃখ নাই অথচ তাহাদের কি যে খেয়াল, তাহারা ঘর বাড়ি ছাড়িয়া একটা কোন হাঙ্গামা লইয়া ব্যস্ত থাকে। উত্তরে দক্ষিণে

বরফের দেশে, আফ্রিকার মরুভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায় তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ মাথা-পাগলা লোকের দ্বারা জগতের অনেক বড় বড় আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অসুরের রাজ্য আবিষ্কারও এইরূপেই হয়। লেয়ার্ড নামে এক ইংরাজ সিংহলে কি একটা ভাল চাকরি পাইয়া এ দেশে আসিতেছিলেন। সোজা পথে জাহাজে চড়িয়া আসিলেই হইত কিন্তু তাঁহার সখ হইল ডাঙার পথে মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেখিয়া তিনি এ দেশে আসিবেন।

কিন্তু ওই যে খেয়ালের মাথায় তিনি মেসোপটেমিয়া গেলেন, উহাতেই তাঁহার সব কাজ কর্ম উল্টাইয়া গেল। মেসোপটেমিয়ার উত্তরে বেড়াইবার সময় তাঁহার মনে হইল এই ত সেই প্রাচীন সভ্য জাতির দেশ, এখানে খুঁজিলে কি তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যায় না? তাঁহার আর চাকরি করা হইল না—তিনি কতকগুলি মজুর লইয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন! খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহার সঙ্গের টাকা-পয়সা সব ফুরাইয়া আসিল, তিনি আবার টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দেখাদেখি আরও দু-চারটি লোক আসিয়া মাটি-খোঁড়া ব্যাপারে যোগ দিল। তখন তুর্কি রাজকর্মচারীদের মনে সন্দেহ জাগিল, 'এই লোকগুলা খামখা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া মাটি কাটিতে চায় কেন? নিশ্চয়ই ইহাদের মনে কোন দুষ্ট মতলব আছে।' সুতরাং তাহারা মাটি-কাটা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। তারপর যখন মাটির ভিতর হইতে নানারকম অদ্ভুত মূর্তি আর ঘর বাড়ি বাহির হইতে লাগিল তখন এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়া সেদেশী মজুরগুলা এমন ঘাবড়াইয়া গেল যে, তাহারাও কাজ করিতে চায় না। ইহার উপর সে দেশে নানারকম হিংস্র জন্তুর অত্যাচার ও জ্বর-জারির উৎপাত ত ছিলই।

যাহা হউক, অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে—ইংরাজ ও ফরাসি গভর্নমেন্টের সাহায্যে শেষটায় মাটির নীচ হইতে একেবারে অসুরের রাজধানী বাহির হইয়া পড়িল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কবে আড়াই হাজার বছর আগে সে সহর ধ্বংস হইয়াছে, লোকজন কোন্ কালে সে দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে অথচ এতদিন পরে তাহাদের সেই পুরাতন কীর্তিগুলি আবার কঙ্কালের মতো মাটির নীচ হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

সেকালের ইতিহাসে জানা যায় যে, নিনেভে সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া আগুনে নষ্ট হয়—তাহার প্রমাণ এখনও চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগুনেও সব নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনও কত মূর্তি, কত কারুকার্য আর পাথরে আঁকা কত ছবি আছে যাহা দেখিলে মনে হয় না যে এগুলি সেই লুপ্ত যুগের জিনিস। সেই সময়ে যে-সকল রং ব্যবহার হইত সেই রংগুলি পর্যন্ত এক-এক জায়গায় বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। এক একটি ঘরের ছাদ, দেওয়াল প্রভৃতি এমন অবস্থায় আছে যে, সমঝদার লোকে তাহা দেখিয়া বলিতে পারে নূতন অবস্থায় ঘরটি ঠিক কিরকম ছিল। এই সকল ছবি ও মূর্তি দেখিলে বোঝা যায় যে, সে দেশের লোকদের বেশ সৌন্দর্যজ্ঞান ছিল। ছবির মধ্যে লড়াই ও শিকারের ছবিই খুব বেশি—মাঝে মাঝে রাজা-রাজড়ার ছবিও আছে। ছবি দেখিয়া সে দেশের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়। অসুরের দল আর তাহাদের শত্রুর দলের মধ্যে এ বিষয়ে কিরূপ তফাৎ ছিল, তাহাও অনেক ছবিতে পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। অসুরেরা বড়ই যুদ্ধপ্রিয় ছিল এবং প্রায়ই অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে লড়াই লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

অসুরদের কথা বলিতে হইলে তাহাদের ভাষার কথাও বলিতে হয়। সে ভাষায় এখন আর কেহ কথা বলে না, সে দেশের লোকেরা পর্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ সংবাদ জানে না—ভাষার একমাত্র চিহ্ন সেকালের অক্ষর। মাটির উপর বাটালি দিয়া তীরের ফলকের মতো অদ্ভুত সব আঁচড় কাটিয়া অক্ষর লেখা হইত। সেই মাটি পোড়াইয়া ইঁটের 'পুঁথি' তৈয়ারি হইত। একশত বৎসর আগে সে অক্ষর পড়িতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে ছিল না। অথচ আজকাল পণ্ডিতেরা এইসব আঁচড় পড়িয়া তাহা হইতে কত সংবাদ কত ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন! বিদ্যা বুদ্ধি ও বাণিজ্যে বাবিলনের লোকেরা অসুরদের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল, সুতরাং তাহাদের ভাষা ধর্ম শিল্প সাহিত্য আইন কানুন প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই অসুরেরা বাবিলনের অল্পাধিক অনুকরণ করিত। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে বাবিলনের অক্ষরের পাশে পারস্যের অক্ষরে লেখা একটা যুদ্ধের বর্ণনা দেখিয়া একজন ইংরাজ পণ্ডিত এই দুয়ের তুলনা করিয়া বাবিলনের অক্ষরের সংকেত বাহির করেন। এইভাবে গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে ইজিপ্টের অদ্ভুত ছবিওয়ালা অক্ষরের রহস্য বাহির করা হয়। এই সকল পুরাতন অক্ষরে লেখা ইঁটের পুঁথি, কীর্তিস্তম্ভ বা খোদাই-করা পাহাড় প্রভৃতি হইতে অসুরদের ইতিহাসের অনেক কথা জানা গিয়াছে। অনেক রাজার নাম ও তারিখ, অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা, ছোট বড় নানা জাতির সহিত সন্ধি ও বিবাদের সংবাদ এ সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অসুরদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। তাহারা ঘোড়ায় ও রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, সঙ্গে পদাতিক সৈন্যও থাকিত। যেমন যোদ্ধা তেমনি শিকারী। আমাদের দেশের মতো অসুরের দেশেও সেকালের রাজারা মৃগয়া করিতেন। হিংস্র জন্তু নষ্ট করিয়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজারই কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইত।

অসুরে রাজাদের বীরত্বের কথা বলিতে গেলে একজনের কথা বিশেষভাবে বলা উচিত, তাঁহার নাম টিগ্‌লাৎ-পিলেসের। তিন হাজার বৎসর আগে ইনি অসুর দেশের রাজা হইয়া নানা দেশ জয় করেন। তাঁহার শাসনে অসুরের রাজ্য ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইনি যখন উত্তরে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হন তখন বাবিলনের সৈন্যরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে এবং রাজমন্দিরের দেবমূর্তি চুরি করিয়া লইয়া যায়। টিগ্‌লাৎ-পিলেসের ইহার প্রতিশোধের জন্য বাবিলন আক্রমণ করেন ও তাহার রাজধানী পর্যন্ত লুটিয়া অনেকখানি দেশ অধিকার করিয়া ফেলেন। একদিকে যেমন যোদ্ধা, অন্যদিকে টিগ্‌লাৎ-পিলেসের একজন অসাধারণ শক্তিশালী শিকারী ছিলেন। হাতি সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু তিনি নিজের হাতে তীর, ধনুক ও তলোয়ার লইয়া শিকার করিতেন। তিনি রথে চড়িয়া প্রকাণ্ড দশটা হাতি ও প্রায় আট শত সিংহ শিকার করেন—ইহা ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া যে-সকল সিংহ মারেন তাহার সংখ্যাও একশতের উপর হইবে।

টিগ্‌লাৎ-পিলেসের মারা গেলে পর অসুরদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রকাণ্ড রাজ্য ক্রমেই ছোট হইতে থাকে। প্রায় দুইশত বৎসর পরে আরও কয়েকটি শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব হয় এবং ইঁহারা অপর দেশকে জাগাইয়া তোলেন। এই সকল রাজাদের মধ্যে অসুর-নাসির-পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রাজত্বকালের নানারূপ চিহ্ন ও পরিচয় খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাতে দেখা যায় যে, ইনি একদিকে যেমন সৌখিন, অপর দিকে যুদ্ধের সময় তেমনি হিংস্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন। দেশ-বিদেশের লোক তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিত।

ইঁহার রাজত্বের পর হইতে ক্রমে আবার অসুরদের অবনতি আরম্ভ হয়। তারপর অসুররাজকুলের শেষ যোদ্ধা মহাবীর অসুর-বানি-পালের সময়ে আর একবার এদেশ মাথা তুলিয়া উঠে। উৎসাহের চোটে অসুরেরা একেবারে আফ্রিকায় গিয়া ইজিপ্ট জয় করিয়া ফেলিল—দক্ষিণে আরবের মরুভূমিতে সসৈন্যে হাজির হইল। কিন্তু ইহাই তাহাদের শেষ কীর্তি। ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সমস্ত জাতি যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল তখন প্রবল শত্রুরাও সুযোগ বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাহাদের রাজ্য লুটিয়া লইল। অবশেষে পারস্যের দুর্দান্ত সেনাদল আসিয়া তাহাদের রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিল। নিনেভে সহরের চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘেরা। এই দেওয়ালের জোরে অসুরেরা তিন বৎসর ধরিয়া তাহাদের প্রাচীন সহরের জন্য লড়াই করিল—কিন্তু অবশেষে হার মানিতেই হইল। তারপর এতদিনের সাধের সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া একেবারে ছারখার হইয়া গেল।

কোথায় বা অসুর রাজ্য—আর কোথায় বা সেই অসুর জাতি। দু হাজার বছর সারা দেশ কাঁপাইয়া যাহারা রাজত্ব করিল এখন কেই বা তাহাদের খবর রাখে। অত বড় নিনেভে সহর, সেও মাটির নীচে কবর চাপা পড়িল। এখন আবার লোকে সেই কবর খুঁড়িয়া তাহার কঙ্কাল বাহির করিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখ শ্মশানের মতো দেশ, লোক নাই জন নাই, আছে কেবল মৃত সহরের জীর্ণ কঙ্কাল, আর রাত্রের অন্ধকারে সিংহের হুংকার।

নীহারিকা

তোমরা আকাশে 'কালপুরুষ' দেখিয়াছ? এই ফাল্গুন মাসে প্রথম রাত্রে যদি দক্ষিণ-মুখী হইয়া দাঁড়াও তবে প্রায় মাথার উপর এই 'কালপুরুষ'কে দেখিতে পাইবে, আর একবারটি যদি তাহাকে চিনিয়া রাখ তবে আর কোনদিন ভুলিবে না।

পৃথিবীর যেমন মানচিত্র বা 'ম্যাপ' হয়, আকাশেরও তেমনি মানচিত্র আছে। এইরকমের অনেক মানচিত্রে আকাশের তারার সঙ্গে অনেক অদ্ভুত ছবি আঁকা থাকে; তাহার মধ্যে যদি কালপুরুষ বা Orion-এর ছবি খুঁজিতে যাও, তবে হয়ত দেখিবে একটা হাত-পাশুদ্ধ মূর্তি আঁকা আছে কিন্তু আকাশে খুঁজিলে অবশ্য সেরকম কোন চেহারা পাইবে না—দেখিবে কেবল ঐ তারাগুলি।

আকাশের গায়ে যে এত হাজার হাজার তারা ছড়ান রহিয়াছে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহার মধ্যে নানারকম ছবি ও মূর্তির কল্পনা করিয়া আসিতেছে। কতগুলা তারা মিলিয়া হয়ত অর্ধচন্দ্রের মতো দেখায়, মানুষে বলিল 'ওটা ধনুকের মতো'; কোনটা হয়ত মুকুট, কোনটা ষাঁড়ের মাথা, কোনটা ভল্লুক, কোনটা যমজ ভাই, কোনটা যোদ্ধা, এইরূপ নানারকম কল্পনার মূর্তিতে সমস্ত আকাশটিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়েই এ সকল কল্পনাকে নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হয় কিন্তু এই কালপুরুষের বেলা বোধহয় কল্পনাটা বেশ খাটিয়াছে। দুই হাত দুই পা আর মাথা সবই মিলিতেছে, তাহার উপর আবার কোমরবন্ধ। তলোয়ারটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই। এত কথা যে বলিলাম সে কেবল ঐ তলোয়ারটির জন্য। ঐ

'তলোয়ার'টার দিকে একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি; তিনটি তারার মধ্যে মাঝেরটি একটু কেমন কেমন দেখায় না? আর সবগুলি তারা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হীরার টুকরার মতো, কিন্তু এটা যেন কেমন একটু ঝাপসা ঠেকে। শুধু চোখে এই পর্যন্ত; কিন্তু দূরবীন দিয়া দেখ, আরও তফাৎ দেখিবে। যত বড়ই দূরবীন কষো না কেন, আর সব তারাগুলিকে কেবলি ঝিক্‌মিকে হীরার মতো দেখিবে কিন্তু এই 'তারা'টিকে দেখিবে যেন সাদা মেঘের মতো। আকাশে এইরকম মেঘের মতো জিনিস আরও অনেক দেখা যায়—ইহাদের নাম নীহারিকা, ইংরাজিতে বলে Nebula।

পণ্ডিতেরা বলেন, এই নীহারিকাগুলি এককালে তারা হইবে এবং এই তারাগুলাও এককালে নীহারিকা ছিল। আমরা যাহাকে সৌরজগৎ বলি—এই সূর্য এবং গ্রহ উপগ্রহশুদ্ধ তাহার বিশাল পরিবারটি—এই সমস্তই এককালে কোন এক প্রকাণ্ড নীহারিকার মধ্যে খিচুড়ি পাকাইয়া ছিল। সে যে কত বড় ব্যাপার তাহা কল্পনাও করা যায় না। সেই নীহারিকা আকাশের একটা প্রকাণ্ড কোণ জুড়িয়া জ্বলন্ত বাষ্পের মতো দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিত। তাহার মধ্যে না ছিল চন্দ্রসূর্য, না ছিল পৃথিবী।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাহারও স্থির হইয়া থাকিবার নিয়ম নাই, একটা কণাপ্রমাণ বস্তু আর একটি কণাকে পাইলে এ উহাকে টানিয়া লয়, দশটা কণা একত্র হইলেই পরস্পরের দিকে ছুটিয়া জমাট বাঁধিতে চায়। সুতরাং এত বড় নীহারিকাটি যে স্থির হইয়া থাকিবে, এমন কোন উপায় ছিল না—সে আপনার ভিতরকার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল আর তাহার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাষ্পের ঢিপি জমাট হইতে লাগিল। এই জমাট ঢিপিকেই এখন আমরা সূর্য বলি।

কালপুরুষের নীহারিকার চেহারা একবার দেখ—ঐ জমাট মেঘের মতো জিনিসটার ভিতর হইতে কত ডালপালা বাহির হইয়াছে; ঐ ডালপালাগুলি আবার আলগাভাবে জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিবে। ঘুরন্ত চাকার গা হইতে যেমন করিয়া কাদা ছিট্‌কাইয়া যায়, এক একটা নীহারিকার চক্র হইতে ঠিক সেইরকম জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। দেখিতে অবশ্য সমস্ত নীহারিকাটি স্থির দেখা যায়—কারণ, জিনিসটা এত দূরে যে ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিলেও এখান হইতে তাহাকে একেবারে স্তব্ধ দেখা যাইবে।

আকাশে এইরকম নীহারিকা কত যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কোনটা একেবারে ঝাপসা কুয়াশার মতো, কোনটার মধ্যে সবে একটু জমাট বাঁধিতেছে, কোনটা রীতিমত গোল পাকাইয়া উঠিতেছে। এক একটার চেহারা ঠিক যেন ঘুরন্ত চরকি বাজির মতো, মনে হয় যেন জ্বলন্ত চক্র হইতে আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আবার এমন নীহারিকাও আছে যাহাকে এখন দেখিতে ঠিক তারার মতোই দেখায়; সে যে এক সময়ে নীহারিকা ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ এখনও তাহার আশেপাশে অতি ঝাপসা কুয়াশার মতো নীহারিকার শেষ নিশ্বাসটুকু লাগিয়া আছে। সে এত ঝাপসা যে, অনেক সময় খুব বড় দূরবীক্ষণ দিয়াও তাহার কিছুমাত্র ধরা যায় না, ধরা পড়ে কেবল ফটোগ্রাফের প্লেটে।

ফটোগ্রাফের প্লেটে কেমন করিয়া ছবি তোলে দেখিয়াছ ত? ক্যামেরার ভিতর হইতে সে টুক্ করিয়া একটিবারমাত্র তোমার দিকে তাকায় আর ঐ এক দৃষ্টিতেই তোমার চেহারার ছাপটুকু নিজের মধ্যে ধরিয়া লয়। সে একবার যাহা ভাল করিয়া ধরে তাহা আর ভুলিতে চায় না। এক মিনিট খুব ঝাপসা জিনিসের দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ শ্রান্ত হইয়া পড়ে—সে তখন আর ভাল দেখে না; কিন্তু ফটোগ্রাফের

প্লেট যত বেশি করিয়া তাকায় ততই বেশি দেখিতে পায়। এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া সে ঐ অন্ধকারের মধ্যেই অনেক আশ্চর্য জিনিসের সংবাদ বাহির করে। এইরকম ফটোগ্রাফ দেখিলে বোঝা যায় যে, সমস্ত আকাশটাই প্রায় নীহারিকায় ঢাকা—আকাশের যেদিকে তাকাও সেইদিকেই নীহারিকার জাল।

মাটির বাসন

মাটির বাসন গড়িতে জানে না, এমন জাতি পৃথিবীতে খুব কমই আছে। নিতান্ত অসভ্য মানুষ যাহারা কাপড় পরিতে জানে না, যাহারা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যেও মাটির বাসনের চল আছে। অতি প্রাচীনকালের মানুষ, যাহারা পাথর শানাইয়া অস্ত্র গড়িত, যাহারা ধাতুর ব্যবহার শিখে নাই, তাহাদের কবর খুঁড়িলে মাটির গেলাস ঘটি বাটি পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, এক একটা জিনিসের উপর তাহারা নানারূপ কারুকার্য করিয়া তাহাদের সৌন্দর্যবোধের যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে এখনও পর্যন্ত তাহার চিহ্ন মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। যাহারা আগুনের ব্যবহার করিতে জানিত না তাহারা মাটির বাসন গড়িয়া রোদে শুকাইয়া লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিত; কোন কোন স্থলে বাঁশের বা পাতার ঝুড়ি বানাইয়া তাহার গায়ে মাটি লেপিয়া বাসন বানান হইত, এরূপও দেখা গিয়াছে।

দশ হাজার বৎসর আগে ইজিপ্ট দেশে যে মাটির বাসন তৈয়ারি হইত, তাহার সুন্দর সুন্দর নমুনা পাওয়া গিয়াছে। বাসনগুলি সমস্তই হাতে গড়া, কারণ, কুমারের চাকে মাটি গড়িবার কায়দা সে সময়ে তাহাদের জানা ছিল না। কিন্তু এ কাজে তাহাদের হাত এমন সাফাই ছিল যে, বড় বড় জালার মতো পাত্রগুলির গড়নেও কোথাও খুঁত ধরিবার যো নাই। বড় বড় জাহাজী নৌকা করিয়া এই সকল বাসন দেশ-বিদেশে চালান হইত এবং তখনকার লোকে আগ্রহ করিয়া তাহা কিনিত। বাসনগুলির উপর চকচকে কালো পালিশ থাকিত, তাহার গায়ে সাদা রঙের কারুকার্য।

মাটির বাসন নানারকমের। সাধারণ 'মেটে বাসন' যাহা অল্প আঁচে পোড়াইলেই চলে, আমাদের দেশে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই। গেলাস, ভাঁড়, সরা, মালসা হইতে আরম্ভ করিয়া কুঁজা, কলসী, জালা পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইবে। কিন্তু 'সাধারণ মাটির' জিনিসও যে কত সুন্দর হইতে পারে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা দেশের লোকে নানাভাবে তাহা দেখাইয়া আসিতেছে।

আর একরকম মাটির জিনিস হয়, তাহাকে পাথুরে মাটি বলা যায়। এগুলিকে কড়া আগুনে পোড়াইলে পাথরের মতো মজবুত হয় এবং তখন তাহাকে অসংখ্য প্রকার দরকারী কাজে লাগান যায়। বাড়ি বানাইবার টালি, ড্রেনের পাইপ, নানারূপ খেলনা প্রভৃতি কত জিনিস তৈয়ারি হয়। তাহাতে আবার নানারকম রং দেওয়া ও ইচ্ছামত পালিশ ধরান চলে।

সাদা মাটির বাসন হইলেই আমরা অনেক সময়ে তাহাকে 'চীনে মাটি' বলি—কিন্তু আসল চীনামাটি অতি উঁচু দরের জিনিস। চীনে মাটির বাসন এক সময়ে কেবল

চীন দেশেই তৈয়ারি হইত। প্রায় সাত শত বৎসর আগে মুসলমান সম্রাট সালাদিনের কাছে চীন সম্রাট কতগুলা উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতগুলা চীনা বাসন ছিল। তেমন বাসন কেহ চক্ষে দেখে নাই। পাতলা ঝিনুকের মতো স্বচ্ছ, ডিমের খোলার মতো হালকা, সে আশ্চর্য বাসনের কথা চারিদিকে রটিয়া গেল।

এই চীনা বাসনের সংকেত শিখিবার জন্য ছয় শতাব্দী ধরিয়া কত লোকে যে কতরকম চেষ্টা করিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। এই একটি বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় কত লোকে জীবনপাত করিয়াছে এবং তাহার ফলে কেবল এইটুকুমাত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছে যে, অমন পাতলা স্বচ্ছ সুন্দর জিনিস করা একেবারেই সহজ নয়। জিনিসটা পাতলা হয় ত স্বচ্ছ হয় না, স্বচ্ছ যদি হয় তবে এমন 'ঠুন্‌কো' যে একটু ধরিতে গেলেই ভাঙিয়া যায়। হয়ত আর সবই ঠিক হইল কিন্তু উপরের মোলায়েম প্যালিশটুকু ধরিল না, হয়ত কোথায় একটি চুল বা এক কণা বালি ছিল কিংবা চুল্লির আঁচ ঠিক সমান ছিল না, তাহাতেই বাসনটি পোড়াইবার সময় ফাটিয়া গেল। এইরকম করিয়া লোকে হাজারবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া তবে এ বিদ্যা শিখিয়াছে।

গ্রীস প্রভৃতি দেশে এক সময়ে অতি সুন্দর মাটির ঘড়া ও ফুলদানি তৈয়ারি হইত কিন্তু গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর এই শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর বহু বৎসর পর্যন্ত ইউরোপে মাটির জিনিস বলিতে সাধারণ মোটা বাসন-পত্রই বুঝিত। তারপর মুসলমানদের দৌলতে যখন এই লুপ্ত শিল্প আবার জাগিয়া উঠে তখন হইতে দক্ষিণ ইউরোপে, বিশেষত ইটালিতে নানারূপ শিল্পের বাসন দেখা দিতে লাগিল। তখনও তাহারা চীনা মাটি গড়িতে পারে নাই বটে কিন্তু মাটির উপর সাদা পালিশ চড়াইয়া তাহার চমৎকার নকল করিতে শিখিয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যবসায় ইটালির একচেটিয়া ছিল।

যাহাদের চেষ্টায় ও যত্নে এই শিল্পের ব্যবসা ইউরোপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে প্যালিসির নাম বিশেষভাবে করা যায়। বার্নার্ড প্যালিসির বাড়ি ছিল ফ্রান্স দেশে। সেখানে ছবি আঁকিয়া, কাচ রঙাইয়া ও জরীপের কাজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার দিন যাইত। হয়ত এইভাবেই তাঁহার সারা জীবন কাটিয়া যাইত; কিন্তু একদিন তিনি একখানা 'মাটি'র পেয়ালা দেখিলেন, তেমন জিনিস আর তিনি কখনও দেখেন নাই—বিশেষত তাহার উপর যে পালিশ করা এনামেলের কাজ ছিল, তাহাতেই প্যালিসিকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। প্যালিসি তখন একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ঐরকম পালিশের সংকেত না শিখিয়া তিনি ছাড়িবেন না।

সেইদিন হইতে তাঁহার আর অন্য চিন্তা নাই, জীবনের আর কোন কাজ নাই, তিনি কেবল চুল্লি জ্বালাইয়া ভাঙা পাথর আর মাটির মশলা গলাইতেছেন, আর দেখিতেছেন পালিশ ঠিক হইল কিনা। নিজে লেখাপড়া জানেন না, কোনদিন এ ব্যবসা শিখেন নাই, অথচ উৎসাহের তাড়নায় শক্তি সময় ও অর্থ অজস্র ঢালিয়া দিতেছেন—তাহাতে কি যে লাভ হইবে তাহা কেহই বোঝে না। লোকে পাগল বলিতে লাগিল, তাঁহার স্ত্রী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বাড়ির লোকে অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। দুই বৎসর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর তিনশত মাটির পেয়ালা গড়িয়া তাহার উপর নানারকম মশলার প্রলেপ দিয়া তিনি চুল্লিতে চড়াইলেন। চুল্লি জুড়াইলে পর দেখা গেল, একটিমাত্র বাসনের গায়ে অতি চমৎকার সাদা পালিশ ধরিয়াছে! তখন প্যালিসির আনন্দ দেখে কে!

এতদিন পর্যন্ত তিনি চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক ব্যবসায়ীর চুল্লিতে তাঁহার

জিনিসগুলা পোড়াইয়া আনিতেন। এখন হইতে তিনি নিজের বাড়িতে একটি চুল্লি বানাইতে সংকল্প করিলেন। ইঁটের পাঁজায় ইঁট কিনিয়া তিনি নিজে তাহা বহিয়া আনিতেন এবং আপনার হাতে সাজাইয়া চুল্লি গড়িতেন। তারপর, চুল্লি খাড়া হইলে তিনি অনেক কাঠ ও কয়লা সংগ্রহ করিয়া চুল্লি জ্বালাইলেন এবং একশত মাটির বাসন বসাইয়া তাহাতে মশলা চড়াইলেন—এই মশলা গলিলে পর বাসনে এনামেলের মতো সাদা পালিশ হইবে। কিন্তু মশলা আর গলিতে চায় না! সারারাত কাটিয়া গেল, তারপর দিন গেল রাত গেল, এমনি করিয়া ছয়দিন ছয়রাত্র চুল্লির পাশে বসিয়া বৃথায় কাটিল। তখন প্যালিসি নূতন মশলা বানাইয়া আবার আগুন চড়াইলেন। প্যালিসির তখন আর দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই। তিনি আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া কেবল চুল্লিতে কাঠ যোগাইতেছেন। ক্রমে কাঠ সব ফুরাইয়া আসিল—তিনি বাগানের কাঠের বেড়া ভাঙিয়া আগুনে দিলেন। তাহাও যখন ফুরাইয়া আসিল তখন বাড়ির টেবিল চেয়ার যাহা সম্মুখে পাইলেন সব ভাঙিয়া ভাঙিয়া জ্বালানি কাঠ করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে সহরের মধ্যে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, আর সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে যে প্যালিসি পাগল হইয়া বাড়িঘর ভাঙিয়া ফেলিতেছেন। শুনিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া দেখিতে আসিল, ব্যাপারখানা কি। ততক্ষণে প্যালিসির মশলা গলিয়া চমৎকার সাদা পালিশ হইয়া ফুটিয়াছে—তিনি অতি যত্নে সেগুলিকে ঠাণ্ডা করিয়া বাহির করিতেছেন।

প্যালিসি স্থির করিলেন তিনি তাঁহার আবিষ্কারকে ব্যবসায়ে লাগাইবেন। এক কুমারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তিনি ছয় মাসে তাহাকে দিয়া কতগুলি সুন্দর সুন্দর বাসন গড়াইলেন। কিন্তু সেগুলিতে পালিশ ধরাইবার সময় তাঁহার চুল্লি ফাটিয়া ধূলা ও ঝুল পড়িয়া তাঁহার চমৎকার পালিশ করা বাসনগুলিতে দাগ ধরাইয়া দিল। প্যালিসি কিছু বলিলেন না, বাসনগুলি ভাঙিয়া আবার চুল্লি মেরামত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে ধৈর্য ও বীরত্বের আর তুলনা হয় না। খোলা বাগানে সারাদিন রোদে ঘামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া তিনি চুল্লির তদ্বির করিতেন; বাড়ির বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে দেখিয়া হাসাহাসি করিত; সারাদিন পরিশ্রমের পর যখন তাঁহার শরীর মন অবসন্ন হইয়া আসিত, তিনি বাড়িতে ঢুকিবামাত্র চারিদিক হইতে সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দা ও অভিযোগ করিত। এতরকম অশান্তির মধ্যে ষোল বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্যালিসি আপনার ব্যবসায়কে সফল করিয়া রাজসম্মান লাভ করেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার দুঃখের শেষ হয় নাই। ব্যবসায়ে কৃতকার্য হইবার পরেও শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে নানা শত্রুর হাতে অনেক অত্যাচার সহিতে হইয়াছিল। সে-সকল অত্যাচার তিনি যেরূপ তেজের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন তাহা প্যালিসির মতো বীরেরই উপযুক্ত। সকল বিষয়ে তিনি যাহা সত্য বুঝিতেন নির্ভিকভাবে তাহা প্রচার করিতেন; এইজন্য তাঁহার নিজের স্বাধীন ধর্মমত বজায় রাখিতে গিয়া তিনি নানা-রকমে লাঞ্ছিত হন এবং অবশেষে আশি বৎসর বয়সে মৃত্যুভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া এক অন্ধকার কয়েদখানায় বন্দী অবস্থায় মারা যান।

ঘুড়ি ও ফানুষ

জলের চাইতে হালকা জিনিস যেমন জলে ভাসে বাতাসের চেয়ে হালকা জিনিস তেমনি বাতাসে ভাসে। আগুনের উপরকার তপ্ত বাতাস সাধারণ ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে অনেক পাতলা; তাই সে উপরে উঠে—আর সেই উপরমুখী স্রোতের টানে যত রাজ্যের কয়লা ধুলা সবশুদ্ধ টেনে তোলে। সেই কয়লা ধুলা শুদ্ধ ময়লা বাতাসের স্রোতকে আমরা বলি ধোঁয়া।

এইরকম হালকা ধোঁয়াকে পাতলা থলির মধ্যে পুরে আমরা তাকে আকাশে ওড়াই—আর সেই কাগজের থলিকে বলি ফানুষ। সেই ফানুষ যদি খুব বড় হয়, আর মজবুত করে তৈরি হয়, তখন তাকে বলি ‘বেলুন’।

এ ত গেল হালকা জিনিসের কথা। কিন্তু বাতাসের চাইতে ভারি জিনিসও অনেক সময় আকাশে ওঠে—যেমন ঘুড়ি। চলন্ত বাতাসের কেমন একটা ধাক্কা দিবার শক্তি আছে, সে বড় বড় ভারি জিনিসকেও ঠেলে তোলে। ঘূর্ণী বায়ুর সময়ে বাতাসের জোর যখন খুব বেড়ে ওঠে তখন তার ধাক্কায় ঘরবাড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে নেয়। ঘুড়ির সুতায় যতক্ষণ টান থাকে ততক্ষণ আপনা হতেই বাতাসের ধাক্কায় ঘুড়িকে উপরদিকে ঠেলে রাখে, কিন্তু বাতাস যখন থেমে আসে তখন ঘুড়ির সুতো ধরে ক্রমাগত টান না দিলে সে বাতাসের ধাক্কাও পায় না, কাজেই তার উপর ভর করে উঠতেও পারে না।

ফানুষকে বাড়িয়ে যেমন প্রকাণ্ড বেলুনের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সাধারণ ঘুড়ির ‘পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ’ হচ্ছে মানুষ তোলা ধাউস ঘুড়ি। এরোপ্লেনের সৃষ্টি হবার আগে লোকে এইরকম ঘুড়িতে চড়ে নানারকম পরীক্ষা করে দেখেছে। এরকম করে শত্রুর চালচলন দেখবার জন্য নানারকম ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর অসুবিধা এই যে বাতাসের জোর না থাকলে কিছু করবার উপায় নাই। তাছাড়া, ঘুড়ি মাত্রেই এক জায়গায় আটকা থাকে, তার পক্ষে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। সুতরাং ঘুড়িই বল আর ফানুষই বল, সকলেই বাতাসের খেয়ালের অধীন।

মানুষ অনেককাল হতেই চায়, পাখির মতো আকাশে উড়তে। কেবল ফানুষে চড়ে বা ঘুড়িতে উঠে হাওয়ার ঠেলায় ভেসে বেড়িয়ে তার মন উঠে না। পাখির নকল করে বড় বড় ডানা বানিয়ে তার সাহায্যে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা অনেকদিন হতেই চলে আসছে। হাতে পিঠে ডানা লাগিয়ে লোকে সাহস করে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছে—আর তাতে কতজনের প্রাণও গিয়েছে। লিলিয়েন্থেল প্রভৃতি যাঁরা এই বিষয়ে বেশ কৃতকার্য হয়েছিলেন তাঁরাও অতিরিক্ত সাহস করতে গিয়ে শেষে মারা পড়েন। তবু লোকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করতে ছাড়েনি। পরীক্ষার ফলে মোটের উপর এইটুকু বোঝা গেছে যে পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়ে ওড়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে বাতাস ভাল থাকলে একটু উঁচু জায়গা থেকে আরম্ভ করে অনেক দূর পর্যন্ত হাওয়ায় ভেসে যাওয়া যায়। শুধু ভেসে যাওয়া নয়, অনেক সময় ডাইনে-বাঁয়ে এদিক-ওদিক একটু-আধটু ঘোরা-ফিরাও সম্ভব হয়। এ বিষয়ে আমেরিকার দুটি ভাই—অর্ভিল ও উইলবার

রাইট—সকলের চেয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের তৈরি ডানার সাহায্যে দশ বিশ মাইল পর্যন্ত অনেকবার ঘুরে এসেছেন। কিন্তু এতে করে উপর থেকে নীচে নামা বেশ সহজ বটে, কিন্তু বাতাস ঠেলে উপরে ওঠা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। ঘুড়ির যখন সুতো ছিঁড়ে যায় তখন সে পাথরের মতো ধপ্ করে না পড়ে কেমন ভেসে ভেসে হেলে দুলে এগিয়ে পড়ে। নানা কৌশল খাটিয়ে নানারকম আকারের ঘুড়িকে এইভাবে বাতাসে ভাসিয়ে কত হাজাররকম পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে; এবং তার ফলে এটুকু বোঝা গেছে যে, জাহাজ যেমন করে জল কেটে এগিয়ে চলে তেমনি করে যদি বাতাস কেটে ঘুড়িকে ঠেলে নেওয়া যায়, তবে হয়ত তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালান যেতে পারে। এই চেষ্টার ফলে যে জিনিস দাঁড়িয়েছে তারই নাম এরোপ্লেন।

এরোপ্লেনের চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার দরকার নাই, কারণ, তার ছবি তোমরা অনেক দেখেছ। কিন্তু সেটা যে একটা ঘুড়িমাত্র এ কথাটা তার পাখির মতো চেহারা দেখে সব সময়ে মনে আসে না। কিন্তু বাস্তবিক সেটা ঘুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘুড়িকে ওড়াতে হলে যেমন সুতো ধরে টানা দরকার, এরোপ্লেনকে ঠিক তেমনি বাতাস ঠেলে কলের জোরে টানতে হয়। সুতরাং ঘুড়িতে যতরকম বদভ্যাস আর কেরামতি দেখা যায়, এরোপ্লেনেও প্রায় সেইরকম। ঘুড়ির মতো সেও বেখাপ্পা 'গোঁৎ' খেতে চায়, হঠাৎ শূন্যের মাঝে কাৎ হয়ে পড়তে চায়, আর এলোমেলো বাতাসে ঘুরপাক খেয়ে উল্টাতে চায়। এতরকম তাল সামলে তবে এরোপ্লেন চালান শিখতে হয়। ঘুড়িতে যদি বেখাপ্পা জোরে হ্যাঁচকা টান দেও তবে সে যেমন ফস্ করে ফেঁসে যেতে পারে, এরোপ্লেনও তেমনি ডানা ভেঙে ধপ্ করে পড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যারা এ বিষয়ে ওস্তাদ, তাদের কাছে এরোপ্লেনের এসব পাগলামি নিতান্তই সামান্য ব্যাপার। তারা ইচ্ছা করেই কত সময় এরোপ্লেনশুদ্ধ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে তামাসা দেখায়, এরোপ্লেনকে নানারকমে গোঁৎ খাওয়ায়।

ঘুড়ি আর ফানুষে যে তফাৎ, 'এরোপ্লেন' আর 'এয়ারশিপ' বা আকাশ-জাহাজে ঠিক সেই তফাৎ। ফানুষকে অর্থাৎ বেলুনকে ইচ্ছামত এদিক-ওদিক চালাবার চেষ্টাতেই আকাশ-জাহাজের সৃষ্টি। গোল বেলুন বাতাসের উল্টোমুখে চলতে গেলে চ্যাপ্টা হয়ে যায়, তাই তাকে চমচমের মতো ছুঁচাল করে বানায়—তাহলে সে সহজেই বাতাস ফুঁড়ে এগুতে পারে। তার পিছনে হাল ও আশেপাশে মাছের ডানার মতো থাকে—তা দিয়ে জাহাজকে ইচ্ছামত ডাইনে বাঁয়ে উপর নীচে চালান যায়। আর থাকে বিদ্যুতের পাখার মতো মস্ত একটা ঘুরন্ত জিনিস, সেইটার ধাক্কায় বাতাস ঠেলে জাহাজ চলে। এরোপ্লেনেও অবশ্য ঠিক এইরকম পাখা থাকে।

এই যুদ্ধের সময়ে এরোপ্লেন আর এয়ারশিপগুলি কিরকম কাজে লেগেছে তার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। এরোপ্লেনগুলা চলে ব্যস্তবাগীশের মতো ফর্‌ফর্ করে, তারা দিন দুপুরে যখন তখন যেখানে সেখানে উড়ে যায় আর নানারকম খবর আনে। দরকার হলে ধাঁ করে শত্রুর শিবিরে বা গোলা-বারুদের গুদামে বা অস্ত্রের কারখানায় দু-দশটা বোমা ফেলে আসে, অথবা বন্দুক দিয়ে শত্রুর এরোপ্লেন বা জাহাজ আক্রমণ করে। এসব ছোটখাট কাজে এরোপ্লেনেই সুবিধা বেশি। দশ বছর আগে বিলাতের লোকেও এরোপ্লেন জিনিসটাকে একটা আশ্চর্য তামাসার ব্যাপার মনে করত, অথচ এখন এই যুদ্ধে কত হাজার হাজার এরোপ্লেন ঘোরা-ফিরা করে—কে তার খবর রাখে?

আকাশ-জাহাজগুলা প্রকাণ্ড গম্ভীর জিনিস, একেবারে ২০/৩০ মণ বোমা

নিয়ে ফেরে! তার উপর কামান বন্দুকও সঙ্গে থাকে। তারা আসে যায় অন্ধকার রাত্রে চোরের মতো—দিনের বেলা বেরুতে গেলে তাদের আর রক্ষা নাই—কারণ, অত বড় জিনিসকে গোলা মেরে ফুটো করতে কতক্ষণ? রাত দুপুরে যখন তারা ঘুমন্ত সহরের উপর বোমা ফেলতে থাকে—তখন চারদিক হতে বড় বড় 'Search light' -এর আলোর ধারা আকাশ হাতড়ে তাকে খুঁজে বেড়ায়। একবারটি তার উপর আলো ফেলতে পারলেই যত রাজ্যের কামান তার উপর তাক্ করতে থাকে। তারপর চারিদিক হতে এরোপ্লেনগুলা ভিমরুলের মতো ঘিরে আসে! তখন জাহাজটিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। এরকম অবস্থায় এরোপ্লেনের সর্বদাই চেষ্টা থাকে জাহাজের উপরে উঠবার জন্য। কারণ, উপর থেকে বোমা ফেলে তার পিঠ ভেঙে দেওয়াই হচ্ছে জাহাজ মারবার সবচাইতে ভাল উপায়। ফানুষ জাহাজ যত উঁচুতে যেমন তাড়াতাড়ি উঠতে পারে ঘুড়ির নৌকা তেমন পারে না; কাজেই জাহাজ কাছে আসবার আগে থেকেই এরোপ্লেন অনেকখানি উঠে থাকে—যাতে ঠিক সময়ে সে জাহাজের ঘাড়ের উপর নামতে পারে!

ক্লোরোফর্ম

আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি, বিরাট রাজার গৃহে অজ্ঞাতবাসের শেষদিকে অর্জুন কৌরবদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে তিনি সম্মোহন অস্ত্র মারিয়া শত্রুদলকে অজ্ঞান করিয়া ফেলেন। সম্মোহন অস্ত্রটা কিরূপ তাহা জানি না—কিন্তু আজকালকার ডাক্তারেরা এই বিদ্যাটি রোগীদের উপর অনেক সময়েই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে, রোগীকে অজ্ঞান করাইয়া তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলা হয়, অথচ রোগী তাহার কিছুই জানিতে পারে না। ব্যাপারটি অতি সহজ! রোগীর নাকের কাছে খানিকটা ঔষধ ধরিয়া তাহাকে শুঁকিতে দেওয়া হইল—রোগী সেই মিষ্ট গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে বেহুঁশ হইয়া গেল। বাস্, তারপর চট্‌পট্ ছুরি চালাইয়া কাজ সারিয়া লইলেই হয়।

আফিং খাইলে বা অন্য নানারকম নেশা করিলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। একবার একটা মাতাল নেশার ঘোরে খানায় পড়িয়া পা ভাঙিয়া ফেলে। ডাক্তার সেই নেশার অবস্থাতেই তাহার পায়ের উপর অস্ত্র-চিকিৎসা করেন—মাতাল তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই। কোন অসুখের যন্ত্রণা যখন রোগীর পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে ডাক্তারেরা তখন আফিং জাতীয় ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখেন—সে ঘুমে শরীরের সমস্ত বেদনাবোধকে এমন অবশ করিয়া ফেলে যে, রোগী আর কোনরূপ যন্ত্রণা টের পায় না।

কিন্তু এরূপভাবে নেশা ধরাইয়া চিকিৎসা করার বিপদ অনেক। একে ত এই-সকল ঔষধে শরীরের মধ্যে নানারূপ অনর্থ ঘটাইয়া থাকে, চিকিৎসা শেষ হইবার বহু পরেও ঔষধের নানারূপ উৎপাত চলিতে থাকে। তাহার উপর আবার ঔষধের অভ্যাস একবার ধরিয়া গেলে—তাহাতে রোগীকে একেবারে নেশার মতো পাইয়া বসে। তখন বিনা প্রয়োজনেও রোগী ঐসকল ঔষধের জন্য পাগল হইয়া উঠে—এবং ঔষধের দাস হইয়া সমস্ত জীবনটিকে মাটি করিয়া ফেলে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭ বৎসর পূর্বে হাম্‌ফ্রে ডেভি নামে একজন অসাধারণ ইংরাজ পণ্ডিত এক প্রকার 'গ্যাস' লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজিতে ইহাকে 'Laughing Gas' অর্থাৎ হাসাইবার গ্যাস বলা হয়। এই জিনিসটিকে নিশ্বাসের সঙ্গে টানিতে গেলে ঘাড়ে মাথায় কেমন সুর্‌সুর্‌ করিতে থাকে—তাহাতে অনেকের হাসি আসে। ডেভি দেখিলেন, শুধু সুর্‌সুর্‌ করে তাহা নয়, একটু বেশি করিয়া টানিলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এইরকমভাবে একটুখানি গ্যাস শুঁকাইয়া মানুষকে মিনিটখানেক বেশ আরামে বেহুঁশ করিয়া রাখা যায়। তাহাতে খুব দুর্বল লোকেরও কোন অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। ডেভি বলিলেন, "এই উপায়ে বেশ সহজেই বিনা যন্ত্রণায় ছোটখাট অস্ত্র-চিকিৎসা চলিতে পারে।" দুঃখের বিষয় সে সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসকেরা এ কথায় কান দেন নাই। চল্লিশ বৎসর পরে একজন আমেরিকান ডাক্তার এই গ্যাসের সাহায্যে বিনা যন্ত্রণায় একটি রোগীর দাঁত তুলিয়া দেখান যে, ডেভির কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। সেই অবধি নানারূপ ছোটখাট অস্ত্র চিকিৎসায়, বিশেষত দাঁতের ডাক্তারিতে এই গ্যাসের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু সামান্য এক মিনিট সময়ের মধ্যে ত আর রীতিমত অস্ত্র-চিকিৎসা চলে না। সুতরাং অধিকাংশস্থলেই চিকিৎসার যন্ত্রণা দূর করিবার আর উপায় ছিল না। সেই সময়কার রোগীদের কাছে অস্ত্র-চিকিৎসার মতো ভয়ানক জিনিস আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। যে কয়েদীর প্রাণদণ্ড হইবে সে যেমন করিয়া ফাঁসির কথা ভাবে, রোগী তেমনি করিয়া চিকিৎসার কথা ভাবিত। কবে 'অস্ত্র করা' হইবে, সেই ভাবনায় রোগী আগে হইতেই আধমরা হইয়া থাকিত। প্রায় সকল রোগীকেই ধরিয়া বাঁধিয়া জবরদস্তি করিয়া তবে ছুরি চালাইতে হইত। এইরকম যখন অবস্থা তখন আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিল সেখানকার এক ডাক্তার 'ইথার' অর্থাৎ সুরা জাতীয় একপ্রকার ঔষধের সাহায্যে রোগীকে বহুক্ষণ নিরাপদে অজ্ঞান রাখিবার উপায় বাহির করিয়াছেন।

জেমস্‌ সিম্‌সন্‌ নামে একটি উৎসাহী চিকিৎসক সেই সময়ে এডিনবরায় চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছাত্র অবস্থায় সেই সময়কার অস্ত্র-চিকিৎসার ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া সিম্‌সন্‌ এক সময়ে আরেকটু হইলেই ডাক্তারি-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেন। বিনা যন্ত্রণায় চিকিৎসার কথা শুনিয়া তিনিও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সিম্‌সনের কয়েকটি বন্ধুও তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। প্রতিদিন রাত্রে কয় বন্ধু মিলিয়া যত রাজ্যের ঔষধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া নানারূপে তাহার নিশ্বাস লইয়া দেখিতেন—ঐরকম অবসাদ আসে কিনা! এ বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ উৎসাহ ছিল সে সম্বন্ধে সিম্‌সনের কোন বন্ধু একটি সুন্দর গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। ঐ বন্ধুটির বাড়িতে একটি নূতন উগ্র ঔষধ দেখিয়া সিম্‌সন্‌ তৎক্ষণাৎ জিনিসটা বিষাক্ত কি না তাহার বিচার না করিয়াই তাহা লইয়া পরীক্ষা করিতে উদ্যত হন। কিন্তু বন্ধুটি বাধা দিয়া আগে দুইটা খরগোসের উপর তাহা প্রয়োগ করেন। ফলে দুইটা খরগোসই মারা যায়।

যাহা হউক, অনেকদিন ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর সিম্‌সন্‌ একদিন এক শিশি ক্লোরোফর্ম আনিয়া হাজির করিলেন। সেইদিন আহারের পর দুটি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তিনি পরীক্ষায় বসিলেন। ক্লোরোফর্মের শিশিতে নাক গুঁজিয়া জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে তিনজনেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যখন সিম্‌সনের জ্ঞান হইল তিনি দেখিলেন বন্ধু দুটি তখনও মোহের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া আছেন। তিনি উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "ইথারের চাইতেও চমৎকার।"

সেইদিন হইতে চিকিৎসকগণ এই সম্মোহন অস্ত্রটিকে আয়ত্ত করিতে আরম্ভ

করিয়াছেন এবং তাহার ফলে অস্ত্র-চিকিৎসার বিভীষিকা সাড়ে পনর আনা পরিমাণ দূর হইয়াছে। পূর্বে যে-সকল অবস্থায় ছুরি ছোঁয়াইতে না ছোঁয়াইতে রোগী যন্ত্রণায় মারা যাইত—সেরূপ সাংঘাতিক ক্ষেত্রেও এখন আর রোগীর সে ভয়ের কারণ নাই।

মরুর দেশে

'মরু' নামটিতেই বলিয়া দেয় যে দেশটি মরা। গাছপালা জীবজন্তু সেখানে বাড়িতে পায় না; মানুষ সেখানে বাস করিতে গেলে দুদিনের বেশি টিঁকিতে পারে না; এমনি ভয়ানক সে দেশ।

পৃথিবীর 'ম্যাপ' যদি দেখ, দেখিবে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে সাহারার প্রান্ত হইতে চীন সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি পর্যন্ত বড় বড় দেশ জুড়িয়া Desert (পরিত্যক্ত দেশ) বা মরুভূমি পড়িয়া আছে। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষের আবাসের আশেপাশেই ছোট বড় ফাঁকা দেশ—সেখানে ঘর নাই বাড়ি নাই, আছে খালি বালির মাঠ আর বালির ঢিপি। মেরুর কাছে সাইবিরিয়া বা গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও এমন সব ফাঁকা জায়গা আছে যেখানে বছরের মধ্যে আট মাস ধরিয়া সারাটি দেশ শ্মশানের মতো পড়িয়া থাকে—কেবল বসন্তের কাছাকাছি একটু-আধটু গাছপালার চেহারা দেখা যায়।

কিন্তু বাস্তবিক 'মরুভূমি' বলিতে কেবল সেইসব দেশকেই বুঝায় যেখানে বারো মাস কেবল বালির স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখিবার যো নাই—যেখানে শুকনা বালি রৌদ্রে তাতিয়া সমস্ত দেশটাকে একেবারে শুকাইয়া রাখে। সারা বছর সেখানে বৃষ্টি নাই—গাছপালার মধ্যে ক্বচিৎ কোথাও একটু সুবিধা পাইয়া হয়ত দু-দশটি মনসা গাছ মাথা তুলিয়াছে। মরুভূমির ধারে কিনারায় হয়ত দু-চারিটা সাপ বিছা বা গিরগিটি মাঝে মাঝে দেখা যায়—কিন্তু যতই ভিতরে যাও ততই দেখিবে জনপ্রাণীর কোন সাড়া নাই। মাছিটা পর্যন্ত সেখানে শুকাইয়া মরে। চারিদিকে কেবল বালি, তার মাঝে জন্তুই বা বাঁচে কি খাইয়া, আর গাছই বা রস পায় কোথায়? মনসা জাতীয় গাছগুলার পাতা মোটা, তাহাতে রস থাকে অনেক বেশি—আর তাদের ছাল পুরু, তাহাতে রসটাকে তাড়াতাড়ি শুকাইতে দেয় না। তাহারা বালির নীচে সরস মাটিতে প্রাণপণে শিকড় বসাইয়া কোনরকমে বাঁচিয়া থাকে।

মরুভূমির মধ্যে আগাগোড়াই কেবল যদি বালি থাকিত, তবে তাহার ভিতরকার সংবাদ লওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইত। কিন্তু বালির নীচেও ত জমি আছে—সেই জমির মধ্যে কত ঝরনা কত জলাশয় বালির চাপে পড়িয়া থাকে, মাঝে মাঝে যেখানে বালির চাপ কম অথবা জলের বেগ খুব বেশি সেখানে সমস্ত চাপ ঠেলিয়া জল একেবারে উপরে উঠিয়া আসে। জলের পরশ পাইয়া তাহার চারিদিকে খেজুর গাছ আর নানারকম লতাপাতা গজাইয়া উঠে; গাছের ছায়ায় ছায়ায় সমস্ত জায়গাটিকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখে। দেখিলে মনে হয় যেন এক একটি তীর্থস্থান। এক একটি মরু-তীর্থের ধারে ধারে ছোট ছোট গ্রাম বসিয়া যায়—মরুপথের যাত্রীরা পথ চলিতে চলিতে এই সকল জায়গায় আসিয়া বিশ্রাম করে।

বাতাস যেখানে শুকনা, সেখানকার জমি অল্পেই তাতিয়া উঠে আর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। সেইজন্য মরুভূমিতে যেমন গরম খুব বেশি, শীতও তেমনি প্রচণ্ড। এক সময়ে যেমন মাটিতে পা ফেলিবামাত্র ফোস্কা উঠিয়া যায়—আরেক সময় হয়ত জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। দিনের বেলা যেখানে গরমে শরীর ঝলসিয়া যায় রাত্রে সেইখানেই কম্বলের উপর কম্বল চাপাইয়া তবু শীত মানিতে চায় না। এইরূপ শীত গ্রীষ্মের লড়াইয়ের মধ্যে বাতাস বড় একটা স্থির থাকিতে পারে না। যেখানেই গরম বেশি বাতাস সেখান হইতে চিমনির ধোঁয়ার মতো উপরে উঠিতে থাকে। তখন চারিদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তোলে। মরুপথের বিপদ অনেক—চলিতে চলিতে পথ হারাইলে তৃষ্ণায় মরিতে হয়—চোরা বালির পাহাড় ধসিয়া কত মানুষ প্রাণ হারায়—শীতে জমিয়া গরমে পুড়িয়া কত সময়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু, যতরকম বিপদ আছে তাহার মধ্যে মানুষ সব চাইতে ভয় করে মরুভূমির ঝড়কে। সে ঝড় যে কত বড় সাংঘাতিক ব্যাপার হইতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। দমকা বাতাসের ঝাপ্‌টায় মরুভূমির তপ্ত বালি হু হু করিয়া ছুটিতে থাকে; বাতাসের আঁচে আর বালির ঘষায় সর্বাঙ্গে ফোস্কা পড়িয়া যায়, ধুলায় অন্ধ হইয়া দম আটকাইয়া মানুষগুলা পাগলের মতো ছুটিতে থাকে। তার উপর বাতাসের ঘূর্ণীটানে মরুভূমির বালি যখন পাক দিয়া উঠিতে থাকে তখন সেই বালুস্তম্ভের মুখে যে পড়ে তাহার আর রক্ষা নাই। বালির স্তম্ভে চাপা পড়িয়া কত বড় বড় যাত্রীদল যে মারা গিয়াছে তাহার আর হিসাব নাই।

এত বালি আসিল কোথা হইতে? সাহারা মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মণ বালি ক্রমাগত উড়িয়া উড়িয়া পশ্চিমে সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—তবু মনে হয় বালির আর শেষ নাই। সাহারার মধ্যে এবং পূবে উত্তরে আশেপাশে বেলে পাথরের পাহাড়। কোন্ কালে সে স্থানে সমুদ্র ছিল—তাহার নরম বালি জমাট বাঁধিয়া এখনও পাহাড় হইয়া সঞ্চিত আছে। বাতাসে সেই পাহাড়কে রেণু রেণু করিয়া উড়াইয়া মরুভূমির মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে—আবার মরুভূমির বালিকে সেই কোথাকার সমুদ্রের মধ্যে নিয়া ফেলিতেছে। মোটের উপর দেখা যায় যে, বালি ক্ষয় হইতে হইতে ক্রমে সমস্ত মরুভূমিটাই নীচু হইয়া আসিতেছে। এখন যেখানে মরুভূমি দেখা যায় শেষে তাহারই কত জায়গায় মানুষের থাকিবার মতো চমৎকার জমি দেখা দিবে।

মরুভমির কথা বলিতে গেলেই উটের কথা আসিয়া পড়ে। উটের শরীরটিকে মরুভূমির উপযোগী করিয়াই গড়া হইয়াছে। চ্যাটাল চ্যাটাল পা, তার আষ্টেপৃষ্টে কড়ায় ঢাকা—ঝামা দিয়া ঘসিলেও তাহাতে ফোস্কা পড়ে না। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই—এক পেট ঘাস খাইয়া তিন দিন উপোস থাকে—এক ঢোক জল লইয়া সারাদিন পথ চলে। সবদিকে তার সবই ভাল—মন্দের মধ্যে কেবল তার মেজাজটি। আরবদের বিশ্বাস যে উট যদি একবার রাগ করে তবে একদিন হউক, এক বৎসর হউক, সে প্রতিহিংসা না লইয়া ছাড়িবে না। সেইজন্য কোন উটের মেজাজ বিগড়াইতে দেখিলেই তাহারা মাটির উপর নানারকম পোশাক ছড়াইয়া উটকে তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। উট তখন ঐগুলার উপর মনের সুখে লাথি চাঁটি মারিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা করে।

মরুর দেশের কথা বলিলাম। এখন মরু সাগরের (Dead Sea) কথা বলিয়া শেষ করি। মরু সাগরটি একটা মাঝারি গোছের হ্রদ—৫০ মাইল লম্বা, ৮/১০ মাইল চওড়া। কিন্তু তাহার মধ্যে কোথাও একটি মাছ বা কোনরকম জলের প্রাণী নাই। সমুদ্রের জলকে শুকাইয়া ঘন করিলে যেরূপ হয়, মরু সাগরের অবস্থা ঠিক সেইরূপ। জল

এমন ভারি যে তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরিবার ভয় নাই আর এমন লবণাক্ত যে জলে স্নান করিলে সর্বাঙ্গে চাপ বাঁধিয়া নুন জমিতে থাকে।

যুদ্ধের আলো

সেকালে অর্থাৎ পুরাণে যে কালের কথা বলা হয় সেই কালে লড়াইটা হত দিনের বেলায়। ভীষ্মপর্বে দশ দিন ধরে লড়াই হল; প্রতিদিনই দেখি সন্ধ্যা না হতেই শঙ্খধ্বনি করে যুদ্ধ থেমে গেল, তারপর যে যার মতো শিবিরে ফিরে গেল। এইরকম দিনের বেলা লড়াই করে রাত্রে সবাই নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করত। কিন্তু আজকালকার যুদ্ধে এরকম হবার যো নেই। এখন কি দিন কি রাত, কোন সময়েই নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। শত্রু যে কখন কোন সুযোগে ঘাড়ে এসে পড়বে, তার জন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। সৈন্যেরা যুদ্ধ থামিয়ে সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্র গুটিয়ে শিবিরে ফিরে গেল, এরকমটি কোন সময়েই হতে পারে না। কারণ, যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময়েই সৈন্য হাজির রাখতে হয়।

কামানেরও বিশ্রাম নেই। রাত্রের অন্ধকারে ঝড়ে বাদলে যখন তখন সে হুংকার দিয়ে উঠছে। তার চোখে দেখবার দরকার হয় না, কেবল ম্যাপ দেখে অঙ্ক কষে হিসাব করে সে গোলা ছুঁড়ছে; দিনে রাতে কোন সময়েই শত্রুকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা খাদ কেটে তারই মধ্যে হয়ত খোলা ময়দানে কত রাত কাটাচ্ছে। সেখানে সারারাত ধরে কড়া পাহারা বসান আছে—কোনখানে টুঁ শব্দটি হলেই তারা কান খাড়া করে শোনে। কোথাও কোন ভয়ের কারণ দেখলেই ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেয়—আর আকাশে তারাবাজি ছুটিয়ে চারদিক আলো করে দেখে, শত্রু আসছে কি না!

যেমন ডাঙায় তেমনি জলে—আবার আকাশেও তেমনি। কোথাও দিনের অপেক্ষায় কেউ বসে থাকে না। কত যুদ্ধের জাহাজ সারারাত সমুদ্রের মধ্যে হাঁ হাঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার 'Search light'-এর ঝক্‌ঝকে আলো খড়্গের মতো অন্ধকার কেটে চারিদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই আলো যেখানে পড়ে সেখানে যেন একেবারে রাতকে দিন করে ফেলে। সেই আলোর মুখে যদি কোন শত্রুজাহাজ পড়ে তবে তার আর লুকোবার যো নেই। সে যেদিকে যাবে, আলো তার পিছন পিছন ঘুরবে। আর সেই আলোতে পরখ্‌ করে যুদ্ধজাহাজ তার উপর কামান দাগবে। তখন তার প্রাণভয়ে পালান ছাড়া আর উপায় নেই। অন্ধকার রাত্রে জার্মানদের বোমাওয়ালা 'জেপেলিন' বেলুনগুলো যখন আকাশ বেয়ে চোরের মতো আসতে থাকে তখন তার সাড়া পেলেই অমনি বড় বড় আলোর ঝাপ্‌টা চারিদিকে ছুটে বেরোয়—আকাশ হাতড়ে খুঁজবার জন্য। যুদ্ধের সময় আলোর ব্যবহারটা যতই ভয়ানক হোক না কেন, তামাসা হিসাবে আলোটা দেখতে ভারি সুন্দর। বড় বড় দরবারী ব্যাপারের সময় দশ বিশটা জাহাজ একসঙ্গে মিলে যখন আলোর খেলা দেখাতে থাকে তখন সে এক চমৎকার দৃশ্য হয়।

কিন্তু জাঁকাল ব্যাপারের কথা যদি বল তবে রাত্রে ডাঙায় লড়াইয়ের সময় যে আলোর খেলা চলে, তার আর তুলনা হয় না। চারিদিকে হাজার হাজার কামান আর

বন্দুক, তাদের মুখে মুখে লাল আগুন ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠছে। থেকে থেকে রং বেরঙের তারাবাজি ছুঁড়ে নানারকম সংকেত চলছে। মনে কর, জার্মান খাদের উপর তারা ফুটছে—সাদা লাল, সাদা লাল—তার মানে 'শত্রু সৈন্য এদিকে আসছে—কামান চালাও।' খানিক পরে হয়ত দেখবে, লাল সবুজ লাল সবুজ লাল সবুজ—জার্মানরা বলছে, 'আমরা কোণঠাসা হয়েছি—শীঘ্র উদ্ধার কর।' মাঝে মাঝে এক একটা বড় বড় 'ফানুষ তারা' আস্তে আস্তে জ্বলতে জ্বলতে চারিদিক আলো করে মাটিতে পড়ছে—সেই আলোতে লড়াই আবার জমে উঠছে। হয়ত আশেপাশে ভাঙাচোরা গ্রামগুলোতে আগুন ধরে এক একদিকে আকাশের গায়ে লাল হয়ে উঠছে। তার উপর, থেকে থেকে শত্রুদের চোখ ধাঁধিয়ে বিদ্যুতের আলোর মতো 'সার্চ লাইট' এসে পড়েছে। উপবে নীচে চারিদিকে বড় বড় গোলা ফাটছে– এক মুহূর্ত আলোর ঝিলিক্‌, তারপর পাহাড় প্রমাণ ধোঁয়া। আলোয় আঁধারে ছায়ায় ধোঁয়ায় মিলে কি ভীষণ তামাসা!

প্রলয়ের ভয়

পুরাণে আমরা প্রলয়ের কথা পড়েছি। কবে প্রলয় হয়েছিল, আবার কবে হবে, কেমন করে প্রলয় হয়, এইসবের নানারকম বর্ণনাও তাতে আছে। প্রলয়েব সময়ে সমস্ত সৃষ্টি যে জলে ডুবে যাবে এ কথাও বার বার করে বলা হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, নানান দেশে নানান জাতির ইতিহাসে প্রলয়ের প্রায় একই ধরনের বর্ণনা আছে। অন্তত এ কথাটা অনেক দেশের অনেক পুরাণেই শোনা যায় যে, একবার প্রলয় হয়ে এই পৃথিবীটা ডুবে গেছিল। তাতে সমস্ত জীবজন্তু প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, এ কথাটার মধ্যে একটুখানি সত্যিকারের ইতিহাস আছে। যাঁরা ভূতত্ত্ববিদ্‌ অর্থাৎ যাঁরা পাথর পাহাড় ঘেঁটেঘুঁটে পৃথিবীর পুরান কথার সংবাদ নিয়ে ফেরেন তাঁরা বলেন যে, মানুষের জীবনে বড় বড় রোগের মতো পৃথিবীর জীবনেও এক একটা বড় বড় 'সংকট যুগ' দেখা গিয়েছে। যুগে যুগে বড় বড় দেশের জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে, গ্রীষ্মের দেশ হিমের হাওয়ায় বরফে ঢেকে গিয়েছে, আর দুরন্ত শীতের দেশে বরফ ঠেলে সবুজ ঘাস আর বনজঙ্গল দেখা দিয়েছে! যেখানে দেশ ছিল সেখানে কত সাগর হয়েছে—আবার, কত কত সাগর ফুঁড়ে নতুন দেশ মাথা তুলেছে। আর, মাঝে মাঝে এক একটা বন্যা এসে পাহাড় ধুয়ে পৃথিবী ধুয়ে দেশকে দেশ সাফ করে দিয়েছে। এইরকম ছোট বড় কত প্রলয় এই পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গিয়েছে—আমরা এখনও পুরাণের মধ্যে, গল্পের মধ্যে তারই একটু আভাস পাই, আর পাহাড়ে পর্বতে পাথরের স্তরে তার নানারকম পরিচয় দেখি।

একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, "এই যে সূর্য, এ চিরকাল এমন থাকবে না। একদিন এরও তেজ ফুরিয়ে যাবে—এ-ও তখন নিভে যাবে।" এই কথা শুনে একজন ভীতু-গোছের ভদ্রলোক তাঁকে চিঠি লেখেন যে, "মহাশয়, আপনি যেরকম বিপদের কথা বললেন তা শুনে আমার বড় ভয় হয়েছে। সেরকম প্রলয়টা কবে হবে, আর আমার ছেলেপিলেদের জন্য তা হলে কিরকম ব্যবস্থা করলে তারা বাঁচতে পারে—আমায় একটু জানাবেন কি?" জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত এর উত্তরে লিখলেন,

“আপনার এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই—আপনার ছেলেরা যদি লাখ বছরও বেঁচে থাকে, তবু এ সূর্যকে আজ যেমন দেখছে তখনও তেমনই দেখবে—তেজ ফুরাতে আরও অনেক দেরি আছে। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” লোকে বড় বড় ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প আগুনের উৎপাত দেখে তা থেকে প্রলয় জিনিসটা কি রকম, তার একটা আন্দাজ করে। বাস্তবিক, ছোটখাট প্রলয় পৃথিবীর উপর দিয়ে সব সময়েই চলেছে। কিন্তু আজ যে প্রলয়ের কথা বলব সেটা কিছু সত্যিকার প্রলয় নয়—লোকে প্রলয়ের হুজুকে যে নানারকম মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি করে, তারই কথা।

অপরিচিত জিনিস দেখলেই তার সম্বন্ধে মানুষের ভয় বিস্ময় বা কৌতূহল জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যে জিনিস সর্বদাই দেখতে পাই তাতে মন এমন অভ্যস্ত হয়ে যায় যে সেটাতে আর কোনরকম আশ্চর্য বোধ হয় না। মনে কর, এই সূর্য যদি প্রতিদিন না উঠে হঠাৎ এক-একদিন ঐরকম ভয়ানক আগুনের মতো মূর্তি নিয়ে হাজির হত, তাহলে অধিকাংশ লোকেই যে একটা প্রলয়কাণ্ড হবে মনে করে ভয়ে অস্থির হত তা বুঝতেই পার। চাঁদকেও যদি দু-দশ বছরে ক্বচিৎ এক-আধবার দেখা যেত তবে লোকে না জানি কত আগ্রহ করে কত আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখত, আর না জানি সেটা আমাদের চোখে কি সুন্দর লাগত।

ধূমকেতুগুলো যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না এসে ঐ চন্দ্র সূর্যেরই মতো নিতান্ত সাধারণ জিনিস হত, তবে তাদের ঐ ঝাপসা ঝাঁটার মতো চেহারা দেখে ভয় পাবার কোনই কারণ থাকত না। কিন্তু তারা কিনা হঠাৎ কেমন করে খবর না দিয়ে আসে যায়, মানুষের কাছে তাই তাদের এত খাতির! পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকেই ধূমকেতুকে একটা অলক্ষণ কিংবা উৎপাত বলে মনে করে। ধূমকেতু যখন আসে তখন যার যা কিছু বিপদ-আপদ সবের জন্যেই ঐ ধূমকেতুকেই লোকে দোষী করে। সে সময়ে রোগ মৃত্যু যুদ্ধ বিদ্রোহ সবই ‘ঐ ধূমকেতুর জন্য’। সুতরাং ধূমকেতু এসে পৃথিবী ধ্বংস করবে, এই ভয়টা মানুষের মধ্যে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড় বড় দুর্ঘটনাকে যে মানুষ ধূমকেতুর ঘাড়ে চাপিয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। নানা দেশের ইতিহাসে নানা সময়কার ধূমকেতুর যেরকম অদ্ভুত ভয়ংকর সব বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায় যে লোকে তাদের কিরকম ভয়ের চোখে দেখেছে। আমরা ছেলেবেলায় একবার খবরের কাগজে গুজব শুনেছিলাম যে কোথাকার এক ‘পাগলা ধূমকেতু’ নাকি পৃথিবীর দিকে আসছে—আর কোন্ জ্যোতিষী নাকি গুণে বলেছেন যে সে অমুক তারিখে এই পৃথিবীকে এমন ঢুঁ লাগাবে যে তখন কেউ বাঁচে কিনা সন্দেহ। এই খবরটা নিয়ে তখন চারিদিকে খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। কয়েক বৎসর আগে যখন ‘হ্যালির ধূমকেতু’ এসে দেখা দেয় তখন কেউ কেউ গুণে দেখেছিলেন যে ঐ ধূমকেতুর ঝাঁটার মতো লেজটা পৃথিবীর উপর এসে পড়বে। ঐ লেজের বাড়ি খেলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি হবে তাই নিয়ে কাগজে-পত্রে খানিকটা তর্কবিতর্ক হয়েছিল, কিন্তু সময় হলে দেখা গেল যে তাতে পৃথিবীর ত কিছু হলই না, বরং লেজটাই ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেল। সুতরাং ধূমকেতুর ধাক্কা লেগে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কল্পনাটা কোন কাজের কল্পনা নয়, কারণ ধূমকেতুর লেজটা এমনই অসম্ভবরকম হালকা যে পৃথিবীর সঙ্গে গুঁতোগুঁতি করতে গেলে তারই বিপদ হবার কথা। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীকে কোনদিন যদি কোন ধূমকেতুর মাথাটার ভিতর দিয়ে যেতে হয় তাহলে অবস্থাটা কেমন হয়, ঠিক বলা যায় না। সম্ভবত তখন খুব একটা জমকালো গোছের উল্কাবৃষ্টি হবে।

উল্কাবৃষ্টি জিনিসটা আমি কখন চোখে দেখিনি, কিন্তু তার যে বর্ণনা শুনেছি সে ভারি চমৎকার। আকাশে মাঝে মাঝে তারার মতো এক একটা কি যেন হঠাৎ ছুটে দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়—দেখে লোকে বলে 'তারা খস্‌ল'; কিন্তু আসলে সে তারা নয়—উল্কা। ঐরকম উল্কা যদি মাঝে মাঝে এক-আধটা না হয়ে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজারে হাজারে আকাশের উপর দিয়ে ছুটে যায়—তখন তাকে বলে 'উল্কাবৃষ্টি'। এর মতো জমকালো ব্যাপার অতি অল্পই আছে। আমরা আকাশে যেসব গ্রহ-নক্ষত্র দেখি তারা সবাই ভাল মানুষের মতো স্থির হয়ে থাকে, তারা ওরকম পাগলের মতো ছুটোছুটি করে না। সুতরাং হাজার হাজার উল্কাকে অমনভাবে ছুটোছুটি করতে দেখলে হঠাৎ মনে কেমন ভয় হয়—যদি দু-চারটা ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলে অবস্থাটা কিরকম হবে। কিন্তু আসলে তেমন ভয় পাবার কিছুই নেই। উল্কাগুলির প্রায় সমস্তই পৃথিবীতে পড়বার ঢের আগেই বাতাসের ঘষায় আপনা হতেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যদি না জ্বলত তবে আমরা তাদের দেখতেই পেতাম না: কারণ, একে তারা অধিকাংশেই নিতান্ত ছোট, তার উপর তাদের নিজেদের কোন আলো নেই; কেবল মরবার সময় যখন তারা আপন "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে" জ্বলে মরে তখন তার সেই শেষ আলোতে আমরা তাদের একটুক্ষণ দেখি মাত্র। যা হোক, ভয়ের কারণ নাই বা থাকুক একেবারে হাজার হাজার উল্কা পৃথিবীর উপর ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরছে এ কথা ভাবতেও খুব আশ্চর্য লাগে! ব্যাপারটা চোখে দেখতে আরও আশ্চর্য, তাতে আর সন্দেহ কি?

আর-একটি ভয়ানক জমকালো ব্যাপারের কথা না বললে একটা মস্ত কথা বাদ থেকে যায়—সেটি হচ্ছে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ। এ জিনিসটি যিনি একবার চোখে দেখেছেন তিনি আর কখনও ভুলতে পারেন না। যখন গ্রহণটা পূর্ণ হয়ে আসতে থাকে, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরে ফেলে, চাঁদের প্রকাণ্ড কালো ছায়া দেখতে দেখতে চোখের সামনে পাহাড় নদী সব গ্রাস করে ছুটে আসতে থাকে—যখন বনের পশু আর আকাশের পাখি পর্যন্ত ভয়ে কেউ স্তব্ধ হয়ে থাকে কেউ চিৎকার করে আর্তনাদ করে তখন মানুষের মনটাও যে ভয়ে বিস্ময়ে কেঁপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? বিশেষত যারা অশিক্ষিত বা অসভ্য, যাদের কাছে সূর্যের এই হঠাৎ-নিভে-যাওয়ার কোনই অর্থ নেই, তারা যে তখন পাগলের মতো অস্থির হয়ে বেড়াবে, এ ত খুবই স্বাভাবিক। তারাও প্রলয় বলতে ঠিক এইরকমই একটা কিছু কল্পনা করে—এমনই একটা অদ্ভুত বিরাট গম্ভীর ব্যাপার—যার ভয়ংকর মূর্তিতে মানুষের মনকে একেবারে দমিয়ে অবশ করে দেয়।

ধূলার কথা

ঘরের দেয়াল মেঝে আসবাবপত্র যতই ঝাড়ি যতই মুছি, খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলেই আবার দেখি, যেই ধুলা সেই ধুলা। এত ধুলা আসেই বা কোথা হইতে, আর এ ধুলার অর্থই বা কি?

টেবিলের উপর হইতে খানিকটা ধুলা সংগ্রহ করিয়া অণুবীক্ষণ দিয়া দেখ—

তাহার মধ্যে চুন, সুরকি, কয়লার গুঁড়া হইতে সুতার আঁশ, পোকার ডিম, ফুলের রেণু পর্যন্ত প্রায় সবই পাওয়া যাইতে পারে। আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পারিলে কত সাংঘাতিক রোগের বীজও তাহার মধ্যে দেখা যাইবে। জানালার ফাঁক দিয়া যে আলোর রেখা ঘরের মধ্যে আসে তাহার মধ্যেও চাহিয়া দেখ, ধূলা যেন কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। এই ধূলার মধ্যেই আমরা বাস করি চলি ফিরি, নিশ্বাস লই। মানুষ যত দূর দেখিয়াছে, যত দূর খুঁজিয়াছে, ধূলার আর শেষ কোথাও নাই। আকাশে খুঁজিয়া দেখ; যত দূর উঠিবে, তত দূর ধূলা—যেখানে মেঘ নাই কুয়াশা নাই, বাতাস যেখানে অসম্ভবরকম পাতলা সেখানেও ধূলার অভাব নাই। সে ধূলা যে কত সূক্ষ্ম তাহা চোখে মালুম হয় না, অণুবীক্ষণের হিসাব দিয়া বুঝিতে হয়। অথচ সে ধূলাও বড় সামান্য নয়—সেই ধূলাই সারাটি আকাশকে নীল রঙে রাঙাইয়া রাখে, সেই ধূলাই উদয়াস্তের সময় সূর্যকিরণকে শুষিয়া এমন আশ্চর্য জমকালো রঙের সৃষ্টি করে। আরও দূরে যাও, পৃথিবী ছাড়িয়া যেখানে আকাশের খোলা ময়দান পড়িয়া আছে সেখানে যাও; দেখিবে, যে নিয়মে গ্রহ চন্দ্র সকলে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে সেই একই নিয়মে অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাও আকাশপথে বড় বড় চক্র আঁকিয়া চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী যদি একটি ধূলিকণার মতোই হইত, তবুও সে এমনিভাবে বছরের পর বছর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিত—কে তখন তাহার খবর রাখিত?

এই পৃথিবীর উপর ধূলার যে অদ্ভুত খেলা চলিয়াছে তাহাকে ধূলার খেলা বলিয়া জানে কয়জন? যখন কণায় কণায় বৃষ্টিজল জমিয়া বর্ষাধারা নামিতে থাকে, যখন কুয়াশার ঘনঘটায় চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে তখন নিশ্চয় জানিও এ সমস্তই ধূলার কৃপায়। ধূলা না থাকিলে বাষ্পকণা জমিয়া জল হয় না, স্বচ্ছ আকাশে মেঘ কুয়াশার জন্ম হয় না।

সুতরাং ধূলা জিনিসটাকে আমরা যতই আমাদের জিনিস বলিয়া উড়াইয়া দেই না কেন, উৎপাত মনে করিয়া তাহাকে যতই দূর করিতে চাই না কেন, আর তাহার পরিচয় লওয়াটা যতই অনাবশ্যক ভাবি না কেন, আসলে সে বড় একটা সামান্য জিনিস নয়। তোমরা হয়ত বলিবে, 'সামান্য না হউক, জিনিসটা বড় বিশ্রী ও নোংরা।' হাঁ, নোংরা বটে। যখন সে আমার সাফ কাপড় ময়লা করিয়া দেয়, আবার ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে জমিয়া থাকে, যেখানে তাহাকে দিয়া আমার কোন দরকার নাই সেইখানে আসিয়া পড়ে—তখন তাহাকে নোংরা বলি। কিন্তু 'ধূলা' বলিলেই যে একটা নোংরা বিশ্রী কিছু ভাবিতে হইবে, এরূপ মনে করা ঠিক নয়। প্রজাপতির পালক ঝাড়িলে যে ধূলা পড়ে তাহা চোখে দেখিতে অতি সূক্ষ্ম একটুখানি হালকা গুঁড়ার মতো দেখায়—দেখিলে কেহই তাহাকে ধূলা ছাড়া আর কিছুই বলিবে না। কিন্তু অণুবীক্ষণ দিয়া তাহাকে এমনই সুন্দর দেখায়! বাতাসে যে সকল ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায় তাহার মধ্যেও কত সময়ে কত আশ্চর্যরকমের কারিকুরি দেখা যায়।

গভীর সমুদ্রের তলা হইতে পাঁক ঘাঁটিয়া বা পচা পুকুরের উপরকার ময়লা ছাঁকিয়া যে জীবন্ত ধূলি বাহির হয় তাহার মতো সুন্দর জিনিস খুব অল্পই আছে। এগুলিকে উদ্ভিদ বলিতে পার, কিন্তু উদ্ভিদ বলিতে সাধারণত যেরকম জিনিস মনে করিয়া বসি, এগুলি একেবারেই সেরূপ নয়। ইংরাজিতে ইহাদিগকে ডায়াটম্‌ (Diatom) বলে—আমরা এখানে তাহাকেই জীবন্ত ধূলি বলিতেছি। এই 'Diatom' কথাটি, ইহার o অক্ষরটির মধ্যে যেটুকু ধরে তাহার চাইতেও কম পরিমাণ ধূলিকে অণুবীক্ষণের সাহায্যে ফটো তুলিয়া দেখিতে পার। তাহার চাইতেও ছোট 'ডায়াটম্‌' অসংখ্য

প্রকারের আছে। জলের উপর শেওলার মতো এই অদ্ভুত জিনিসগুলি কত সময়ে ভাসিতে থাকে। সাধারণ লোকে তাহাকে নোংরা ও বিশ্রী বলিয়া এড়াইয়া চলে, তাহার ভিতরে যে কি আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ তাহারা সে সংবাদ রাখে না। কিন্তু যাঁহারা এ সকলের চর্চা করেন তাঁহারা যত্ন করিয়া এই ময়লা ঘাঁটিয়া এইসব উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন ও তাহাদের চালচলন আকার-প্রকার লক্ষ করিয়া তাহাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা আমাদের শুনাইয়া থাকেন। ডায়াটম্গুলিকে পোড়াইয়া সাফ করিলেও তাহার এই জীবকঙ্কাল সহজে নষ্ট হয় না—এগুলি এমনই মজবুত! ইহাদের আসল বাহার এই কঙ্কালগুলিতেই। জীবন্ত অবস্থায় এই কঙ্কালগুলি সবুজ কোষের মধ্যে ঢাকা থাকে। ইহাদের কারিকুরিগুলা তখন অণুবীক্ষণ দিয়াও চোখে পড়ে না।

এ পর্যন্ত অন্তত দশ হাজাররকমের ডায়াটম্ পাওয়া গিয়াছে। ছবিকে যত বড় করিবে তাহার গায়ে কারিকুরির মধ্যে ততই আরো আশ্চর্য সূক্ষ্ম কাজ দেখা যাইবে।

জীবন্ত অবস্থায় এই ডায়াটম্গুলির মধ্যে আরেকটি অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখা যায় এই যে হাত পা কিছুই নাই, অথচ তাহারা চলিয়া বেড়ায়। জলের মধ্যে এমন সুন্দর সহজভাবে তাহারা ঘুরিয়া চলে যে দেখিলে আশ্চর্য লাগে। কি করিয়া যে তাহারা চলে, তাহার কারণ ঠিক করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতদের অবধি মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

আকাশ আলেয়া

মানুষের বুদ্ধিতে আজ পর্যন্ত কত অসংখ্যরকমের আলোব সৃষ্টি হয়েছে। সেই কাঠে-ঘষা আগুন থেকে শুরু করে আজকালকার বিদ্যুতের আলো পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তার নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড তালিকা হয়ে পড়ে। সেই কতরকমের তেলের প্রদীপ, কত শত চর্বি-বাতি, মোমের বাতি, কত অসংখ্য গ্যাসের আলো, বিদ্যুতের আলো, তার হিসাব রাখে কে! মানুষের তৈরি জিনিসে কাজ চলে ভালো, তাতে আর সন্দেহ নাই। রোদের আলো আর চাঁদের আলো আর প্রকৃতির নানা খেয়ালের নানারকমের আলো কেবল এই নিয়ে আজকালকার নিতান্ত অসভ্য মানুষেরও জীবন চলে না। কিন্তু তবু বলতে হয় যে, এই প্রকৃতির রাজ্যে আমরা যতরকমের আলো দেখি, মানুষের তৈরি এইসব আলো তারই অতি সামান্য নকল মাত্র। সূর্যের কথা ছেড়েই দিলাম, আকাশের মেঘে যে বিদ্যুতের আলো চমকায় তার সঙ্গে মানুষের কোন্ 'ইলেকট্রিক্ লাইটের' তুলনা হয়? সামান্য জোনাকি পোকার গায়ে যে আলো জ্বলে যাতে গরম হয় না অথচ আলো হয়, মানুষ তার নকলে 'ঠাণ্ডা আলো' জ্বালাবার জন্য কত চেষ্টা করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের কিরণ-মুকুট হতে যে অদ্ভুত আলো বেরোয়, তার গম্ভীর শোভায় পশুপাখি পর্যন্ত ভয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়; মানুষের মাথায় সেরকম আলোর কল্পনাও আসে না।

কিন্তু এই পৃথিবীতে সব চাইতে অদ্ভুত আর সব চাইতে সুন্দর যে আলো সে হচ্ছে মেরু দেশের 'আকাশ আলেয়া' বা 'মেরুজ্যোতি'। তাকে দেখতে হলে উত্তরে কিংবা দক্ষিণে মেরুর প্রদেশে যেতে হয়। সেখানে শীতকালের রাত্রে মেরুর চারিদিকে কয়েকশত মাইল দূর পর্যন্ত আলোর অতি চমৎকার খেলা চলতে থাকে। শুধু এই

আলো দেখবার জন্যই প্রতি বৎসর কত দূর দেশের কত শত যাত্রী নরওয়ের উত্তরে দুরন্ত শীতের মধ্যে বেড়াতে যায়।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র এদের আলো কেমন স্থির। তারাগুলো অনেক সময়ে মিট্‌মিট্‌ করে বটে, কিন্তু এলোমেলোভাবে কেউ নড়ে চড়ে বেড়ায় না। কিন্তু ‘আকাশ আলেয়া’ বাস্তবিক ঐ সুদূর আকাশের জিনিস নয়, তার জন্মস্থান এই পৃথিবীর বাতাসেরই চূড়ার উপরে। বাতাস সেখানে অসম্ভবরকম হালকা, তার উপরে সূর্যের বিদ্যুৎকিরণ পড়ে তাকে চঞ্চল করে ‘আকাশ আলেয়া’র সৃষ্টি করে—সুতরাং ‘আকাশ আলেয়া’র চালচলনটাও কিছু অস্থিররকমের। কিন্তু অস্থির বলতে একেবারে বিদ্যুতের মতো দুরন্ত একটা কিছু মনে কর না। তার অস্থিরতা শ্রাবণের তুফান হাওয়ার মতো নয়, বসন্তের ঝির্‌ঝিরে বাতাসের মতো।

‘আকাশ আলেয়া’র রং রামধনুর চাইতেও সুন্দর, কারণ সেটা সত্যিকার আলোক-শিখা; আলোকটা তার নিজেরই আলো—আর রামধনুর আলো সূর্যের আলোর ধার-করা ছায়া মাত্র। তাছাড়া অন্ধকার আকাশের কালো জমির উপরে রঙের খেলা যেমন খোলে, দিনের বেলায় মেঘের গায়ে তেমন করে খুলতেই পারে না। অতি সুন্দর অতি স্নিগ্ধ হালকা নীল লাল সবুজ রঙের শিখার মতো এই আলো আকাশ জুড়ে খেলা করে। কখন উপরে ওঠে, কখন নীচে নামে, কখন মিনিটে মিনিটে বহুরূপীর মতো রং বদলায়, কখন রঙিন পর্দার মতো দুলতে থাকে, কখন ঘূর্ণার পাকের মতো ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে, কখন ধূমকেতুর ল্যাজের মতো আকাশের গায় খাড়া থাকে, আবার কখন আলগা হয়ে টুকরো হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে। এক-এক সময়, বিশেষত শীতের রাতে এই আলোর খেলা এমন সুন্দর হয় যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর তামাসা দেখেও ক্লান্তিবোধ হয় না।

এই পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের গোলা—সেই চুম্বকের এক মাথা উত্তরে আর এক মাথা দক্ষিণে, মেরুর কাছে। আর সূর্যটা যেন একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎশক্তির কুণ্ড—তার মধ্যে থেকে নানারকম আলো আর বিদ্যুতের তেজ আকাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; তার খানিকটা আমরা দেখি, আর অনেকটাই হয়ত দেখি না। পণ্ডিতেরা বলেন, এই সূর্যের বিদ্যুৎছটা আর পৃথিবীর চুম্বকশক্তি আর এই আলেয়ার আলো, এই তিনটির মধ্যে ভিতরে ভিতরে খুব একটা সম্পর্ক দেখা যায়। সূর্যটা কেবল যে পৃথিবীকে আলো দেয় আর গরম রাখে তা নয়, সে নানারকম অদৃশ্য তেজে পৃথিবীকে ভিতরে বাইরে সব সময়েই নানারকমে চঞ্চল করে রাখছে। সূর্যের গায়ে যখন ঘূর্ণির মতো দাগ দেখা যায় তখন পৃথিবীতেও চুম্বকের দৌরাত্ম্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে—আর মেরুর আকাশে যেখানে পৃথিবীর এই চুম্বকের মাথা, সেখানে এই আলেয়ার আলো আরো দ্বিগুণ উৎসাহে নূতন বাহার দেখিয়ে খেলা করতে থাকে। এগারো বছর পর পর সূর্যের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের এক একটা বড় বড় উৎপাত দেখা যায়—ঠিক সেই সময়েই পৃথিবীতেও চুম্বকের উপদ্রব আর আকাশ আলেয়ার বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে।

তোমরা জান, পাম্প্‌ দিয়ে ফুটবলে বাতাস পোরা যায়—কিন্তু একরকম উল্টা ‘পাম্প্‌’ আছে তা দিয়ে বাতাস খালি করে ফেলে। পণ্ডিতেরা এইরকমে বোতলের মধ্যে থেকে বাতাস বের করে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে আকাশ আলেয়ার নকল করতে পেরেছেন। কিন্তু একটা বোতলের মধ্যে আলোর তামাসা আর খোলা আকাশের প্রকাণ্ড শরীরে আলোর খেয়াল-খেলা, এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ।

আষাঢ়ে জ্যোতিষ

মানুষের বিদ্যায় যেখানে কুলায় না কল্পনা সেখানের অভাব পুরাইয়া লয়। প্রাচীন কালের মানুষ যাহারা চন্দ্র সূর্য মেঘ বৃষ্টি আগুন বিদ্যুৎ দেখিয়া অবাক হইত অথচ কোন ঘটনার কারণ খুঁজিয়া পাইত না, কোন কিছুর মর্ম বুঝিত না, তাহারাও এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে নানারকম কল্পনা করিতে ছাড়ে নাই। সেইসব প্রাচীন কালের কল্পনা কিন্তু কত দেশের কত পুরাণে কত গল্পের আকারে এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল, তাহার কতরকম কাহিনী লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহা শুনিলে আমাদের কৌতূহল জাগে। নানান দেশের নানান কাহিনীর মধ্যে সত্য ঘটনা আর কল্পিত কাহিনী এমনভাবে জড়ানো আছে যে, তার কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা তাহা ঠিক করাই কঠিন।

এই পৃথিবীর সম্বন্ধেই কত গল্প মানুষে বানাইয়াছে। আমাদের দেশেই এক-এক পুরাণে তার এক একরকম ঘটনা। এই পৃথিবীকে শূন্যে রাখিবার জন্য বাসুকীর মাথায় তাহাকে বসান হইল, আবার তাহাতেও লোকের মন ওঠে নাই—মানুষ ক্ষীর সমুদ্রে কচ্ছপের কল্পনা করিয়া সেই কচ্ছপের পিঠে হাতি, হাতির পিঠে বাসুকী শুদ্ধ পৃথিবীকে চাপাইয়াছে। গ্রীস দেশের পুরাণে পৃথিবীটাকে পাতলা চাকতির মতো কল্পনা করা হইয়াছে। সেই অদ্ভুত চাকতি টুকরা টুকরা হইয়া সমুদ্রের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে—সেই সমুদ্রের আর শেষ নাই, কূল কিনারা কোথাও নাই। কোন কোন দেশে এই জগৎটাকে একটা ঢাকনি-দেওয়া সরার মতো মনে করা হইত। চন্দ্র সূর্য শুদ্ধ আকাশটা ঢাকনি আর পৃথিবীটা সরা। এই পৃথিবীর চেহারাটা বর্ণনাই কি কম পাওয়া যায়? তিন কোণা, চার কোণা, টাকার মতো, বাটির মতো, পদ্মের মতো, কতরকমের কল্পনা!

নরওয়ে দেশের পুরাণে বলে এই পৃথিবীটা একটা দৈত্যের মৃতদেহ। পৃথিবীর স্থলের ভাগ তার মাংস, এই সমুদ্রগুলি তার রক্ত, পাহাড়গুলি তার হাড় আর দাঁত, আর গাছপালা সব তার গায়ের লোম আর চুলের জটা। সৃষ্টির আদিকাল হইতে অন্ধকার আর শীতের দৈত্যগুলার সঙ্গে আগুন ও আলোর দেবতাদের লড়াই লাগিয়া আছে। দৈত্যযোদ্ধা ঈমিরকে বধ করিয়া দেবতারা তার শরীরটাকে আকাশের একটা প্রকান্ড ফাঁকের মধ্যে গুঁজিয়া সেইখানে এই পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। মনের মতো পৃথিবী গড়িয়া তাঁহারা দৈত্যের মাথার খুলিটা দিয়া আকাশ বানাইলেন, সেই আকাশে দৈত্যের মগজ ছিটাইয়া মেঘের সৃষ্টি হইল। তখন সকলে বলিলেন, এমন সুন্দর পৃথিবী, ইহাকে অন্ধকার রাখা চলে না, ইহার জন্য আলো চাই। তাঁহারা সমস্ত আকাশটার গায়ে আগুন ছিটাইয়া তারপর বড় বড় দুইটা আগুনের গোলা দিয়া চন্দ্র সূর্য গড়িলেন। সেই চন্দ্র সূর্যের চমৎকার রথ গড়া হইল। সল্ (সূর্য) ও মানি (চন্দ্র) দুই মহাবীর হইলেন রথের সারথি।

সমস্তই ঠিক হইল, কেবল দুইটি ভয়ানক দৈত্য নেকড়ে বাঘের চেহারা ধরিয়া

কখন যে চন্দ্র সূর্যের পিছনে ছুটিতে লাগিল দেবতারা তাহাদের আটকাইতে পারিলেন না। দৈত্য দুইটার নাম স্কোল্ (ঘৃণা) ও হাটি (বিদ্বেষ)। তাহারা দেবতাদের এই কীর্তি নষ্ট করিবে বলিয়া সেই হইতে আজ পর্যন্ত পিছন পিছন ছায়ার মতো ছুটিয়া চলিতেছে। কখন এক একবার তাহারা একেবারে চন্দ্র সূর্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদের গিলিবার উপক্রম করে; তখন স্বর্গে মর্ত্যে—চারিদিকে ভয়ানক কোলাহল করিয়া লোকে হায় হায় করিতে থাকে; সেই কোলাহলের ভয়ে দৈত্যেরা মুহূর্তের জন্য দমিয়া যায় আর চন্দ্র সূর্যও সেই ফাঁকে আবার ছুটিয়া বাহির হয়। এইরকমভাবে গ্রহণের পর গ্রহণ আসে আর চন্দ্র সূর্যের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। এমন একদিন আসিবে যখন এই দৈত্য চন্দ্র সূর্যকে একেবারে গিলিয়া হজম করিয়া ফেলিবে তখন প্রলয় আসিয়া সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

চন্দ্রের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, তাহাদের নাম হিউক আর বিল্। তাহারা আগে পৃথিবীতে থাকিত। সেই সময়ে তাহাদের নিষ্ঠুর বাপ সারারাত তাহাদের দিয়া জল বহাইত। সেইজন্য চন্দ্র তাহাদের পৃথিবী হইতে কাড়িয়া নিয়া নিজের বুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ দেখিতে পাও সেগুলি আর কিছু নয়, হিউকি ও বিল্ তাহাদের মায়ের কোলে ঘুমাইয়া আছে। ইংরাজিতে যে ছেলে ভুলানো ছড়া শুনা যায়—

Jack and Jill went up the hill to
fetch a pail of water.

(জ্যাক ও জিল্ জল আনিতে পাহাড়ে উঠিল)।

সেই ছড়ার জ্যাক্ ও জিল্ বাস্তবিক এই হিউকি ও বিল্। তাহাদের গল্প নরওয়ে দেশের নাবিকদের মুখে মুখে ইংলণ্ড পর্যন্ত আসিয়া এখন এইরকম দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশের পুরাণেও এইরূপ গল্প আছে—সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিল, দৈত্যদিগকে ফাঁকি দিয়া দেবতারা সে অমৃত বাঁটিয়া খাইলেন। রাহু দৈত্য লুকাইয়া দেবতাদের সঙ্গে বসিয়া সে অমৃতের ভাগ লইল। চন্দ্র সূর্য রাহুকে ধরিয়া ফেলিলে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দিয়া তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। সেই অবধি রাহুর কাটা মাথা রাগিয়া এক একবার চন্দ্র সূর্যের ঘাড়ের উপর পড়িয়া তাহাদের গিলিবার আয়োজন করে আর তাহাতেই গ্রহণ হয়।

অলংকারের কথা

সুন্দর শরীরটিকে সাজাইয়া আরও সুন্দর করিব, মানুষের এই ইচ্ছাটি পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু শরীরটি কিরকম হইলে যে ঠিক সুন্দর হয় আর কেমন করিয়া সাজাইলে যে তাহার সৌন্দর্য বাড়ে এ বিষয়ে নানা জাতির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণত সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী মেয়ে বলিতে আমরা যা বুঝি, আফ্রিকার বাসুটো বা হটেন্টট জাতির কাছে তাহার বর্ণনা করিতে গেলে তাহারা হয়ত আমাদের নিতান্তই বেয়াকুব ঠাওরাইবে।

যে ছেলেটা একেবারে ধ্যাপ্‌সা মোটা, আমাদের দেশের ছেলেরা তাহাকে পাইলে প্রশংসা করা দূরে থাকুক বরং তাহাকে ক্ষেপাইয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে যেসব অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদের অনেকের মধ্যে মোটা হওয়ার সখটা খুবই বেশি। বিশেষত ছেলেপিলেরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে মোটা না হয় তবে বাপ মায়ের আর দুঃখের সীমা থাকে না। ছেলেদের চাইতে আবার মেয়েদের মোটা হওয়াটা আরও বেশি দরকার। যে সহজে মোটা হয় না তাহাকে জোর করিয়া খাওয়াইবার এবং ঘরে বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাকে কোনরকম কাজকর্ম করিতে দেওয়া হয় না, পাছে সে খাটিয়া রোগা হইয়া পড়ে।

আফ্রিকার মুর জাতি এবং পারস্য তুরস্ক ও আমেরিকার কোন কোন জাতির পছন্দটা ঠিক ইহার উল্টা। সেখানে মেয়েরা যে যত রোগা হইতে পারে ততই তার কদর বেশি। তাহারা কত কষ্টে কত সাবধানে আহার কমাইয়া, নানারকম পথ্যাপথ্য বিচার করিয়া চলে। একটু মোটা হইবার লক্ষণ দেখা দিলে তাহাদের ভাবনা-চিন্তার আর সীমা থাকে না।

চীন দেশে পা ছোট করিবার জন্য মেয়েরা কত যন্ত্রণা সহ্য করে তাহা তোমরা বোধহয় জান। তাহারা ছেলেবেলা থেকেই মুড়িয়া বাঁধিয়া পাগুলাকে এমন অস্বাভাবিক অকর্মণ্য ও বিকৃত করিয়া ফেলে যে দেখিলে আতঙ্ক হয়। আবার এমন জাতিও আছে যাহারা হাঁটুর নীচে তাগা আঁটিয়া পা-টাকে জন্মের মতো ফুলাইয়া দেয় আর মনে করে পায়ের চমৎকার শোভা বাড়িয়াছে!

অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন জাতি চ্যাপ্টা নাকের ভারি ভক্ত। সে দেশের মায়েরা নাকি খোকাখুকীদের নাকের ডগাগুলি প্রতিদিন চাপিয়া চাপিয়া অল্পে অল্পে দমাইয়া দেয়। ইংরাজ ছেলেমেয়েদের নাক দেখিয়া তাহারা ভারি নাক সিঁটকায়, আর বলে যে, ‘ইহাদের বাপ মায়েরা নিশ্চয় ছেলেপিলেদের নাক ধরিয়া টানাটানি করে, নইলে নাকগুলা এমন বিশ্রীরকম বাড়ে কি করিয়া!’

উত্তর আমেরিকার ‘রেড ইন্ডিয়ান’দের মধ্যে চ্যাপ্টা কপালের ভারি খাতির। তাহারা ছেলেবেলায় কপালে এমনভাবে পট্টি বাঁধিয়া রাখে যে, কপালটি বনমানুষের কপালের মতো চ্যাপ্টা ও ঢালু হইয়া দাঁড়ায়।

কানটা মাথার পাশে লাগিয়া থাকিবে কি বাদুড়ের মতো আলগা হইয়া থাকিবে এ বিষয়েও মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং দেশ বিশেষে ও জাতি বিশেষে কানের উপরেও নানারকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলির কৌশল খাটান হয়। শরীরটিকে এইরকমে যতটা সম্ভব গড়িয়া পিটিয়া কোনরকম পছন্দসই করিতে পারিলে তারপরেও তাহাকে সাজাইবার দরকার হয়। সাজাইবার সব চাইতে সহজ উপায় তাহাতে রং মাখান। এই রং লেপিবার সখটি অনেক জাতির মধ্যেই দেখা যায় এবং তাহার রকমারিও অনেক প্রকারের লাল হলদে সাদা এবং কালো, সাধারণত এই কয়রকম রঙেই সব কাজ চলিয়া থাকে। এই সকল রঙে সমস্ত দেহখানি চিত্র-বিচিত্র করিয়া আঁকিলে দেখিতে কেমন সুন্দর হয় বল দেখি? কেবল যে সৌন্দর্যের জন্যই রং লাগান হয় তাহা নয়, অনেক দেশে লড়াইয়ের সময় বড় বড় যোদ্ধারা নানারকম রং লাগাইয়া অদ্ভুত বিকট চেহারা করিয়া বাহির হয়। রং লাগাইবার কায়দা কানুন আবার এমন হিসাবমত যে তাহাতে জাতি, ব্যবসায়, বংশ প্রভৃতি সমস্ত পরিচয়ই দেওয়া হয়।

কিন্তু রঙের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে জীবন্ত চামড়ার উপর তাহাকে পাকা করিয়া মাখান চলে না। স্নান করিতে গেলেই বা বৃষ্টিতে ভিজিলেই সমস্ত ধুইয়া

যায়—সুতরাং যাহাদের সখ বেশি তাহারা কাঁচা রং ছাড়িয়া উল্কি আঁকিতে সুরু করিল। উল্কি আঁকা এক বিষম ব্যাপার। শরীরের মধ্যে ক্রমাগত ছুঁচ বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া চামড়ার ভিতরে ভিতরে রং ভরিয়া তবে উল্কি আঁকিতে হয়। সৌখিন লোকেরা অল্পে অল্পে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর এইরূপে শরীরকে রীতিমত যন্ত্রণা দিয়া উল্কি রচনা করে। উল্কি আঁকার ওস্তাদ যাহারা, লোকে মোটা মোটা মাহিনা দিয়া তাহাদের কাছে উল্কি আঁকাইতে যায়। উল্কির কাজ অনেক দেশেই প্রচলিত আছে, কিন্তু এ বিষয়ে জাপানীদের মতো কারিকর আর বোধহয় কোথাও দেখা যায় না।

উল্কির অসুবিধা এই যে, গায়ের রঙটা নিতান্ত ময়লা হইলে তাহার উপর উল্কি ভাল খোলে না। সুতরাং আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদের মধ্যে, বিশেষত কঙ্গো অঞ্চলের নিগ্রোদের মধ্যে এবং আরও অনেক দেশের কৃষ্ণবর্ণ লোকেদের মধ্যে উল্কির প্রচলন নাই। তাহাদের মধ্যে উল্কির বদলে একরকম ঘা-মরা দাগের ব্যবহার দেখা যায়, সে জিনিসটা উল্কির চাইতেও সাংঘাতিক। প্রথমত শরীরে অস্ত্র খোঁচাইয়া বড় বড় ঘা বানাইতে হয়, তারপর নানারকম উপায়ে সেই তাজা ঘাগুলিকে অনেকদিন পর্যন্ত জিয়াইয়া রাখিতে হয়। এতরকম কাণ্ড-কৌশলের পর শেষে ঘা যখন শুকাইয়া উঠে তখন উঁচু উঁচু দাগের মতো তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্যের খাতিরেই স্ত্রী-পুরুষ সকলে সখ করিয়া এত যন্ত্রণা সহ্য করে! শুনিয়াছি, ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন সৌখিন মেমসাহেব দাঁতের মধ্যে ফুটা করিয়া তাহাতে হীরা মুক্তা বসাইয়া অলংকারের চূড়ান্ত করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিলে, অলংকারের সখটা মানুষের এক অদ্ভুত খেয়াল বলিয়া মনে হয়। রসায়নশাস্ত্রে বলে হীরা আর কয়লা, এই দুইটা আসলে একই জিনিস। যে মুক্তার এত আদর সেই মুক্তাও একটা পোকার রস ছাড়া আর কিছুই নয়। সভ্য দেশে সোনা রূপা দিয়া অলংকার গড়ে, কিন্তু অনেক দেশে তামা, লোহা, দস্তা, সীসা পর্যন্ত অলংকার হিসাবে চলিয়া যায়। প্রবাল, নুড়ি, শঙ্খ, কড়ি, হাতির দাঁত, হাঙরের দাঁত, মানুষের হাড়, পাখির পালক, সমুদ্রের শ্যাওলা, কাঁচের পুঁথি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ফলের বীচি, ফুল, পাতা, কাঠ—এমনকি জোনাকি পোকা বা জীবন্ত পাখি ও কচ্ছপ পর্যন্ত দেশ হিসাবে অলংকার বলিয়া আদর পাইয়া থাকে! কিন্তু যতরকম আশ্চর্য অলংকারের কথা শুনিয়াছি তাহার মধ্যে যেটি আমার কাছে সব চাইতে অদ্ভুত ঠেকিয়াছে সেটি হইতেছে টেলিগ্রাফের তার। প্রথম যখন পূর্ব আফ্রিকার নিগ্রো জাতিরা টেলিগ্রাফের নূতন পুরাতন তারগুলি খুব কিনিত তখন তাহার কারণ বুঝা যায় নাই। পরে দেখা গেল, ঐ তারগুলিকে তাহারা মজবুত করিয়া হাতে বা পায়ে প্যাঁচাইয়া সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত সৌখিন তাহারা হাত পা ও গলা একেবারে তারে ঢাকিয়া ফেলে। কেহ কেহ এমন মজবুত করিয়া তার বাঁধে যে, গায়ের চামড়ায় একেবারে স্ক্রুর মতো দাগ বসিয়া যায়। বর্মাতে কোন কোন জায়গায় মেয়েরা গলায় এমন করিয়া তার জড়ায় যে তাহাতে গলা অস্বাভাবিকরকম লম্বা হইয়া পড়ে।

গলার অলংকারের কথা বলিতে গেলে কঙ্গো প্রদেশের আর এক জাতির কথা মনে পড়ে। তাহাদের মেয়েরা গলায় গোল যাঁতার মতো পিতলের হাঁসুলি পরে, সেগুলি যত বড় আর যত ভারি হয় ততই লোকে বেশি করিয়া বাহবা দেয়। তাহার এক একটা প্রায় আধমণ পর্যন্ত ভারি হইতে দেখা গিয়াছে।

এরপর নাক কানের কথা আর বেশি কি বলিব। আমাদের দেশেই এক-এক সময় নথ বা মাকড়ির যে রকম উৎকট চেহারা হয় তাহা দেখিয়া বিদেশী কেহ যদি হাসে, তবে সেটা কি খুব অন্যায় হয়? নাকের গহনার একটা অদ্ভুত ছবি দেখিয়াছি, তাহাতে একটি মেয়ের নাক ফুটা করিয়া কতগুলা মোটা মোটা কাঠি বসান হইয়াছে। কাঠিগুলা শিকারী বিড়ালের গোঁফের মতো মুখের দুই দিকে বাহির হইয়া রহিয়াছে।

নাক কান ফুটা করিয়া গহনা পরা এ দেশে সকলেই দেখিয়াছ কিন্তু ঠোঁট বা গাল ফুঁড়িয়া অলংকার বসান কোথাও দেখিয়াছ কি? দক্ষিণ আমেরিকার বামন জাতির মধ্যে উপরের ঠোঁটে আংটি গাঁথিবার প্রথা চলিত আছে। গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো জাতির মধ্যে এবং উত্তর আমেরিকার কোন কোন স্থানে তলার ঠোঁট চিরিয়া তাহার মধ্যে কাঠের চাকতি গুঁজিয়া রাখা হয়। আফ্রিকার কোন কোন স্থানে ঠোঁট বা গাল ফুটা করিয়া তাহাতে হাতির দাঁতের ছিপি বসাইবার দস্তুর আছে। সৌন্দর্যের জন্য লোকে এত কষ্টও সহ্য করে!

এখন চুলের কথা বলিয়া শেষ করি। নানা ফ্যাশানের চুল ছাঁটা, টেরিকাটা, বাব্‌ড়ি রাখা, ঝুঁটি বাঁধা, এসব ত আমরা সর্বদাই দেখি। কিন্তু কোন মেয়ে যদি মাথায় আঠা লেপিয়া, চুলগুলিকে দড়ির ছড়ের মতো ঝুলাইয়া তাহার উপর লাল রং মাখাইয়া আসে, তবে সেটা কেমন দেখাইবে? কিংবা যদি মাথায় চুনকাম করিয়া চুলগুলাকে একেবারে ইঁটের মতো চাকা বাঁধিয়া রাখে, তাহা হইলেই বা কেমন হয়? আফ্রিকা দেশে অনেক জায়গায় এরকম জিনিস অহরহই দেখিতে পাওয়া যায়।

গাছের ডাকাতি

ধীর শান্ত ক্ষমাশীল লোকের কথা বলতে হলে আমাদের দেশে গাছের সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া হয়—'তরোরিব সহিষ্ণুণা'। গাছের মহত্ত্বের কথা ছেলেবেলায় কত যে পড়েছি এখনও তার কিছু কিছু মনে পড়ে। 'ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ'—যে লোক পাশে বসে গাছের ডাল কাটছে তার কাছ থেকেও গাছ তার ছায়াটুকু সরিয়ে নেয় না। আরও শুনেছি, 'কঠিন অপ্রিয় বাক্য করিলে শ্রবণ, রক্তজবা রাগ ধরে মনুজ লোচন। ইহাদের শিরোপরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণে, সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে'। এমন যে শান্ত নিরীহ গাছ সে-ও নাকি আবার অত্যাচার করে! নানারকম কৌশল করে, বিষ ঢেলে, ফাঁদ পেতে, হুল্ ফুটিয়ে, সঙ্গিন চালিয়ে, গোলা মেরে, সাঁড়াশি বিঁধিয়ে কত উপায়ে যে তারা দৌরাত্ম্য করে তা শুনলে পরে তোমরা বলবে 'গাছের পেটে এত বিদ্যে'!

এর আগে শিকারী গাছের কথা বলেছি। তাতে গাছেরা কেমন করে আশ্চর্য রকম ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে খায়, তার গল্প দেওয়া হয়েছিল। তারা নানারকম লোভ দেখিয়ে, রঙের ছটায় মন ভুলিয়ে পোকাদের সব ডেকে আনে; কিন্তু যারা আসে তারা আর ফিরে যায় না। মধু খেতে খেতে কখন যে তারা ফাঁদের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেটা তাদের খেয়ালই থাকে না; কখন হঠাৎ টপ্ করে ফাঁদের মুখ বুজে যায়, কিংবা গাছের আঠাল রসে তাদের পা আটকিয়ে যায়, কিংবা ফাঁদের মধ্যে পিছল পথে উঠতে

গিয়ে আর উঠতে পারে না তখন বেচারাদের ছট্‌ফটানি সার। এরা মাংসাশী গাছ, পোকামাকড় খেয়ে এরা বেঁচে থাকে তাই প্রাণের দায়ে একটু-আধটু হিংসাবৃত্তি না করলে এদের চলবে কেন?

খোঁজ করলে দেখা যায়, অনেক সময় গাছে গাছেও লড়াই চলে। অল্পে অল্পে দিনের পর দিন নিঃশব্দে সে লড়াই চলতে থাকে। এক জায়গায় দশ বিশটা গাছ থাকলেই তাদের মধ্যে কিছু না কিছু রেষারেষি বেধে যায়। সকলেই চায় প্রাণ ভরে আলো আর বাতাস পেতে—সুতরাং যারা প্রবল তারা গায়ের জোরে সকলকে ঠেলে-ঠুলে বেড়ে ওঠে আর দুর্বল বেচারিরা আড়ালে অন্ধকারে শুকিয়ে মরে।

এক-একরকম গাছ থাকে তাদের কেমন অভ্যাস, তারা অন্য গাছের গায়ে পড়ে পাক দিয়ে উঠে তারপর তাদের চিপ্‌সে মারে। এক-এক সময় দেখা যায়, একটা গাছ সিন্ধবাদের বুড়োর মতো আর একটা গাছের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। গাছের অন্য বিদ্যা যেমনই থাক, সে ত হনুমানের মতো লাফাতে পারে না, তাহলে সে অন্যের ঘাড়ে চড়ল কি করে? চড়তে হয়নি, ঐ ঘাড়ের উপরেই তার জন্ম হয়েছে। ঐখানে কবে কোন্‌ পাখি এসে ফলের বীজ ফেলে গেছে, সুবিধা পেয়ে সেই বীজ এখন ডালপালা মেলে, মাটি পর্যন্ত শিকড় ঝুলিয়ে প্রকাণ্ড গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে নীচের গাছটার খুবই আপত্তি থাকবার কথা, কিন্তু আপত্তি থাকলেই বা শোনে কে? যেখানে সেখানে জন্ম নিয়ে বেড়ে ওঠায় এক একটি গাছের বেশ বাহাদুরি দেখা যায়। আমাদের দেশের অশ্বথ গাছ এ বিষয়ে একেবারে পাকা ওস্তাদ। ছাদে দালানে পোড়ো মন্দিরে অন্য গাছের ঘাড়ে, কারখানার চিমনির চূড়ায়, যেখানে তাকে সুযোগ দেবে সেখানেই সে মাথা বাঁচিয়ে বেড়ে উঠবে। বটগাছের জন্মও অনেক সময়ে অন্য গাছের ঘাড়ের উপর হয়—সেইখানে বাড়তে বাড়তে সে যখন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয় তখন নীচের গাছটিকে সে অল্পে অল্পে ফাঁস দিয়ে চেপে মারে। এইরকম করে সে বড় বড় তালগাছকেও কাবু করে ফেলতে পারে।

আর একদল গাছ আছে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সব সময় তৈরি থাকে, পাছে কেউ তাদের অনিষ্ট করে। শুকনা বালির দেশে মনসা গাছের বাড়তি খুব বেশি। মনসা গাছের পুরু ছাল, তার মধ্যে জলভরা নরম শাঁস, তাতে ক্ষুধাও মেটে তৃষ্ণাও দূর হয়। কিন্তু মনসা গাছের গা-ভরা কাঁটা, জানোয়ারের সাধ্য কি তার কাছে ঘেঁষে। গরু ছাগলে কত সময়ে ক্ষুধার তাড়ায় কাঁটার কথা ভুলে গিয়ে মনসা গাছে মুখ দিতে গিয়ে নাকে মুখে কাঁটার খোঁচা খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে পালিয়ে আসে। মনসা জাতীয় গাছ নানারকমের হয়; কোনটা ছোটখাট, তার পুরু পুরু চ্যাটাল পাতা, কোনটার পাতা নেই একেবারে থামের মতো খাড়া, কোনটার চেহারা ঝোপের মতো, কোনটা ভুট্টার মতো, কোনটা চল্লিশ হাত লম্বা, কোনটা বড় জোর এক হাত কি দেড় হাত। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই সমান, সকলের গায়ে সজারুর মতো কাঁটা। কোনটার কদমফুলের মতো সুন্দর চেহারা, দেখে হাত দিতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু একটিবার হাত দিলেই বুঝবে কেমন মজা।

এই গাছগুলির কাঁটা এক-এক সময়ে এমন সরু হয় যে, হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না—কিন্তু ধরতে গেলে একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে কাঁটা চামড়ার মধ্যে ফুটে যায়। কাঁটাওয়ালা গাছ নানারকমের আছে, তার মধ্যে কোন কোনটি শুধু কাঁটাতেই সন্তুষ্ট নয়, তারা কাঁটার মধ্যে বিষ ভরে রাখে। তাতে কাঁটার খোঁচা আর বিষের জ্বালা দুটোই বেশ একসঙ্গে টের পাওয়া যায়। আবার দু-একটার কাঁটা নিতান্তই সামান্য—সরু

শুঁয়ার মতো কিন্তু তাদের বিষ বড় তেজাল। বিছুটির পাতা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন অসংখ্য হুল উঁচিয়ে আছে—তাতে হাত দিবা মাত্র তার আগাটুকু ভেঙে গিয়ে ভিতর থেকে বিষাক্ত রস বেরিয়ে আসে। এক-এক জাতীয় বিছুটি আছে—তাদের বিষে অসহ্যরকম যন্ত্রণা হয় এবং সপ্তাহ ভরে তার জের চলে। এক সাহেব একবার এইরকম এক বিছুটি ঘাঁটতে গিয়ে তারপর নয় দিন শয্যাগত ছিলেন। তিনি বলেছেন যে বিছুটি লাগবার পর সারাদিন তাঁর মনে হত যেন তপ্ত লোহা দিয়ে কে তাঁর হাড়ের মধ্যে ঘা মারছে।

'ওল খেয়ো না ধরবে গলা'—এ কথা আমিও জানি তোমরাও জান; কিন্তু জঙগলের ধারে যখন বুনো ওলের নধর সবুজ পাতাগুলো ছড়িয়ে থাকে, তা খেলে যে গলা ধরবে এ কথা গরু ছাগলে কি করে জানবে? এইসব পাতার মধ্যে ছুঁচের চাইতেও সরু অতি সূক্ষ্ম দানা থাকে, সেইগুলি গলায় জিভে ফুটে মুখের অবস্থা সাংঘাতিক করে তোলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপে একরকম বেত পাওয়া যায় তার পাতা খেলে গলা ফুলে কথা ত বন্ধ হয়ই, অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে যেতে চায়। শুনা যায়, সেখানকার নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়ীরা এই পাতা খাইয়ে ক্রীতদাসদের শাসন করত। এই বেতের নাম Dumb Cane বা 'বোবা বেত'।

আত্মরক্ষার জন্যেই অধিকাংশ গাছে নানারকমের ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নেয়। কিন্তু কেবল নিজেকে বাঁচিয়েই সকলে সন্তুষ্ট নয়, বংশরক্ষার জন্যেও তাদের যেসব উপায় খাটাতে হয় সেগুলিও এক-এক সময় কম সাংঘাতিক নয়। অনেক গাছের ফল বা বীজ দেখা যায় যেন কাঁটায় ভরা। এইরকম কাঁটাওয়ালা নখওয়ালা ফল সহজেই নানা জানোয়ারের গায়ের চামড়ায় লেগে এক জায়গায় ফল আর এক জায়গায় গিয়ে পড়ে। তাতে জানোয়ারের অসুবিধা খুবই হতে পারে—কিন্তু গাছের বংশ বিস্তারের খুব সুবিধা হয়। এক একটা ফলের কাঁটার সাজ অনাবশ্যকরকমের সাংঘাতিক বলে মনে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম ফল হয় সে ফল মানুষে খায় না, তার গুণের মধ্যে তার প্রকাণ্ড দুইটি বঁড়শির মতো শিং আছে, তার একটি কোন জন্তুর গায়ে বিঁধলে তার সাধ্য কি যে ছাড়িয়ে ফেলে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, এই ফলের কামড় ছাড়াতে গিয়ে গরু ছাগল বা হরিণের মুখের মধ্যে বঁড়শি আটকে গিয়েছে। পোষা জন্তু হলে মানুষের সাহায্যে সে উদ্ধার পেয়ে যায়, কিন্তু বনের জন্তু নিরুপায়। তারা কেবল অস্থির হয়ে পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়—তাতে আধ-খোলা ফলের ভিতরকার বিচিগুলো চারিদিকে ছিটিয়ে পড়বার সুযোগ পায়, কিন্তু নিরীহ জন্তুর প্রাণটি যায়। এই ফলকে সে দেশের লোকে 'শয়তানের শিং' বলে।

এর চাইতেও ভয়ানক হচ্ছে আফ্রিকার সিংহ-মারা ফল। আঁকড়শির মতো চেহারা, তার চারিদিকে 'বাঘনখা' ফলের মতো বড় বড় নখ। নখের গায়ে ভীষণরকম কাঁটা, তাদের এক-এক মুখ এক-এক দিকে—একটাকে ছাড়াতে গেলে আর একটা বেশি করে বিঁধে যায়। প্রতি বছর সে দেশে হাজার হাজার হরিণ, ভেড়া আর ছাগল এইভাবে জখম হয়। যেখানে নখ বসে সেখানে ঘা হয়ে পচে ওঠে, তাতে ফল যদি খসে যায় তাহলে কতক রক্ষা; না হলে শেষটায় প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বয়ং পশুরাজ সিংহও যে এর হাত থেকে সকল সময়ে নিস্তার পেয়ে থাকেন তা নয়। এর জন্যে সিংহের প্রাণ দিতে হয়েছে এমনও দেখা গিয়েছে।

আর এক রকম গাছ আছে, তাদের ফল পাকলে ফেটে যায় আর ভিতরের বিচিগুলো সব ছিটিয়ে পড়ে। কোন কোন গাছে এই বীজ ছড়ান কাজটি বেশ একটু

জোরের সঙ্গে হয়। এক বাঁদরের গল্প শুনেছি, সে খুব বাহাদুরি করে গিলার গাছে বসে বসে মুখ ভ্যাংচাচ্ছিল। গিলার ফল হয় বড় বড় সিমের মতো—সেগুলো পেকে পটকার মতো আওয়াজ করে ফেটে যায় আর চারিদিকে গিলা ছিটায়; বাঁদর ত সে খবর রাখে না, সে আরাম করে ল্যাজ ঝুলিয়ে বসে খুব একটা উৎকটরকম দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে; এমন সময় ফট্ করে গিলা ফেটে তার কানের কাছে চাঁটি মেরে গেল। বাঁদরটা হঠাৎ হাত পা ছেড়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল—তারপর দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ফিরে দেখে কেউ নেই। এরকম অদ্ভুত কান্ড দেখে তার ভয় হল, না কি হল, তা জানি না—কিন্তু সে এক লাফে সেই যে পালাল, একেবারে বিশ ত্রিশটা গাছ না ডিঙিয়ে আর থামল না। দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম ফল আছে, সে এই বিদ্যাতে গিলার চাইতেও ওস্তাদ। তার ফলগুলো ফাটবার সময় বন্দুকের মতো আওয়াজ করে আর তার ভিতরকার বিচিগুলো এমন জোরে ছুটে যায় যে ভালো করে তার চোট লাগলে মানুষ পর্যন্ত জখম হতে পারে।

ছেলেবেলায় একরকম গাছের গল্প পড়েছিলাম, তারা নাকি মানুষ ধরে টেনে খায়। কিন্তু আজকাল পন্ডিতেরা এ কথা বিশ্বাস করেন না—কারণ, অনেক খোঁজ করেও সে গাছের কোনরকম প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যে গাছ পোকামাকড় খায়, সে সুযোগ পেলে পাখিটা বা ইঁদুরটা পর্যন্ত হজম করতে পারে। কিন্তু সে যদি মানুষ পর্যন্ত খেতে আরম্ভ করে তাহলে ত আর রক্ষা নেই।

কয়লার কথা

আমি এক টুকরো কয়লা। রাস্তার ধারে পড়ে আছি, কেউ আমার খবর নেয় না। একটি ছোট্ট ছেলে তার মার সঙ্গে যেতে যেতে খপ্ করে আমায় কুড়িয়ে নিল। দেখে মা বললেন, "আরে, ছি ছি—নোংরা! ওটা ফেলে দাও।" ছেলেটা অমনি আমায় তাচ্ছিল্য করে ফেলে গেল। দেখে রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। হায়রে! আমার যদি কথা কইবার শক্তি থাকত, একবার আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতাম।

কি শোনাতাম? কেন, আমার বয়সের কথা, আমার বংশের কথা, আমার গুণের কথা। সে কথা এখন কি আর তোমরা বিশ্বাস করবে?

হাজার হাজার বছর আগে যখন তোমরা কেউ ছিলে না, তোমাদের মতো দু-পেয়ে জন্তুরা যখন পৃথিবীর উপর সর্দারী করতে শেখেনি, আমি তখন ছিলাম ভীষণ বড় জঙ্গলের প্রকান্ড গাছের মধ্যে। তোমরা যাকে বল 'বনস্পতি' আমি ছিলাম সেইরকম জাঁকাল গাছের জ্যান্ত ডাল। কত যুগের পর যুগ আমরা সেখানে ছায়া দিয়েছি, কত অদ্ভুত পাখি আমার উপর বসে বিশ্রাম করেছে, কত বিদ্ঘুটে জন্তু সেই গাছের আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু অমন যে বিরাট জঙ্গল সেও কি চিরকাল টিঁকতে পারে? এমন দিন এল, যখন আর সে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র রইল না। যেখানে জঙ্গল ছিল সেখানে ছাই ভস্ম ধুলা বালির চাপের নীচে, ভিজা মাটি আর বৃষ্টির জলে মরা কাঠ পচতে লাগল। কত পথ-হারান নদীর স্রোত কত কাদামাটি জঞ্জাল এনে তার উপরে ফেলে গেল; কত ভূমিকম্পে কত আগুনের উৎপাতে সেই জমি কতবার ধসে

পড়ল, কতবার ফেঁপে উঠল; কত পাহাড়-গলা পাথর এসে কত নতুন জমি তৈরি হল, তার উপরে নতুন মাঠ, নতুন বন, নতুন প্রাণীর খেলা চলল। আমরা যুগ যুগ ধরে তারই তলায় পচতে পচতে চাপে আর গরমে পাথর হয়ে জমে উঠলাম। এমনি যে কত হাজার বছর ছিলাম, তার কি আর হিসাব রেখেছি? সেখানে মাটির নীচে কবরের মধ্যে বাইরের কোন খবর পৌঁছায় না—বাইরের কেউ তার খবর জানে না।

তারপর একদিন শুনলাম কিসের শব্দ—কে যেন কি ঠুকছে। দিনের পর দিন রোজই ঠুকছে—খটাখট্ ঠকাঠক্ খটাং খটাং। ডাইনে বাঁয়ে চারিদিকে সেই একই শব্দ। শব্দ কাছে আসতে আসতে একদিন একেবারে আমারই সামনে এসে পড়ল—দেখলাম, তোমাদেরই মতো কতগুলো অদ্ভুত দু-পেয়ে জন্তু আমাদের সব ঠুকে ঠুকে কেটে নিচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম আমাদের কাজ বুঝি ফুরিয়েছে—এখন থেকে চিরটা কাল বুঝি এমনিভাবেই কাটাতে হবে। কিন্তু দেখলাম, তা নয়। আমাদের নেবার জন্যই এরা খেটেখুটে রাস্তা কেটে নেমে এসেছে।

তারপর বাইরে এসে দেখলাম, পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই। সেসব গাছপালা নাই, সেসব জীবজন্তু নাই—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি এই দু-পেয়ে জন্তুর আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা। তুমি ছোক্‌রা.. বড় যে আমায় তাচ্ছিল্য করে কথা কইছ, তুমি জান আমার খাতির কত? আমারই এই কালো রূপকে রাঙিয়ে নিয়ে তোমার ঘরের আগুন জ্বলে, আমার গুণেই রেল চলে, স্টিমার চলে, কলকারখানা সবই চলে। এই কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের বাতি, বলি, এ গ্যাস আসে কোথা হতে? কয়লা চুঁয়ে জ্বালানি গ্যাস হয়—আর হয় এমোনিয়া আর তেল-কয়লা—যাকে তোমরা বল Coalter ।

শুধু কি তাই? ঐ এমোনিয়া দিয়ে কত যে কাজ হয়, প্রতি বছর কত হাজার মণ গাছের সার তৈরি হয় তোমরা কি তার খবর রাখ? তারপর ঐ যে আলকাতরার মতো চট্‌চটে কালো নোংরা জিনিস, যাকে তেল-কয়লা বললাম—তা থেকে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা কত যে আশ্চর্য জিনিস বানিয়েছেন, তাদের নাম করতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হয়ে যায়! কত আশ্চর্য সুন্দর রং, ছবির রং, কাপড়ের রং, কালীর রং; কত নতুন নতূন সুগন্ধ, এসেন্সে ফুলের গন্ধ, সিরাপে ফলের গন্ধ; কত ডাক্তারি ওষুধপত্র —পোকা মারবার, রোগের বীজ মারবার কত অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র; কত নূতন নূতন যুদ্ধ-সামগ্রী, কত বোমার মশলা, কত বারুদের মশলা; আর ছোটবড় কত যে নকল জিনিস তার আর অন্তই নাই। এ সবই সম্ভব হচ্ছে কেবল আমার জন্যই, অথচ তোমরা ত আমায় খাতির করবে না—কারণ, আমি যে কয়লা, আমি যে নোংরা ময়লা কালো রাস্তার কয়লা।

জাহাজ ডুবি

সমুদ্রে চলিতে চলিতে প্রতি বৎসরই কত জাহাজ ডুবিয়া মরে। কেহ মরে ঝড় তুফানে, কেহ মরে ঢেউয়ের ঝাপ্‌টায়, কেহ মরে পাহাড়ের গুঁতায়, আর কেহ মরে অন্য জাহাজের ধাক্কা লাগিয়া—যুদ্ধের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। এইরকম কত উপায়ে জাহাজ

মরিতেছে তাহার ঠিকানাই নাই। এইসকল জাহাজের মধ্যে কত সময় কত লাখ লাখ টাকার জিনিস থাকে, সেগুলি সমুদ্রের তলায় পড়িয়া নষ্ট হইবে—ইহা কি মানুষের সহ্য হয়? বিলাতে বড় বড় ব্যবসাদার কোম্পানি আছে, তাহারা ডোবা-জাহাজ হইতে মাল উদ্ধার করে। এই কাজকে Salvage বলে। ইহাতে তাহারা এক-একসময় অনেক টাকা লাভ করিয়া থাকে। গভীর সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে তাহাকে আর বাঁচাইবার উপায় থাকে না; কিন্তু জল যদি খুব বেশি না হয় তবে অনেক সময় একেবারে জাহাজকে-জাহাজ উঠাইয়া ফেলা যায়।

জাহাজ উঠাইবার নানারকম উপায় আছে। এক উপায়, তাহার সঙ্গে বাতাস-পোরা বড় বড় বাক্স বাঁধিয়া তাহাকে হালকা করিয়া ভাসাইয়া তোলা। আর এক উপায়, তাহার চারিদিকে দেয়াল ঘিরিয়া সেই দেয়ালের ভিতরকার সমুদ্রকে 'পাম্প্' দিয়া শুকাইয়া ফেলা। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন পোর্ট আর্থার দখল করে তখন সেখানকার বন্দরে রুশেরা কতগুলা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। জাপানীরা দেয়াল তুলিয়া সমস্ত বন্দরের মুখ আঁটিয়া দেয়; তারপর বড় বড় কল দিয়া বন্দরের জল সেঁচিয়া ফেলিতেই জাহাজগুলা বাহির হইয়া পড়িল। জাপানীরা সেই জাহাজ আবার মেরামত করাইয়া কাজে লাগাইয়াছে।

একবার স্পেন হইতে কিছু দূরে একটি জাহাজ জখম হইয়া ডুবিতে আরম্ভ করে। জাহাজের কাপ্তান দেখিল স্পেন পর্যন্ত পেঁাছিবার আগেই জাহাজ ডুবিয়া যাইবে। জাহাজের নীচেকার খোলে হাজার মণ লবণ বোঝাই রহিয়াছে—সকলে মিলিয়া সারাদিন লবণ ফেলিলেও তাহার কিছুই কম্‌তি হইবে না। তাই তিনি হুকুম দিলেন, "জাহাজ ছাড়িতে হইবে, নৌকা নামাও।" এমন সময় এক সালভেজ কোম্পানির জাহাজ আসিয়া হাজির—তাহারা আসিয়াই ব্যাপার দেখিয়া জাহাজ ডুবিবার আগেই তাহা কিনিতে চাহিল। লবণ-জাহাজের কাপ্তান বলিল, "মাঝ সমুদ্রে জাহাজ ডুবিলে কিনিয়া লাভ কি?" সালভেজ কাপ্তান বলিল, "জাহাজ ডুবিতে দিব না।" শুনিয়া লবণের কাপ্তান হাসিয়া বলিল, "আমি ত জাহাজ ছাড়িয়াই দিব—তুমি কিনিতে চাও আমার আপত্তি কি?" জাহাজ কিনিয়াই নূতন কাপ্তান তাহাতে জল বোঝাই করিতে লাগিল—পুরাতন নাবিকেরা বলিল, "আহা কর কি? একেই জাহাজ ডুবিতেছে, আবার জল চাপাইতেছ? তুমি পাগল নাকি?" কাপ্তান কোন কথা না বলিয়া লবণের মধ্যে ক্রমাগতই জল ঢালিতে লাগিল। তারপর সমস্ত লবণ জলে গুলিয়া সেই লবণ-গোলা জলে পাম্প বসাইয়া হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া জল সেঁচিয়া ফেলিল। জাহাজ হালকা হইয়া ভাসিয়া উঠিল। পুরাতন কাপ্তান ব্যাপার দেখিয়া আহাম্মক বনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

আশ্চর্য আলো

আজকাল সহরে সহরে বিদ্যুতের আলো দেখা যায়। জাহাজে রেলগাড়িতে সবখানেই 'বিজলীবাতি'র আমদানি হইয়াছে। জল জোগাইবার জন্য রাস্তায় যেমন নল বসান হয়, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পাঠাইবার জন্য সেইরকম লোহা বা তামার তার খাটাইতে হয়। জলের কারখানায় বড় বড় দমকলের চাপে জল ঠেলিয়া উঁচুতে তোলে, সেই তোলা-জল

সহরের নল বাহিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিদ্যুতের ব্যবস্থাও কতকটা সেইরকম —বিদ্যুতের কারখানায় বড় বড় কলে বিদ্যুৎ জমাইয়া রাখে, আর সেই বিদ্যুৎ আপনার চাপে তারের পথ ধরিয়া বহু দূর পর্যন্ত ছুটিয়া যায়। নলের মুখ বন্ধ থাকিলে যেমন জল আর চলে না, তেমনি তার কাটিয়া দিলে বা কোনখানে তারের জোড় খুলিয়া গেলে বিদ্যুতেরও চলার পথ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু জলের চাপ যদি খুব বেশি হয়, তবে সে অনেক সময়ে সকল বাধা ঠেলিয়া আপনার পথ করিয়া লয়—জলের তোড়ে রাস্তাঘাট ভাসাইয়া বিষম কাণ্ড উপস্থিত করে। সেইরকম বিদ্যুতের প্রবল স্রোত যদি সহজ পথ না পায় তবে সেও আকাশ চিরিয়া জোর করিয়া আপনার পথ কাটিতে জানে। ঝড়ের সময়ে আকাশ ফুঁড়িয়া মেঘে মেঘে বিদ্যুতের হাসাহাসি চলে, সেই পথহারা বিদ্যুৎ পৃথিবীর ঘাড়ে পড়িলে যে ভয়ানক কাণ্ড হয় তাহারই নাম 'বাজ পড়া'। নর্দমা কাটিয়া যেমন জল সরায়, বুদ্ধিমান মানুষে তেমনি বাড়ির পাশে লোহার শিক খাড়া করিয়া বিদ্যুতের জন্য সহজ পথ করিয়া রাখে।

পণ্ডিতেরা বোতলের ভিতরে এইরকম বিদ্যুৎ ছুটাইয়া অনেক আশ্চর্য পরীক্ষা করিয়াছেন। বোতলটাকে খালি করিয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইলে অতি অদ্ভুত রঙিন আলোর খেলা দেখা যায়। কেবল রঙের খেলা নয়, পণ্ডিতেরা তাহার মধ্যে এমন সব আশ্চর্য কাণ্ড দেখিতে পান যে তাহার আলোচনার জন্যই কত লোকে সারা জীবন ভরিয়া খাটিতেছেন।

বোতলকে 'খালি' করার কথা বলিলাম কিন্তু তাহার অর্থ কি? সাধারণত, আমরা যাহাকে 'খালি বোতল' বলি তাহা মোটেও খালি নয়, কারণ, তাহার ভিতরটা আগাগোড়াই বাতাসে পোরা। সেই বাতাসকে কলে চুষিয়া বাহির করিলে যাহা থাকে পণ্ডিতেরা তাহাকে বলেন Vacuum অর্থাৎ ফাঁকা আকাশ। এইরকম একটা বোতলের দুই দিকে তার জুড়িয়া তাহার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক্ চালাইলে দেখা যায় যে সেই ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের এক নূতন চেহারা বাহির হয়। বিদ্যুতের তেজ স্নিগ্ধ জ্যোতির মতো বোতলের এক মাথা হইতে আর এক মাথায় ছড়াইয়া পড়ে, আর বোতলের ভিতরটা আশ্চর্য সুন্দর আলোয় ভরিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে।

দেখিবার জিনিস এবং শিখিবার জিনিস ইহার মধ্যে এত আছে যে সেসব কথা আজ আর বলিবার সময় নাই, কেবল একটা আশ্চর্য ব্যাপারের কথা এখানে বলিব। তাহার কথা তোমরা অনেকে হয়ত শুনিয়াছ—তাহার নাম "রঞ্জেনের আলো" বা X-Ray (অজানা আলো)। ফাঁকা বোতলের মধ্যে বিদ্যুতের আঘাতে এই আশ্চর্য আলোর জন্ম হয়। কাঁচ ফুড়িয়া সেই আলো বাহিরে চলিয়া আসে, কিন্তু তাহাকে চোখে দেখা যায় না।

কোন কোন জিনিস আছে, তাহারা নানারকম তেজ শুষিয়া সেই তেজে আবার আপনি আলো দিতে থাকে। একরকম পাথর দেখা যায়, তাহারা দিনের আলোক জমাইয়া রাখে আর অন্ধকারে জ্বল্‌জ্বল্ করে। রাত্রে সময় দেখিবার জন্য আজকাল একরকম ঘড়ি কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার কাঁটা ও সময়ের অঙ্কগুলা আপনার আলোয় টিম্‌টিম্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আজকাল যুদ্ধেও এইরূপ মশলা-মাখান একপ্রকার রঙের ব্যবহার হয়; যেখানে শত্রুর ভয়ে ভালরকম আলো জ্বালিবার উপায় নাই সেখানে এই জ্বলন্ত রঙের চিহ্ন আঁকিয়া নানারকম সংকেত জানান হয়, অন্ধকারে পথ দেখাইয়া চলাফেরার সুবিধা করা হয়।

ফাঁকা বোতলের ঐ অদৃশ্য তেজ ধরিবার জন্যও নানারকম মশলা পাওয়া যায়।

একটা পর্দার উপর সেই মশলা মাখাইয়া তাহাকে ঐ বিদ্যুৎ-পোরা বোতলের কাছে আনিলেই পর্দাটা আলো হইয়া ওঠে। বোতলটাকে কালো কাগজে মুড়িয়া ফেল, তবুও পর্দা জ্বলিতে থাকিবে। বোতলের উপর কাঠের বাক্স চাপা দেও—কাঠ ভেদ করিয়া সে অদৃশ্য আলো মশলার পর্দাকে জ্বালাইয়া তুলিবে। কিন্তু বিদ্যুৎ চালান একটিবার বন্ধ করিয়া বোতলের তেজ নিভাইয়া দাও, সেই সঙ্গে পর্দার আলোও নিভিয়া যাইবে। পর্দার সামনে যদি একখানা লোহার টুকরা ধর, তাহা হইলেও যেখানে লোহার আড়াল পড়িয়াছে সেইখানে পর্দা জ্বলিবে না—কারণ বোতলের আলো লোহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। একটা পয়সা আনিয়া পর্দার সামনে ধর, তাহারও পরিষ্কার গোল ছায়া পড়িবে। এইরকম পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পর্দার উপর হাড়ের ছায়া পড়ে কিন্তু মাংস বা চামড়ার কোন ছায়া পড়ে না।

এইজন্য পর্দার সামনে তোমার জামাশুদ্ধ হাতখানা ধরিলে তোমার জামাও দেখিবে না আর নধরপুষ্ট মাংস-ভরাট আঙুলও দেখিবে না—দেখিবে কতগুলো হাড়ের ছায়া।

একটি কাঠবিড়ালের ছবি তোল। ছবিতে হাড়গোড় সবই উঠিবে—অথচ অমন জমকালো ল্যাজটির চিহ্নমাত্র থাকিবে না। জ্যান্ত জীবের এরকম কঙ্কালছায়া সর্বপ্রথম দেখেন রঞ্জেন বা রণ্ট্‌গেন সাহেব (Rontgen), তিনিই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ২২ বৎসর আগে ঐরূপ জ্বলন্ত পর্দার সাহায্যে এই আলো আবিষ্কার করেন। প্রথম যখন তিনি পর্দার সামনে হাতের আড়াল দিয়া দেখেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে কতগুলা হাড়ের ছায়া দেখিবেন। তাই হঠাৎ আপনার 'হাড্ডিসার' ছায়া দেখিয়া তিনি ভারি আশ্চর্যবোধ করিয়াছিলেন।

তামাসা হিসাবেও এটা একটা দেখিবার মতো ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাঠের বাক্সের মধ্যে চামড়ার ব্যাগ, কাগজ কলম, হাড়ের বোতাম, ছুঁচসুতা, চাবি ভরিয়া একবার পর্দার আলোর সামনে ধর—কাঠের বাক্স ছায়াতে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখাইবে আর তাহার ভিতরকার ছুঁচ চাবি আর কলমের মুখটা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িবে। বোতামের দিকে ছায়া দেখা যাইবে কিন্তু কাগজ সুতা বা চামড়ার ব্যাগ খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইবে—অথচ ব্যাগের ভিতর যদি টাকা পয়সা থাকে তাহারও পরিষ্কার ছায়া পড়িবে।

কিন্তু পণ্ডিতেরা কেবল তামাসা দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁহারা ইহার নিয়ম-কানুন বাহির করিয়া ব্যাপারটাকে অনেকরকম কাজে লাগাইয়াছেন। ডাক্তারেরা এই আলোকের সাহায্যে রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছেন, নানারকম কৌশল করিয়া জ্যান্ত মানুষের বুকের ধুক্‌ধুকানি আর পাকস্থলীর হজমক্রিয়া দেখিতেছেন, শরীরের ভিতরে কোথায় হাড় ভাঙিল, কোথায় গুলি লাগিল, কোথায় উৎকট রোগের সঞ্চার হইল, সব চোখে দেখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। আজকালকার যুদ্ধে কত হাজার হাজার আহত সৈন্যকে এই আলোকে পরীক্ষা করিয়া আঘাতের রকমটা স্পষ্ট বুঝিয়া তাহার চিকিৎসা করা হইতেছে। ব্যবসা বাণিজ্যে নানা জিনিসের ভেজাল ধরিবার জন্য ও নানারকম খুঁৎ পরীক্ষার জন্যও এই আলোর ব্যবহার হয়। প্রথম যাঁহারা এই সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এ আলো কি সাংঘাতিক জিনিস! অদৃশ্য আলোয় ক্রমাগত কাজ করিতে করিতে অনেকের চোখ অন্ধ হইয়াছে, হাতে সাংঘাতিক ঘা হইয়া হাতটি নষ্ট হইয়াছে, এমনকি কেহ কেহ প্রাণ পর্যন্ত দিয়াছেন। এমন সর্বনেশে আলো!

তোমাদের কাহারও মনে কি এমন অহংকার আছে যে তোমার চেহারাটি খুব সুন্দর? যদি থাকে, তবে একটিবার এই আলোতে ঐ মুখখানির ফটো তুলাইয়া দেখ। তাহা হইলে বোধহয় আর রূপের দেমাক থাকিবে না।

পিরামিড

ইংরাজিতে Seven Wonders of the World বা পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য কীর্তির কথা শুনিতে পাই। ইজিপ্টের পিরামিড তার মধ্যে একটি। 'একটি' বলিলাম বটে কিন্তু আসলে পিরামিড একটি নয়, অনেকগুলি। ইজিপ্টের নানা জায়গায় ঘুরিলে হয়ত একশ গণ্ডা পিরামিড খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মধ্যে অধিকাংশই ভাঙা ইঁট পাথরের স্তূপমাত্র। বাস্তবিক দেখিবার মতো নামজাদা পিরামিড খুব অল্পই আছে, তাহাদের মধ্যে কাইরো নগরের কাছে যে তিনটি পিরামিড সেইগুলিই সকলের চাইতে আশ্চর্য।

আশ্চর্য বলি কিসে? প্রথম আশ্চর্য তার বিপুল আয়তন। সব চাইতে বড় যে পিরামিড, যাহাকে চেয়প্‌স্‌ বা খুফুর পিরামিড বলে সেটি প্রায় সাড়ে তিনশ হাত উঁচু! একটা সাধারণ তিনতলা বাড়ির দশ গুণ। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় একটা ইঁটের পাঁজা—তাহার গায়ে কোন কারুকার্য নাই, গঠনের কোন বিশেষত্ব নাই। দেখিয়া বিশেষ কোন সম্ভ্রমের উদয় হয় না। কিন্তু একটিবার কাছে গিয়া তাহার নিচে দাঁড়াইয়া দেখ. কি বিরাট কাণ্ড। এক-একটি ইঁট এক-একটি প্রকাণ্ড পাথর—তার মধ্যে নিতান্ত ছোট যেটি, তাহার ওজন ৫০ মণের কম হইবে না। আর খুব বড় বড়গুলা এক-একটি হাজার দেড় হাজার মণ।

কত পাথর! চারিদিকে চাহিয়া দেখ কেবল পাথরের উপর পাথর। না জানি কত বৎসর ধরিয়া কত সহস্র লোকের প্রাণপণ পরিশ্রমে এত পাথর একত্র করিয়া এমন স্তূপ গড়িয়াছে। ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। প্রায় একশত বিঘা জমির উপরে এই প্রকাণ্ড জিনিসটাকে দাঁড় করান হইয়াছে। এই কলিকাতা সহরের সমস্ত ঘরবাড়ি ভাঙিয়া যদি পিরামিড গড়িতে যাও দেখিবে তাহাতেও মালমসলায় কুলাইবে না—সমস্ত সহর স্তূপাকার করিয়াও অত বড় পিরামিড গড়িতে পারিবে না। অথচ এমন অসম্ভব কাজও মানুষ করিয়াছে। নীল নদীর ওপার হইতে পাহাড় কাটিয়া মানুষ পাথর আনিয়াছে, সেই পাথর নৌকায় তুলিয়া নদী পার করিয়াছে, তারপর দুই মাইল পথ সেই পাথর টানিয়া লইয়াছে, আর ধাপে ধাপে সেই পাথর সাজাইয়া প্রকাণ্ড পিরামিড গড়িয়াছে।

সে কি আজকার কথা! প্রায় ছয় হাজার বৎসর হইল, রাজা চেয়প্‌স্‌ ভাবিয়াছিলেন নিজের গোরস্থান বানাইয়া পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, সেই কল্পনাই ৩০ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিরামিডের মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইল।

এই ছয় হাজার বৎসরে পিরামিডের চেহারা অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। আগে তাহার উপরে সাদা পাথরের পালিশ করা ঢাকনি ছিল, এখন কেবল দু-এক জায়গায় তাহার একটু-আধটু চিহ্নমাত্র বাকি আছে। একটা পিরামিডের চূড়ায় এখনও সেকালের

সেই সাদা ঢাকনিটি লাগিয়া আছে, তাহাতে দেখা যায় যে ছয় হাজার বৎসর আগে পিরামিডের চেহারা কেমন মোলায়েম ছিল। এখন আর তাহার সে চেহারা নাই, চারিদিকে পাথরের ধাপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে—চেষ্টা করিলে তাহার সাহায্যে পিরামিডের গা বাহিয়া চূড়ায় উঠা যায়। এমন দুরবস্থা না হইবে বা কেন? অন্তত দু-তিন হাজার বৎসর ধরিয়া লোকে এই পিরামিডের পাথর বসাইয়া সেই পাথরে নিজেদের ঘরবাড়ি মসজিদ বানাইয়াছে। পিরামিডের কাছাকাছি যত কোঠা দালান তাহার মধ্যে কতগুলা যে এইরূপ চোরাই মালে তৈরি তাহার আর সংখ্যা নাই।

ছয় হাজার বৎসর আগেকার মানুষ, তাহারা কেমন করিয়া এত বড় বড় পাথর সাজাইয়া এমন পিরামিড গড়িল একালের মানুষ ভাবিয়া তাহার কিনারা পায় না। তবে সেকালের গ্রীক লেখক হেরোডোটস এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পিরামিড বিষয়ে মোটামুটি অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

তাহাতে দেখা যায় যে নদীর ওপার হইতে পিরামিডের ভিত্তি পর্যন্ত পাথর বহিবার জন্য প্রায় ২০০০ হাজার হাত লম্বা, ৪০ হাত চওড়া এক রাস্তা বানাইতে হইয়াছিল। রাস্তাটা আগাগোড়া পালিশ-করা পাথরের তৈরি, তার একদিক প্রায় ৩২ হাত উঁচু, আর-একদিকে ক্রমে ঢালু হইয়া নদী পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। এক লক্ষ লোক ক্রমাগত দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া এই রাস্তা বানাইয়াছিল। যতক্ষণ রাস্তা বানান হইতেছিল, ততক্ষণ আর-একদল লোকে পাহাড়ে জমি ভাঙিয়া পিরামিডের ভিত্তি সমান করিতেছিল। সেই ভিত্তির উপর আশ্চর্য কৌশলে ঘর বসাইয়া তাহারই চারিদিকে রাজার সমাধি-মন্দির তৈরি হইয়াছে।

হেরোডোটস বলেন, পিরামিড শেষ করিতে আরও ২০ বৎসর লাগিয়াছিল। কত অসংখ্য ক্রীতদাস কত হাজার হাজার প্রজা মিলিয়া এই কাজে লাগিয়াছিল তাহার আর হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে সে অতি চমৎকার। এক সময়ে পিরামিডের গায়ে আয়-ব্যয়ের একটা ফর্দ লেখা ছিল—তাহারই একটুখানি হেরোডোটসের সময় পর্যন্ত টিঁকিয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় যে মজুরদের জন্য পেঁয়াজ রসুন আর মুলা এই তিন জিনিসেরই খরচ লাগিয়াছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। এখন ভাবিয়া দেখ সমস্ত পিরামিডটাতে না জানি কত কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। শোনা যায় রাজা ইহার জন্য তাঁহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ধনরত্ন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই তাঁহার সঙ্গে কবরের মধ্যে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার কিছুই বাকি নাই, আছে কেবল শূন্য কবরের কতগুলা ভাঙা পাথর মাত্র। ভিতরে মূল্যবান যাহা কিছু ছিল মানুষে লুঠ করিয়া তাহার আর কিছু রাখে নাই। পিরামিডের ভিতরটা কিরকম, অনেকদিন পর্যন্ত তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না, এমনকি উহা বাস্তবিকই সমাধিস্তম্ভ কিনা, সে-বিষয়ে নানারকম তর্ক শোনা যাইত। কিন্তু এখন মানুষে আবর্জনা সরাইয়া তাহার ভিতরে ঢুকিবার সুড়ঙ্গ পথ বাহির করিয়াছে। ভিতরের ব্যবস্থাও অতি আশ্চর্য।

পিরামিডের গোড়ার কাছেই একটা নীচমুখী সুড়ঙ্গ—সেটা খানিক দূরে গিয়া দুমুখো হইয়া গিয়াছে। একটা মুখ মাটির নীচে একটা খালি ঘর পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে—আর-এক মুখ উপরের দিকে উঠিয়াছে। সেদিকে রানীর কবরঘর—তার উপর প্রকাণ্ড সিঁড়ি, তার পরে রাজার সমাধি। সমাধির উপরে আবার পাঁচতলা ঘর। তাছাড়া আরও ছোটখাট ঘর আছে, ঘরের মধ্যে বাতাস আনিবার জন্য বড় বড় লম্বা

লম্বা নলের মতো সুড়ঙ্গ আছে—আর আছে কতগুলা বড় বড় পাথর যাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

কেবল প্রকাণ্ড জিনিস বলিয়াই যে পিরামিডের সম্মান করি তাহা নয়—যাহারা পিরামিড গড়িয়াছে, ওস্তাদ কারিকর হিসাবেও তাহারা নমস্কারযোগ্য। বড় বড় পাথরকে অদ্ভুত কৌশলে তাহারা এমন নিখুঁতভাবে জোড়া দিয়াছে যে, আজও সেই জোড়ের মুখে একটি ছুঁচ ঢুকাইবার মতোও ফাঁক হয় নাই। যে চতুষ্কোণ জমির উপরে পিরামিড বানান হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি কোণ সূক্ষ্ম হিসাবে মাপিয়া সমান করা হইয়াছে, চতুষ্কোণের চারটি দিক এমন নিখুঁতভাবে সমান, যে নিপুণ জরীপের হিসাবে তাহাতে দু আঙুল পরিমাণও তফাৎ পাওয়া যায় না। ঘড়ির কলের মতো এমন সূক্ষ্ম হিসাব ধরিয়া যে জিনিস খাড়া করা হইল, তাহার ওজন ১৯০,০০০,০০০. উনিশ কোটি মণ! এই ভারতবর্ষের অর্ধেক লোককে যদি দাঁড়িপাল্লায় চাপাও তবে এইরকম একটা ওজন পাইতে পার।

যাহারা পিরামিড বানাইল, তাহারা কিরকম লোক ছিল? তাহাদের চালচলন পোশাক পরিচ্ছদ বাড়িঘর আচার-ব্যবহার এসবই বা কিরকম ছিল? জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? যাঁহারা পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, কেবল প্রাচীনকালের খবর খুঁজিয়া ফেরেন, তাঁহারা ইজিপ্টের মাটি খুঁড়িয়া তাহার ভিতর হইতে সেই কোন্‌কালের ইতিহাসকে টানিয়া বাহির করিয়াছেন। কত ঘরবাড়ি, কত আসবাবপত্র, কত অদ্ভুত ছবি, কত মোমে আঁটা মৃতদেহ, তাহার আর অন্ত নাই। ইজিপ্টে মৃতদেহ রক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, সে অতি আশ্চর্য। মৃতদেহকে পরিস্কার করিয়া নানারকম মশলা মাখাইয়া মোমজামার ফিতা দিয়া এমন করিয়া মোড়া হইত যে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সে দেহ আর পচিতে পারিত না। ফিতার উপর ফিতা, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ! এক-একটি রাজার মৃতদেহ মুড়িতে পাঁচ দশ মাইল ফিতা অনায়াসেই খরচ হইয়া যাইত। তাহার মধ্যে দেহগুলি কাঠ হইয়া শুকাইয়া থাকিত, কিন্তু পচিত না। এইরূপে অতি প্রাচীনকালের ইতিহাসে যে-সকল রাজার নাম শোনা যায় তাহাদেরও অনেকের আস্ত দেহ পাওয়া গিয়াছে।

ইজিপ্টের আর-একটি জিনিস তাহার 'ছবির ভাষা'। তাহাদের মনের কথাগুলি ভাষার অক্ষরে না লিখিয়া তাহারা ছবি আঁকিয়া বুঝাইয়া দিত। ইহাতে কত সুবিধা হইয়াছে বুঝিতেই পার। 'রাজা যুদ্ধ করিতে গেলেন' ইহা ভাষায় না বলিয়া যদি জলজ্যান্ত ছবি আঁকিয়া দেখাই তবে এ কথাটুকু ত বলা হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে রাজা কিরকম পোশাক পরিতেন, কিরকম রথে চড়িতেন, কিরকম অস্ত্র লইতেন, তাহাও বোঝাইয়া দেওয়া যায়। বাস্তবিকই এই সমস্ত ছবি আর ঘর বাড়ির চিত্র দেখিয়া সেকালের ইজিপ্টকে কল্পনার চোখে বেশ পরিস্কার করিয়া দেখা সম্ভব হয়।

দক্ষিণ দেশ

কলম্বসের আগে লোকে আমেরিকার কথা জানিত না—সে সময়ে লোকে তিনটিমাত্র মহাদেশের কথা জানিত। আমেরিকা আবিষ্কারের পর প্রায় একশত বৎসর পর্যন্ত

আর কোন নূতন মহাদেশের কথা শুনা যায় নাই। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে এক পর্টুগীজ নাবিক আসিয়া বলে যে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অঞ্চলে সে এক প্রকাণ্ড নূতন দেশ দেখিয়াছে। তার পাঁচ বৎসর পরে স্পেন দেশের এক জাহাজের কাপ্তান বলে সেও নাকি ঐ দেশের কাছ দিয়া আসিয়াছে। তারপর বহুদিন পর্যন্ত ওলন্দাজ নাবিকদের মুখে ঐ দেশের কথা মাঝে মাঝে শুনা যাইত। কেহ কেহ সেই নূতন দেশে যাইবার চেষ্টায় জাহাজডুবি হইয়া মারা যায়। দু-একজন দেশে ফিরিয়া বলে "দেশটা একেবারে ফাঁকা—দেখিবার কিছু নাই।"

১৬৪২ খৃষ্টাব্দে টাসমান নামে এক সাহসী ওলন্দাজ নাবিক এই নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে একটা দ্বীপে গিয়া জাহাজ ভিড়াইলেন, তাঁহারই নামে সেই দ্বীপের নাম হইয়াছে টাসমানিয়া। দ্বীপটাকে তিনি দ্বীপ বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই—তিনি ভাবিলেন, এই সেই প্রকাণ্ড নূতন দেশ। দুঃখের বিষয় দ্বীপটা তাঁহার ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। একদল নাবিক লইয়া তীরে নামিতেই তাঁহারা দেখিলেন একটা গাছের গায়ে কতগুলা খাঁজ কাটা রহিয়াছে। অস্ত্রের দাগ দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন এখানে মানুষ আছে। তিন হাত সাড়ে তিন হাত অন্তর এক-একটি খাঁজ দেখিয়া নাবিকেরা ভাবিল ঐ খাঁজে খাঁজে পা দিয়া যাহারা গাছে চড়ে তাহাদের পা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক লম্বা, সুতরাং তাহারা নিশ্চয়ই রাক্ষস। রাক্ষসের ভয়ে তাহাদের আর নূতন দেশ দেখা হইল না। টাসমানের পর যাহারা নূতন দেশ দেখিতে আসে তাহারা সকলেই হল্যাণ্ড দেশের লোক—তাহারা সে দেশের নাম দিল 'নূতন হল্যাণ্ড'। ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরে ড্যাম্পিয়ার নামক এক ইংরাজ অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে জাহাজ লাগাইলেন। সে এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। তীরে নামিতেই তাজা ফুলের গন্ধে তাঁহাদের মনটা খুশি হইয়া উঠিল। সবুজ গাছগুলি ফুলে ফুলে রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে রং-বেরঙের নানান পাখি উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে। তাহারা ডাঙায় নামিয়া চারিদিক ঘুরিয়া কত অদ্ভুত দৃশ্য আর তাহার চাইতেও কত অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাইলেন। একটা জন্তু, তার ইঁদুরের মতো মুখ, প্রায় মানুষের মতো বড়—সে দুই পায়ে ভর দিয়া বিশ হাত লম্বা লাফ দেয়। তোমরা জান সে জন্তুর নাম কাঙারু, কিন্তু সে-সময়ে অমন জন্তু কেহ দেখে নাই। সে দেশের মানুষদের তিনি দেখিলেন—রোগা লম্বা, সরু সরু হাত পা আর কুচ্‌কুচে কালো। তাহারা কাপড় পরিতে জানে না; গাছের ছাল পরিয়া থাকে।

ড্যাম্পিয়ারের পর আরও প্রায় আশি বৎসর কেহ সে দেশের বড় একটা খবর লয় নাই। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আবার আর একজন ইংরাজ নাবিক তাহার সন্ধান করিতে বাহির হইলেন। ইঁহার নাম কাপ্তান কুক। কাপ্তান কুকের মতো অমন সাহসী নাবিক সেকালে খুব কমই ছিল। তিনি জাহাজে করিয়া কত যে নূতন দেশের সন্ধানে ঘুরিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিতে গেলেও প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া যায়। কাপ্তান কুক প্রথম যেখানে গেলেন সেটা অষ্ট্রেলিয়া নয়, সেটাকে এখন নিউজিল্যাণ্ড বলা হয়। নিউজিল্যাণ্ডের চারিদিক ঘুরিয়া তিনি দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ—আসল মহাদেশটা আরও পশ্চিমে। তারপর নিউজিল্যাণ্ড ছাড়িয়া উনিশ দিন পরে তিনি 'নূতন হল্যাণ্ডে' উপস্থিত হইলেন। অনেক ঘুরিয়া একটা সুবিধামত জায়গায় জাহাজ ঠেকাইতেই চারিদিক হইতে কতগুলা কাদামাখা অদ্ভুত লোক আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তারপর নাবিকেরা যখন জাহাজ হইতে ডাঙায় নামিবার চেষ্টা করিল তখন তাহারা বল্লম ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। জাহাজ হইতে কতগুলা ফাঁকা আওয়াজ করিতে

তাহারা একটু ভয় পাইল, কিন্তু তাহাতে কেহ মরিল না দেখিয়া আবার তাহাদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তখন একটা লোকের পায়ে ছর্‌রা মারিতেই তাহারা ভয় পাইয়া পলাইল।

জাহাজ মেরামতের জন্য কাপ্তান কুককে কিছুদিন সেখানে থাকিতে হইল। এই সময়ের মধ্যে নাবিকেরা সে দেশী লোকদের সঙ্গে বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিল। জাহাজ মেরামত হইলে কাপ্তান কুক তীর ধরিয়া ধরিয়া উত্তর দিক পর্যন্ত ঘুরিয়া দেখিলেন। নূতন দেশের সমস্ত পূর্ব দিকটাতে ইংরাজের অধিকার ঘোষণা করিয়া তিনি তাহার নাম রাখিলেন 'নিউ সাউথ ওয়েলস'। তারপর কথা হইল এই নূতন দেশটা লইয়া কি করা যায়। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট বলিলেন, "যে সকল কয়েদী অপরাধীদের দ্বীপান্তরে তাড়ান আবশ্যক, তাহাদের ঐখানে চালান করিয়া দাও।" তখন এগারটি জাহাজ বোঝাই করিয়া কয়েদী পাঠান হইল। তাহাদের পাহারার জন্য সৈন্য গেল; শাসন ব্যবস্থার জন্য সরকারী কর্মচারী গেল, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া দলে দলে ডাক্তার নাবিক মজুর গেল। কাপ্তান ফিলিপ হইলেন এই দলের গভর্নর বা শাসনকর্তা। তাঁহারা সুবিধামত জায়গা খুঁজিয়া সেইখানে কাঠের ঘর বাড়ি বসাইয়া বেশ ছোটখাট একটি সহর পত্তন করিলেন।

কাপ্তান ফিলিপ সে দেশী লোকদের মনে সদ্ভাব জাগাইবার জন্য নানারকম চেষ্টা করিয়াও তাহাদের ভয় ও সন্দেহ দূর করিতে পারেন নাই। ভাল ভাল বকশিস দিয়া নানারকম লোভ দেখাইয়া তিনি ২/১ জনকে অনেকটা বশ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বেন্নিলনি নামে একজন ছোকরাকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া কয়েকদিন খুব আমোদে রাখিয়াছিলেন। বেন্নিলনি যখন তাহার লোকদের কাছে ফিরিয়া গেল তখন তিনি অনেকরকম উপহার লইয়া একদিন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। দুঃখের বিষয় একজন সে দেশী লোকের সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করিতে যাওয়ায় সে হঠাৎ কেমন ভুল বুঝিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া কাঁধের কাছে বল্লম বিঁধাইয়া দেয়। বেন্নিলনির যত্নে ও সাহায্যে সেবার তিনি বাঁচিয়া গেলেন। ইহার পর হইতে বেন্নিলনি তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে সে দেশী লোকদের সঙ্গে অনেকটা বনিবনাও হইয়া গেল।

এমনি করিয়া নূতন দেশে ইংরাজের উপনিবেশ আরম্ভ হইল। কথা ছিল মাঝে মাঝে বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া রসদ আসিবে, তাহাতে তাহাদের খাবার কষ্ট ঘুচিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিয়া পৌঁছিতে অসম্ভব রকম বিলম্ব হইয়া গেল। সহরের চালময়দা শাক সবজী গরু ছাগল সব ফুরাইয়া আসিল। গভর্নর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক লোকেই দিনে তিন ছটাক ময়দার রুটি, দুই ছটাক মাংস আর এক ছটাক চালের ভাত খাইয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনরকমে দিন কাটাইতে লাগিল।

তাহাতেও যখন খাদ্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন তিন জাহাজ বোঝাই করিয়া রসদ আসিয়া হাজির হইল। এইরকম কষ্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় ইংরাজ রাজ্যের পত্তন হইল। তাহার পর আরও কত লোক সেদেশে আসিতে আরম্ভ করিল; কেহ চাষবাসের জন্য, কেহ খনি খুঁড়িবার জন্য। কেহ দেশ আবিস্কারের জন্য, কেহ কেবলমাত্র চাকুরী খুঁজিবার জন্য। একটা সহর ছিল দেখিতে দেখিতে দুই চার দশটা সহর জাগিয়া উঠিল। ততদিনে তাহার 'নিউ হল্যাণ্ড' নাম ঘুচিয়া নূতন নাম হইয়াছে, অস্ট্রেলিয়া বা 'দক্ষিণ দেশ'।

অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে অনেকটাই সে সময়ে অজানা দেশ ছিল। বড় বড় মরুভূমি, সেখানে কি আছে তাহা অনেকদিন পর্যন্ত কেহ জানিত না। ওই সকল অজানা দেশে যাইবার জন্য অনেক লোকে চেষ্টা করিত লাগিল। এই সকল ভ্রমণবীরের বীরত্ব-কাহিনী শুনিলে অবাক হইতে হয়। ফিণ্ডার্স আর বাস্ নামক দুই ইংরাজ ছোকরা নানা জায়গায় ঘুরিয়া অনেক নূতন স্থানের সংবাদ আনিয়াছিল। একটা সামান্যরকমের নৌকায় চড়িয়া তাহারা নদীতে ও সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ফিরিত। ফিণ্ডার্স বড় আমুদে লোক ছিল, সে একবার কতগুলা সে দেশী লোকের হাতে পড়ে। তাহাদের ভাবগতিক মোটেই সুবিধামত ছিল না, তাই তাহাদের খুশী রাখিবার জন্য সে নানারকম কাণ্ড করিয়াছিল; এমনকি শেষটায় রসিকতা করিয়া তাহাদের কয়েকজনের দাড়ি পর্যন্ত কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সেই লোকেরা নাকি ভারী খুশী হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

অস্ট্রেলিয়ার অজানা দেশে যাওয়া বড়ই বিপদের কথা। লোকের অত্যাচার আর মরুভূমি ত আছেই, তাহার উপর মাঝে মাঝে এমন চোরা মাটি যে তাহার উপর চলিতে গেলে পাঁকে ডুবিয়া মরিতে হয়। সে দেশের নদীগুলাও কেমন বেয়াড়া, তাহাদের মতিগতির যেন কিছুই স্থির নাই। লেফটেনাণ্ট অক্সলি এক জায়গায় প্রকাণ্ড নদী দেখিয়াছিলেন, সে নদীতে বান আসিয়া তাঁহাকে অনেকবার নাকাল করিয়াছিল। ছয় বৎসর পরে কাপ্তান স্টার্ট্ সেইখানে গিয়া দেখেন খট্খটে শুকনা ডাঙা, তাহার মাঝে মাঝে ছোটখাট বিলের মতো—নদীর চিহ্নমাত্র নাই!

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আয়ার নামে এক সাহেব অস্ট্রেলিয়ার মাঝখানে অজানা দেশটা দেখিবার জন্য বাহির হন। তিনি দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিতেছিলেন—দিনের পর দিন চলিয়া কেবল লাল বালি আর শুকনা হ্রদ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান নাই। তারপর তিনি পশ্চিমমুখে গিয়া সেদিকেও সামান্য কাঁটাঝোপ ছাড়া আর কোন গাছ পাইলেন না। জলের কষ্ট এত বেশি যে চল্লিশ দিনে তিনি দেড়শত মাইল পথও যাইতে পারেন নাই—বার বার জলের জন্য ফিরিতে হইত। অন্য কোনও লোক হইলে সেইখানে উৎসাহ নিভিয়া যাইত, কিন্তু আয়ার বলিলেন, সমুদ্র না পাওয়া পর্যন্ত এইভাবে চলিব, না হয় মরিব। লোকজন সকলে বিদায় লইল, সঙ্গে রহিল কেবল ব্যাকস্টার নামে সাহেব আর তিনটি দেশী লোক। চলিতে চলিতে মরুভূমিব ধুলায় তাঁহাদের চোখ অন্ধপ্রায় হইয়া আসিল, জলের কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তাঁহাদের ঘোড়াগুলি একে একে পড়িয়া মরিল, সঙ্গের ছাগল-ভেড়াগুলিও দুর্বল হইয়া মরিতে লাগিল, তার উপর কোথা হইতে একরকম মাছি আসিয়া দেখা দিল, তাহার কামড়ের যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকে। খাবার জিনিস যখন ফুরাইয়া আসিল, তখন সঙ্গের দুটি লোক ব্যাকস্টারকে মারিয়া খাবার চুরি করিয়া পলাইল। একজনমাত্র দেশী লোক সঙ্গে লইয়া আয়ার চলিতে লাগিলেন। একটি ঘোড়া তখনও বাঁচিয়াছিল, তাঁহারা সেইটিকে মারিয়া তাহার কাঁচা মাংস খাইলেন। সেই মাংসও যখন পচিয়া উঠিল তখন কেবল এক-এক মুঠা ময়দা জলে গুলিয়া তাহাতেই একদিনের আহার চালাইতে লাগিলেন। শেষটায় এমন দিন আসিল যখন ময়দাও ফুরাইয়া গেল। সেদিন খালি পেটে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা এক অজানা সমুদ্রের ধারে আসিয়া দেখেন কোথা হইতে এক জাহাজ আসিয়াছে। আর কতগুলি ফরাসী নাবিক নৌকায় করিয়া তীরে আসিয়া উঠিয়াছে। আয়ার অবাক, নাবিকেরাও অবাক! এমনি করিয়া মরিতে মরিতে আয়ার বাঁচিয়া গেলেন।

আয়ারের পর ডাক্তার লাইকহার্ড ঐ মরুভূমি পার হইতে গিয়া দলেবলে মারা পড়েন। কাপ্তান স্টার্ট আর একবার চেষ্টা করিতে গিয়া অন্ধ হইয়া যান। ম্যাকডুয়াল স্টুয়ার্ট দুইবার চেষ্টা করিয়া দুইবারই মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আসেন। আরও অনেকে আধ পথ সিকি পথ গিয়া আর যাইতে পারে নাই। তারপর বার্ক আর উইলস্ এক প্রকাণ্ড দল লইয়া বাহির হন। মরুভূমির মাঝখানে একটা হ্রদ পর্যন্ত গিয়া তাহার ধারে আড্ডা বসান হইল এবং বার্ক আর উইলস্ আর দুইজন ইংরাজকে সঙ্গে লইয়া আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তাহারা গিয়াছিলেন ভালই কিন্তু ফিরিবার সময় খাবার ফুরাইয়া গিয়া তাঁহাদের বিপদ ঘটিল। তাঁহারা যতদিনের হিসাব করিয়াছিলেন, পথে নানা গোলমাল হইয়া তাহার তিন চারগুণ সময় লাগিয়া গেল।

আড্ডায় ফিরিতে যখন আর চার দিন মাত্র বাকি তখন ঐ চারজনের মধ্যে একজন অবসন্ন হইয়া মারা গেল। বাকী তিনজন এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাকে কবর দিতে তাহাদের সমস্ত দিন লাগিল। এই দেরীতেই তাহাদের সর্বনাশ হইল। চারদিন পরে কোনওরকমে পথ পার হইয়া যখন আড্ডায় পৌঁছিল তখন দেখিল সেখানকার লোকজন তার কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিয়া সে আড্ডা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়! হায়! আর কয়েক ঘণ্টা আগে আসিলেই তাহাদের এ সর্বনাশ হইত না। তিনজনেই তখন অবসন্ন—আর চলিবার শক্তি নাই। তাহারা কোনওরকমে উঠিয়া বসিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিল—যদি দলের দেখা পায়। এরকম করিয়া আর কতদিন চলা যায়। খানিক পথ গিয়া উইলস্ এক গাছতলায় শুইয়া পড়িল। সেই তার শোয়া। একে নিজের কষ্ট, তার উপর বন্ধুর এই অবস্থা—বার্ক আর কিং পাগল হইয়া আহার খুঁজিতে বাহির হইল। কোনরকমে দুই মাইল গিয়া বার্কও পথের পাশে মরিয়া পড়িল। তারপর কিং একাই ঘুরিতে ঘুরিতে এক জায়গায় সে দেশী খাবারের সন্ধান পাইয়া বাঁচিয়া গেল। পরে যখন আড্ডার লোকেরা তাহাদের উদ্ধারের জন্য লোক পাঠাইল, তখন তাহারা দেখিল একটা নদীর ধারে ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা পাগলের মতো চেহারা, ধূলামাখা জটা চুল একটি লোক বসিয়া আছে--অনেক কষ্টে তাহারা চিনিতে পারিল, এই লোকটি কিং!

ভূমিকম্প

দুপুরবেলায় দিব্য আরামে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দুরদুর দুরদুর করিয়া ঘরবাড়ি কাঁপিয়া উঠিল, ঝাড়-লণ্ঠন পাখা সব দুলিতে লাগিল, তারপর খাট চৌকি সবশুদ্ধ খটাখট্ করিয়া এমন ঝাঁকানি লাগাইয়া দিল যে, আর নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা সম্ভব হইল না। ততক্ষণে চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়াছে, শাঁখ কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শুনা যাইতেছে আর সকলেই বলিতেছে 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প'। পরের দিন কাগজে ভূমিকম্পের নানারকম বর্ণনা বাহির হইল—কেমন করিয়া বড় বড় গির্জার চূড়াগুলি দুলিতে দুলিতে পড়ো-পড়ো হইয়াছিল, কেমন করিয়া হাইকোর্টের জজসাহেব হইতে উকিল ব্যারিস্টার পেয়াদা পর্যন্ত সবাই ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল, কেমন করিয়া দোকানের বাবুরা আর আপিসের বড় বড় সাহেবরা

দোকানপাট কাগজপত্র সব ফেলিয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল ইত্যাদি অনেক কথা। আর জানা গেল এই যে, কেবল যে কলিকাতাতেই ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা নয়, বাংলার নীচুজমি হইতে আসামের পাহাড় পর্যন্ত সব জায়গাতেই সেই এক কাঁপুনি!

শাস্ত্রে যে বলে পৃথিবীটা স্থির আর 'অচলা', পণ্ডিতেরা সে কথা অনেকদিনই মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবী যে শূন্যের মধ্যে প্রকাণ্ড চক্র আঁকিয়া সূর্যের চারিদিকে ছুটিয়া চলে এবং চলিতে চলিতে লাটিমের মতো ঘুরপাক খায়, এ সকল কথা আমরা সকলেই জানি। সে চলুক আর ঘুরুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কারণ সেটা আমরা টের পাই না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আবার গা-ঝাড়া দেয় কেন? পাহাড় পর্বত কাঁপাইয়া, জমি জাঙ্গাল ফাটাইয়া, বাড়ি ঘর দুয়ার উল্টাইয়া এ আবার কেমন উপদ্রব? সেদিন যে ভূমিকম্প হইল, সে ত নেহাৎ সামান্যরকমের। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এ দেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে অনিষ্ট করিয়াছিল আরও অনেক বেশি। সেবারে পূর্ববাংলায় আর আসামে অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল এবং কলিকাতা শহরেও বড় বড় কোঠা দালান ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আর রেলপুল টেলিগ্রাফের থাম কত যে নষ্ট হইয়াছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

'ভূমিকম্প' মানে মাটির কাঁপুনি। এ কাঁপুনি ত বলিতে গেলে রোজই কতবার করিয়া হইতেছে। রাস্তা দিয়া দমকল ছুটিয়া গেল, ঘোড়সোয়ার পল্টন গেল, মাটি গুম্ গুম্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এমনকি একজন মোটা লোক যদি সিঁড়ি দিয়া খুব উৎসাহ করিয়া নামিতে যায়, তাহাতেও বাড়ির ভিতরে ছোটখাটরকমের 'ভূমিকম্প' হয়। যদি বেশ সূক্ষ্মরকম যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে পাশের ঘরে বিড়াল হাঁটিয়া গেলে এই ঘরে তাহার চলা-ফিরার সাড়া পাইবে। কিন্তু ভূমিকম্প বলিতে আমরা এরকম কাঁপুনি বুঝি না। মাটির ভিতর হইতে যে ধাক্কা আসে, মাটির তলে তলে যাহা বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই নাম ভূমিকম্প। কোথায় খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে মাটির নীচে কোন্ গভীর তলে একটু নাড়াচাড়া পড়িয়াছে আর সমস্ত বাংলা দেশটা ভূমিকম্পের ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সিমলা পাহাড়ে আর লঙ্কা দ্বীপে পর্যন্ত কম্পনলিপি যন্ত্রে (Seismograph) তার স্পষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক, যাঁহারা এইসকল সূক্ষ্ম যন্ত্রের হিসাব লইয়া কারবার করেন, তাঁহার বলেন প্রায় প্রতিদিনই পৃথিবীর নানাস্থানে ছোট বড় নানারকমের ভূমিকম্প চলিতেছে। কয়েক বছর আগে যখন আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো নগরে বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল তখন এখানকার যন্ত্রে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। কম্পনলিপি যন্ত্রের কাঠি একটা কাগজের উপর সাদা আঁচড় কাটিয়া চলে। যতক্ষণ ভূমিকম্পের গোলমাল না থাকে ততক্ষণ সে বারবার সোজারকমের রেখা টানিয়া যায়, কিন্তু মাটির তলায় কোথাও যদি ভূমিকম্পের ছোঁয়া লাগে, অমনি কলের কাঠি বিগড়াইয়া হিজিবিজি আঁচড় কাটিতে আরম্ভ করে।

বাহির হইতে এই মাটির দিকে চাহিয়া দেখ, মনে হয় তাহার মতো অটল স্থির আর কিছুই নাই। চারিদিকে সমুদ্রের অশান্ত ঢেউ খ্যাপার মতো লাফালাফি করিতেছে, মাথার উপরে চঞ্চল বাতাস দিনরাত ছুটিয়া মরিতেছে, কিন্তু পৃথিবী—সে ধীর গম্ভীর নিশ্চল। বড় বড় গাছপালা হইতে সামান্য ঘাসটা পর্যন্ত তাহার গায়ে শিকড় বসাইয়া তাহার বুক ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে—পৃথিবী তাহাতে আপত্তিও করে না, বাধাও দেয় না। কিন্তু, কেবল বাহিরের মূর্তি না দেখিয়া যদি একবার গভীর মাটির নীচে ঢুকিতে পার তবে বুঝিবে তার ভিতরটায় কেমন তোলপাড় চলিতেছে। সেখানে

গেলে মনে হইবে পৃথিবীর বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে; যতই তার ভিতরে ঢুকি ততই গরম। সেই গরমে পাথর পর্যন্ত গলিয়া যায়, তুমি আমি ত এক মুহূর্তেই ঝামা হইয়া পুড়িয়া যাইব।

পৃথিবীর এই মাটির খোলসটি আগাগোড়া সমান নয়। কত লক্ষ লক্ষ যুগ নানারকম পাথর স্তরের পর স্তর সাজাইয়া তবে এই খোলস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত কঠিন স্তর আগুনে গরম হইয়া, চাপে কঠিন হইয়া, দিনরাত ঠেলাঠেলি করিতেছে। কোথাও পাথর গলিয়াছে, জল ফুটিয়া বাষ্প হইয়াছে, তাহারা বাহির হইবার পথ চায়; কোথাও মাটির নীচে বড় বড় ফাটল রহিয়াছে, পাশের মাটি উপরের চাপে তাহার মধ্যে ধসিয়া পড়ে; কোথাও নীচেকার গরমের ঠেলায় উপরের মাটি ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে। দিন রাত যুগের পর যুগ এইরকম চাপাচাপি ঠেলাঠেলি চলিয়াছে। গরমে বাষ্প আর গলিত পাথর যদি বাহির হইবার সহজ পথ না পায় তবে তাহারা অনায়াসেই একটা ভূমিকম্প বাধাইয়া তুলিতে পারে। আগ্নেয়গিরির উৎপাতের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এইসব পাহাড়ের উৎপাত সকলের চাইতে সাংঘাতিক হয় সেই সময়ে যখন পাথর জমিয়া তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাদের ভিতরের আগুন আর বাহির হইবার পথ পায় না, কেবল তাহার চাপ জমিয়া জমিয়া ভিতরে ভিতরে গুমরাইতে থাকে। ভিসুভিয়াসের অত্যাচারে পম্পিয়াই শহর ধ্বংস হইবার আগে এইরকম একটা কাণ্ড হইয়াছিল। সে সময়ে পাহাড় দেখিতে বেশ শান্ত ছিল, কিন্তু ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধরিয়া গুম্ গুম্ শব্দ শুনা যাইত, মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় মাটি কাঁপিয়া উঠিত, আর ঘন ঘন ভূমিকম্প হইত। কিন্তু সে সময়ে মানুষ বুঝিতে পারে নাই যে এই সমস্তই পাহাড় ফাটাইবার আয়োজন। এইরূপে ভিতরের চাপ জমিয়া জমিয়া এমন ভয়ংকর হইয়া উঠে যে পাহাড় আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না—জ্বলন্ত পাথর পাহাড় ভেদ কবিয়া ফোয়ারার মতো ছুটিয়া বাহির হয়। এইরকম ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে কতবার ঘটিয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই।

এক একটা আগুনের পাহাড়কে অনেকদিন চুপচাপ থাকিতে দেখিয়া কত সময়ে লোকে মনে করে তাহার ভিতরকার আগুন মরিয়াছে—কিন্তু আবার যখন সে কুম্ভকর্ণের মতো ভয়ংকর মূর্তিতে জাগিয়া উঠে তখন মানুষের আতঙ্কের আর সীমা থাকে না। এইরকম যত উৎপাতের কথা শুনা গিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রাকাতোয়ার অগ্নিকাণ্ডই সকলের চাইতে ভয়ানক। সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মাঝামাঝি একটা দ্বীপ আছে তাহারই নাম ক্রাকাতোয়া। সেই দ্বীপের মধ্যখানে প্রকাণ্ড পাহাড় ছিল—এককালে তাহার মাথায় আগুন দেখা যাইত। দুই শত বৎসর ধরিয়া সেই পাহাড় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এই সুযোগে তাহার চারিদিকে গাছপালা গজাইয়া রীতিমত বনজঙ্গল দেখা গিয়াছিল। এমন সময়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। সে কম্প এক একটি বড় সামান্য নয়, কারণ সমুদ্র পার হইয়া অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাহার ধাক্কা পৌঁছাইত। তিন বৎসর ভূমিকম্পের পর সহস্র কামান গর্জনের মতো ভীষণ শব্দে পাহাড় ভেদ করিয়া আগুন আর গরম বাষ্পের প্রকাণ্ড স্তম্ভ বাহির হইল। সেই স্তম্ভ সাত মাইল উঁচু হইয়া চারিদিকে গরম ধূলা ছাই আর পাথর ছিটাইতে লাগিল। এইরূপ তিন মাস পাথর বৃষ্টি করিয়াও পাহাড়ের তেজ কমিল না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট সন্ধ্যার পর সমুদ্র হইতে জাহাজের নাবিকেরা দেখিয়াছিল, পাহাড়ের চারিদিকে লাল ধোঁয়ার আকাশ ঘিরিয়া রহিয়াছে,

তাহার মধ্যে আগুনের গোলা ছুটিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে এবং ঘন ঘন বাজ পড়িতেছে। তাহার পরদিন ভোরবেলা একশত মাইল দূরে বাটাভিয়া শহরে গরম ধূলার বৃষ্টি হইল এবং তাহার কয়েক ঘণ্টা পরেই অসম্ভব ভয়ংকর শব্দে ক্রাকাতোয়ার প্রকাণ্ড পাহাড় আকাশে উড়িয়া গেল। আট মাইল ডাঙা বেমালুম শূন্যে মিলাইয়া গেল, গভীর সমুদ্র আসিয়া তাহার স্থান দখল করিল। সেই শব্দের ধাক্কা তিন হাজার মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, আকাশ তোলপাড় করিয়া সমস্ত পৃথিবীময় বাতাসের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হাজার হাজার মণ পাথর চূর্ণ হইয়া ধূলার মতো আকাশের দিক্‌দিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবীর সকল দেশে উদয়াস্তের সময় আশ্চর্য রঙের খেলা দেখাইয়াছিল।

এখানেও তাহার শেষ হয় নাই; পাহাড় ফাটিবার সময় সমুদ্রের ভিতর পর্যন্ত আগুন ঢুকিয়াছিল এবং ভীষণ ভূমিকম্পে সমুদ্রকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল। তাহার উপর যখন পাহাড় উড়িয়া সমুদ্রের মধ্যে গিয়া পড়িল তখন সমুদ্র একেবারে প্রলয়মূর্তি ধারণ করিয়া, ফুলিয়া পাহাড় সমান উঁচু হইয়া ডাঙার উপর ছুটিয়া পড়িল। শহর গ্রাম ঘর বাড়ি গাছপালা পলকে কোথায় ভাসিয়া গেল। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার লোক মারা পড়ে, অনেক জাহাজ ডুবিয়া যায়, আর সুণ্ডা প্রণালীর চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়। সমুদ্রের ঢেউ এমন বেগে আসিয়াছিল যে একটা জাহাজকে পাওয়া যায় সমুদ্র হইতে তিন মাইল দূরে শুকনা ডাঙার উপরে। ইহার তুলনায় আমাদের সেদিনকার ভূমিকম্পটাকে অবশ্য নিতান্তই সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে। তাহার সঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি, পাহাড়বৃষ্টি বা সমুদ্রের ঢেউ এসব কোন হাঙ্গামা ছিল না।

পৃথিবীর মাটি কোঁকড়াইয়া বড় বড় পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি হয়। সেইসব পাহাড় উঠিবার সময়ে মাটির স্তরগুলাকে বাঁকাইয়া ফাটাইয়া ভাঙিয়া উলট-পালট করিয়া দেয়। যে মাটি সমানভাবে শোয়ান ছিল তাহাকে খাড়া করিয়া ঝুলাইয়া দেয়। কঠিন পাথরকে ঠেলিয়া নরম মাটির মধ্যে বসাইয়া দেয়, নরম মাটিকে চাপ দিয়া পাথরের ফাটলে ফোকরে ঢুকাইয়া দেয়, পাথরের গায়ে পাথরকে পিষিয়া ভাঙিতে চায়। এইরূপে সমস্ত মিলিয়া এমন চাপাচাপি করিয়া থাকে যে, কোথাও একটুকু স্তর খসাইতে গেলে সমস্ত পাহাড়শুদ্ধ টলমল করিয়া উঠে। এই সকল কাণ্ড প্রতি মুহূর্তেই চলিয়াছে। ধীরে ধীরে যুগের পর যুগ পাহাড়ের স্তর সরিয়া সরিয়া একদিন হয়ত একেবারেই বেসামাল হইয়া টলিয়া পড়িল; নরম মাটির ভিতর পাহাড় বসিতে বসিতে একদিন হঠাৎ পিছলাইয়া ধসিয়া গেল; দুই দিকের উল্টা চাপে ফুলিতে ফুলিতে একদিন পাহাড়ের দেমাক ফাটিয়া চৌচির হইল, এইরকমে বহুদিনের ঠাসাঠাসি ঠেলাঠেলি এক একদিন হঠাৎ ভূমিকম্পের আকারে গা-ঝাড়া দিয়া বাহির হয়।

ভূমিকম্পের ধাক্কা মাটির ভিতর দিয়া ঢেউয়ের মতো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সেই ঢেউয়ের আঘাতে কেমন করিয়া পৃথিবী টল্‌মল্‌ করিতে থাকে, তাহার সামান্য একটু নমুনা তোমরা দেখিয়াছ। তাহাতে ঘরবাড়ি ভাঙিয়া পড়ে, পথঘাট ফাটিয়া যায়, রেলের লাইন মোচড়াইয়া বাঁকিয়া যায়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় কুইটো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে শহরের কোন কোন জায়গায় মানুষগুলিকে ফুটবলের মতো ছুঁড়িয়া দিয়াছিল। তাহার একশত বৎসর পূর্বে পোর্টরয়ালের ভূমিকম্পে বাজারের ভিড়কে ছিটাইয়া নীচে বন্দরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল। লিসবনের ভূমিকম্পে নদীতে বান ডাকিয়া শহরের অসংখ্য লোককে ডুবাইয়া দিয়াছিল।

কয়েক বৎসর আগে সানফ্রান্সিসকো শহরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল সে কেবল বাড়ি-ঘর ফেলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, গ্যাসের নল আর বিদ্যুতের তার ভাঙিয়া জড়াইয়া সে শহরে আগুন লাগাইয়া দেয়। সে এমন সর্বনেশে আগুন যে শহরের সমস্ত দমকল মিলিয়াও তাহাকে কিছুমাত্র জব্দ করিতে পারে নাই। তারপরে শহরের কর্তারা বোমা-বারুদ ফাটাইয়া আগুনের আশেপাশে অনেকগুলি বাড়ি উড়াইয়া দিয়া মনে করিলেন আগুন আর ছড়াইতে পারিবে না। কিন্তু আগুন প্রায় সিকি মাইল ফাঁকা জমি টপ্‌কাইয়া শহরের আর একদিকে ফুটিয়া বাহির হইল। যাহা হউক, খানিক বাদে বাতাসের মুখ ঘুরিয়া গেল তাই রক্ষা, তাহা না হইলে শহরের চিহ্নমাত্র থাকিত কিনা সন্দেহ।

ভূমিকম্পে অনেক সময়ে পাখিরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে থাকে। ডাঙার জন্তু ছুটাছুটি আর চিৎকার করিতে থাকে। একটা হাতির কথা শুনিয়াছি, সে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বড় ভূমিকম্পের সময়ে প্রথমটা অবাক হইয়া চারিদিকে তাকাইতেছিল, তারপর কাঁপুনি যখন বাড়িয়া উঠিল তখন সে প্রাণপণে চার পা ছড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। গল্প শুনিয়াছি, একটা বাড়ির পাঁচিলের উপরে দুইটি বিড়াল মুখামুখি বসিয়া সুর ভাঁজিতেছিল, এমন সময়ে ভূমিকম্পের ধাক্কায় দুইজনকেই পাঁচিল হইতে ফেলিয়া দেয়। সংগীতচর্চায় হঠাৎ এরকম বাধা পাইয়া তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জোগাড় করিতেছিল, এমন সময়ে পাঁচিল ভাঙিয়া দু-চারখানা ইঁট পড়িতেই তাহাদের যুদ্ধের উৎসাহ থামিয়া গেল। আর এক নাবিকের পোষা টিয়াপাখির গল্প শুনিয়াছি, সে আশ্চর্যরকম কথা বলিতে পারিত। একবার ভূমিকম্পে সে খাঁচাশুদ্ধ ঘরচাপা পড়িয়াছিল। পরে শোন গেল ভাঙা ঘরের তলা হইতে কে যেন চিৎকার করিয়া গালাগালি করিতেছে। তখন ইঁট সরাইয়া দেখা গেল, পাখিটা খাঁচার মধ্যে এক জায়গায় কোণঠাসা হইয় বসিয়া আছে, আর বলিতেছে "বড় গরম, বড় গরম"।

মানুষের কথা

জগতে কাহারও স্থির থাকিবার হুকুম নাই। জ্যোতির্বিদ বলেন, "চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী সমস্তই চলিতেছে।" জড় বিজ্ঞানের পণ্ডিত বলেন, "প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে তাহার অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণু পর্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে।" ভূতত্ত্ববিদ বলেন, "এই পৃথিবীকে আজ যেমন দেখিতেছি, চিরদিন সে এমন ছিল না এবং পরেও এমন থাকিবে না—তাহার চেহারা পর্যন্ত যুগের পর যুগ বদলাইয়া চলিয়াছে।" সুতরাং মানুষ যে চিরকাল মানুষ ছিল না, সে যে ক্রমে এইরকম ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা কিছুই আশ্চর্য কথা নয়। কোন্ আদিম কালের কোন্ জন্তু কেমন করিয়া ক্রমে মানুষের মতো হইয়া উঠিল, তাহার সমস্ত ইতিহাস জানিবার কোন উপায় নাই। যতটুকু জানা যায় তাহাতে মানুষের সঙ্গে বানরের, বিশেষত 'বনমানুষের' জ্ঞাতি সম্পর্কটাই স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

চোখে দেখিতে মানুষ ও বানরের চেহারার মধ্যে যেমন মিল দেখিতে পাই তেমনি

কতগুলা তফাৎ বুঝিতে পারি, যাহার দরুণ বানরকে বানর বলিয়া বোঝা যায়। একটা মানুষের আর একটা গরিলার কঙ্কাল পাশাপাশি লইয়া দেখিবে শরীরের গড়ন মোটামুটি একইরকমের; একইরকম ভাবে হাড়ের পরে হাড় সাজাইয়া কাঠাম দুটিকে দাঁড় করান হইয়াছে। বাঘ সিংহ বা গরু ঘোড়ার কঙ্কাল যদি ইহার পাশে বসাও তবে কখনই এতটা মিল দেখিতে পাইবে না। কিন্তু এতটা মিল থাকিলেও দুয়ের মধ্যে তফাৎটাও বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। গরিলার হাত প্রকাণ্ড লম্বা এবং মজবুত কারণ তাহাকে গাছে গাছে ফিরিতে হয়, চলিতে-ফিরিতে তাহাকে হাতের ব্যবহার করিতে হয়। গরিলার পায়ের পাতা ঠিক হাতেরই মতো অর্থাৎ বলিতে গেলে তাহার চারিটাই হাত। তাহার শরীরে যে অসাধারণ শক্তি, তাহার পাঁজরের হাড়গুলা দেখিলেই সেটা বেশ বোঝা যায়। তারপর মাথার খুলিটা—গরিলার দাঁত এবং চোয়াল খুবই মজবুত কিন্তু আসল মাথাটুকু অর্থাৎ মগজের জায়গাটুকু মানুষের তুলনায় খুব ছোট। মানুষকে বুদ্ধি খাটাইয়া বাঁচিতে হয়, তাই তাহার মগজ বাড়িয়া মাথাটাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। আরও কতগুলা সূক্ষ্ম তফাৎ আছে পণ্ডিতেরা যাহাকে খুব গুরুতর বলিয়া মনে করেন, যেমন হাঁটুর হাড়। মানুষ যে পায়ের পাতার উপর খাড়া হইয়া চলে এবং গরিলা যে সামনের হাত দুটিতে ভর রাখিয়া কুঁজা হইয়া চলে, হাঁটুর হাড় দেখিয়াই পণ্ডিতেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন।

মানুষ কতদিন হইল এ পৃথিবীতে আসিয়াছে অর্থাৎ কতদিন হইল সে 'মানুষ' হইয়াছে, তাহা পণ্ডিতেরা এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই। সকলের চাইতে পুরাতন মানুষেব চিহ্ন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের চোয়ালের হাড় আর মুখের ভিতরকার গড়ন দেখিয়া মনে হয় তাহারা কথা বলিতে জানিত না। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডুবয় যবদ্বীপে প্রাচীন জন্তুর কঙ্কাল খুঁজিতে গিয়া একটা মানুষের কয়েক টুকরা কঙ্কাল খুঁড়িয়া তোলেন। সেটা মানুষের কঙ্কাল কি বানরের কঙ্কাল, সে বিষয়ে প্রথমে একটু সন্দেহ ছিল—কারণ তাহার মগজকোষটি বানরের চাইতে অনেকটা বড় হইলেও আজকালকার সভ্য মানুষের তুলনায় খুবই ছোট এবং কপালটাও বানরের মতো চ্যাপ্টা। তাহার দুইটা দাঁত পাওয়া গিয়াছিল, সে দুইটা দেখিলে গরিলার দাঁতের কথাই মনে হয়। কিন্তু তাহার উরুর হাড় দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলিত। এই প্রাচীন মানুষটির অর্থাৎ জন্তুটির নাম দেওয়া হইয়াছে বানর-মানুষ। ইহার চাইতে প্রাচীন কোন মানুষের কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ইউরোপে সেকালের মানুষের যে-সকল চিহ্ন পাওয়া যায়, এই বানর-মানুষের তুলনায় তাহাদের খুব প্রাচীন বলা চলে না। কিন্তু তাহারাও এক একজন প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগেকার মানুষ। ধনুকের মতো বাঁকা ছোট ছোট পা, বানরের মতো উঁচু উঁচু ভ্রূ, একটু-আধটু কথা বলিতে পারে—সেইসব মানুষ এখন পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে। এইসব মানুষের চেহারা কেমন ছিল তাহা এই সকল কঙ্কাল হইতেই কতকটা বোঝা যায়।

মানুষ যখন সভ্য হয় নাই, যখন সে অস্ত্র গড়িতে বা আগুন জ্বালাইতে শিখে নাই, তাহারও অনেক আগে সে এমন বিদ্যা শিখিয়াছিল যাহা মানুষ ছাড়া অন্য কোনও পশুর জানা নাই। সেই বিদ্যাটি খাড়া হইয়া চলিবার বিদ্যা। কেবলমাত্র পায়ের সাহায্যেই যখন সে চলিতে শিখিল তখন হইতে তাহার হাত দুইটা ছাড়া পাইল। সেই সময় হইতে সে হাত দুটাকে যে কতরকম কাজে লাগাইয়াছে এবং কত কৌশল

শিখিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই।

সেইসব মানুষেরা যে-সকল চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায় যে, হাতের ওস্তাদি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রথম যে মানুষ অস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিখে, তাহার অস্ত্র ছিল গাছপাথর জানোয়ারের শিং ও হাড়। এই অতি প্রাচীন মানুষটি যদি অস্ত্রশস্ত্রের আরও উন্নতি করিতে পারিত, তবে হয়ত সে আরও কিছুকাল টিঁকিয়া থাকিত। কিন্তু পাথরের অস্ত্রওয়ালা মানুষের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়া পারে নাই। প্রাচীনকালের নানারকম পাথরের অস্ত্র পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই পাওয়া গিয়াছে। সব চাইতে পুরান যেগুলি সেগুলিকে হঠাৎ দেখিয়া অস্ত্র বলিয়া বুঝা যায় না, কারণ সে সময়ে এক-এক টুকরা পাথরকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া নিতান্তই মোটা রকমের, উবড়োখাবড়ো অস্ত্র গড়া হইত। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এইরকম অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা পৃথিবীতে শিকার করিয়া ফিরিয়াছিল। যে-সকল পর্বতের গুহায় তাহারা বাস করিত সেই গুহার মধ্যে পাথরে আঁচড় কাটিয়া তাহারা যে-সকল ছবি আঁকিত, তাহারও চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। সেই ছবিগুলি দেখিলে তোমরা হয়ত হাসিবে—কারণ আজকালকার পাঁচ-সাত বৎসরের শিশুও অমন ছবি আঁকিতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা এই সমস্ত ছবি দেখিয়া সেই গুহাবাসী মানুষদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর জানিতে পারিয়াছেন। এই মানুষদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম হইত, তাহাদের চেহারা ছিল কতকটা এস্কিমোদের মতো, তাহারা চাষবাস জানিত না, বেদে জাতির মতো নানা স্থানে ঘুরিত আর দল বাঁধিয়া শিকার করিত। সম্ভবত ইহাদের অনেকেই কাঁচা মাংস খাইত এবং কেহ কেহ হয়ত মানুষ খাইতেও কোন আপত্তি বোধ করিত না। ইহার পর আরও বুদ্ধিমান একরকম মানুষ দেখা দিল যাহারা পাথর-কাটা বিদ্যায় রীতিমত কারিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অস্ত্রগুলি খুব সমান ও ধারাল এবং রীতিমত শান দিয়া পালিশ করা। তার উপর ইহারা মাটির বাসন গড়িতে, চাষবাস করিতে, কাপড় বুনিতে ও গরু ছাগল প্রভৃতি জন্তু পুষিতেও শিখিয়াছিল। ইহারা যেখানে যাইত সেইখানেই সেই প্রাচীন যুগের আনাড়ি মানুষকে তাড়াইয়া মারিয়া শেষ করিত। বলিতে গেলে, পাথরের যুগের এই নূতন মানুষটি হইতেই সভ্যতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে।

মেঘবৃষ্টি

বর্ষাকালে রাস্তায় বাহির হইবার আগে আমরা আকাশের পানে তাকাইয়া দেখি তাহার ভাবগতিক কিরূপ—মেঘ আছে কিনা, বৃষ্টির সম্ভাবনা অথবা ঝড় দেখা যায় কিনা। কিন্তু মেঘ কিরূপে জন্মায়, আকাশে কিভাবে থাকে, মেঘের আকার-প্রকার এবং চালচলন কিরূপ সে কথা ভাবিবার অবসর তখন আমাদের থাকে না।

মেঘের জন্মের কথা বোধহয় তোমরা সকলেই জান। পৃথিবীর খাল, বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্রের জল গরমে বাষ্প হইয়া আকাশে মিশিয়া যায়; সেই বাষ্প জমিয়া খুব ছোট ছোট জলকণার সৃষ্টি হয়। এইসকল জলকণার স্তূপকেই আমরা বলি মেঘ। মনে হইতে পারে যে জলকণা ত বাতাসের চেয়ে ভারি; তাহা হইলে মেঘ

কেমন করিয়া শূন্যে থাকে? বাস্তবিক মেঘ সর্বদাই নীচে নামিতে চেষ্টা করে। কখনও বাতাসের ঠেলায় উপরে উঠিতেও পারে, কিন্তু নীচে নামাই তাহার স্বভাব। যে মেঘের জলকণার আকার যত বড় সে মেঘ তত তাড়াতাড়ি নীচে নামে। জলকণাগুলি আকারে বেশি বড় হইয়া গেলে বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ে। খুব উঁচুতে যে মেঘ থাকে, তাহাতে অনেক সময়ে জলকণাগুলি জমিয়া বরফের কণা হইয়া থাকে। এই মেঘ আবার নীচে গরম বাতাসের মধ্যে নামিলে সেই বরফ গলিয়া জলকণা হইয়া যায়। ঠাণ্ডা দেশে এই বরফকণাই তুষার বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পড়ে।

অনেক সময় উপরের মেঘ বৃষ্টি হইয়া মাটিতে পেঁছাইবার আগেই বাষ্প হইয়া মিলিয়া যায়। কাজেই মেঘ আসিলেই যে বৃষ্টি পড়িবে, এ কথা বলা যায় না। শীতের দেশে মাঝে মাঝে একটা বড় মজার জিনিস দেখা যায়। মেঘের জলকণা খুব ঠাণ্ডা হইয়া নীচে নামিতে নামিতে হঠাৎ কোন গাছপালা অথবা অন্য কোন জিনিসের গায়ে বরফ হইয়া জমিয়া যায়।

মেঘ বৃষ্টি ও ঝড় বাতাসের খবর রাখিবার জন্য সকল সভ্য দেশেই বড় বড় সরকারী অফিস আছে। ইংরাজিতে তাকে বলে মিটিয়রলজিক্যাল (Meteorological) আফিস। এই সমস্ত আফিসের কাজ কেবল মেঘ বাতাস ইত্যাদির নানারকম মাপ-জোখের হিসাব লওয়া। সে কিরকম হিসাব? কোন্‌খানে কত গরম তাহার হিসাব, কোন্‌খানের বাতাস কতখানি ভিজা বা শুকনা তাহার হিসাব; কোন্‌খানে বাতাসের চাপ কিরূপ, বাতাস কতটা হাল্কা বা কতটা ভারি, তাহার হিসাব; বাতাস কতখানি জোরে কোন্‌দিকে চলিতেছে, কোন্‌খানে কতখানি বৃষ্টি পড়িল, কিরকম মেঘ দেখা দিল, তাহার হিসাব।

বাতাস যখন চলে তখন তাহাকে বলে 'হাওয়া', হাওয়া যখন ছোটে তখন তাহার নাম 'ঝড়'। বাতাস আবার চলা-ফিরা করে কেন? গরম লাগিলে বা জলের বাষ্প মিশিলে বাতাস ছড়াইয়া হাল্কা হইয়া উপর দিকে ভাসিয়া উঠে। তখন তাহার চাপ কমিয়া খানিকটা জায়গা যেন ফাঁকা হইয়া উঠিতে চায়। কিন্তু ফাঁকা হইবার যো নাই, চারিদিকের চাপে আশপাশ হইতে বাতাস ছুটিয়া সেই হাল্কা জায়গাটাকে দখল করিতে চায়, তাহাতেই বাতাসের চলাচল হয়। বাতাস যখন যেদিকে চলে, সে তখন মেঘগুলিকে শুদ্ধ সেদিকে টানিয়া লইতে থাকে। এইরকম টানাটানির মধ্যে পড়িয়া এক একটা মেঘের এক একরকম চেহারা হইয়া উঠে। যাঁহারা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা মেঘের চেহারা দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারেন। খুব উঁচুতে ৫/৬ মাইল উপরে যে মেঘ থাকে তাহার চেহারা অতি হাল্কা সূক্ষ্ম চামরের মতো। সে মেঘে বৃষ্টি হয় না, সে মেঘ নীচে নামিতে গেলেই গরম বাতাসে শুকাইয়া মিলাইয়া যায়।

তারপর দু মাইল চার মাইল উঁচুতে ছিটান তুলার মতো বা চষাক্ষেতের মতো যেসব সাদা সাদা মেঘ দেখা যায়, তাহাতেও হঠাৎ বৃষ্টি পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। এই সমস্ত মেঘ যখন সূর্যাস্তের সময়ে লম্বা লম্বা স্তর বাঁধিয়া আকাশের গায়ে শুইয়া থাকে তখন তাহার উপর সূর্যের আলো পড়িয়া কি আশ্চর্য সুন্দর রঙের খেলা দেখা যায়, তাহা সকলেই দেখিয়াছ। বিদ্যুতের যে মেঘ তাহার চেহারাটা খুব গম্ভীর ও জমকালো হয়, সে যেন রাগে ফুলিয়া পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া উঠিতে থাকে কিন্তু বৃষ্টি নামিতে আরম্ভ করিলেই সে দেখিতে দেখিতে শান্ত হইয়া যায়। তখন সে বৃষ্টি মেঘ হইয়া ধোঁয়ার প্রলেপের মতো আকাশের গায়ে লেপিয়া যায়।

বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখনই মনে হয় 'এইবার বাজ পড়ার শব্দ শুনিব'—এবং অনেক সময়ই সে শব্দ শোনা যায়। বিদ্যুৎ চমকাইলে বাতাসটা কিরকম তোলপাড় হইয়া উঠে, ওই আওয়াজটা হইতেই তাহা বুঝিতে পার। বিদ্যুতের ঝলক ছুটিবামাত্র চারিদিকে গরম বাতাস ঠিক্‌রাইয়া পড়ে, আবার সেই চোট্‌ সামলাইতে গিয়া চারিদিকের বাতাস ছুটিয়া কড়্‌কড়্‌ শব্দে টক্কর বাধাইয়া বসে। তাহার পরেও খানিকক্ষণ পর্যন্ত বারবার বহু দূরের মেঘ হইতে গুড়্‌গুড়্‌ করিয়া সেই শব্দের প্রতিধ্বনি আসিতে থাকে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিস থাকাতে বৃষ্টি বাদল সম্বন্ধে নানারকম খবর আমরা আগে হইতে জানিতে পারি। 'ঝড় আসিতেছে' এই খবর সময়মত জানিতে পারিলে মানুষে সাবধান হইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। মনে কর, খবর আসিল—এখান হইতে দুই শত মাইল দূরে একটা বড় ঝড় খুব বৃষ্টি লইয়া ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে এইদিকে আসিতেছে। সে যদি বরাবর ঐভাবে এই মুখেই আসে এবং আসিতে আসিতে তাহার বৃষ্টি যদি ফুরাইয়া না যায়, অথবা যদি মাঝে কোথাও গরম শুকনা বাতাসে তাহার মেঘ শুকাইয়া না ফেলে, তবে চার ঘণ্টা পরে এখানে বৃষ্টি হইবে।

মিটিয়রলজিক্যাল আফিসে বড় বড় মানচিত্রে সর্বদাই চারিদিকের খবর আঁকিয়া রাখা হয়। বাতাসের চাপ, বাতাসের গতি, বাতাসের বেগ, বাতাসের উত্তাপ, বাতাসের ভিজা ভাব ও মেঘবৃষ্টি, সব খবর সেই মানচিত্রের গায়ে স্পষ্ট রেখা টানিয়া দেখান হয় এবং বাতাসের ভাবগতিক যেমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাইতে থাকে, মানচিত্রের উপরেও সেই সমস্ত পরিবর্তনের হিসাব ক্রমাগত বদলাইয়া দেখান হয়।

বেগের কথা

যে লোক সৌখিন, সামান্য কষ্টেই কাতর হইয়া পড়ে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় 'ফুলের ঘায় মূর্ছা যায়।' রঘুবংশে আছে যে দশরথের মা ইন্দুমতী সত্যসত্যই ফুলের ঘায়ে কেবল মূর্ছা নয়, একেবারে মারাই গিয়াছিলেন। ইন্দ্রের পারিজাতমালা আকাশ হইতে তাঁহার গায়ে পড়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথম যখন এই বর্ণনাটা শুনিয়াছিলাম তখন ইহাকে অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হইয়াছিল; কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিতেছি ইহা নিতান্ত অসম্ভব কিছু নয়।

তাল গাছের উপর হইতে ভাদ্রমাসের তাল যদি ধুপ্‌ করিয়া পিঠে পড়ে তবে তার আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয়; কিন্তু ঐ তালটাই যদি তাল গাছ হইতে না পড়িয়া ঐ পেয়ারাগাছ হইতে এক হাত নীচে তোমার পিঠের উপর পড়িত, তাহা হইলে এতটা চোট্‌ লাগিত না। কেন লাগিত না? কারণ, বেগ কম হইত। কোন জিনিস যখন উঁচু হইতে পড়িতে থাকে তখন সে যতই পড়ে ততই তার বেগ বাড়িয়া চলে। যে হাড়ের টুকরাটি দোতলা হইতে একতলায় মানুষের মাথায় পড়িলে বিশেষ কোনই অনিষ্ট হয় না—সেইটিই যখন চিলের মুখ হইতে পড়িতে পড়িতে অনেক নীচে প্রবল বেগে আসিয়া নামে তখন তাহার আঘাতে মানুষ রীতিমত জখম হইতে

পারে। ফুলের মালাটিকেও যদি যথেষ্ট উঁচু হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহার আঘাতটি যে একেবারেই মোলায়েম হইবে না, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

ঘূর্ণী বায়ুর সময় সামান্য খড়কুটা পর্যন্ত যে ঝড়ের বেগে গাছের ছালে বিঁধিয়া যায়, ইহা অনেক সময়েই দেখা যায়। একটা নরম মোমবাতিকে বন্দুকের মধ্যে পুরিয়া গুলির মতো করিয়া ছুটাইলে সে যে পুরু তক্তা ফুটা করিয়া যায়, ইহাও মানুষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। বন্দুকের গুলি জিনিসটা আসলে খুব মারাত্মক নয়; হাতে ছুঁড়িয়া মারিলে তাহাতে চোট্ লাগিতে পারে, কিন্তু সে চোট্ খুব সাংঘাতিক হয় না। কিন্তু সেই জিনিস যখন বন্দুকের ভিতর হইতে বারুদের ধাক্কায় প্রচণ্ড-বেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন আস্ত মানুষটাকে এপার-ওপার ফুঁড়িয়াও তাহার রোখ থামিতে চায় না।

জলের কল হইতে যে-জলধারা পড়িতে থাকে, তাহার মধ্যে আঙুল চালাইয়া দেখ—যেটুকু বাধা বোধ করিবে তাহা নিতান্তই সামান্য। কিন্তু ঐরকম সরু একটি জলের ধারা যখন খুব প্রবল বেগে ছুটিয়া বাহির হয় তখন মনে হয় সে যেন লোহার মতো শক্ত—তখন তাহাকে কুড়াল দিয়াও কাটা যায় না। ফ্রান্সের একটা কারখানায় চারশত হাত উঁচু পাহাড় হইতে জলের স্রোত আনিয়া তাহার জোরে কল চালান হয়। সেই জল যখন এক আঙুল মোটা একটি নলের ভিতর হইতে ভীষণ তোড়ে বাহির হয়—তখন তাহাতে তলোয়ার দিয়া কোপ মারিলে তলোয়ার ভাঙিয়া খান্ খান্ হইয়া যায়। এমনকি, বন্দুকের গুলিও তাহাকে ভেদ করিতে পারে না—তাহাতে ঠেকিয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়ে। আমেরিকার কোন কোন কারখানার নর্দমা দিয়া যে-জল পড়ে, তাহার উপর কুড়াল মারিয়া দেখা গিয়াছে, জলের মধ্যে কুড়াল বসে না—জলের এমন বেগ!

চলন্ত জিনিস মাত্রেরই এইরূপ একটা ধাক্কা দিবার ও বাধা দিবার শক্তি আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, জগতে যা কিছু তেজ দেখি, যে কোন শক্তির পরিচয় পাই, সমস্তই এই চলার রকমারি মাত্র। বাতাসে ঢেউ উঠিল, অমনি শব্দ আসিয়া কানে আঘাত করিল—আকাশে তরঙ্গ ছুটিল, অমনি চোখের মধ্যে আলোর ঝিলিক্ জ্বলিল। কেবল তাহাই নয়, প্রত্যেক ধূলিকণার মধ্যে কোটি কোটি পরমাণু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরের এই ছুটাছুটি বাড়িলেই সব জিনিস গরম হইয়া উঠে। যখন ঠাণ্ডা হয়, তেজ কমিয়া আসে তখন বুঝিবে এই পরমাণুর ছুটাছুটি ঢিমাইয়া পড়িতেছে।

যে-জিনিসটা ছুটিতে চায় তাহাকে বাধা দিলে সে গরম হইয়া ওঠে। তাহার বাহিরের বেগ বন্ধ হইয়া তখন ভিতরে পরমাণুর বেগকে বাড়াইয়া তোলে। বন্দুকের গুলিটা লোহায় লাগিয়া থামিয়া গেল—হাত দিয়া দেখ, এত গরম যে হাতে ফোস্কা পড়িবে। একটা শক্ত জিনিসের উপর ক্রমাগত হাতুড়ি মার, হাতুড়ির বেগ যতবার বাধা পাইবে ততই দেখিবে হাতুড়িটা গরম হইয়া উঠিতেছে—আর যাহার উপর আঘাত করিতেছে, তাহাকেও গরম করিয়া তুলিতেছে। রেলগাড়ি যখন লোহার রেলের উপর দিয়া যায় তখন চাকার সঙ্গে রেলের ঘষা লাগিয়া সে ক্রমাগত বাধা পাইতে থাকে। ট্রেন চলিয়া যাইবার পর যদি রেলের উপর হাত দিয়া দেখ, দেখিবে লোহাগুলি বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেন যখন স্টেশনে আসিয়া থামে, তখন তাহার চাকায় হাত দিলে দস্তুরমত গরম বোধ হয়।

কেবল যে কঠিন জিনিসেই বাধা দেয় তাহা নয়, বাতাসের মতো হাল্কা জিনিসেরও বাধা দিবার শক্তি আছে। খুব বড় একটা পাখা লইয়া জোরে চালাইতে

গেলে বেশ বোঝা যায় যে বাতাসের ঠেলা লাগিতেছে। তোমরা নিশ্চয়ই উল্কা দেখিয়াছ। মাঝে মাঝে আকাশে যে তারার মতো জিনিসগুলি হঠাৎ কোথা হইতে বোঁ করিয়া ছুট্ দিয়া পালায়, সেগুলিই উল্কা। উল্কাগুলি এই পৃথিবীরই মতো ভীষণভাবে ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার বা লক্ষ মাইল বেগে ছুটিতে থাকে। বাহিরের আকাশ তাহাকে বাধা দেয় না. কিন্তু দৈবাৎ যদি সে পৃথিবীর বাতাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে অমনি বাতাস তাহাকে বাধা দিতে থাকে। এই বাধাতেই তাহার বেগ কমিয়া যায়, সে গরমে জ্বলিয়া আগুন হয়। সেই আগুনকে ছুটিতে দেখিয়া আমরা বলি 'ঐ উল্কা পড়িল।'

পৃথিবীর তুলনায় উল্কাগুলি নিতান্তই ছোট। তাই তাহাদের ধাক্কায় পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় না, উল্কাগুলিই মরিয়া শেষ হয়। কিন্তু দুইটা বড় বড় পৃথিবী যদি এইরকম ছুটাছুটি করিয়া ধাক্কা লাগায় তবে কাণ্ডটা কিরকম হয়! মানুষের কল্পনা তাহার ধারণাই করিতে পারে না। দুইটাব মধ্যে যখন ধাক্কা লাগে তখন তাহাদের প্রচণ্ড বেগ বাধা পাইবামাত্র জ্বলিয়া আগুন হইয়া বাহির হয়। সেই আগুন হইতে পাহাড়-প্রমাণ স্ফুলিঙ্গ চারিদিকে হাজারে হাজারে ছুটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে দুই পৃথিবীর শেষ চিহ্ন ঘুচিয়া গিয়া কেবল লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়িয়া আগুনের শিখা জ্বলিতে থাকে। এরূপ ঘটনা যে একেবারেই হয় না তাহা নয়; কিছুদিন আগে যে 'নূতন তারা' দেখা গিয়াছিল তাহাও এইরূপ একটা লুপ্তবেগের আগুনমাত্র। কবে ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কিনারে এই আগুন জ্বলিয়াছিল; তাহারই জ্বলন্ত কিরণ আকাশে তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিতে ছুটিতে এতদিনে আমাদের চোখে আসিয়া আঘাত করিয়া গেল। সেই যে আলোকের বেগ, তাহার কাছে আর সমস্ত বেগই হার মানিয়া যায়। কামানের গোলা এত যে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া যায়, তাহার গতিও আলোকের গতির তুলনায় যেন রেলগাড়ির কাছে শামুকের চলার মতো।

আগুন

আজকালকার সভ্য মানুষ, যাহারা দিব্য আরামে ঘরে বসিয়া দিয়াশালাই ঠুকিয়া আগুন জ্বালায়, তাহারা ভাবিয়াই দেখে না যে এই আগুন মানুষের কত তপস্যার ধন। যে-আগুন বনে জঙ্গলে দাবানল হইয়া জ্বলে, যে-আগুন আগ্নেয় পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জিভ মেলিয়া ধুঁকিতে থাকে—সেই আগুনকে মানুষ যখন আপনার শক্তিতে জ্বালাইতে শিখিল, সেইদিন মানুষ এমন বিদ্যা শিখিল যাহা মানুষ ছাড়া আর কেহ জানে না। চক্মকি পাথর ঠুকিয়া বা কাঠে কাঠে ঘষিয়া সেই সে কোন্ কালের আদিম মানুষ আগুন জ্বালাইবার উপায় বাহির করিয়াছিল, আজও পৃথিবীর কত অসভ্য জাতি ঠিক সেই উপায়ে প্রতিদিন আগুন জ্বালিতেছে। এই কাজ করিতে কৌশল ও পরিশ্রম দুয়েরই দরকার হয়। কাঠের মধ্যে কাঠ ঘুরাইয়া আগুন জ্বালিবার প্রথা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল—বেদে এবং পুরাণে তার কথা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকবার এইভাবে আগুন জ্বালান বড় সহজ কথা নয়. সেইজন্য একবার আগুন জ্বালান হইতে তাহাতে বার বার কাঠ-কুটা শুকনা পাতা ইত্যাদি দিয়া সেই আগুনকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার হইত। কেবল আমাদেব

দেশে নয়, এইরকম আগুন রক্ষার আয়োজন রোম গ্রীস ইজিপ্ট প্রভৃতি সকল দেশেই ছিল। অনেক সময়ে রীতিমত মন্দির গড়িয়া পুরোহিত রাখিয়া এই আগুনের তদ্বির করা হইত। লোকে সেই সকল মন্দির হইতে প্রতিদিন আগুন লইয়া আসিত এবং সকলে মিলিয়া আগুনের সম্মান ও পূজা করিত।

আগুন না থাকিলে মানুষের অবস্থা কি হইত? আগুন ছিল তাই মানুষ শীতের মধ্যেও টিঁকিতে পারিয়াছে, কত হিংস্র জন্তুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, রান্না করিতে শিখিয়াছে, মাটি পোড়াইয়া বাসন গড়িতে শিখিয়াছে, লোহা তামা প্রভৃতি ধাতুকে কাজে লাগাইতে শিখিয়াছে। সহরে গ্রামে ঘরের আশেপাশে সর্বদা যেসব জিনিস কাজে লাগে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ, আগুন না হইলে তাহার কোন্‌টা তৈয়ারি করা সম্ভব হইত? মাটির হাঁড়ি, কাঁসার বাসন, সোনা রূপার অলংকার এসব ত ছাড়িয়াই দিলাম। জুতাটি যে পায়ে দিয়াছ, তাহার কাঁটাগুলি ত লোহার, ঐ জুতা সেলায়ের জন্য লোহার ছুঁচ দরকার হইয়াছিল ত? আগুন না থাকিলে তাহা সম্ভব হইত কিরূপে? ঘরে এত যে সাবান সুগন্ধি ওষুধপত্র ব্যবহার কর, তাহার মালমশলার জন্য কত কারখানায় কত চুল্লি জ্বালিতে হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখ ত। রাত্রে যে আলো জ্বালাইয়া পড়াশুনা কর, সেই আলোটুকু যদি না থাকিত তবে কেমন অসুবিধা হইত বল দেখি। আর ঐ যে কাচের চশমা পর, কাচের 'থার্মমিটার' দিয়া জ্বর মাপ, আর অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি অসংখ্য কাচের যন্ত্র ব্যবহার কর, ক্ষার চূর্ণ ও বালি আগুনে না গলাইলে সে কাচ আসিত কোথা হইতে? আগুন ছাড়া পৃথিবী যদি কল্পনা করিতে চাও ত এই সমস্ত জিনিস বাদ দিতে হয়—এই সমস্ত জিনিসের সাহায্যে মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতায় যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে সে সমস্ত লোপ করিতে হয়; আর মানুষকে কল্পনা করিতে হয় সেই আদিমকালের অসভ্যের মতো—যাহারা ফলমূল ও কাঁচা মাংস খাইয়া, গাছের ছাল বাকল ও জানোয়ারের চামড়া পরিয়া, গাছ পাথরের অস্ত্রে সাজিয়া, গাছে জঙ্গলে গুহা গহ্বরে লুকাইয়া ফিরিত। সে সময়ের পৃথিবীতেও কাঠ ছিল, কয়লা ছিল, আগুন জ্বালিবার মালমশলা সবই ছিল। ছিল না কেবল আগুন—ছিল না কেবল সেই জ্ঞানটুকু যাহাতে আগুন জ্বালিবার সংকেতটি জানা যায়। সেই মানুষ, আর এখনকার এই মানুষ! এ দুয়ের মধ্যে এত যে প্রকাণ্ড তফাৎ দেখিতেছ, তাহার প্রধান কারণ এই আগুনের আবিষ্কার!

আমাদের দেশে আগুনকে বলে 'সর্বভুক'। একবার যদি সে জিভ মেলিয়া বাহির হইল, তবে তাহার ক্ষুধার আর শেষ নাই—সে তখন সব খাইয়া উজাড় করিতে পারে। আগুনকে যদি তুষ্ট করিতে চাও, কাজে লাগাইতে চাও, তবে তাহার ক্ষুধা মিটাইবার খোরাক দেওয়া চাই। কাগজ দাও, খড় দাও, কাঠ দাও, কয়লা দাও, তেল ঘি কেরোসিন যাহা সে হজম করিতে পারে তাহাই দাও—একটা কোন খোরাক না জোগাইলে সে জ্বলিতে পারে না। আগুন জ্বালিবার জন্য মানুষে প্রতি বৎসর কত বন জঙ্গল উজাড় করে, মাটির ভিতরে ঢুকিয়া কত লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা খুঁড়িয়া তোলে, কত বড় বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া কেরোসিন প্রভৃতি খনির তেল দেশ-বিদেশে চালান দেয়, কত মোম চর্বি ঘি তেল খরচ করিয়া ঘরে ঘরে বাতি জ্বালায়, তাহার হিসাব লইতে গেলে অবাক হইতে হয়। আজকালকার নিতান্ত অসভ্য যে মানুষ—লংকা দ্বীপের ভেদ্দা বা আফ্রিকার 'বুশম্যান'—তাহারাও আগুনের ব্যবহার জানে। অতি প্রাচীনকালে আগুন-ছাড়া মানুষ যাহারা ছিল তাহারা সে আগুনওয়ালা মানুষের সঙ্গে

পাল্লা দিয়া টিঁকিতে পারিত না, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। শীতের অত্যাচারে, শত্রুর অত্যাচারে, হিংস্র জন্তুর অত্যাচারে—নানারকম বিপদে আপদে আগুনের সাহায্য না পাইলে আজকালকার এই মানুষ আজ কোথায় থাকিত, কে জানে? হয়ত মানুষ জাতিটারই পৃথিবী হইতে লোপ পাইবার জোগাড় হইত।

হিংস্র জন্তু পোষ মানিলেও তাহার হিংস্রতা একেবারে দূর হয় না। সেইজন্য সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়, কখন তাহার হিংসা বুদ্ধি জাগিয়া উঠে। আগুনকে বাগ মানাইতে গিয়াও মানুষকে পদে পদেই এইরকম বিপদে পড়িতে হইয়াছে। আমরা একবার শিলং পাহাড়ে গিয়াছিলাম; সেখানে পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা দাগ দেখিয়া দূর হইতে ভাবিয়াছিলাম, ওগুলি বুঝি পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা। পরে কাছে গিয়া বুঝিলাম ওগুলি রাস্তা নয়, জঙ্গলের মাঝে মাঝে চওড়া ফিতার মতো ফাঁকা জমি;—ঠিক যেন পাহাড়ের মাথার উপর ক্ষুর চালাইয়া খালের মতো করিয়া চাঁচিয়া রাখিয়াছে। শুনিলাম, আগুনের ভয়ে নাকি ওরকম করা হইয়াছে; কোথাও আগুন লাগিলে, ঐ ফাঁকা জায়গা পর্যন্ত আসিয়া আগুন আর ছড়াইতে পারে না। আমেরিকার বড় বড় Prairie বা ঝোপজমিতে কেবল ঝোপজঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না—সেখানে আগুন লাগিলে এক-এক সময়ে ব্যাপার ভারি মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। সে আগুন এমন হু হু করিয়া ছড়াইয়া পড়ে যে মানুষে অনেক সময়ে ঘোড়া ছুটাইয়াও তাহার হাত এড়াইয়া পলাইতে পারে না।

এসব ত গেল বাহিরের আগুনের কথা। মানুষের ঘরে ঘরে সংসারের কাজের জন্য প্রতিদিন যে আগুনের দরকার হয়, সেই আগুন যখন এক একবার ছাড়া পাইয়া ঘরবাড়ি সহর গ্রাম সব খাইয়া শেষ করে, তাহাও কি কম সাংঘাতিক,! কখন কাহার অসাবধানতায় আগুন ছড়াইয়া সর্বনাশ উপস্থিত হয়, তাহার জন্য কতরকমে মানুষকে সতর্ক হইতে হয়। বড় বড় সহরে দমকলের স্টেশন থাকে, আগুন নিভাইবার জন্য কত লোকলস্কর ও কতরকম আয়োজন রাখিতে হয়। বড় বড় দমকল, যাহা হইতে জলের ফোয়ারা ছুটিয়া আগুনের মধ্যে গিয়া পড়ে; তিনতলা চারতলার সমান লম্বা লম্বা মই, যাহাকে দূরবীণের মতো গুটাইয়া রাখা যায়; আর বড় বড় মোটর বা ঘোড়ার গাড়ি, যাহাতে আগুনের জায়গায় চট্‌পট্ ছুটিয়া যাওয়া যায়; আর আগুন লাগিলে পর আগুনের আফিসে তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছাইবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা। টেলিফোনের আফিসে একটিবার 'ফায়ার!' (Fire') বলিয়া খবর দাও, অমনি মুহূর্তের মধ্যে আগুনস্টেশনের সাড়া শুনিবে—'কোথায় আগুন?' বাস্! এক মিনিটের মধ্যে ঢং ঢং শব্দে দমকল ছুটিয়া বাহির হইবে। সে শব্দ শুনিলে রাস্তার গাড়ি ঘোড়া মোটর সাইকেল সব শশব্যস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয়। যাহারা আগুনের পল্টনে কাজ করে, তাহাদের শিক্ষা এবং সাহস দুই দরকার। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহাদের বীরত্বের অনেক আশ্চর্য কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

বড় বড় আগুনের দৃশ্য একদিকে যেমন ভয়ানক, আর একদিকে তেমনি সুন্দর। আগুনে সহর বাড়ি পুড়াইয়া কত মানুষের সর্বনাশ করে, তাহাতে মানুষ হাহাকার করে, আবার সেই আগুনেরই প্রচণ্ড গম্ভীর তেজ দেখিয়া বিস্ময়ে মানুষ অবাক হইয়া থাকে। এম্‌ডেন (Emden) নামে জার্মানদের একটা যুদ্ধ জাহাজ কয়েকদিন বঙ্গসাগরে ভারি উৎপাত করিয়াছিল। সেই জাহাজের একটা গোলা মান্দ্রাজের একটা প্রকাণ্ড কেরোসিনের চৌবাচ্চায় পড়িয়া সমুদ্রের ধারে যে অগ্নিকাণ্ড লাগাইয়াছিল 'তামাসা' হিসাবে সে দৃশ্য নাকি অতি চমৎকার হইয়াছিল! আর কেরোসিনের জন্ম

যেখানে—সেখানে ব্যবসার জন্য খনি খুঁড়িয়া, কুয়া বসাইয়া, কেরোসিনের হ্রদ বিল ও আর বর্ণনা হয় না। পেটুক আগুন তখন মনের মতো খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ মণ কেরোসিন ধু ধু করিয়া জ্বলিতে থাকে তখন ব্যাপারটি যে কেমন হয়, তাহার আর বর্ণনা হয় না। পেটুক আগুন তখন মনের মতো খোরাক পাইয়া উল্লাসে লক্ষ লক্ষ জিভ মেলিয়া ধোঁয়ার হুংকার ছাড়িয়া স্বর্গ মর্ত্য গ্রাস করিতে চায়। তাহার কাছে লঙ্কাকাণ্ডই বা কি আর খাণ্ডব দাহনই বা লাগে কোথায়।

লাইব্রেরি

লাইব্রেরি মানে পুস্তকাগার বা কেতাবখানা—অর্থাৎ সেখানে বই রাখা হয়। আজকাল আমাদের দেশে সহরে গ্রামে নানা জায়গায় ছোট বড় নানারকম লাইব্রেরি দেখা দিয়েছে, সুতরাং লাইব্রেরি জিনিসটা যে কিরকম সেটা আর কাউকে বুঝিয়ে দেবার দরকার নাই।

পৃথিবীর বড় বড় লাইব্রেরির নাম করতে গেলে লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির নামটা নিশ্চয় করা উচিত। এই লাইব্রেরিতে সকল দেশের সকল সময়ের এবং সকলরকমের বই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আসিরিয়া বা অসুর দেশের রাজা অসুর-বানি-পালের আড়াই হাজার বছরের পুরনো লাইব্রেরি খুঁড়ে সেখান থেকে প্রায় বিশ হাজার ইঁটের পুঁথি এখানে এনে রাখা হয়েছে। তাতে তীরের ফলকের মতো খোঁচা-খোঁচা সব অক্ষর; সেই অক্ষর বুঝবার জন্য কত বড় বড় পণ্ডিতকে কত বছরের পর বছর ভাবতে হয়েছে। তাতে আসিরিয়া দেশের জ্যোতিষ পুরাণ ইতিহাস আইন আর ধর্মকর্মের কথা আছে, গল্পের বই কবিতার বই আছে, এমনকি লাইব্রেরির ক্যাটালগ বা বইয়ের ফর্দ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। তার চাইতেও অনেক পুরাতন পুঁথি কিছু কিছু আছে, সেগুলি বেবিলনিয়ার ভাষায় লেখা। তার মধ্যে একখানা পুঁথি প্রায় ৬ হাজার বছর আগেকার! পেপিরস গাছের নরম ছালের উপর ছবির অক্ষরে লেখা ইজিপ্টের পুঁথিও সেখানে অনেক আছে।

ভারতবর্ষের নানান ভাষার পুঁথি, যে-ভাষা এখন কেউ পড়তে পারে না সেই সব অজানা ভাষার পুঁথি, চীনেদের হিজিবিজি অক্ষরের সেই আদ্যিকালের পুঁথি, আফ্রিকা আমেরিকার অদ্ভুত ভাষার পুঁথি, পাথরে খোদাই করা পুঁথি, তামা লোহা ইঁট কাঠের পুঁথি, কাগজ কাপড় রেশম পশম চামড়া বাকলের পুঁথি, হাতের লেখা হাজার হাজার পুঁথি, আর লক্ষ লক্ষ ছাপান পুঁথি—ঐ এক লাইব্রেরির মধ্যে এই সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। লাইব্রেরিতে যে বইয়ের ফর্দ রয়েছে সেই ফর্দ লিখবার জন্যই প্রায় দেড়হাজার প্রকাণ্ড বড় বড় খাতার দরকার হয়েছে।

এই লাইব্রেরিতে পড়বার জন্য পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে বড় বড় পণ্ডিতেরা পড়বার ঘরে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের দরকারমত বই, বলবামাত্র চট্‌পট্‌ এনে দেবার জন্য দু-তিনশ কেরাণী কর্মচারী সমস্তক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি প্রায় দুশ বছরের পুরনো। অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরির বয়স প্রায় পাঁচশ বছর। তার আট লক্ষ ছাপান বই আর একচল্লিশ হাজার হাতের লেখা পুঁথির মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা অন্য কোথাও পাওয়া যায়

না। বিশেষত প্রথম যখন মুদ্রাযন্ত্র হয়, সেই সময়কার ছাপান চমৎকার সংগ্রহ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। প্যারিসের জাতীয় লাইব্রেরি (Bibliotheque Nationale) কেবল যে বয়সে ৭০০/৮০০ বৎসর তা নয়, তার আয়তনও লণ্ডনের লাইব্রেরির চাইতে বেশি ছাড়া কম নয়। এই লাইব্রেরিতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ ছাপান বই, হাতের লেখা এক লক্ষ পুঁথি, আড়াই লক্ষ মানচিত্র আর দশ লক্ষ ছবি সংগ্রহ করা হয়েছে। পূর্বদেশীয় প্রাচীন পুঁথির অর্থাৎ এসিয়ার নানা অঞ্চলের পুঁথির নানারকম দৃষ্টান্ত এখানে যেমন আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন নাই।

কিন্তু লাইব্রেরির চূড়ান্ত কাণ্ড যদি দেখতে হয় তবে আমেরিকায় যাওয়া দরকার। সেখানে ঠিক বৃটিশ মিউজিয়াম বা প্যারিস্ লাইব্রেরির মতো অত বড় লাইব্রেরি না থাকতে পারে কিন্তু যেগুলি আছে সেগুলিও বড় সামান্য নয়। আর তাদের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে পৃথিবীর আর কোথাও তেমন সুন্দর ব্যবস্থা দেখা যায় না। লাইব্রেরি যত বড়ই হোক, বইয়ের সংখ্যা দশ লাখই হোক কি বিশ লাখই হোক, যে-কোন বই চাইবামাত্র ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে যদি হাজির না হয় তবেই লাইব্রেরির দুর্নামের কারণ হয়। বই পেতে হলে কেবল তার নাম কিংবা নম্বরটি জানাতে হয়; অমনি লাইব্রেরিতে টেলিফোন করে দেয় আর দেখতে দেখতে তারের গাড়ি চড়ে বই এসে পড়বার ঘরে হাজির হয়। আমেরিকা কুবেরের দেশ, লক্ষপতি ক্রোড়পতি মহাজনের দেশ। লাইব্রেরির জন্য সে দেশে টাকার অভাব হয় না। সাধারণ লোকের ব্যবহারের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যেসব বড় বড় লাইব্রেরি আছে তেমন লাইব্রেরি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বস্টন পাবলিক লাইব্রেরিতে লোকে টাকা জমা দিয়ে বই পড়তে নেয়। এইরকমে প্রতিদিন কত বই আসছে যাচ্ছে বই-বিলির খাতায় তার হিসাব থাকে। সেই হিসাবে দেখা যায় যে এক বৎসরে পনের লক্ষ বার সেখানে বই বিলি করা হয়েছে!

পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে জাঁকাল লাইব্রেরি হচ্ছে আমেরিকান কংগ্রেস লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির বাড়িটার জন্যই সওয়া দুকোটি টাকা খরচ হয়েছে। লাইব্রেরিতে চল্লিশ লক্ষ বই রাখার মতো জায়গা রয়েছে। লাইব্রেরির তদ্বিরের জন্য প্রতি বৎসর দশ বিশ লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ঘর বাড়ি আলমারি আসবাবপত্র সব এমনভাবে তৈরি যে আগুনে ভূমিকম্পে ঝড় বিদ্যুতে তার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। এমনকি, বইগুলো যাতে পোকায় না কাটতে পারে তার জন্য মোটা মোটা মাইনে দিয়ে লোক রাখা হয়—তাদের কাজ হচ্ছে কেবল পোকা ধ্বংস করবার জন্য নানারকম ব্যবস্থা করা।

একালের মতো প্রাচীনকালেরও অনেক বড় লাইব্রেরির নাম শোনা যায়। আসুরবানি-পালের লাইব্রেরি আর বেবিলনিয়ার লাইব্রেরির কথা আগেই বলা হয়েছে। তার চাইতেও আধুনিক সময়ে অর্থাৎ প্রায় দু হাজার বছর আগে গ্রীকদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির নাম খুব শোনা যেত।

এই লাইব্রেরির উপর রাজাদের খুব অনুগ্রহ ছিল, তাঁরা নানারকমে তার সাহায্য করতেন। বিদেশী জাহাজে যদি কখনও পুঁথি পাওয়া যেত, তাহলে সেই পুঁথিগুলো রেখে তার নকল দিয়ে জাহাজকে বিদায় করা হত। ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে নানা দেশ থেকে নানারকমের পুঁথি নিয়ে আসা হত। এথেন্সে দুর্ভিক্ষের সময়ে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে শস্য জোগান হয়েছিল এবং তার দাম হিসাবে এথেন্সের ভাল ভাল সরকারী বই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরিতে ভর্তি করা হয়েছিল। গ্রীকদের এই লাইব্রেরিটির সঙ্গে রোমানদের পার্গেমাম লাইব্রেরির ভারি রেষারেষি ছিল। রোমানরা

তাদের লাইব্রেরি বাড়াবার জন্য লোকের উপর অত্যাচার করত, জবরদস্তি করে যার তার পুঁথি কেড়ে নিয়ে যেত, এমনকি গ্রীকদের লাইব্রেরি থেকে লোক ভাগিয়ে নেবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করত।

সে সময়ে কাগজের সৃষ্টি হয়নি, খালি পেপিরসের ছালকে পিটিয়ে লম্বা লম্বা 'রোল্' বা থান তৈরি হত। সেইগুলোতে লিখে লাটাইয়ের মতো গুটিয়ে লাইব্রেরিতে বই বলে জমা করা হত। রোমানদের জব্দ করবার জন্য গ্রীকেরা এই পেপিরসের চালান বন্ধ করে দেয়। রোমানরা তখন অনেক চেষ্টা করে চামড়া থেকে একরকম পাতলা কাগজের মতো জিনিস (পার্চমেণ্ট) তৈরি করে তাই দিয়ে পুঁথি বানাতে শেখে।

নৌকা

আমি একজন ছেলের কথা জানিতাম, সে কখনও নৌকা দেখে নাই। ইংরাজি বইয়ে সে ছবি দেখিয়াছিল এবং নৌকা যে জলে ভাসে এটুকুও তাহার জানা ছিল; কিন্তু সত্যিকারের নৌকা কখনও সে চোখে দেখে নাই। আশা করি সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের এমন কেউ নাই যাহাকে, নৌকা জিনিসটা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া বলা দরকার। এই আমাদের দেশেই নদী নালায় খালে বিলে কত রকম-বেরকম নৌকা দেখা যায়। ভারি ভারি বজরা, ছোট ছোট ডিঙি, লম্বা লম্বা ছিপ্—এক একটা এক-একরকম।

গাড়ি তৈয়ারি করিবার আগেই বোধহয় মানুষ নৌকা তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছিল। এখনও অনেক অসভ্য জাত দেখা যায়, তাহারা গাড়ি ঘোড়ার ব্যবহার জানে না কিন্তু নৌকা বানাইতে জানে। তাহার কারণ, ডাঙায় মানুষ যেমন ইচ্ছা হাঁটিয়া যাইতে পারে, গাড়ি চড়িবার দরকার সে বোধ করে না, সে কথাটা তাহার মাথায়ও আসে না। কিন্তু নৌকা না হইলে জলের মধ্যে কতটুকুই বা যাওয়া আসা চলে? সেইজন্য মানুষের এমন একটি জিনিসের দরকার যাহা জলে ভাসে এবং যাহার উপর চড়িয়া এদিক ওদিক চলা ফিরা করা যায়।

সব চাইতে সহজ নৌকা কলার ভেলা! তোমরা হয়ত তাহাকে নৌকা বলিতেই আপত্তি করিবে; কিন্তু তাহাতে নৌকার কাজ যে চমৎকার চলিয়া যায়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে যদি তুমি সৌখিন লোক হও আর কাপড়-চোপড় কিংবা হাত-পা ভিজাইতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আট দশটা ভেলার উপর মাচা বাঁধিয়া তুমি অনায়াসে একটু আরাম করিয়া বসিতে পার। আর ভেলারই বা দরকার কি? চার কোণে চারটি কলসী বা জালা বাঁধিয়া লইলেই ত চমৎকার হয়। কিন্তু সাবধান! কোথাও গুঁতা লাগিয়া যদি ফুটা হইয়া যায়, তবেই কিন্তু বিপদ! একটা বড়রকমের গামলা পাইলে তাহাতেও নৌকার কাজ বেশ ভালরকমেই চলিতে পারে।

আমি এগুলি কিছুই কল্পনা করিয়া বলিতেছি না।

যতরকমের বর্ণনা দিলাম সবরকমের নৌকারই রীতিমত ব্যবহার হইতে দেখা যায়। পেরু প্রভৃতি অনেক দেশে এবং অস্ট্রেলিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ভেলার উপর লতাপাতা ও ডালপালা দিয়া মাচা খাটান হয় অথবা খড়ের গদি বানাইয়া বসিবার চৌকি বানান

হয়। মেসোপটেমিয়ার লোকেরা এখনও গোল গোল গামলায় চড়িয়া বড় বড় নদী পার হইয়া যায়। জলের উপর মাচা ভাসাইবার জন্য বড় বড় জালাও সে দেশে ব্যবহার করে।

অনেক দেশেই বড় বড় গাছের গুঁড়ি লম্বালম্বি চিরিয়া তার মাঝখানটা ফাঁপা করিয়া নৌকা বানান হয়। যাহারা অস্ত্রের ব্যবহার জানে তাহারা চেরা গাছের পেট কুরিয়া খোল বানায়। যাহাদের সে বিদ্যাও নাই তাহারা কাঠের মাঝখানটা পোড়াইয়া পোড়াইয়া গর্ত করিয়া ফেলে। কিন্তু বোধহয়, বেশির ভাগ নৌকাই আল্‌গা তক্তা জোড়া দিয়া বানাইতে হয়।

পুরীর সমুদ্রে জেলেরা যে কাটামারন ব্যবহার করে, কোন সভ্যদেশের কোন নাবিক তাহাতে চড়িয়া সমুদ্রে নামিতে সাহস পাইবে কিনা সন্দেহ। কতগুলি আল্‌গা কাঠ নারকেলের দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহারা নৌকা বানায় আর সেই নৌকায় চড়িয়া এক মাইল দেড় মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে অনায়াসে চলিয়া যায়।

সমুদ্রে ব্যবহারের জন্য অনেক জাহাজের সঙ্গে বড় বড় নৌকা লওয়া হয়। হঠাৎ জাহাজের কোন বিপদ হইলে লোকেরা জাহাজ ছাড়িয়া নৌকায় করিয়া সমুদ্রে নামে। এই সমস্ত নৌকাকে Life boat অর্থাৎ 'প্রাণ-বাঁচান নৌকা' বলে। জাহাজ বেশিরকম জখম হইলে অনেক সময় নৌকা নামান অসম্ভব হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বার্থ সাহেব একরকম হালকা নৌকা বানাইয়াছেন, তাহাকে মুড়িয়া রাখা যায় এবং জলে ফেলিয়া দিলে আপনি ভাসিতে থাকে। নাবিকেরা তখন তাহার আশে-পাশে সাঁতরাইয়া জলের মধ্যেই নৌকা খাটাইয়া ফেলে।

এইবার আমাদেরই দেশের একটা অদ্ভুত 'নৌকা'র কথা বলিয়া শেষ করি। ভিস্তিওয়ালা আস্ত জন্তুর চামড়া দিয়া যে 'মশক' বানায়—সেই যে যাহার মধ্যে সে জল পুরিয়া রাখে—তাহা দেখিয়াছ ত? ঐরকম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশকে বাতাস ভরিয়া ফুটবলের মতো ফুলাইয়া পঞ্জাব অঞ্চলের লোকে অনেক সময় নদী পার হইয়া থাকে। নৌকাটির চেহারা কিরকম বীভৎস হয়, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

ব্যস্ত মানুষ

অসভ্য মানুষ যে কাজ নিজের হাতে করে, সভ্য মানুষে তারই জন্যে কলকব্জার ব্যবহার করে। গ্রীষ্মকালের এই যে গরম যার জন্য কতকাল ধরে লোকে নানারকম হাত-পাখার ব্যবহার করে এসেছে, এই গরমে কলে-চালান বিদ্যুতের পাখা না হলে আর আজকালকার মানুষের মন ওঠে না। যে মানুষ এক সময় পায়ে হেঁটে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াত সেই মানুষ এখনকার যুগে গাড়ি-ঘোড়া চড়েও সন্তুষ্ট নয়, কত সাইকেল মোটর ট্রাম রেল, কত বাষ্প বিদ্যুতের কারখানা করে তবে তার চলা-ফেরা করতে হয়। এক সময় দিনে পঞ্চাশ মাইল গেলে সে ভাবত 'খুব এসেছি'। এখন এরোপ্লেনে চড়ে ঘণ্টায় ১০০ মাইল গিয়েও সে বলছে, 'এখনও হয়নি'।

এইসকল কলকব্জার দৌলতে একদিকে মানুষের সুখ হয় আরাম হয়, সময় আর পরিশ্রম বাঁচে, আর একদিকে হাঙ্গামাও বাড়ে, নূতন নূতন বিপদেরও কারণ দেখা দেয়। কলকারখানার চিম্‌নির ধোঁয়ায় সহরের বাতাসকে বিষাক্ত করে মানুষের

স্বাস্থ্য নষ্ট করে; রাস্তায় মোটরের উৎপাতে নিরীহ পথিক চাপা পড়ে; জলে স্থলে আকাশে নানারকম নূতন দুর্ঘটনায় নূতন নূতন ভয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তবু লাভ-লোকসানের হিসাব করে মানুষ সর্বদাই বলে 'লাভের চেয়ে লোকসান অনেক কম'। একশ বছর আগে এখান থেকে বিলাত যেতে তিন মাস চার মাস, কখনও বা আরও বেশি সময় লাগত। এখন ১৬/১৭ দিনে যাওয়া যায়। এরোপ্লেনের বন্দোবস্ত হলে ৪/৫ দিনে যাওয়া যাবে। কিন্তু সে বন্দোবস্ত হতে না হতে এখনই ভাবতে বসেছে, তার চাইতেও ভালো ব্যবস্থা সম্ভব কি না অর্থাৎ আজকে কলকাতায় ভাত খেয়ে বেরুলাম, কাল রাত্রে লণ্ডনে গিয়ে ঘুমোলাম, এইরকম বন্দোবস্ত হয় কিনা!

একখানা বাড়ি বানাতে কত সময় লাগে? এখন আমেরিকায় শুনতে পাই, সাত দিনের মধ্যে নাকি বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। যারা তৈরি করে তাদের নমুনা-মতো নক্সা পছন্দ করে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াও—আট দশ দিন বাদে ঘুরে এসে দেখবে, তোমার জন্যে দিব্যি দোতলা দালান তৈরি হয়ে আছে। ঢালাই-করা পাথর জমিয়ে এইসব বাড়ি তৈরি হয়। ঢালাই করবার জন্যে নানারকম তৈরি-ছাঁচ মজুত রাখতে হয়। বাড়ি করতে হলে আগে ছাঁচগুলো খাটিয়ে এক একটা ফাঁপারকমের কাঠাম তৈরি হয়। তারপর সেই ছাঁচের ভিতরে পাথুরে মশলা ঢেলে দেয়। দুই দিনের মধ্যে মশলা জমে পাথর হয়ে যায়। এইরকমে এক একখানা আস্ত দেয়াল, আস্ত ছাদ বা মেজে তৈরি করে তারপর সেগুলোকে কল দিয়ে তুলে খাটিয়ে বসালেই বাড়ি হয়ে গেল।

এমনি করে মানুষ একদিকে কাজের সময়টাকে খুব সংক্ষেপ করে আনছে আর একদিকে দূরের জিনিসকে সে আর দূরে থাকতে দিচ্ছে না। পৃথিবীর এ-পিঠে আমরা বসে আছি, আর বারো হাজার মাইল দূরে ও-পিঠের মানুষরা আমেরিকায় বসে কি করছে, প্রতিদিন তার খবর পাচ্ছি। কোথায় যুদ্ধ হল, কোথায় জাহাজ ডুবল, কোথায় মানুষের কি নূতন কীর্তির কথা জানা গেল, অমনি 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হয়ে দেশবিদেশে খবর ছুটল—আমরা সকালে উঠে দিব্যি আরামে নিশ্চিন্তে বসে খবরের কাগজে তার সংবাদ পড়লাম। কিন্তু এতেও কি মানুষের মন ওঠে? মানুষে চেষ্টা করছে, খবরের সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি শুদ্ধ টেলিগ্রামে পাঠাতে। 'চেষ্টা করছে'ই বা বলি কেন—সত্যি করেই টেলিগ্রামে ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এই যন্ত্রের এক মাথায় ছবি বসিয়ে তার উপর গ্রামোফোনের মতো ছুঁচের কলম বুলিয়ে যায়, আর ২০০/২৫০ মাইল দূরে আরেক মাথায় সেই ছবির অবিকল নকল উঠে যায়। কয়েক বৎসর আগে বিলাতের 'ডেইলি মিরার' কাগজের জন্যে লণ্ডন থেকে ম্যানচেস্টার (প্রায় ২০০ মাইল দূর) এইরকম করে ছবি পাঠান হয়েছিল। সেই সময়ে এই ছবি পাঠাতে প্রায় ১৫ মিনিট লেগেছিল। আজকাল এর চাইতেও কম সময়ে আরও ভাল ছবি পাঠাবার যন্ত্র তৈরি হয়েছে। হয়ত আরও কয়েক বছর পরে বিলাত থেকে এদেশে ছবি পাঠাবার এইরকম বন্দোবস্ত হতে পারবে। ততদিনে হয়ত বিলাতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবারও ব্যবস্থা হবে। তোমরা যদি কেউ সে সময়ে বিলাত যাও, তাহলে এ দেশের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলা ত চলবেই, তারা তোমার চেহারা দেখতে চাইলে অমনি ছবি তুলিয়ে টেলিগ্রাম করলেই তোমার সেই দিনকার টাট্‌কা ছবি দেখতে দেখতে এসে পড়বে।

একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একরকম দ্রুত ডাকের যন্ত্র বানিয়েছেন, তাতে চিঠি-বোঝাই গাড়িগুলো তার-বাঁধান বিদ্যুতের পথের উপর উড়ে উড়ে চলে। এই উড়ুক্কু গাড়ি নাকি ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ছুটতে পারে! পঞ্চাশ মণ ওজনের একটা গাড়িকে

অনায়াসেই শ‍ূন্যে ঝ‍ুলিয়ে পার করা যায়। আজকালকার ডাকের গাড়ি এখান থেকে বর্ধমান যেতে না যেতেই এই গাড়ি একেবারে কাশীতে গিয়ে হাজির হবে।

পরিশ্রমের কাজ কিংবা কুলিমজ‍ুরের হাতের কাজ, যার জন্যে খ‍ুব বেশি ব‍ুদ্ধি খরচ করতে হয় না, সেগ‍ুলো না হয় কলে করা গেল। কিন্তু যাতে মাথা ঘামিয়ে ব‍ুদ্ধি খরচ করে পদে পদে হিসাব করতে হয়, তেমন কাজ কি কলে হতে পারে? হাঁ, তাও পারে—যেমন, অঙ্কের কল বা পাটিগণিত যন্ত্র। এই যন্ত্রে বড় বড় অঙ্কের যোগফল আপনা থেকেই বলে দেয়। বড় বড় কারখানার জমাখরচের হিসাব এই কলের সাহায্যে চট্‌পট্‌ বার করে ফেলা হয়। কলের মধ্যে কাগজ বসিয়ে ঠিক 'টাইপরাইটারে'র মতো চাবি টিপে টিপে অঙ্কগ‍ুলো লিখে যাও—তারপর ডানদিকের হাতলখানা চেপে দিলেই আপনা থেকেই তার যোগফল কাগজের উপর ছাপা হয়ে যাবে। মান‍ুষে হিসাব করতে গিয়ে অনেক সময়ে ভুল করে, তাড়াতাড়িতে বড় বড় পণ্ডিত লোকেরও গোল বেধে যায়—কিন্তু কলের কাজ একেবারে নির্ভুল। অঙ্কটা যদি ঠিকমত দেওয়া হয়, কলের জবাবটাও ঠিক হবেই। কারণ কল কখন অন্যমনস্ক হয় না—তার হ‍ুঁসিয়ারির কোন ত্র‍ুটি হয় না। বড় বড় ব্যাঙ্কের হিসাব রেখে রেখে যারা পাকা হয়ে গেছে, এই কলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তারা পর্যন্ত হার মেনে যায়। তাদের কাজ অর্ধেকটুকু বা সিকিট‍ুকু হতে না হতেই কলের কাজ শেষ হয়ে যায়, আর সেটা ঠিক হল কিনা তাও দ‍ু-বার করে মিলিয়ে দেখবারও দরকার হয় না।

সমুদ্র বন্ধন

মান‍ুষ টেলিগ্রাফের কৌশল যখন আবিষ্কার করল, সে প্রায় একশ বছরের কথা। সেই সময় থেকে এই প‍ৃথিবীটার আষ্টেপ‍ৃষ্ঠে খ‍ুঁটি মেরে তার বসিয়ে মান‍ুষ দেশ বিদেশে খবর চালাচালি করবার ব্যবস্থা করে আসছে। তারের পথ দিয়ে বিদ‍্যুতের খবর চলে; সেই তার মান‍ুষ যেখান দিয়েই নিতে পেরেছে—সেখান দিয়েই খবর বলবার পথ খ‍ুলে গিয়েছে। কেবল ডাঙায় নয়, গভীর সম‍ুদ্রের ভিতর দিয়েও হাজার হাজার মাইল তার প‍ৃথিবীর এপার-ওপার জ‍ুড়ে ফেলেছে। সম‍ুদ্রের মধ্যে খোঁটা বসাবার যো নাই, এমন কিছ‍ু নাই যার সঙ্গে তার বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়—কাজেই সেখানে টেলিগ্রাফের তার বসাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে তারের দ‍ুই মাথা ডাঙায় রেখে বাকী সমস্ত তারটিকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া।

সত্তর বৎসর আগে যখন এইরকমভাবে ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তারের যোগ করবার প্রস্তাব হয়েছিল তখন লোকে সেটাকে পাগলের প্রস্তাব বলে ঠাট্টা করেছিল। অথচ এখন তার চাইতে বড় বড়, একটি নয়, দ‍ুটি নয়, অন্তত দ‍ু হাজার টেলিগ্রাফের লাইন সম‍ুদ্রের নীচে বসান হয়েছে। মান‍ুষের যত বড় বড় কীর্তি আছে তার মধ্যে এই সম‍ুদ্রবন্ধনের কীর্তিটা বোধহয় কারও চাইতে কম আশ্চর্য নয়। এর জন্য মান‍ুষকে যে কতরকম বাধাবিপদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে ২৫/৩০ মাইল সম‍ুদ্রের ফারাক; সে সম‍ুদ্রও খ‍ুব গভীর নয়। ১৮৫০ খ‍ৃষ্টাব্দে যখন অনেক হাজার টাকা খরচ করে এইট‍ুকু সম‍ুদ্রের

মধ্যে তার ফেলা হল আর সেই তার দিয়ে এপার-ওপার খবর চলাচল হল—তখন টেলিগ্রাফ কোম্পানির মধ্যে খুবই উৎসাহ হয়েছিল। কিন্তু সে উৎসাহ চব্বিশ ঘণ্টার বেশি থাকেনি। কারণ, একটা দিন যেতে না যেতেই জেলে-জাহাজের জালের টানে তারের লাইন ছিঁড়ে নিয়ে খবর আসা বন্ধ হয়ে গেল। পরের বছর আবার দুই লক্ষ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে আরো মোটা আর মজবুত তার বানিয়ে নূতন লাইন বসান হল। সেই তারে অনেকদিন বেশ কাজ চলবার পর লোকের মনে বিশ্বাস হল যে—হ্যাঁ, ছোটখাট সমুদ্রের মধ্যে তার বসান চলতে পারে।

পরের বৎসর ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড থেকে আয়ার্লণ্ড পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন বসাবার জন্য তিনবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনবারই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুবার জোয়ার-ভাঁটার বিষম টানে পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে তারের লাইন ভেঙে-চুরে ভেসে গেল। আর তৃতীয়বারে তারের জাহাজ সমুদ্রের ওপারে পৌঁছবার আগেই সব তার ফুরিয়ে গেল—তারের আগাটা সমুদ্রেই পড়ে গেল—আয়ার্লণ্ড পর্যন্ত আর পৌঁছলই না। যা হোক, চতুর্থবারের চেষ্টায় আইরিশ সমুদ্রের ভিতর দিয়ে নিরাপদে তারের লাইন বসান হল। তারপর দেখতে দেখতে পাঁচ দশ বছরের মধ্যে ইউরোপ আমেরিকায় অনেক দেশেই সমুদ্রের ভিতরে, পঁচিশ পঞ্চাশ বা একশ মাইল পর্যন্ত লম্বা তার বসান হয়ে গেল। তখন ইংলণ্ডের এক টেলিগ্রাফ কোম্পানি সাহস করে বলল, "আমরা অতলান্তিক মহাসাগরের ভিতর দিয়ে ইংলণ্ড থেকে আমেরিকা পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসাব।"

লোকে বলল, "সে কি কথা! অতলান্তিকের ওপার যে দু হাজার মাইল দূর! সেখানকার সমুদ্র যে তিন মাইল গভীর! সমুদ্রের নীচটা উঁচুনীচু পাহাড়ের মতো, তাতেই যে হাজার মাইল তার খেয়ে যাবে! অসম্ভব লম্বা তার, অসম্ভবরকম ভারি করাতে অসম্ভব খরচ—সবই অসম্ভব!" কিন্তু টেলিগ্রাফ কোম্পানির যাঁরা পাণ্ডা তাঁরা কোমর বেঁধে বসলেন, অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। কোম্পানির মূলধন হল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। একুশ হাজার মাইল লম্বা তামার তারকে দড়ির মতন পাকিয়ে পাকিয়ে, তার উপর আঙুলের মতো পুরু করে রবারের প্রলেপ দিয়ে, তার উপর সাড়ে তিন লক্ষ মাইল লোহার তার পেঁচিয়ে টেলিগ্রাফের লাইন তৈরি হল। এই সমস্ত তার যদি একটানা সোজা করে বসান হত, তাহলে পৃথিবীটাকে প্রায় চোদ্দবার পাক দিয়ে বেঁধে ফেলা যেত—কিংবা এখান থেকে চাঁদ পর্যন্ত পৌঁছান যেত! লাইনের ভিতরকার তামার তারটুকু দিয়েই বিদ্যুৎ চলে; রবারের কাজ কেবল বিদ্যুৎটাকে তারের মধ্যে আটকে রাখা। লোহার প্যাঁচাল তারটুকু হল বর্ম। ওটা না থাকলে পাহাড়ের ঘষায় স্রোতের ধাক্কায় জলজন্তুর উৎপাতে দুদিনে তার নষ্ট হয়ে যায়—গভীর জলে লাইন বসাতে গিয়ে আপনার ভারে তার আপনি ছিঁড়ে যায়। সমস্ত লাইনটির ওজন হল সত্তর হাজার মণ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে দুই জাহাজ বোঝাই তার আমেরিকার দিকে রওনা হল। তারের এক মাথা আয়ার্লণ্ডের তীরের উপর রেখে কোম্পানির জাহাজ পশ্চিম মুখে তার ফেলতে ফেলতে চলল। বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে তারের কুণ্ডলী জড়ান রয়েছে। ক্রমাগত ঘষায় ঘষায় তারের লাইন গরম হয়ে ওঠে, তাই চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখতে হয়। জাহাজের উপর 'ব্রেক' বসান, তাতে তারটাকে ওজনমত টেনে ধরে,—পাছে হুড়্হুড়্ করে সব তার বেরিয়ে যায়। জাহাজ যদি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল যায়, তাহলে সমুদ্রের উঁচুনীচু হিসাব বুঝে, ঘণ্টায় ৬ মাইল কি ৭ মাইল তার ছাড়তে

হয়। আবার বেশি টান পড়লে পাছে তার ছিঁড়ে যায় সেজন্য তারের 'টান্' মাপবার জন্য একটা যন্ত্র আছে। টান বেশি হলেই ব্রেক ঢিলা করে দেয়। তারের ভিতর দিয়ে দিনরাত ডাঙার সঙ্গে জাহাজের সংকেত চলতে থাকে। হঠাৎ কোথাও তার ছিঁড়ে গেলে বা জখম হলে অমনি সে সংকেত বন্ধ হয়ে যায়। তাহলেই জাহাজের লোকেরা বুঝতে পারে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। তখন আবার তার গুটিয়ে গুটিয়ে, সেই জখম জায়গা পর্যন্ত ফিরে গিয়ে, নষ্ট লাইন মেরামত করতে হয়।

এমনি সমস্ত আয়োজন করে কোম্পানির জাহাজ রওনা হল। কিন্তু পাঁচ মাইল যেতে না যেতেই হঠাৎ কোথায় টান লেগে তারের লাইন ছিঁড়ে গেল। তখন ফিরে এসে তীরের দিক থেকে সমস্ত তারটিকে টেনে টেনে, তার ভাঙা মুখ বার করে তার সঙ্গে নূতন তার জুড়ে জাহাজ আবার পশ্চিমে চলল। দু-তিন দিন নিরাপদে চলতে চলতে প্রায় চারশ মাইল তার বসাবার পর হঠাৎ ব্রেক কষাবার দোষে তার ছিঁড়ে আড়াই মাইল গভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল। জাহাজের লোকে হতাশ হয়ে বন্দরে ফিরে চলল, কোম্পানির সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মাল (৪০০ মাইল তার) সমুদ্রের নীচেই পড়ে রইল।

পরের বৎসর আবার নূতন করে চেষ্টা আরম্ভ হল। এবার স্থির হল এই যে, সমুদ্রের মাঝখানে দুই জাহাজের তারের মুখ একত্র করে তারপর দুই জাহাজ দুই দিকে তার বসিয়ে চলবে—একটা যাবে আমেরিকার দিকে, আরেকটা আয়ার্লণ্ডের দিকে। মাঝ সমুদ্রে যাবার পথে এমন ঝড় উঠল যে তেমন ঝড় খুব কমই দেখা যায়। সপ্তাহ ভরে ঝড়ের আর বিরাম নাই। তারের ভারে বোঝাই জাহাজ ঝড়ের ধাক্কায় ডোবে-ডোবে অবস্থায় সমুদ্রের মধ্যে নিরুপায় হয়ে মাতালের মতো টলতে লাগল। অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ষোল দিন পর তারা মাঝ সমুদ্রে হাজির হল। তারপর এর-লাইন ওর-লাইনে জুড়ে দিয়ে তারা দুইজনে দুই মুখে চলল। তারের ভিতর দিয়ে এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজ পর্যন্ত বিদ্যুতের সংকেত চলছে—কিন্তু চল্লিশ মাইল পার না হতেই হঠাৎ সংকেত বন্ধ হয়ে গেল, এক জাহাজ থেকে আরেক জাহাজের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। আবার দুই জাহাজ মুখোমুখি হয়ে তারের সঙ্গে তার জুড়ে দুই দিকে ছুটল। এবারের দৌড় একশ মাইল। তারপরেই আর সাড়া শব্দ নাই—আবার কোথায় লাইন ফেঁসে গেছে! আরম্ভেই দুই-দুইবার ব্যাঘাত পেয়ে আর নানারকমে নাকাল হয়ে জাহাজ আবার নিরাশ হয়ে ফিরে এল। লাভের মধ্যে, 'কোম্পানির মাল, দরিয়ামে ঢাল।'

এইবার কোম্পানির উৎসাহ প্রায় নিভে এসেছিল। অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে, এ অসম্ভব কাজের পিছনে আর অনর্থক টাকা নষ্ট করা উচিত নয়। কোম্পানির বড় বড় পাণ্ডারা পর্যন্ত বলতে লাগলেন, এখন তারের লোহালক্কর সব বিক্রি করে টেলিগ্রাফ কোম্পানির কারবার বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। কেবল দু-একজন উৎসাহী লোক বলল যে, তারা এখনও হার মানতে প্রস্তুত নয়। শেষটায় সেই দু-একজনেরই বিশেষ চেষ্টায়, সেই বছরেই আর-একবার প্রাণপণ আয়োজন করে, অনেকরকম হাঙ্গামার পর আয়ার্লণ্ড থেকে আমেরিকা পর্যন্ত নিরাপদে লাইন বসান হল—টেলিগ্রাফ কোম্পানির জয়-জয়কার পড়ে গেল। তখন এদেশের সিপাহী বিদ্রোহ সবেমাত্র শেষ হয়েছে—কিন্তু সে খবর তখনও আমেরিকায় পৌঁছায়নি। বিদ্রোহের জন্য কানাডা থেকে দুই দল ইংরাজ সৈন্য এ দেশে আসবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারের লাইন বসান হতেই ইংলণ্ড থেকে খবর গেল, 'সৈন্য পাঠাবার দরকার নাই।' ঐ খবর যদি

না যেত তাহলে মিছামিছি সৈন্য পাঠিয়ে, গভর্নমেণ্টের অন্তত সাত লক্ষ টাকা খামখা বাজে খরচ হয়ে যেত। এই কথাটা প্রচার হওয়াতে টেলিগ্রাফ কোম্পানির খুব বিজ্ঞাপন হয়ে গেল। সমুদ্র পার করে টেলিগ্রাফ পাঠাবার সুবিধা যে কি, মানুষকে তা বোঝাবার জন্য আর বেশি ব্যাখ্যা বা বক্তৃতার দরকার হল না। তুমুল উৎসাহে টেলিগ্রাফ কোম্পানিব ব্যবসার আরম্ভ হল।

কিন্তু হায়! কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই টেলিগ্রাফের সাড়া ক্ষীণ হতে হতে একদিন একেবারেই সব বন্ধ হয়ে গেল—এপারের বিদ্যুৎ আর ওপারে পেঁছায়ই না। এত সাধের টেলিগ্রাফ-লাইন, তার কিনা এই অকাল মৃত্যু—তিন মাসও তার আয়ু হল না। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে বললেন যে, তারের মধ্যে যে বিদ্যুৎ চালান হয়েছে—সেই বিদ্যুতের তেজ খুব বেশি হওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

তারপর সাত বৎসর গেল আবার নূতন করে লাইন বসাবার আয়োজন করতে। অনেকরকম আলোচনা আর পরীক্ষার পর, আরও মজবুত করে নূতন তার তৈরি হল। সেই তারের লাইন প্রশস্ত এক জাহাজে করে সমুদ্রে পাঠান হল। জাহাজ ৪৪ মাইল সমুদ্র পার হতেই বোঝা গেল, তারের মধ্যে কোথাও গলদ রয়ে গেছে। সেটা খুঁজে মেরামত করে তারপর ৭০০ মাইল পর্যন্ত বিনা উৎপাতে গিয়ে আবার এক মারাত্মক গলদ। আবার অনেক মাইল তার গুটিয়ে নিয়ে তারপর এক জায়গায় প্রকাণ্ড জখম পাওয়া গেল। সেইটুকু দেখে মেরামত করতে প্রায় দশ ঘণ্টা সময় নষ্ট হল। প্রায় ১২০০ মাইল যাবার পর আবার সেইরকম বাধা। আবার সেই গভীর সমুদ্র থেকে তার টেনে তুলে, কোথায় দোষ আছে খুঁজে বার করে মেরামত করতে হবে। কিন্তু এবারে মাইলখানেক তার গুটিয়ে তুলতেই বাকী তারটুকু চোখের সামনেই পট্ করে ছিঁড়ে জলের মধ্যে ফস্কে পড়ল।

জাহাজের কর্তারা পরামর্শ করলেন, আঁকড়াষি দিয়ে ঐ তার তুলতে হবে। প্রকাণ্ড লোহার শিকলের আগায় অদ্ভুত নখ-ওয়ালা যন্ত্র ঝুলিয়ে, তাই দিয়ে নাবিকেরা সমুদ্রের তলায় হাতড়াতে লাগল। একবার মনে হল আঁকড়াষিতে তার আঁক্‌ড়িয়েছে—অমনি টানাটানির ধুম পড়ে গেল। প্রায় আড়াই মাইল গভীর সমুদ্র, তার নীচ পর্যন্ত শিকল নেমেছে, সে শিকল গুটিয়ে তোলা কি সহজ কথা! এক হাত দু হাত, দশ হাত বিশ হাত, একশ হাত দুশ হাত, এমনি করে প্রায় মাইলখানেক শিকল তুলবার পর তারে-গাঁথা আঁকড়াষি-শুদ্ধ দেড়মাইল শিকল ছিঁড়ে জলের মধ্যে অন্তর্ধান! তখন মোটা শনের দড়ি দিয়ে আবার সমুদ্রের মধ্যে নূতন করে আঁকড়াষি ফেলা হল। তিন চারদিন ক্রমাগত চেষ্টার পর আবার তারের লাইন আঁকড়িয়ে পাওয়া গেল। কিন্তু এবারেও তুলবার সময় তারের ভারে দড়িদড়া সব ছিঁড়ে আঁকড়াষিটা জলের ভিতর তলিয়ে গেল। তারপর আরও দুইখানা আঁকড়াষি এইরকমে হারিয়ে জাহাজের শিকল দড়ি সব প্রায় শেষ করে ইংলণ্ডের জাহাজ ইংলণ্ডেই ফিরে চলল।

এতদিনের আশা ভরসার পর এইরকম দুঃসংবাদ! কিন্তু মানুষের প্রতিজ্ঞার কি জোর! পরের বৎসর (১৮৬৬) সেই জাহাজ আবার নূতন তার বোঝাই করে নূতন উৎসাহে সমুদ্রে বেরুল—দুই সপ্তাহের মধ্যে সে জাহাজ সারা সমুদ্র লাইন বসিয়ে আমেরিকার টেলিগ্রাফ স্টেশন পর্যন্ত তার জুড়ে ফেলল। তখনকার আনন্দের কথা বর্ণনায় শেষ করা যায় না। কোম্পানির একজন এঞ্জিনিয়ার সে সময়ে লিখেছিলেন, "যখন তার বসান শেষ হল, তোপের গর্জন আর মানুষের আনন্দধ্বনির মধ্যে জাহাজের নাবিকেরা পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল, তখন গৌরবে আমারও

শরীরের রক্ত প্রবল বেগে আমার বুকের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কতগুলো লোক লাইনের তার ধরে নেচে নেচে গাইতে লাগল। কেউ কেউ পাগলের মতো তারটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। চোখের জলে আনন্দের কোলাহলে হাসিকান্না সব মিশিয়ে সকলে মিশে মহোৎসব লাগিয়ে দিল।”

এখানেও তাদের উৎসাহের শেষ হয়নি। সেই জাহাজ আবার ফিরে গিয়ে ১৮ দিন ধরে অজানা সমুদ্রের ভিতর হাতড়িয়ে, আগেরবারের সেই হারান লাইন উদ্ধার করে, সেই লাইনকেও আমেরিকা পর্যন্ত পেঁাছে দিল। এতদিনে, প্রায় চার কোটি টাকা নষ্ট করবার পর, কোম্পানির কারবারের পাকা প্রতিষ্ঠা হল।

শনির দেশে

কেউ যদি বলে যে, এই পৃথিবীর বাইরে যেখানে বলবে, সেখানে নিয়ে তোমাদের তামাশা দেখিয়ে আনবে—তাহলে তোমরা কোথায় যেতে চাও? আমি জানি, সেরকম হলে আমি নিশ্চয় শনিগ্রহে যেতে চাইব। পৃথিবীর আকাশে আমরা শুধু চোখে যতটুকু দেখতে পাই, তাতে মনে হয় যে, সব চাইতে সুন্দর জিনিস হল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে আর কিছু না হোক, এই পৃথিবীটাকে কেমন মস্ত আর জমকালো চাঁদের মতো দেখায়, সেটা নিশ্চয়ই একটা দেখবার মতো জিনিস। কিন্তু শনিগ্রহে যাবার পথে সেটা আমরা দেখে নিতে পারব।

যাক, মনে কর যেন শনিগ্রহে যাত্রা করাই স্থির হল। মনে কর এমন আশ্চর্য আকাশ-জাহাজ তৈরি হল যাতে পৃথিবী ছেড়ে, পৃথিবীর বাতাস ছেড়ে ফাঁকা শূন্যের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তোমার বয়স কত? দশ বৎসর? বেশ! তাহলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা স্বপ্ন-জাহাজে রওনা হলাম শনিগ্রহে যাবার জন্য। আমাদের জাহাজটা মনে কর খুব দ্রুত এরোপ্লেনের মতো ঘণ্টায় ১০০ মাইল বা ১২৫ মাইল করে চলে।

আমরা আকাশের ভিতর দিয়ে হু হু করে চলেছি আর পৃথিবীর ঘর বাড়ি সব ছোট হতে হতে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় সহর, বড় বড় নদী সব বিন্দুর মতো, রেখার মতো হয়ে আসছে। এই গোল পৃথিবীর গায়ে পাহাড় সমুদ্র, দেশ মহাদেশ ক্রমে সব অতি নিখুঁৎ ম্যাপচিত্রের মতো দেখা যাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাশে হলদে মরুভূমি, ঘন সবুজ বন, ঐ ছেয়ে-নীল সমুদ্র, ঐ সাদা সাদা বরফের দেশ। নভেম্বর মাসে আমরা, এখান থেকে চাঁদ যতদূর, ততদূর চলে গিয়েছি। এক বছরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আমরা প্রায় দশ লক্ষ মাইল এসে পড়েছি। পৃথিবী থেকে চাঁদটাকে যেমন দেখি এখন পৃথিবীটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। হিমালয় পাহাড়কেও আর পাহাড় বলে ভাল বোঝাই যাচ্ছে না। চাঁদের যেমন অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়, দিনেদিনে কলায় কলায় বাড়ে কমে, পৃথিবীরও ঠিক তেমনি। এমনি করে বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, কিন্তু কই? শনিগ্রহ ত একটুও কাছে আসছে বলে মনে হয় না। শুনেছিলাম সে এক প্রকাণ্ড গ্রহ, তার চারিদিকে আংটি ঘেরা। কিন্তু তোমার ত বিশ বছর বয়স হল, গোঁফদাড়ি বেরিয়ে গেল, এখনও ত সে সবের কিছুই দেখা গেল না! ঐ লাল

রঙের মঙ্গলগ্রহটা যেন একটুখানি কাছে এসেছে, কিন্তু সেও ত খুব বেশি নয়। আমাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতটি বলছেন, মঙ্গল পর্যন্ত পৌঁছতে আরও চল্লিশ বৎসর লাগবে। ও হরি! তাহলে শনিতে পৌঁছব কবে? শনি পর্যন্ত যেতে লাগবে প্রায় আটশ বৎসর! তাহলে উপায়? একমাত্র উপায়, আরও বেগে যাওয়া। আরও পাঁচ গুণ দশ গুণ বিশ গুণ বেগে কামানের গোলার মতো বেগে ঘণ্টায় দু হাজার মাইল বেগে ছুটতে হবে। তাই ছোটা যাক্।

আরও দুই বৎসরে মঙ্গল পর্যন্ত এসে পড়া গেল। ওখানে গিয়ে একবার নামলে মন্দ হত না। ঐ লম্বা লম্বা আঁচড়গুলো সত্যিকারের খাল কিনা, ওখানে সত্যি সত্যি বুদ্ধিমান জীব কেউ আছে কিনা, একটিবার খবর নেওয়া যেত। কিন্তু আমাদের ত অত অবসর নেই, যেমনভাবে চলছি এমনি করে চললেও শনিতে পৌঁছতে আরও অন্তত চল্লিশ বৎসর লাগবে। সুতরাং সোজা চলতে থাকি!

মঙ্গলের পথ পার হয়ে এখন বৃহস্পতির দিকে চলেছি। মাঝে মাঝে ছোট বড় গোলার মতো ওগুলো কি সামনে দিয়ে হুস্ করে ছুটে পালাচ্ছে? কোনটা দশ মাইল, বিশ মাইল, কোনটা একশ মাইল বা দুশ মাইল চওড়া—আবার কোনটা ছোটখাট ঢিপির মতো বড়, কোন কোনটা সামান্য গুলি-গোলার মতো। এরা সবাই গ্রহ। যে নিয়মে বড় বড় গ্রহরা সূর্যের চারিদিকে চক্র দিয়ে ঘোরে—এরাও প্রত্যেকেই, এমনকি যেগুলি ধূলিকণার মতো ছোট সেগুলিও, ঠিক সেই নিয়মেই নিজের নিজের পথে নিজের নিজের তাল বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে ছুটতে ছুটতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল, ছোট ছোট গ্রহগুলি আর যেন দেখাই যায় না। পৃথিবী সূর্যের আশেপাশে মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। সূর্যও দেখতে অনেকখানি ছোট্ট হয়ে গেছে—সেই পৃথিবীর সূর্য আর এ সূর্য যেন ফুটবলটার কাছে একটি ক্রিকেট বল। ক্রমে আরও আট দশ বছর ছুটে, গ্রহরাজ বৃহস্পতির চক্র পথের সীমানায় এসে হাজির হওয়া গেল। কোথায় পৃথিবী আর কোথায় বৃহস্পতি! ৩৬৫ দিনে পৃথিবীর এক বৎসর—কিন্তু বৃহস্পতি যে প্রকাণ্ড পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেই পথে একবার পাড়ি দিতে তার প্রায় বারো বৎসর সময় লাগে। ধোঁয়ায় ঢাকা প্রকাণ্ড শরীর—তার মধ্যে হাজারখানেক পৃথিবীকে অনায়াসেই পুরে রাখা যায়। অথচ এই বিপুল দেহ নিয়েই গ্রহরাজকে লাটিমের মতো ঘোরপাক খেতে হচ্ছে। এ কাজটি করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু বৃহস্পতির দশ ঘণ্টাও লাগে না। বৃহস্পতির চারিদিকে সাত-আটটি চাঁদ—তার মধ্যে চারটি বেশ বড় বড়—তিনটি আমাদের চাঁদের চাইতেও বড়।

বৃহস্পতির এলাকা পার হয়েছি। শনির আলো ক্রমে আরও উজ্জ্বল হয়ে আসছে—ক্রমে বোঝা যাচ্ছে যে, তার চেহারাটা ঠিক অন্য গ্রহের মতো নয়। মনে হয় কেমন যেন লম্বাটে মতন—দুপাশে যেন কি বেরিয়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখ তার গায়ের চমৎকার আংটিটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। পৃথিবী থেকে ছোটখাট দূরবীণ দিয়ে যেমন দেখেছি এখন শুধু চোখেই সেইরকম দেখতে পাচ্ছি। আংটিটা বাসনের কানার মতো, উকিলের শাম্‌লার ঘেরের মতো—খুব পাতলা আর চওড়া। শনিগ্রহকে আমরা যে দেখি, সব সময়ে ঠিক একরকম দেখি না—কখন একটু উঁচু থেকে, কখন একটু নিচু থেকে; কখন আংটির উপর দিকটা, কখন তার তলাটা, কখন সামনে ঝোঁকা, কখন পিছন-হেলান। যখন ঠিক খাড়াভাবে আংটির কিনারা থেকে দেখি, তখন আংটিটাকে দেখি সরু একটি রেখার মতো—এত সরু যে খুব বড় দূরবীণ না হলে

দেখাই যায় না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হল আমরা পৃথিবী ছেড়েছি—এখন আর আট-দশ বৎসর গেলে আমরা শনিতে পৌঁছব। ততদিনে তোমার চুল দাড়ি গোঁফ সব পেকে যাবে—তুমি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যাবে। শনিকে অনেকখানি ডাইনে রেখে আমরা ছুটে চলেছি। শনিও ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে ঐ বাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে, আর কয়েক বৎসর পরে সে ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হবে। সেও কিনা সূর্যের প্রজা, কাজেই সূর্যের চারদিকে তাকেও প্রদক্ষিণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের উনত্রিশটা বছরেও তার একটা পাক পুরো হয় না।

যাক্—এতদিনে পথের শেষ হয়েছে; আমরা শনিগ্রহের উপরে এসে পৌঁছেছি। 'আংটি'টার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ, আকাশের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যেন আলোর খিলান গেঁথে দিয়েছে। খিলানের মধ্যে খিলান, তার মধ্যে ঝাপসা আলোর আরেকটি খিলান। তার উপর আবার শনিগ্রহের ছায়া পড়েছে। সূর্যের এই প্রকাণ্ড রাজত্বের মধ্যে যতদূর যাও, এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখবে না—আমাদের পৃথিবীর দূরবীণের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যায়, এমন জিনিস আর দ্বিতীয় কোথাও পাওয়া যায়নি।

আকাশে কত চাঁদ! একটি নয়, দুটি নয়, একেবারে আট-দশটা চাঁদ—ছোট বড় মাঝারি নানারকমের। সওয়া দশ ঘণ্টায় এখানকার দিন রাত—ঘুমের পক্ষে ভারি অসুবিধা। দিনটিও তেমনি—পৃথিবীর রোদ এখানকার চাইতে একশ গুণ কড়া। পৃথিবী থেকে সূর্যকে যদি চায়ের পিরিচের মতো বড় দেখায়, তবে এখান থেকে তাকে দেখায় আধুলিটার মতো। যখন তখন চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ ত লেগেই আছে: তার উপর আবার থেকে থেকে চাঁদে চাঁদেও গ্রহণ লেগে যায়, এক চাঁদ আর-এক চাঁদকে ঢেকে ফেলে। এখানকার জন্য যদি পঞ্জিকা তৈরি করতে হয়, তবে তার মধ্যে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কেবল গ্রহণের হিসাব লিখতেই কেটে যাবে।

আংটিগুলি যেন অসংখ্য চাঁদের ঝাঁক—ছোট ছোট ঢিপির মতো, পাথরের ভেলার মতো, কাঁকড়ের কুচির মতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাঁদ কেউ কারও গায়ে ঠেকে না, আশ্চর্য নিয়মে প্রত্যেকে নিজের পথে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। আর সমস্তে মিলে আশ্চর্য সুন্দর আংটির মতো চেহারা হয়েছে।

এখন অসুবিধার কথাটাও একটু ভাবা উচিত। গরম বাতাস আর ধোঁয়ার ঝড় ত এখানে আছেই—তার উপর সব চাইতে অসুবিধা এখানে দাঁড়াবার মতো ডাঙা পাবার যো নাই—ডাঙা খুঁজতে গেলে অনেক হাজার মাইল গভীর গরম ধোঁয়াটে মেঘের সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিতে হবে। সেই মেঘের মধ্যে জীবজন্তু কেউ বাঁচতে পারে কিনা খুবই সন্দেহ। সুতরাং এখন কি করার উপায় দেখতে হবে।

এসেছিলাম কামানের গোলার মতন বেগে—কিন্তু তার চাইতে তাড়াতাড়ি চলা যায় কি? আলো চলে সব চাইতে তাড়াতাড়ি—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মাইল। তাহলে সেইরকম বেগে আলোর সওয়ার হয়ে ছোটা যাক্। পৃথিবীতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট।

লোহা

যে সমস্ত জিনিস মানুষে সর্বদা ব্যবহার করে, আজ যদি হঠাৎ তাহার কোনটির অভাব পড়িয়া যায়, তাহা হইলে ঠিক বোঝা যায়, কোন্ জিনিসটার যথার্থ মূল্য কতখানি! সোনা রূপা মণি মুক্তা সব যদি হঠাৎ একদিন পৃথিবী থেকে লোপ পায়, তবে অনেক সৌখিন লোকে হা-হুতাশ করিবে—মানুষের টাকা-পয়সার কারবারের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, রূপার অভাবে ফটোগ্রাফের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিবে এবং ছোটখাট অনেকরকমের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। কিন্তু তবু মানুষের জীবনযাত্রার কোন ব্যাঘাত হইবে না। বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যেমন চলিতেছিল, অনেকটা সেইরকমই চলিতে থাকিবে। কিন্তু তেমনিভাবে যদি লোহার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাটা আরও মারাত্মক হইবে। মানুষের কলকারখানা রেল পুল জাহাজ প্রভৃতি, সভ্য দেশে যাহা কিছু না হইলে চলে না, তাহার সমস্তই বন্ধ হইয়া আসিবে। মানুষের যে-কোন অস্ত্র বা যে-কোন যন্ত্র বল—বড় বড় কামান, এঞ্জিন বা মোটর হইতে লাঙল কোদাল কাঁটা পেরেক পর্যন্ত—সবটাতেই লোহার দরকার হয়। যার মধ্যে লোহা নাই এমনও অসংখ্য জিনিস তৈয়ারি করিবার সময়ে লোহার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। যে জিনিসে তাহারও দরকার হয় না, যেমন অনেক ডাক্তারি ওষুধ, সেখানেও অনেক সময়েই কয়লার চুল্লি জ্বালিতে হয় এবং সেই কয়লা ভাঙিয়া উঠাইবার জন্য খনিতে লোহার কোদাল আর অনেক কলকব্জার দরকার হয়। মানুষের সকলরকম কাজে যে সমস্ত তৈজস বা বাসনপত্রের দরকার হয়, তাহার সমস্তই খনিজ জিনিসের তৈয়ারি। সেই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কাজের উপযোগী করিয়া গড়িতেও লোহার দরকার হয়। ঘরের দরজা জানালা, কড়ি বরগা, আসবাবপত্র, এ সমস্ত কাঠের তৈয়ারি হইতে পারে, কিন্তু সেই কাঠকে কাটিয়া চিরিয়া চাঁচিয়া ঘষিয়া দরকারমত গড়িয়া লইবার জন্য পদে পদেই লোহার কুড়াল করাত র‍্যাঁদা বাটালি প্রভৃতি যন্ত্রের দরকার হয়।

পৃথিবীতে এমন দেশ নাই যেখানে লোহা পাওয়া যায় না। পথে ঘাটে, মাটিতে জলেতে, খুঁজিতে গেলে সর্বত্রই লোহা পাওয়া যায়। অথচ এক সময়ে লোকে লোহার ব্যবহার জানিত না, লোহা তৈয়ারি করিতে পারিত না। জল লাগিলে লোহায় মরিচা ধরিয়া যায়; লোহাধাতু আর লোহার মরিচা, দুটা এক জিনিস নয়। কিন্তু মরিচা বা 'লৌহমল' নানারকমে 'শোধন' করিয়া তাহা হইতে আবার খাঁটি লোহা বাহির করা যায়। যে সমস্ত খনিজ জিনিস হইতে লোহা তৈয়ারি করা হয়, সেগুলিও এইরকম মরিচা-জাতীয় জিনিস, অনেক হাঙ্গামা করিয়া তাহাদের শোধন না করিলে তাহা হইতে লোহা বাহির হয় না। সোনা রূপা ও তামা অনেক সময়ে খাঁটি ধাতুর আকারেও পাওয়া যায় এবং খনিজ অবস্থায় তাহাদের শোধনও লোহার চাইতে অনেক সহজ। সেইজন্য তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার শিখিবার পরেও মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত লোহা বানাইবার কৌশল বাহির করিতে পারে নাই।

একবার যদি কোথাও কোন লোহা বানাইবার কারখানায় যাও, তাহা হইলে

বুঝিতে পারিবে যে লোহার মতো সামান্য জিনিসের জন্যও মানুষকে কতখানি চিন্তা পরিশ্রম ও হাঙ্গামা করিতে হয়। আমাদের দেশে সাক্‌চিতে টাটা কোম্পানির লোহার কারখানা আছে—সেখানে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মণ লোহা আর ইস্পাত তৈয়ারি হয়। প্রকাণ্ড চিমনির মতো বড় বড় পাথরের চুল্লি, তাহার মধ্যে সারাদিন সারারাত আগুনের আর বিশ্রাম নাই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, রাবণের চিতার মতো সে আগুন জ্বলিতেই থাকে। একবার আগুন নিভিয়া গেলেই হাজার হাজার টাকার চুল্লি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে। তাই দিনরাত সেখানে কাজ চলিতেছে, চিমনির মুখ দিয়া আগুনের লাল জিভ সারাক্ষণ আকাশকে রাঙাইয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে চুল্লির ঢাকনি খুলিয়া, গাড়ী-বোঝাই কয়লা-মিশান লোহখনিজের মশলা চুল্লির মধ্যে ঢালিয়া দেয়—একেবারে বিশ ত্রিশ বা একশ-দুশ মণ। চুল্লির মধ্যে সেই সমস্ত মশলা গলিয়া পুড়িয়া তরল লোহা হইয়া জমিতে থাকে। মাঝে মাঝে চুল্লির নর্দামা দিয়া লোহার ময়লা 'গাদ' বাহির করিয়া দিতে হয়। দরকারমত শোধন হইলে পর পাশের একটা নল খুলিয়া তরল লোহা ঢালিয়া ফেলিতে হয়।

পৃথিবীতে যত লোহার কারখানা আছে, তাহাতে প্রতি বৎসর তিনশ কোটি মণ লোহা তৈয়ার হয়। এবং বছর বছর ইহার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোহা নানারকমের হয়। যে লোহা ঢালাই করিয়া সাধারণত কড়ি বরগা শিক প্রভৃতি তৈয়ারি হয় আর যে ইস্পাত লোহা ক্ষুর বা তলোয়ারের জন্য ব্যবহার হয়, এ দুয়ের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। সাধারণ চুল্লির মধ্যে যে লোহা তৈয়ারি হয়, তাহা একেবারে খাঁটি লোহা নয়; আমরা যতরকম লোহা সর্বদা ব্যবহার করি, তাহার কোনটাকেই ঠিক খাঁটি লোহা বলা যায় না। এইসব লোহার সঙ্গে অল্প বা বেশি পরিমাণে অঙ্গার বা কয়লা, গন্ধক, ফস্‌ফরাস্‌ প্রভৃতি নানারকম জিনিসের মিশাল থাকে এবং সেই মিশালের জন্য লোহার রূপ গুণ নানারকম হইয়া যায়। কোনটা নরম, কোনটা শক্ত, কোনটা সহজে ঢালাই হয়, কোনটা বেশ দলিয়া পিটিয়া নানারকম করা যায়, কোনটা স্প্রিং-এর মতো বাঁকান যায়, কোনটা বাঁকাইতে গেলে ভাঙিয়া যায়, কোনটাকে নানারকমে তাতাইয়া এবং নানা কৌশলে ঠাণ্ডা করিয়া ইচ্ছামত মজবুত করা যায়, কোনটাকে চমৎকার শান দেওয়া বা পালিশ করা যায়।

এক একরকম কাজের জন্য এক একরকম লোহা। আজকাল ভাল ইস্পাত ও উঁচুদরের লোহা করিতে হইলে আগে খাঁটি কাঁচা লোহা তৈয়ারি করা হয়। তারপর তাহার সঙ্গে ঠিক দরকারমত অন্য কোন ধাতু বা কয়লা প্রভৃতি মিশাইয়া আবার সমস্তটা গলাইয়া একসঙ্গে জ্বাল দিয়া লইতে হয়। প্রথম কাজটির জন্য বিশেষরকম চুল্লির দরকার হয়—তাহার গঠন এবং ভিতরকার বন্দোবস্ত সাধারণ চুল্লির মতো নয়। একটা প্রকাণ্ড পিপার মতো জিনিস—তাহার মধ্যে পাঁচশ বা হাজার মণ মশলা ধরে; সেই পিপার তলার দিকে আগুন জ্বালাইয়া, তাহার ভিতর দিয়া ঝড়ের মতো দম্‌কা বাতাস চালাইয়া দেওয়া হয়। বাতাসের ঝাপটায় আগুনের শিখা প্রকাণ্ড জিভ মেলিয়া পিপার মুখ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। লোহার মশলা আগুনের তেজে গলিয়া পুড়িয়া যতই বিশুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে, আগুনের রংও সেই সঙ্গে বদলাইয়া আসিতে থাকে। প্রথমে বেগুনি, তারপর ক্রমে লাল হলদে সাদা হইয়া, শেষে যখন ঘোর নীল রং দেখা দেয় তখন আগুনের তেজ নিভাইয়া, প্রকাণ্ড পিপাটিকে কলে ঘুরাইয়া কাৎ করিয়া, তাহার ভিতর হইতে তরল কাঁচা লোহা ঢালিয়া ফেলা হয়। তারপর ওজনমত নানা জিনিসের মিশাল দিয়া সেই লোহাকে নানা কাজের উপযুক্ত

করিতে হয়।

এখানেও কি হাঙ্গামার শেষ আছে? সেই লোহাকে আরও কতবার অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিয়া, কত দুরমুষ কলে সাংঘাতিকভাবে দলিয়া পিষিয়া, কতরকমের উৎপাত সহাইয়া তবে তাহাকে ভারি ভারি কঠিন কাজে লাগান চলে।

পৃথিবীর শেষ দশা

সংসারে কোন জিনিসই চিরকাল একভাবে থাকে না—তা সে ছোটই হউক আর বড়ই হউক। এই যে প্রকাণ্ড পৃথিবীটা যাহার উপর তোমার আমার মতো কোটি কোটি জীব এমন নিশ্চিন্তে বসিয়া দিন কাটাইতেছে, এই পৃথিবীটাও চিরকাল এমন ছিল না। এক সময়ে—সে কত লক্ষ বৎসর আগেকার কথা তাহা জানি না—এই পৃথিবী এমন গরম ছিল যে, জীবজন্তু থাকা ত দূরের কথা, ইহার উপর বৃষ্টি পড়িবারও যো ছিল না। উপরের আকাশে বৃষ্টি জমিয়া নীচে পড়িতে না পড়িতে শূন্যেই বাষ্প হইয়া মিলাইয়া যাইত। যখন আরেকটু ঠাণ্ডা হইল তখন তেমন তেমন বৃষ্টি হইলে তাহা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িত কিন্তু জল দাঁড়াইবার উপায় ছিল না। বৃষ্টিধারা ডাঙায় নামিবামাত্র টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিত এবং চারিদিক গরম ধোঁয়ায় ঢাকিয়া আকাশের জিনিস আকাশেই ফিরিয়া যাইত। তখন দেখিবার কেহ ছিল না, শুনিবার কেহ ছিল না; ফুটন্ত বৃষ্টিধারার অবিশ্রাম গর্জনের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরা আকাশ যখন পৃথিবীর উপর ঘনঘন বিদ্যুতের চাবুক মারিত তখনকার সে ভয়ংকর দৃশ্য কল্পনা করাও সহজ কথা নয়।

তাহারও পূর্বে এক সময়ে পৃথিবীটা প্রকাণ্ড আগুনের পিণ্ডমাত্র ছিল। তখন তাহার শরীরটি ছিল এখনকার চাইতে প্রায় লক্ষগুণ বড়। বেশ একটি ছোটখাট সূর্যের মতো সে আপনার প্রচণ্ড তেজে আপনি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিত। তাহারও পূর্বেকার অবস্থা কেমন ছিল, সে কথা পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, মোট কথা এই যে, পৃথিবীর বয়স অনেক হইয়াছে। মানুষের বয়স বাড়িয়া যখন সে বৃদ্ধ হইতে চলে তখন তাহার শরীরের তেজ কমিয়া যায়, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া আসে। পৃথিবীর এটা কোন্ বয়স? সে কি এখন প্রৌঢ় বয়স পার হইতেছে? ভাবিবার কথা বটে। পৃথিবীর শেষ বয়সটা কিরকম হইবে, তাহার পক্ষে বার্ধক্যই বা কি আর মৃত্যুই বা কি, তাহার বিচার করা দরকার।

মানুষের মরিবার নানারকম উপায় আছে। কেহ অল্পে অল্পে বৃদ্ধ হইয়া মরে, কেহ বা তাহার পূর্বেই মরে, কেহ বহুদিন রোগে ভুগিয়া মরে, কেহ দুর্ঘটনায় হঠাৎ মরে। পৃথিবীর বেলায় মৃত্যুটা কিরকমে ঘটিবে তাহা কে জানে? যদি বৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে অল্পে অল্পেই মরিতে হয় তবে কোন্ অবস্থাকে তাহার মৃত্যুর অবস্থা বলিব? যখন জীবজন্তু থাকিবে না, মেঘ বাতাস থাকিবে না, নদী সমুদ্র থাকিবে না, পৃথিবী শুকাইয়া চাঁদের মতো কঙ্কালসার হইয়া পড়িবে তখন বলা যাইবে 'পৃথিবীটা মরিয়াছে'। সেরকম হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় কি? যায় বৈ কি! পৃথিবী যখন শূন্যে ছুটিয়া চলে তখন সে বাতাসটাকেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলে বটে, কিন্তু

তবু কিছু বাতাস চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে; তাহা শূন্যে উড়িয়া যায় আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না। সেই বাতাসের মধ্যে যেটুকু জল বাষ্প হইয়া থাকে তাহাও এইরূপে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। এইভাবে যাহা নষ্ট হয় তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য; কিন্তু সামান্য লোকসানও যদি ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিতে থাকে তবে শেষে তাহার হিসাবটা খুবই মারাত্মক হইয়া পড়ে। নদী ও সমুদ্রের মধ্যে যে জল আছে ডাঙার মাটি তাহাকে প্রতিদিনই অল্পে অল্পে শুষিয়া লইতেছে এবং তাহাতেও জলটা দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে; সুতরাং আজ না হউক, হাজার বৎসরে না হউক, জল বাতাস সব একদিন শেষ হইবেই। তখন মেঘ থাকিবে না, কুয়াশা থাকিবে না, রামধনুকের শোভা, উদয়াস্তের রঙের খেলা কিছুই থাকিবে না—কেবল নিস্তব্ধ নির্জন শ্মশানের মতো পৃথিবীর মৃত কঙ্কাল পড়িয়া থাকিবে।

কিন্তু দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, এই যে আলো আঁধারের অবিশ্রাম খেলা, ইহাও কি চিরকাল থাকিবে না? না, তাহাও থাকিবে না। মোটামুটি আমরা যে দিনরাতের হিসাব ধরি সেই দিনরাতের হিসাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। জোয়ার ভাঁটার আঘাত পৃথিবীকে প্রতিদিনই সহিতে হয়, জলের সঙ্গে ডাঙার ঘষাঘষি প্রতিদিনই বাধিয়া থাকে; তাহার ফলে, পৃথিবীর ঘোরপাকের বেগ ক্রমেই ঢিলা হইয়া পড়িতেছে। পাঁচ লক্ষ বৎসরে দিনরাতের পরিমাণ এক সেকেণ্ড বাড়িয়া যাইবে এবং ক্রমেই আরো বেশি করিয়া বাড়িবে। শেষে এমন দিন আসিবে যখন এক পাক ঘুরিতে তাহার এক বৎসর লাগিবে। চাঁদ যেমন তাহার একই মুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহার উল্টা পিঠ আমাদিগকে দেখিতেই দেয় না, পৃথিবীও ঠিক তেমনি করিয়াই ক্রমাগত একইভাবে সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে। বুধ ও শুক্রগ্রহের আজকালকার অবস্থা ঠিক এইরূপ। এ অবস্থায় যেখানে রাত সেখানে বারো মাসই রাত, যেখানে দিন সেখানে বারো মাস দিনের আর শেষ নাই। একদিক রোদে পুড়িয়া ঝল্‌সিয়া ঝামা হইয়া যায়, আর একদিক শীতে জমিয়া এমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা যে বাতাস জমিয়া বরফ বাঁধিয়া যায়! শেষ বয়সে, যতদিন সূর্যের তেজ থাকিবে, ততদিন এইরকম করিয়াই পৃথিবীর দিন চলিবে। তারপর সূর্যও যখন নিভিয়া যাইবে তখনও অন্ধকারে আকাশের গায়ে কত লক্ষ লক্ষ তারার আলো এমনি করিয়াই চাহিয়া থাকিবে, কিন্তু বহুদূরের সেই জ্যোতিতে আলো-হারা সূর্যকে আর খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না, পৃথিবী ত কোন্‌ ছার।

পৃথিবীর মৃত্যুর কি আর কোন উপায় নাই? হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাহার জীবনটা কি নষ্ট হইতে পারে না? ধূমকেতুকে এক সময়ে লোকে বড়ই ভয় করিত। নয় বৎসর আগে এই পৃথিবীটা যখন 'হ্যালি'র ধূমকেতুর ল্যাজের ভিতর ঢুকিয়া গিয়াছিল তখন আগে হইতেই কত লোকে ভয় পাইয়াছিল, কত লোকে বলিয়াছিল যে এইবার পৃথিবীর আর রক্ষা নাই! কিন্তু তবু পৃথিবীর ত কোন ক্ষতি হয় নাই, বরঞ্চ ধূমকেতুর ধোঁয়াটে ল্যাজটাই ছিঁড়িয়া শূন্যে উড়িয়া গিয়াছে। এইরূপে কত ধূমকেতু কত উল্কাবৃষ্টির হাত হইতে সে কতবার বাঁচিয়া আসিল; কিন্তু ধূমকেতুর চাইতে ভারি একটা কিছুর সহিত যদি তাহার ধাক্কা লাগে তাহা হইলে অবস্থাটা খুবই সাংঘাতিক হইতে পারে। সুতরাং সেই 'একটা কিছু' আসা সম্ভব কি না, আর আসিলে কি হইবে, তাহার একটু খবর লওয়া যাক্‌।

পৃথিবীর দেহের বাঁধন ও চালচলন এমন হিসাব-মাফিক সুন্দর নিয়মে বাঁধা

যে, হঠাৎ কিছু উলট্‌পালট্‌ হওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকম্প ঝড়বৃষ্টি অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি যেসব ব্যাপারকে আমরা খুব ভয়ানক মনে করি, পৃথিবীর গায়ে সেগুলি সামান্য আঁচড় বা ফোস্কার মতো। চন্দ্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি সকলকেই অতি আশ্চর্য নিয়মের বাঁধনে নিরাপদ করিয়া বাঁধা হইয়াছে। সুতরাং বাহির হইতে একটা কোন উপদ্রবকে হাজির না করিলে সূর্যের এই প্রকাণ্ড সংসারটির বাঁধন ভাঙা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সূর্যদেব সপরিবারে শূন্যের ভিতর দিয়া ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন—কিন্তু আকাশের কূল কিনারা নাই; লক্ষ লক্ষ বৎসর ক্রমাগত ছুটিয়াও তিনি যে কোনদিন কোন তারার উপর গিয়া পড়িবেন, এমন আশঙ্কার কোন কারণ এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু, চোখে দেখা যায় না এমনও ত অনেক বিপদ থাকিতে পারে। আকাশে যত তারা আছে তাহাদের সকলেরই যে আলো আছে এমন নয়। যাহাদের আলো নিভিয়া গিয়াছে আমরা তাহাদের কোন খবর পাই না। সেইরূপ কোন তারা যদি অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে সূর্যের উপর আসিয়া পড়ে, তবে অবস্থাটা কেমন হইবে? সেটা যে একেবারেই ভাল হইবে না, তাহা বুঝিতেই পার।

তেমন একটা তারা যদি আসে তবে সে সূর্যের রাজ্যের সীমানায় আসিবার পূর্বেই নেপচুন প্রভৃতি বহু দূরের গ্রহগুলির চালচলন বিগড়াইতে আরম্ভ করিবে। পণ্ডিতেরা ব্যস্ত হইয়া হিসাব করিতে বসিবেন, উপদ্রবটা কত বড়, কত দূরে এবং কোন্‌দিকে। সূর্যের আলোয় সেই অন্ধকার তারা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, ক্রমে সে সৌরজগতের ভিতরে আসিয়া পড়িবে। ততদিনে বড় বড় গ্রহেরা পর্যন্ত তাহাদের বহুদিনের অভ্যস্ত চাল ভুলিয়া বেচাল চলিতে আরম্ভ করিবে। একদিকে সূর্য আর একদিকে নূতন অতিথি, এই দোটানায় পড়িয়া পৃথিবী টল্‌মল্‌ করিতে থাকিবে। জোয়ারের বিপুল টানে নদীর জল ফুলিয়া উঠিবে, সাগরের তরঙ্গ ভীষণ বেগে পৃথিবীর উপর ছুটিয়া পড়িবে, ভূমিকম্পে পাহাড় পর্বত ধসিয়া পড়িবে, বহুদিনের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি আবার জাগিয়া সহস্র মুখে আগুন ফুঁকিতে থাকিবে। আর জীবজন্তুর হাহাকার ডুবাইয়া ঝড়ের বাতাস পাগলের মতো ছুটিয়া ফিরিবে। তারপর যখন সূর্যে তারায় সংঘর্ষ বাধিবে তখনকার অবস্থা কল্পনা করাও অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে এক সূর্য কোটি সূর্যের তেজ ধারণ করিবে, সূর্যের আগুন অসম্ভব বেগে সমস্ত গ্রহ চন্দ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। আবার সেই আদিকালের নীহারিকার মতো জ্বলন্ত বাষ্পের আগুন সমস্ত সৌরজগতের আকাশ জুড়িয়া জ্বলিতে থাকিবে। তারপর কত যুগযুগান্তর পরে তাহার ভিতর হইতে আবার নূতন সূর্য বাহির হইয়া নূতন উৎসাহে নূতন সংসার পাতিয়া বসিবে। এ পৃথিবী তখন না থাকুক, আবার নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হওয়াই বা বিচিত্র কি?

ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছুই নাই। সেদিন যে হঠাৎ নূতন তারা দেখা গিয়াছিল, তাহাও সুদূর আকাশে এইরূপ কোন দুর্ঘটনার সামান্য একটু নমুনা মাত্র। আমাদের এই ছোট জগৎটুকুর মধ্যে যদি তেমন কোন প্রলয় আসিয়া পড়ে, তবে বিপদের সম্ভাবনা বুঝিবার পর সমস্ত শেষ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং অন্তত আরও চল্লিশটা বছর তোমরা সকলেই খুব নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।

কাঁচ

এক ছিল সওদাগর। সে গেল বাণিজ্য করতে। প্যালেস্টাইনের তীরের কাছে নদীর মুখে তার ছোট্ট জাহাজটি বেঁধে সে তার লোকজন নিয়ে ডাঙায় নামল, আর সেখানেই বালির উপর আগুন জ্বেলে রান্না করতে বসল। হাঁড়ি বসাবার জন্য পাথর পাওয়া গেল না, কাজেই তাদের সঙ্গে যে সোডা-ক্ষারের পাটালি ছিল (যে সোডা দিয়ে বাসন সাফ করে) তারই কয়েকটার উপর তারা হাঁড়ি চড়াল। রান্না খাওয়া সব যখন শেষ হয়েছে, তখন তাদের সোডা-পাথরের চাক্তিগুলো তুলতে গিয়ে দেখলে তার চিহ্নমাত্র নেই—আছে কেবল স্বচ্ছ পাথরের মতন কি একটা জিনিস যা তারা আর কখন চোখে দেখেনি। এমনি করে নাকি কাঁচের আবিষ্কার হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত বালির সঙ্গে ক্ষার গলিয়ে লোকে কাঁচ তৈরি করে আসছে।

কলার ‘বাসনা’ পুড়িয়ে যে ছাই হয়, তার মধ্যে ক্ষার থাকে—তাকে বলে পটাশ-ক্ষার। সোডা পটাশ চুন এই সমস্তই নানারকমের ক্ষার। চুল্লির আঁচে শুধু বালি কখনও গলে না; কিন্তু তার সঙ্গে চুন-পাথর আর ক্ষার মিশিয়ে জ্বাল দিলে সব গলে এক হয়ে যায়, আর ঠাণ্ডা হলে কাঁচ হয়ে জমে থাকে।

প্রথম প্রথম মানুষে যে কাঁচ ব্যবহার করত, সে কেবল সৌখিন জিনিস হিসাবে। কাঁচ তৈরি করবার সময় তার সঙ্গে নানারকম ধাতুর মশলা মিশিয়ে তাতে নানারকম রং ফলান যায়। সেই সমস্ত রঙিন কাঁচের পুঁথিমুক্তো এক সময়ে লোকে অসম্ভব দামে কিনে নিত। বহুমূল্য রত্ন বলে দেশ বিদেশে তার আদর হত। সে সময়ে কাঁচ তৈরীর সংকেত খুব অল্প লোকেই জানত; আর তারা কাউকে সেসব শেখাত না। কিন্তু তবু দুশ পাঁচশ বা হাজার বছরে সেসব গোপন কথাও অল্পে অল্পে ফাঁস হয়ে যেতে লাগল। ক্রমে এশিয়া থেকে ইউরোপের নানা স্থানে এ বিদ্যার চলন হতে লাগল। বুদ্ধিমান রোমানেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচ তৈরিতে এমন উন্নতি করে ফেলল যে, কয়েক শ বছরের মধ্যেই কাঁচের সারসি, বাসন, প্রদীপ-দান প্রভৃতি মানুষের—অন্তত ধনী লোকদের—নিত্য ব্যবহারের জিনিস হয়ে দাঁড়াল।

এখন আমরা যে সমস্ত ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার কাঁচ সদা সর্বদা ব্যবহার করি, তিনশ বছর আগে সেরকম কাঁচ তৈরিই হত না। সে সময়কার কাঁচ হত ময়লাগোছের, তার মাঝে মাঝে ঘোলাটে দাগ থাকত। তার উপরেই রং ফলিয়ে, কৌশলে তার দাগের সঙ্গে দাগ মিলিয়ে ওস্তাদ কারিকরেরা আশ্চর্য সুন্দর সব জিনিস গড়ত। কিন্তু নিখুঁৎ সাদা কাঁচ যে কাকে বলে, সে তারা জানতই না। প্রায় তিনশ বছর আগে ইংলণ্ডের কয়েকজন উৎসাহী লোকের চেষ্টায় একরকম চমৎকার কাঁচ তৈরি হয়, সেই থেকেই কাঁচের ব্যবসার চূড়ান্ত উন্নতির আরম্ভ। তার আগে কাঠের চুল্লিতে কাঁচ তৈরি হত, এই ইংরাজেরাই সকলের আগে কয়লার চুল্লি ব্যবহার করলেন। এঁরা সমুদ্রের পানা পুড়িয়ে, তা থেকে পটাশ বার করে, সেই পটাশের মধ্যে খাঁটি চক্‌মকি পাথরের গুঁড়ো আর সীসা-ভস্ম মিশিয়ে জলের মতো স্বচ্ছ নূতনরকমের কাঁচ তৈরি করলেন।

তখন হতে সেই কাঁচের সারসি, সেই কাঁচের আরসি, সেই কাঁচের যন্ত্র বাসন চশমা দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সৌখিন ধনীর সখের কাঁচ সাধারণ লোকের ঘরাও জিনিস হয়ে উঠল।

লোহা না থাকলে মানুষের সভ্যতার শক্তি যেমন খোঁড়া হয়ে যায়, কাঁচ না থাকলেও বিজ্ঞানের বুদ্ধিও সেইরকম কানা হয়ে পড়ে। এই তিনশ বছরের মানুষ তার জ্ঞানের পথে যা কিছু উন্নতি ও আবিষ্কার করেছে, কাঁচ না থাকলে তার প্রায় বারো আনাই অসম্ভব হত। কাঁচ ছিল তাই দূরবীণ হতে পেরেছে; কাঁচ ছিল তাই অণুবীক্ষণের জন্ম হয়েছে। আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের আশ্চর্য রহস্য, গাছপালা কীট-পতঙ্গের গঠন কৌশল, অসংখ্য রোগবীজের সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিত্য লড়াই, অতি বড় ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব আর অতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর ইতিহাস—এ সমস্তই মানুষ জানতে পারছে কেবল কাঁচের কৃপায়। গ্রহনক্ষত্রের আলোক দেখে পণ্ডিতে তার মালমশলার বিচার করেন, তার ভূত-ভবিষ্যৎ কত কি বলেন,—তার জন্যও কাঁচের বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র চাই। ফটোগ্রাফার ছবি তোলেন, তার জন্য কাঁচের লেন্স চাই। বৈজ্ঞানিকের ঘরে ঘরে কাঁচের থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, আরো নানারকম কত যন্ত্র আর কত 'মিটার'। মোট কথা, কাঁচের ব্যবহার যদি মানুষে না জানত তবে আজও তার সভ্যতার ইতিহাস অন্তত তিনশ বছর পেছিয়ে থাকত।

নানারকম কাজের জন্য নানারকম কাঁচ তৈরি হয়। তা থেকে কাজের জিনিস গড়বার উপায়ও নানারকম। সামান্য একটা গেলাস বোতল চিম্‌নি বা কাঁচের নল বানাবার জন্য কত যে কায়দা কৌশলের দরকার হয়, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। একটি কারিকর একটা লোহার নলে করে খানিকটা গলা কাঁচ নিয়ে, তার মধ্যে ফুঁ দিয়ে, তাকে নেড়ে ঝেড়ে দুলিয়ে ঝুলিয়ে চট্‌পট্ কত যে আশ্চর্য জিনিস গড়তে পারে, সে একটা দেখবার মতো ব্যাপার। নলের মুখটা চুল্লিতে-চড়ান তরল কাঁচের মধ্যে ডুবিয়ে তুললে নলের আগায় খানিকটা গলা কাঁচ উঠে আসে। তখন সেই নলের মধ্যে ফুঁ দিলে কাঁচটা গোল বুদ্বুদের মতো ফাঁপা হয়ে ফুলে ওঠে। নরম থাকতে থাকতে সেই বুদ্বুদটাকে লোহার টেবিলের উপর ইচ্ছামত চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করা যায়; অথবা গড়িয়ে ডিমের মতন বা হুঁকোর মালার মতন লম্বাটে করে দেওয়া যায়। কোন জিনিস গড়তে গড়তে, তার খানিকটা জায়গা আগুনে তাতিয়ে আবার যদি ফুঁ দেওয়া যায় তাহলে সেই তাতান জায়গাটুকু গম্বুজের মতো ফুলে উঠতে থাকে। কিংবা যদি সেটাকে নরম অবস্থায় ঝুলিয়ে ধরে আস্তে আস্তে ঘোল-মউনির মতন পাক দেওয়া যায়, তাহলে যেখানটা নরম সেটা চিমনির ডাঁটা বা নলের মতন লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। গোল জিনিসের গোড়ায় একটু নল বানিয়ে, তারপর আগার দিকটা গরম করে ফুঁয়ের জোরে ফাটিয়ে দিলে খাসা একটি বোতলের মুখ বা কলকে তৈরি হয়। এই সমস্ত নানারকম জিনিসের গায়ে আবার খানিক নরম কাঁচ লাগিয়ে ইচ্ছামত হাতল বা পায়া গড়ে দেওয়া যায়। এসব শিখতে যা সময় লাগছে, গড়তে গেলে ওস্তাদ লোকের তার চাইতেও কম সময় লাগে।

এইরকম অনেক জিনিসই আজকাল কলে তৈরি হয়। তার কতক গড়ে ঢালাই করে, কতক বানায় কল দিয়ে বাতাস ফুঁকে, আবার কতকগুলো তৈরি হয় নরম কাঁচের উপর অস্ত্র চালিয়ে। সাধারণ সরাসরি কাঁচ সমস্তই আগে অনেক হাঙ্গাম করে হাতে গড়ে তৈরি হত। এখনও প্রতিদিন হাজার হাজার সারসি সেইরকমে তৈরি হয়। তার জন্য প্রথমে ঘাড়-কাটা বোতলের মতো মস্ত মস্ত চোঙা বানিয়ে, তারপর সেই-

গুলোকে কেটে চিরে, নরম করে, চেপ্টিয়ে ছোটবড় সারসি তৈরি হয়। কিন্তু খুব বড় বড় আরসি আর ভারি ভারি আসবাবী আয়নাগুলি প্রায় সমস্তই হয় ঢালাই করে। চুল্লির তরল কাঁচ গামলার মতো প্রকাণ্ড হাতায় করে তুলে একটা মস্ত টেবিলের উপর ঢেলে দিতে হয়। তারপর প্রকাণ্ড 'রোলার' দিয়ে সেই গরম কাঁচকে ক্রমাগত বেলে এবং দলে, শেষে পালিশ-কলে ঘষে সমান করতে হয়।

সব চাইতে ভাল আর দামী যে কাঁচ সেগুলো দরকার হয় বিজ্ঞানের কাজে। তা দিয়ে দূরবীণ হয়, ফটো তুলবার 'লেন্স' হয়, হাজাররকম যন্ত্র তৈরি হয়। এইসব কাজের জন্য যে কাঁচ লাগে, সে কাঁচ একেবারে নিখুঁৎ হওয়া দরকার। তার আগাগোড়া সমান স্বচ্ছ হওয়া চাই। জলের মধ্যে নুন ফেললে সে নুন যেমন গলে গিয়ে সমস্তটা জলের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে কাঁচের সমস্ত মশলাগুলি সব জায়গায় ঠিক সমানভাবে সমান ওজনে মিশে যাওয়া চাই। তা যদি না হয়, কাঁচের মধ্যে কোথাও যদি অতি সামান্য একটুখানিও দাগী বা ঘোলা থেকে যায়, তাহলেই আর তা দিয়ে কোন সূক্ষ্ম কাজ চলতে পারবে না। সুতরাং এই কাঁচ তৈরি করবার সময় খুব সাবধান হতে হয়। কয়লা বা গ্যাসের চুল্লির উপর পাথুরে মাটির বাসনের মধ্যে অল্প আঁচে একটু একটু করে কাঁচের মশলা জ্বাল দিতে হয়। দশ বারো ঘণ্টা জ্বাল দেবার পর, চুল্লির আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে খুব কড়া আঁচের তাপে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা রাখতে হয়। তারপর 'asbestos' বা রেশমী পাথরের পোশাক-পরা মজুরেরা পাথরের ডাণ্ডা দিয়ে সেই তরল গরম কাঁচটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রমাগত ঘুঁটতে থাকে। একে আগুনের মতো গরম, তার উপর এই ভীষণ পরিশ্রম—এক মিনিট থামবার যো নেই। মজুরের পর মজুর আসে, তারা ঘেমে হাঁপিয়ে হয়রান হয়ে পড়ে, তাদের ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হয়ে যায়, আবার তাদের জায়গায় নূতন মজুর আসে। ক্রমে চুল্লির আগুনও আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে—কাঁচটাও অল্পে অল্পে ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসতে থাকে। এই সময়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি জুড়িয়ে গেলে সবটা কাঁচ ঠিক সমানভাবে জমতে পারে না—এলোমেলোভাবে জমাট বেঁধে কাঁচের মধ্যে নানারকম 'টান' ধরে যায়; সে দোষ চোখে দেখা না গেলেও কাজের সময় ধরা পড়ে। সাধারণ কাঁচের জিনিসও তৈরি করার সময়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে ফেললে ঠুনকো হয়ে যায়, নাড়তে-চাড়তে সহজেই ভেঙে যায়। তাই, কাঁচ যখন জমে আসতে থাকে তখনই চুল্লির চারদিকে ইঁটের দেওয়াল দিয়ে সব বুজিয়ে দিতে হয়; তার মধ্যে চুল্লির আগুন আস্তে আস্তে নিভে যায়। কাঁচটাও পাঁচদিন দশদিন বা পনেরদিন ধরে অল্পে অল্পে জমাট বেঁধে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তারপর দেওয়াল ভেঙে পাথুরে বাসন ভেঙে ভিতরকার কাঁচ বার করে আনে। সে কাঁচ যদি আস্ত থাকে তাহলে কাঁচওয়ালার খুব ভাগ্য বলতে হবে। প্রায়ই সেগুলো আট দশ টুকরো হয়ে ভাঙা অবস্থায় বেরোয়—তার মধ্যে ভাল ভাল টুকরোগুলো বেছে নিতে হয়।

বড় বড় দূরবীণের জন্য দু হাত তিন হাত বা তার চাইতেও চওড়া নিখুঁৎ কাঁচের চাক্তির দরকার হয়। সেরকম কাঁচ করবার মতো কারিকর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। পৃথিবীর যত বড় বড় দূরবীণ তার প্রায় সমস্তগুলিরই কাঁচ ঢালাই হয় ফ্রান্সের একটিমাত্র কারখানায়। সেখানে গরম পাত্রে গরম কাঁচ ঢেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আস্তে আস্তে চুল্লি জুড়িয়ে, নানারকম তোয়াজ করে, তারপর কাঁচখানাকে বার করা হয়। তবু প্রায়ই দেখা যায় কাঁচ ফেটে চৌচির হয়ে আছে। এইরকমে বার বার ঢালাই করে, বার বার ভেঙে যায়। হয়ত বিশ-ত্রিশবার চেষ্টা করে

তারপর একখানি নিখুঁৎ কাঁচ বেরোয়। এইজন্যেই সে কাঁচের এত দাম; এক একখানি কাঁচের জন্য হয়ত দশ বিশ হাজার বা লাখ দুই লাখ টাকা দাম লেগে যায়! আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড দূরবীণের জন্য সাড়ে পাঁচ হাত চওড়া একখানি কাঁচের দরকার; তার জন্য যত টাকাই লাগুক তারা তা দিতে প্রস্তুত। আজ তেরো বছর ধরে সেই কাঁচ ঢালাই করবার চেষ্টা চলছে—কিন্তু এই এতদিন পরে সবে সেদিন মাত্র শোনা গেল যে, সে কাঁচ নাকি ঢালাই হয়ে আমেরিকায় আসছে। কাঁচখানির ওজন হবে একশ কুড়ি মণ আর তার দাম নাকি প্রায় দশ লক্ষ টাকা!

শরীরের মালমশলা

এখানে একটা বাক্স আছে। বাক্সটা কাঠের তৈরি। শুধু কাঠ? না, তাতে লোহার কব্জা আর তালা, আর চারধারে পিতলের কাজ আছে। আর কি আছে? আর তার গায়ে চক্‌চকে গালা বার্নিশ আছে। সামনে ঐ একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? ইঁট কাঠ লোহা চুন সুরকি বালি সিমেণ্ট রং তেল, এইরকম সব জিনিস। এই সমস্ত হল তার মালমশলা। যারা বাড়ি বানায় তারা হিসাব করে বলতে পারবে, এতে অমুক জিনিস এতখানি আন্দাজ লেগেছে—তার বাজার দাম এত। আচ্ছা—সামনে একটা মানুষ বসে আছে—বল ত কিসের তৈরি মানুষ? কিসের তৈরি, তার একটু নমুনা শুনবে?

দু মণ ওজনের একটি মানুষের শরীরের মধ্যে হিসাব করলে একমণ জল পাওয়া যাবে—বেশ বড় বড় তিন-চার কলসী জল। তার শরীরে যতরকম গ্যাস বাষ্প বা বাতাস আছে তা যদি আলগা করে বার করতে চাও, তাহলে এত গ্যাস বেরোতে পারে যে তার জন্য ১২ হাত লম্বা ১২ হাত চওড়া ৮ হাত উঁচু একটা ঘর লাগবে। তার মধ্যে এমন অনেকখানি গ্যাস পাবে বাজারে যার দাম আছে—বিক্রি করতে পারলে প্রায় টাকা দশেক পাওয়া যায়।

ঐ ওজনের একজন সাধারণ মানুষের গায়ে যত চর্বি আছে তা দিয়ে এক পোয়া ওজনের প্রায় গোটা ত্রিশেক মোমবাতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া খাঁটি অঙ্গার বা মূল-কয়লা এত পাওয়া যাবে যে তা দিয়ে দশ হাজার পেন্সিলের শিষ তৈরি হতে পারে। বারো সের পাথুরে কয়লার মধ্যেও অতখানি অঙ্গার থাকে না।

খোঁজ করলে একটা শরীরের মধ্যে থেকে প্রায় কুড়ি চামচ নুন আর দু-তিন মুঠো চিনি অনায়াসেই বার করা যেতে পারে।

যে সমস্ত জিনিস না হলে শরীর টিঁকতে পারে না তার একটি হচ্ছে লোহা। এই যে রক্তের রং দেখছ, টক্‌টকে লাল, শরীরে লোহা কম পড়লেই সে রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে, কঠিন ব্যারাম দেখা দেয়। তখন মানুষকে লোহা-মেশান ওষুধ খাওয়াতে হয়। শরীরে যে লোহার মশলা থাকে, ইচ্ছা করলে তা থেকে লোহা ধাতু বার করে খাঁটি শক্ত লোহা বানান যায়। একজন সুস্থ মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ লোহা বেরোয় তা দিয়ে এরকম মোটা একটি পেরেক তৈরি হতে পারে যে, একটা আস্ত মানুষকে অনায়াসে সেই পেরেক থেকে টাঙিয়ে রাখা যায়।

মানুষের শরীরে যে হাড় থাকে তা থেকে দুটি জিনিস খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়—চুন আর ফস্‌ফরাস্‌। চুন দিয়ে কত কাজ হয়, তা সকলেই জান। ফস্‌ফরাস্‌ দিয়ে দেশলাইয়ের জ্বালানি মশলা তৈরি হয়, আর ইঁদুর মারবার সাংঘাতিক বিষ তৈরি হয়। অনেক ওষুধেও ফস্‌ফরাসের ভাগ থাকে। হাড় পুড়িয়ে জমির সঙ্গে মেশালে যে চমৎকার সার হয় সে-ও ঐ ফস্‌ফরাসের গুণে। একটি মানুষের শরীর থেকে যে পরিমাণ খাঁটি ফস্‌ফরাস্‌ বার করা যায় তা খাওয়ালে অন্তত পাঁচশ মানুষ মারা পড়বে। দেশলাই বানালে তাতে প্রায় আট লক্ষ দেশলাইয়ের মশলা হবে।

অতিকায় জাহাজ

সৌখিন ধনীদের জন্য আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের জন্য যে সমস্ত জাহাজ অতলান্তিক মহাসাগরের খেয়া পারাপার করে, তেমন বড় জাহাজ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। কি করে খুব তাড়াতাড়ি সাগর পার করা যায় আর আরামে পার করা যায়, আর একসঙ্গে অনেক লোককে বিনা কষ্টে পার করা যায়, তার জন্য বড় বড় জাহাজ-কোম্পানিদের মধ্যে রেষারেষি চলে। এক একটা জাহাজও নয়, যেন এক একটা সহর, রাজা-রাজড়ার থাকবার মতো সহর। তারই খুব বড় দু-একটির নমুনা দেওয়া হয়েছে।

জাহাজের সাঁতার-ঘরটি দেখা যাক। মধ্যেকার চৌবাচ্চাটি হচ্ছে ২২ গজ লম্বা আর ১৮ গজ চওড়া। এ ছাড়া নানারকম স্নানের ঘর, তুর্কী হামাম, ফোয়ারা-স্নান প্রভৃতির আলাদা বন্দোবস্ত আছে। ১২ তলা জাহাজ, তার মাঝিমাল্লা যাত্রী সব নিয়ে লোকসংখ্যা ৫০০০ হবে। পাঁচটি জাহাজ লম্বালম্বি সার বেঁধে দাঁড়ালে, এক মাইল পথ জুড়ে বসবে।

একটি জাহাজের এক সপ্তাহের খোরাক হল ২২টা ট্রেন বোঝাই কয়লা—এক একটা ট্রেনে সাড়ে আট হাজার মণ। জাহাজের মানুষগুলোর খোরাকের হিসাবও বড় কম নয়। এক এক যাত্রায় পশুমাংস ৭০০ মণ, পাখির মাংস ১৫০ মণ, মাছ ১২৫ মণ, ডিম ৪৮,০০০, আলু ১,৬০০ মণ, তরিতরকারি ৪০০ মণ, টিনের সবজি ৬,০০০ টিন আর কফি ও চা ৯০ মণ লাগে। তাছাড়া ফল দুধ কোকো চকোলেট ইত্যাদিও সেইরকম পরিমাণে।

জাহাজের মধ্যে বড় বড় খানাঘর চা-ঘর ইত্যাদি ত আছেই, তাছাড়া নানারকম হোটেল সরাই-এর অভাব নেই। ধোপা, নাপিত, ফুলের দোকান, ছবির দোকান, মিঠাই-এর দোকান, প্রকাণ্ড থিয়েটার ও নাচঘর এসবও জাহাজের মধ্যেই পাবে। উঠবার জন্য লিফ্‌ট্‌ বা চলতিঘর। ইচ্ছা করলে আর টাকা থাকলে, সেখানে আল্‌গা বাড়ি ভাড়ার মতো করে থাকা যায়—একবারের (অর্থাৎ ৫ দিনের) বাড়িভাড়া ধর ১৫,০০০্‌। এক একটি জাহাজ করতে খরচ হয় প্রায় দু-তিন কোটি টাকা।

আকাশপথের বিপদ

‘জলে কুমির ডাঙায় বাঘ’। মানুষের যখন পালাবার পথ থাকে না তখন লোকে এইরকম বলে। কিন্তু আজকালকার লোকে আকাশ দিয়েও পালাতে জানে। তা বলে সেইখানটাই কি মানুষের পক্ষে নিরাপদ? যুদ্ধের সময়ে সেটা যে খুব সুবিধার জায়গা নয় তা তোমরা জান, কিন্তু অন্য সময়ে? জলের জন্তু অনেক আছে যার ভয়ে মানুষ পালায়; ডাঙায়ও তেমনি শত্রুর অভাব নেই। কিন্তু আকাশের পাখিকেও কি মানুষের ভয় করে চলা দরকার? মাঝে মাঝে দরকার বই কি! বছর ছয়েক আগে আলপ্‌স্‌ পাহাড়ের কাছে এক সাহেব এরোপ্লেন করে অনেক উঁচুতে উড়ছিলেন। পরিষ্কার দিন, ঝড় বাতাসের চিহ্নও নেই, কোথাও ভয়ের কোন কারণ দেখা যায় না। এর মধ্যে হঠাৎ কলের ভীষণ ভন্‌ভন্‌ শব্দের উপর চিলের চিৎকারের মতো একটা কর্কশ শব্দ শোনা গেল—আর সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড এক ঈগল পাখি সাহেবের মুখের উপর ডানার ঝাপটা লাগিয়ে, দুই পায়ের নখ দিয়ে তার মাংস ছিঁড়ে নেবার জোগাড় করে তুলল! একবার নয় দু-বার নয়, পাঁচ-সাত বার ঘুরে ঘুরে সে সাহেবকে তার রাগখানা জানিয়ে গিয়েছিল। সাহেবের গায়ের জামা থেকে সে বেশ দুই-এক খাবলা কাপড়ও তুলে নিয়েছিল, গায়েও যে দু-চারটা আঁচড় লাগায়নি, এমন নয়।

তারা আলপ্‌স্‌ পাহাড়ের রাজবংশী ঈগল, যুগের পর যুগ আকাশের মেঘের উপর সকলের চাইতে উঁচু নীল ময়দানের হাওয়া এতদিন তারাই কেবল খেয়ে আসছে। সেখানে আর কোন পাখিরও যাওয়ার সাধ্য নেই। কাজেই পৃথিবীর মানুষকে অতটা দূর স্পর্ধা করতে দেখে তার ত রাগ হবারই কথা।

যুদ্ধের সময়ে কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন যে, দলে দলে ঈগলপাখি পুষে শত্রুর এরোপ্লেনের উপর ছেড়ে দিলে মন্দ হয় না। সেরকমের পরীক্ষাও নাকি করা হয়েছিল। যারা এরোপ্লেন চালায় তাদের চোখে মস্ত গোল চশমা থাকে। ঐরকম চশমাধারী মূর্তি গড়ে, যদি তার উপর ঈগল পাখিকে রোখ্‌ করতে শেখান যায়, তাহলেই সময় বুঝে তাকে কোন এরোপ্লেনের উপর লেলিয়ে দিলেই চলবে। কিন্তু একবার ছাড়া পেলে পর সে শত্রু মিত্র চিনবে কি করে, সেটাই হচ্ছে ভাববার কথা।

আকাশের পথে কোন বিপদ উপস্থিত হলে সব চাইতে মুশকিল এই যে, চট্‌ করে কোথাও পালাবার পথ থাকে না। শূন্যে উঠে দু-তিন মাইল উঁচুতে উড়তে উড়তে হঠাৎ যদি বেলুন বা এরোপ্লেনে আগুন ধরে যায় তখন চট্‌ করে ডাঙায় নামবে তার আর উপায় থাকে না। জাহাজ হলেও নাহয় জলে ঝাঁপ পাড়া যায়, হালকা শোলার কোমরবন্ধ এঁটে কোনরকমে সাঁতার কেটে পালান যায়। জাহাজ ডুবলেও ‘লাইফ্‌বোট’ ভাসিয়ে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু আকাশযাত্রীর উপায় কি?

বড় বড় বেলুন যখন আকাশে ওঠে তখন অনেক সময় তার গায়ে গোটান ছাতার মতো একটা প্রকাণ্ড জিনিস ঝোলান থাকে—সেটাকে বলে প্যারাসুট্‌। হঠাৎ বিপদে পড়লে, বা চট্‌ করে নামবার দরকার হলে বেলুনবাজ তার কোমরে প্যারাসুটের

দড়ি জড়িয়ে বেলুন থেকে লাফ দিয়ে পড়বে। অমনি ছাতাটা খুলে গিয়ে প্রকাণ্ড গোল হয়ে ফুলে উঠবে, আর তাতেই পড়বার চোট্ সামলিয়ে যাবে। কিন্তু এরোপ্লেন থেকে সেরকম ছাতা ঝুলান সম্ভব নয়; তাতে চলবার বাধা হয় আর ছাতার দড়িদড়া কোথাও কলকব্জায় আটকে গেলে সেও এক সাংঘাতিক বিপদ। তাই আজকাল এরোপ্লেনে ব্যবহারের জন্যে নতুনরকম প্যারাসুট তৈরি হয়েছে। সেটাকে পোশাকের মতো করে পরতে হয়। ছাতাটাকে চমৎকারভাবে কলে পাট করে ফিতে দিয়ে কোমরের সঙ্গে বাঁধে। ফিতেগুলোও আবার কতরকম কায়দামাফিক ভাঁজ করে করে গুটিয়ে রাখতে হয়। তারপর দরকারের সময় হাত পা মেলে লাফ দিলেই হল।

সেকালের কীর্তি

পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকের যেরকম চাল চলন ছিল তার কথা বলতে গেলে আমরা বলি 'সেকেলে ধরন'। একালের মানুষ আমরা, এইটুকু সময়ের তফাৎ দেখলেই বলি 'একাল আর সেকাল'।—আর সেকালের মানুষদের ভারি একটা কৃপার চক্ষে দেখবার চেষ্টা করি। আহা! সেকালের মানুষ, তারা কিছুই দেখল না; তারা না চড়ল এরোপ্লেন, না দেখল বায়োস্কোপ, না শুনল গ্রামোফোনের গান, না খেল বিদ্যুৎ-পাখার হাওয়া, টেলিফোনের কথাবার্তা আর বিলাতের টেলিগ্রাফ এসব আশ্চর্য ব্যাপার কিছুই তারা জানল না। আরও আগেকার কথা ভাব, একশ দেড়শ বা দুশ বছরের কথা—তখন কোথায় বা কলের জাহাজ, কোথায় বা রেলের গাড়ি আর কোথায় বা সাগর-জোড়া টেলিগ্রাফের তার? তখনকার মানুষ ফটোও তোলে না, ডাকটিকিটের ব্যবহারও জানে না, এমনকি সাইকেলও চড়ে না। আরও খানিক পেছিয়ে দেখবে, ছাপাখানা বা খবরের কাগজেরও নাম-গন্ধ পর্যন্ত পাবে না।

দুশ বা পাঁচশ বছরে যদি এতখানি তফাৎ হয়, তাহলে দশ বিশ বা পঞ্চাশ হাজার বছর আগে না জানি কেমন ছিল! সেই বুনো গোছের মানুষ, যার ঘর নাই, বাড়ি নাই, গুহার মধ্যে থাকে; যে লিখতে জানে না, পড়তে জানে না, হয়ত খালি অল্পস্বল্প কথা বলতে শিখেছে; কাপড় জামা পর্যন্ত তৈরি করতে পারে না, বড় জোর জানোয়ারের চামড়া বা গাছের বাকল জড়িয়ে থাকে। এমন যে মানুষ, তাকে কি আর পূর্বপুরুষ বলে কেউ খাতির করতে চায়? বল দেখি?

কিন্তু যখন ভেবে দেখি যে, ঐরকম বেচারা মানুষ, গাছ পাথর ছাড়া কোন অস্ত্র যার সম্বল নাই, সে কি করে সেই সময়কার বড় বড় দুর্দান্ত জন্তুগুলোকে ঠেকিয়ে রাখল, তখন ভারি আশ্চর্য বোধ হয়, আর মানুষটার সম্বন্ধেও মনে একটু একটু সম্ভ্রম আসে।

ইউরোপের নানাদেশে পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন গুহাবাসীদের নানারকম চিহ্ন পাওয়া যায়; তা থেকে সেইসব মানুষের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য খবর পাওয়া যায়। এক একটা গুহার মধ্যে মানুষের হাড়ের সঙ্গে আরও অনেকরকম জন্তুর হাড় পাওয়া যায়। তা দেখে বোঝা যায় যে, ঐসব গুহার মধ্যে মানুষ ছাড়া অন্য অন্য জন্তুরাও থাকত, মানুষ এসে তাদের তাড়িয়ে গুহা দখল করেছে। আবার অনেক সময়ে

হয়ত এমনও হয়েছে যে, তাদেরই অত্যাচারে মানুষকে গুহা ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

সেকালের গুহা-ভল্লুক, খড়্গদন্ত বাঘ, লোমশ গণ্ডার, মহাশৃঙ্গী হরিণ, অতিকায় হস্তী এরাই ছিল মানুষের প্রধান সঙ্গী, শিকার ও শত্রু। পণ্ডিতেরা গুহার ভিত্ খুঁড়ে স্তরের পর স্তর মাটি পরীক্ষা করে দেখেছেন। এক-এক স্তরের এক একরকম ইতিহাস। খুঁড়তে খুঁড়তে কোথাও হয়ত দেখবে, এক জায়গায় খালি গণ্ডারের হাড়, তার নীচের স্তরেই মানুষের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রের চিহ্ন—অর্থাৎ সেখানে আগে মানুষ ছিল, তারপর তারা গণ্ডারের অত্যাচারে পালিয়েছে। পোলাণ্ডের এক গুহার মধ্যে প্রায় হাজারখানেক অতি প্রকাণ্ড ভালুকের হাড় পাওয়া গিয়েছে—তার মধ্যে অনেক জন্তুই আজকাল পাওয়া যায় না।

মানুষের চিহ্নের মধ্যে কঙ্কাল আর অস্ত্রশস্ত্রই বেশি। খুব শক্ত চক্‌মকি পাথরকে নানারকমে ঠুকে আর শান দিয়ে সে সমস্ত অস্ত্র তৈরি হত। খুঁটিনাটি ঘরাও কাজের জন্য হাড়ের অস্ত্রও ব্যবহার হত। আর তাছাড়া ভালরকম একটা গাছের ডাল, কিংবা অতিকায় হস্তীর পায়ের হাড় পেলেও ত বেশ একটি উঁচুদরের মুগুর তৈরি হতে পারে। ঐ সময়কার মানুষে তীর ধনুকের ব্যবহার জানত কিনা সন্দেহ; কারণ আজ পর্যন্ত ধনুকের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি; কাঠের জিনিস কিনা, বেশি দিন টেঁকে না! দু একটা অস্ত্র দেখে মনে হয় যেন তীরের ফলক, কিন্তু সেগুলো বর্শার মুখও হতে পারে। আজকালকার বড় বড় শিকারীদের যদি এইরকমের অস্ত্র নিয়ে সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে বলা হয় তবে তারা যে খুব উৎসাহ প্রকাশ করবে, এমন ত বোধ হয় না; অথচ কেবল এইসবের জোরেই গুহাবাসীরা সকলরকম সাংঘাতিক জন্তুকে শিকার করত।

সে যে মানুষ, অর্থাৎ বুদ্ধিমান জীব, ঐ অস্ত্রগুলোই তার প্রমাণ। তাছাড়া সে যে আগুনের ব্যবহার জানত, তার প্রমাণ, গুহার মধ্যে কাঠ-কয়লা আর ছাইয়ের চিহ্ন। তাই নয়, তার আসবাবের সঙ্গে মোটা মোটা হাড়ের ছুঁচ পাওয়া গিয়েছে, সুতরাং গুহাবাসীদের মেয়েরা তাদের চামড়ার কাপড় সেলাই করতে জানত। কি দিয়ে সেলাই করত? বোধহয় চামড়ার কিংবা তাঁতের ফিতে, নাহয় গাছের তন্তু দিয়ে। কে জানে, হয়ত তাদের মধ্যেও নানারকম বাহার দেওয়া পোশাকের ফ্যাসান ছিল। কিন্তু তাদের সব চাইতে বড় কীর্তি হচ্ছে এই যে, তারা ছবি আঁকতে পারত। সেগুলো হচ্ছে পৃথিবীর আদিম ছবি, গুহার দেওয়ালের উপর লাল মাটি আর ভুষা কালি দিয়ে আঁকা। মাঝে মাঝে দু একটা মাটির মূর্তি আর হাড়ে পাথরে বা হাতীর দাঁতের উপর নানারকম চেহারার নকশা। প্রায় সমস্তই জানোয়ারের ছবি; হরিণ, ঘোড়া, বাইসন, হাতী এইসব।

চীনের পাঁচিল

চীনদেশের রাজা ছিলেন চীন্-শিঃ-হোয়াংতি। 'চীন্' মানে আদি রাজা,—যার আগে আর কেউ রাজা ছিল না। আসলে কিন্তু তাঁর আগে অনেক রাজা ঐ চীনদেশেই রাজত্ব করে গিয়েছেন; কারণ, হোয়াংতি যে সময়ে রাজা ছিলেন, সে হল মোটে দু হাজার

বছর আগেকার কথা। তার আগে যাঁরা রাজা ছিলেন তাঁদের নাম ধাম, রাজত্বের তারিখ, বংশপরিচয়, আর বড় বড় কীর্তির কথা সমস্তই ইতিহাসের পুঁথিতে লেখা ছিল। কিন্তু হোয়াংতি বললেন, "তা হলে চলবে না। আমি হলাম আদি রাজা 'চীন'—আমার আগে আর কোন রাজা-টাজার নাম থাকলে চলবে না। এখন থেকে নতুন করে আবার সব ইতিহাস আরম্ভ হবে।"

এই বলে তিনি হুকুম দিলেন, সেকালের ইতিহাসের যত পুঁথি যেখানে পাও সব খুঁজে এনে পুড়িয়ে ফেল। রাজার হুকুমে চারিদিক থেকে রাশি রাশি হাতের লেখা পুরান বই জড়ো করে পোড়ান হল।

কিন্তু শুধু বই পোড়ালে কি হবে? দেশের যাঁরা পণ্ডিত লোক, তাঁরা ত সেসব বই পড়েছেন; এতদিন কিরকমভাবে দেশের কাজকর্ম হয়ে এসেছে তাও তাঁরা সব জানেন। রাজার এসব খামখেয়াল তাঁরা পছন্দ করবেন কেন? কাজেই আবার হুকুম হল, মারো সব সেকেলে পণ্ডিতদের! অমনি খুঁজে খুঁজে বড় বড় পণ্ডিতদের ধরে এনে মেরে ফেলা হল।

কিন্তু এত কাণ্ড করেও রাজা যেরকম চেয়েছিলেন তেমনটি হল না। রাজা যখন মারা গেলেন তখন দেখা গেল এখানে সেখানে দু-চারটি বুড়ো বুড়ো পণ্ডিত তখনও বেঁচে আছেন, প্রাচীনকালের কীর্তিকথা আইনকানুন সব তাঁদের মুখস্থ! তারপর সেকালের পুঁথিপত্র যা ছিল তাও দেখা গেল সব পোড়ান হয়নি। এমনকি, পুরান একটা বাড়ির ভেতর থেকে আস্ত একটা লাইব্রেরিই বেরিয়ে গেল—যার মধ্যে আগেকার রাজা-রাজড়াদের অনেক কথাই লেখা রয়েছে। সুতরাং, রাজা হোয়াংতি কেবল নামেই আদি রাজা হয়ে রইলেন; মাঝে থেকে খালি কতগুলো বই নষ্ট করাই সার হল, আর কয়েকশ নিরীহ পণ্ডিত মিছামিছি প্রাণ হারালেন। আর হোয়াংতি রাজার দুর্বুদ্ধির জন্য ইতিহাসে তাঁর দুর্নাম থেকে গেল।

জবরদস্তি করে রাজামশাই নাম কিনতে গিয়ে ঠকে গেলেন, কিন্তু আর-একদিকে সত্যি সত্যি তিনি এমন একটা কীর্তি রেখে গিয়েছেন যার জন্য আজও তাঁর নাম লোকে মনে করে রেখেছে। সেই কীর্তিটি হচ্ছে চীনদেশের রাজ্য-ঘেরা পাঁচিল! মানুষ যেমন করে তার দালানদুর্গ বা ক্ষেতবাগান দেয়াল দিয়ে আর বেড়া দিয়ে ঘেরে ঠিক তেমনি করে তিনি তাঁর রাজ্যের উত্তর আর পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড পাঁচিলের ঘেরাও দিয়েছিলেন। পুব সীমানার সমুদ্র থেকে উত্তরের পাহাড় পর্যন্ত, পাহাড়ের উপর দিয়ে পশ্চিমের মরুভূমি পর্যন্ত, উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা, দেড় হাজার মাইল লম্বা প্রকাণ্ড দেয়াল। এমন আশ্চর্য বড় দেয়াল পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

চীন সাম্রাজ্যের মধ্যে যে জায়গাটুকুকে ইংরাজিতে 'চায়না' বলা হয়, সেইটুকু হচ্ছে আসল চীনদেশ। মাঞ্চু আর তাতার জাতীয় দস্যুরা এই চীনদেশের লোকেদের উপর ভারি অত্যাচার করত। থেকে থেকে হঠাৎ দল বেঁধে এসে লোকের টাকাকড়ি ফল শস্য সব লুঠপাট করে তারা পালিয়ে যেত। তাদের ঠেকাবার জন্যই এই প্রকাণ্ড পাঁচিল। ভিতরে মাটির বাঁধ, বাইরে ইঁট পাথরের গাঁথুনি, তার মাথার উপর টালি-বাঁধান রাস্তা, পাঁচিলের উপর দিয়ে লোকজন গাড়ি ঘোড়া সব যাতায়াত করে। এক-এক জায়গায় এমন চওড়া যে পাঁচ-সাতটা উটের গাড়ি অনায়াসে পাশাপাশি চলতে পারে। কোথাও দেয়ালের গায়ে প্রকাণ্ড ফটক, কোথাও সিঁড়ির মতো ধাপকাটা, কোথাও প্রহরীদের প্রকাণ্ড উঁচু পাহারা ঘর। এমনি করে পাঁচিলের পথ চলেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা নামা করতে করতে, কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্বতের চুড়োয় ওঠে, আবার

কত নদীর ধারে সমান জমিতে নেমে এসেছে।

দু হাজার দুশ বছর তার বয়স। সে যদি কথা বলতে পারত, তাহলে তার এই বুড়ো বয়সে কত আশ্চর্য কথাই শুনতে পেতাম। কত যুগের পর যুগ এই দেয়ালের বুকের উপর দিয়ে কত দেশ-বিদেশের লোক আসা-যাওয়া করেছে—কেউ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, কেউ চুরি ডাকাতির জন্য, কেউ দলে-বলে রাজ্যজয়ের জন্য। তুর্কি, তাতার, মোঙ্গল, মাঞ্চু, চীন, কার অস্ত্রের কত বিক্রম ঐ দেয়াল তার সাক্ষী। কত রাজার কত রাজবংশের কত অদ্ভুত কাহিনী, কত সুখ দুঃখের ইতিহাস! হোয়াংতি রাজার বংশের বা 'হান্' বংশের প্রতাপের কথা—যার ভয়ে তুর্কি তাতাররা জব্দ হয়েছিল। তারপর অরাজক দেশে অশান্তির যুগ—যখন ঘরে শত্রু বাইরে শত্রু, তার মধ্যে রাজায় রাজায় লড়াই। তারপর 'তাং' রাজাদের দিগ্বিজয়ের কথা—তাঁরা যুদ্ধ জয় করতে করতে পারস্য আর কাস্পিয়ান থেকে কোরিয়ার শেষ পর্যন্ত রাজ্য দখল করে বসেছিলেন। তারপর ছোটখাট রাজাদের ইতিহাস পার হয়ে 'সুং' বংশের কত কীর্তির কথা—কত বড় বড় কবি, কত বড় বড় পণ্ডিত, আর চারিদিকে জ্ঞান বিজ্ঞানের কত আলোচনা!—সে সময়ে প্রথম ছাপার কল তৈরি করে মানুষে সকলের প্রথম পুঁথির লেখা ছাপতে সুরু করেছে। তারপর কেবলি যুদ্ধবিগ্রহ—মোঙ্গল সেনাপতি চেঙ্গিস খাঁ-র কাছে চীনেদের বার বার লাঞ্ছনা,—আর শেষে কুবলাই খাঁ-র আমল থেকে একশ বছর ধরে চীনদেশে মোঙ্গলদের রাজত্ব। শুধু চীনদেশ কেন, এশিয়ার পূর্বকূল থেকে ইউরোপে হাঙ্গারি রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত তাদের প্রচণ্ড শাসন! তারপর 'মিং' বংশের সৌখিন চীন রাজাদের রাজত্ব আর শিল্প বাণিজ্যের কাহিনী। আজও পাঁচিলের কাছে কাছে তাঁদের সমাধি দেখতে পাওয়া যায়—তার চারিদিকে বড় বড় পাথরের মূর্তি কবর পাহারা দিচ্ছে। তারপর ক্রমে মাঞ্চুদের হাতে চীনের দুর্দশা—আর মাঞ্চু রাজাদের হুকুমে চীনাদের টিকি রাখার নিয়ম আরম্ভ। সেই থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মাঞ্চু বংশের তা-ৎচিং বা 'অতি শুদ্ধ' রাজাদের রাজত্ব চলে এসেছে।

বুড়ো পাঁচিল এখন মরতে বসেছে। এত যুগ যুগ ধরে তার উপর কত যে চোট গিয়েছে, কত ভাঙা গড়া মেরামত, কত তালির উপর তালি! আর হাজার দু হাজার বছর পরে হয়ত তার চিহ্ন খুঁজে বার করতে হবে। এখনই কত জায়গায় ইঁট পাথর সব ধসে পড়ছে—মস্ত মস্ত ফাটল দিয়ে আগাছা আর জংলি ফুল গজিয়ে উঠছে। আগেকার যুগে শত্রু ছিল যারা তাদের হয়ত বা দেওয়াল দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যেত, কিন্তু এখনকার শত্রু যারা তাদের কামান গোলার সামনে দেয়ালের বাঁধ করবে কি? তাই দেয়ালের আর তেমন যত্নও নেই, চিকিৎসাও নেই। অনেক জায়গায় দেয়ালের পথ দিয়ে চলাফেরার সুবিধা হয় তাই সেইসব জায়গায় এখনও লোকে দেয়ালের যত্ন করে, বছর বছর মেরামত করে। এত ভেঙেচুরে তবুও যা রয়েছে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এক ইজিপ্টের পিরামিড ছাড়া সেকালের মানুষের তৈরি এত বড় কীর্তি আর পৃথিবীর কোথাও নেই।

চাঁদমারি

সৈন্যেরা যেখানে বন্দুক ছুঁড়তে শেখে, সেখানে এক তক্তার উপরে মস্ত চাঁদের মতো একটা গোল চক্র আঁকা থাকে, তার উপর নিশান করে সৈন্যেরা গুলি চালায়। লোকেরা তাকে 'চাঁদমারি' বলে। কেন বলে তা ঠিক জানি না, বোধহয় ওখানে 'চাঁদ'কে মারে বলে তার নাম চাঁদমারি।

আমেরিকার এক মাতাল গোলন্দাজের গল্প শুনেছিলাম, সে বনের মধ্যে গাছের আড়ালে আলো জ্বলতে দেখে সেই আলোর উপর তাক করে কামানের গোলা চালাচ্ছিল। এমন সময় তার কাপ্তান এসে বললেন "ব্যাপার কি? কামান দাগছ কিসের জন্য?" গোলন্দাজ বললে, "ঐ যে সামনে বনের মধ্যে কারা আলো জ্বালিয়েছে, ওদের আলো ফুটো করে দিচ্ছি।" কাপ্তান বললেন, "ওরে হতভাগা! ওটা যে চাঁদ উঠছে, দেখতে পাসনে?" তখন গোলন্দাজের হুঁস হল, সে তাকিয়ে দেখল যে এতক্ষণ সে চাঁদটাকে ফুটো করবার আশায় গুলি চালাচ্ছিল!

পৃথিবীর বাইরে আকাশের গায়ে যে সমস্ত আলো আমরা দেখতে পাই, যাদের চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র বলি তাদের মধ্যে চাঁদটাই সবচেয়ে কাছে। কিন্তু হিসাব করলে দেখি, সেও বড় কম নয়—প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল। মানুষের সব চাইতে ভয়ানক যে কামান, তার গোলা গিয়ে পড়ে ষাট মাইল দূরে। বড় বড় কামানের মুখ থেকে অসম্ভব বেগে গোলা ছুটে বেড়ায়, কিন্তু তবুও সে পৃথিবীর টান ছাড়িয়ে যেতে পারে না। প্রথমে তার যতই তেজ থাকুক, শেষটায় ক্রমে নিস্তেজ হয়ে সেই পৃথিবীতেই ফিরে আসে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, একটা সাধারণ বড় কামানের গোলাকে যদি আরও পাঁচ দশগুণ বেগে খাড়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না,—একেবারে পৃথিবীর এলাকার বাইরে শূন্যের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যাবে। গোলাটাকে যদি হিসাবমত চাঁদের দিকে তাক করে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে একেবারে চাঁদের গায়ে গিয়ে ঢুঁ মেরে পড়বে। কতখানি জোরে, কিরকমভাবে গোলা ছুঁড়লে সে ঠিক চাঁদে গিয়ে পড়বে, তাও হিসাব করে বলে দেওয়া যায়।

এক ফরাসী লেখক চাঁদে যাওয়ার সম্বন্ধে একটা চমৎকার গল্প লিখেছিলেন। তাতে কয়েকজন লোককে একটা প্রকাণ্ড গোলার মধ্যে পুরে চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। একটা পাহাড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড কামান গেঁথে গোলা ছুঁড়বার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গল্পের আর সব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু গোলা যখন ছুটে বেরোল তখনও যে ভিতরের মানুষগুলো বেঁচে রইল, এটা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

আজকাল শুনতে পাই, কামানের গোলার চাইতে চাঁদে হাউই ছুঁড়ে মারা নাকি অনেক বেশি সহজ। আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধ্যাপক গডার্ড সাহেব একরকম আশ্চর্য নূতন ধরনের হাউই বানিয়েছেন। তার ভিতরে এমন অদ্ভুত কৌশলে বারুদ-মশলা পোরা থাকে যে, সে বারুদ একবারে সমস্তটা ফাটে না—থেকে থেকে একবার বারুদ ফুটে ওঠে আর তার ধাক্কায় হাউই ক্রমাগত এগিয়ে চলে। প্রথম

ধাক্কাতেই হাউই অনেক দূর পর্যন্ত যায়, তারপর যেই তেজ থেমে আসতে থাকে, অমনি আবার দ্বিতীয় ধাক্কা এসে লাগে। সেটার বেগ কমতে না কমতেই আবার তৃতীয় ধাক্কা। এমনি করে নিজের ভিতরকার বারুদের কাছে বারবার ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হাউই অসম্ভব উঁচুতে উঠে যায়।

গডার্ড সাহেবের তৈরি চার সের ওজনের একটা হাউই অনায়াসে দুশ মাইল উঁচুতে উঠতে পারে। আর বারুদশুদ্ধ ১৬ মণ ওজনের ঐরকম একটা হাউই বানিয়ে যদি আকাশের দিকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে হাউই আর ফিরে আসবে না। বারুদ ফুরাবার আগেই সে এতদূর গিয়ে পড়বে যে পৃথিবী তাকে আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তখন তার বেগ আর কমবে না; সে নিজের বেগে সোজা নিজের পথে যুগের পর যুগ ছুটে চলতে থাকবে—যদি পথের মধ্যে চাঁদ কিংবা অন্য কোন গ্রহ কিংবা আর কিছুতে তাকে টেনে না নেয়। গডার্ড সাহেব বলেন, এইরকমের একটা হাউইকে চাঁদের দিকে ছেড়ে দিলে সে নিশ্চয়ই চাঁদে গিয়ে পৌঁছাবে। হাজার পাঁচেক টাকা হলেই নাকি এইরকম একটা হাউই বানান যেতে পারে। চাঁদের অন্ধকার দিকটায় যদি হিসেব করে হাউই ফেলা যায়, আর হাউয়ের মধ্যে যদি এমন মশলা দেওয়া থাকে যে চাঁদের গায়ে ঠেকবামাত্র তাতে বিদ্যুতের আলোর মতো চোখ-ঝলসান আগুন জ্বলে ওঠে, তাহলে পৃথিবীতে বসে দূরবীণ দিয়ে সেই আলোর ঝিলিক্ দেখে পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন—'ঐ হাউই গিয়ে চাঁদের গায়ে পড়ল।'

আরও অনেকখানি বড় করে যদি চাঁদমারি হাউই বানান যায়, আর তার মধ্যে দুচারজন মানুষ থাকবার মতো ঘরের ব্যবস্থা করা যায় আর বড় বড় চোঙায় ভরা বাতাস আর কিছুদিনের মতো খাবার খোরাক যদি সংগে দেওয়া যায়, তাহলে মানুষও চাঁদে বেড়াতে যেতে পারবে না কেন? চাঁদে লেগে হাউই যাতে চুরমার হয়ে না যায়, তার জন্য নানারকম বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। ফিরে আসবার সময় পৃথিবী-মুখো করে হাউই ছাড়বার মতন ব্যবস্থাও সহজেই করা যায়। এর মধ্যেই নাকি কোন কোন উৎসাহী লোকে খুব সাহস করে গডার্ড সাহেবকে লিখেছেন যে, চাঁদে যাওয়ার জন্য যদি লোকের দরকার হয়, তাহলে তাঁরা যেতে রাজি আছেন। কেউ কেউ নাকি তার জন্য টাকাও দিতে চেয়েছেন! কিন্তু গডার্ড সাহেবের সেরকম কোন মতলবই নেই।

যা হোক মানুষের খেয়াল চাপলে মানুষ সবই করতে পারে। হয়ত তোমরা সব বুড়ো হবার আগেই শুনতে পারে যে চাঁদের দেশের প্রথম যাত্রীরা চাঁদে যাবার জন্য রওনা হয়েছে! তারা যদি গিয়ে ফিরে আসতে পারে, তাহলে কত যে আশ্চর্য অদ্ভুত কাহিনী তাদের কাছে শুনতে পাবে, তা এখন কল্পনা করাও কঠিন!

বায়োস্কোপ

ঘরের বাইরে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে। চেয়ে দেখ, খাড়া খাড়া রেখার মতো বৃষ্টির ধারা পড়ছে। এক একটি ধারা এক একটি বৃষ্টির ফোঁটা; কিন্তু ফোঁটাগুলো মোটেই ফোঁটার মতো দেখাচ্ছে না—দেখাচ্ছে ঠিক লম্বা লম্বা আঁচড়ের মতো। একটা দড়ির আগায় একটা পাথর বেঁধে যদি খুব তাড়াতাড়ি ঘোরাতে পার তাহলে দেখতে মনে

হবে, যেন আস্ত একটা চাকা ঘুরছে। কিন্তু তা বলে পাথরটা ঘুরবার সময় ত আর সত্যি করে চাকার মতো হয়ে যায় না! তবে এরকম দেখায় কেন?

অন্ধকার রাত্রে আকাশের গা দিয়ে যখন উল্কা ছুটে যায় তখন তাদেরও দেখায় ঠিক ঐরকম একটানা লম্বা দাগের মতো। উল্কাটা জ্বলতে জ্বলতে যে পথ দিয়ে ছুটে গেল, মনে হয় যেন সেই পথের সমস্তটা গা অনেকখানি এক সঙ্গে জ্বলতে দেখলাম। কিন্তু আমরা জানি, উল্কাটা সত্যি সত্যি একই সময়ে ততখানি লম্বা জায়গা জুড়ে ছিল না। সেটা আগে এখানে, পরে ওখানে, তারপর সেখানে, এমনি করে ক্রমাগত ছুটে চলেছে—কিন্তু সে খুব তাড়াতাড়ি চলছে বলে মনে হয় যেন একই সময়ে তাকে এখানে ওখানে সেখানে দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টির ফোঁটার বেলাও তেমনি হয়। এইমাত্র তাকে দেখছি মাটির থেকে বিশ হাত উঁচুতে; কিন্তু এই দেখাটুকু মন থেকে মুছতে না মুছতে সেই ফোঁটাটা একেবারে মাটি পর্যন্ত নেমে পড়ছে। তাই মনে হচ্ছে যেন একই সময়ে বিশ হাত উঁচু থেকে মাটি পর্যন্ত সমস্তটা জায়গা জুড়েই ফোঁটাটাকে দেখতে পাচ্ছি।

এইরকম পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি, চোখের দেখা শেষ হলেও তাকে আমাদের মন খানিকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখে। সে অতি অল্প সময়—এক সেকেণ্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, অথবা তার চাইতেও কম।

মনে কর, একটা ছবির দিকে তুমি তাকিয়ে আছ। আমি মাঝে থেকে তোমার চোখের সামনে আড়াল দিলাম, তুমি আর সে ছবি দেখতে পারছ না। যদি আড়াল সরিয়ে নেই, অমনি আবার দেখতে পাবে। যদি বারবার আড়াল দেই আর বারবারই সরাই, তাহলে মনে হবে, ছবিটা বারবার দেখা যাচ্ছে আর বারবার অদৃশ্য হচ্ছে। কিন্তু এই কাজটি যদি খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি, অর্থাৎ মনে কর প্রতি সেকেণ্ডে যদি দশবার আড়াল পড়ে আর দশবার দেখতে পাও, তাহলে আর আড়াল-দেওয়া টের পাবে না। মনে হবে আগাগোড়াই স্থিরভাবে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ। প্রথম যে ছবি দেখছ, তার জের ফুরোতে না ফুরোতে দ্বিতীয়বারের ছবিটা এসে পড়ছে; এই দ্বিতীয়বারের 'রেশটুকু' থাকতে থাকতেই আবার তৃতীয়বারের ছবিটা চোখে পড়ছে। তাই মনে হয়, আগাগোড়াই সমান দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু ছবিটা যদি আগাগোড়া একইরকম না থেকে ক্রমাগত বদলিয়ে যেতে থাকে? মনে কর, একটা সং খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ক্রমে সে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ছে, তারপর মাথা নীচু করে ঠ্যাং দুটোকে ঘুরিয়ে, কেমন ডিগবাজী খেয়ে, শেষটায় আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ছবিগুলো যদি খুব তাড়াতাড়ি একটার পর একটা ঠিকমত তোমার চোখের সামনে ধরে দেওয়া যায়, তাহলে তোমার মনে হবে সত্যি সত্যি যেন ছবিতে সঙটা ডিগ্‌বাজী খাচ্ছে।

আজকাল যে সহরে সহরে, এমনকি পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত লোকেরা বায়োস্কোপ দেখে তার সংকেতও এইরকম। খুব চট্‌পট্ করে যদি কোন চলতি জিনিসের অনেকগুলো ফটো নেওয়া হয়—আর তারপর যদি সেই ফটোগুলোকে তেমনি তাড়াতাড়ি, সেকেণ্ডে ১০/১২টা করে পরপর চোখের সামনে ধরে দেখান হয়, তা হলেই বায়োস্কোপ দেখান হল। মনে কর, বায়োস্কোপে তোমার ভাত-খাওয়ার ছবি নেওয়া হচ্ছে। তাহলে কিরকম হবে?—প্রথম ছবিতে হয়ত তুমি ভাতের গ্রাস ধরেছ, তোমার মুখটা তখনও বোজা আছে। দ্বিতীয় ছবিতে থালা থেকে তোমার হাত উঠছে, মুখটাও একটু খুলতে চাচ্ছে। তারপর হাতটা ক্রমেই মুখের কাছে এগিয়ে আসছে আর মুখের

হাঁ-টাও বেশ বড় হয়ে আসছে। তারপর হাত গিয়ে মুখে ঠেকছে, তারপর মুখের মধ্যে গ্রাস ঢুকছে ইত্যাদি।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম যে বায়োস্কোপের ছবি তোলা হয়েছিল, সেই ছবি তুলবার জন্য চব্বিশটা ফটোগ্রাফের কল পর পর সাজান হয়েছিল আর প্রত্যেকটা কলের সামনে এক একটা সুতো এমনভাবে টেনে বাঁধা হয়েছিল যে একটা ঘোড়া কলের সামনে দিয়ে যেতে গেলেই সুতো ছিঁড়ে যাবে, আর ক্যামেরাতে ঘোড়ার ফটো উঠে যাবে। আজকালকার বায়োস্কোপ-কলের বন্দোবস্ত এরকম নয়। তাতে একটা লম্বা ফিতের উপর পর পর হাজার হাজার ছোট ছোট ফটো তোলা হয়। এক একটা ছবি ওঠে আর ফিতেটা এক-এক ঘর সরে যায়। এমনি করে প্রত্যেক সেকেণ্ডে দশ-বারোটা করে ফটো তোলা হয়—ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ হাজার!

এমন কলও তৈরি হয়েছে যাতে প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার ফটো তোলা যায়। এইরকম তাড়াতাড়ি ফটো তুলে তারপর যদি দেখাবার সময়ে বেশ ধীরে ধীরে সাধারণ বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখান হয় তাহলে খুব দ্রুত ঘটনার ছবিও বেশ স্পষ্ট করে সহজভাবে দেখবার সুবিধা হয়। একটা সাবানের বুদ্বুদের ভিতর দিয়ে বন্দুকের গুলি ছুটে গেলে বুদ্বুদটা কিরকম করে ফেটে যায় তাও দেখান যায়। চোখে দেখলে এই ব্যাপারটা হঠাৎ এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়,—বন্দুক ছুটল আর বুদ্বুদ ফাটল, এইটুকুই খালি বোঝা যায়। যে-ব্যাপারটা ঘটতে অনেক সময় লাগে তাকেও বায়োস্কোপের ছবিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চট্‌পট্‌ ঘটিয়ে দেখান যায়। ফুলগাছের টবে সবেমাত্র অংকুর গজাচ্ছে, সেই অংকুর থেকে গাছ হবে, সেই গাছ বাড়বে, তাতে কুঁড়ি ধরবে, তারপর ফুল ফুটবে—বসে বসে দেখতে গেলে কতদিন সময় লাগে! বায়োস্কোপে যদি তার ছবি তোল, এক-এক দিনে দশ বারোটা বা পঁচিশ ত্রিশটা করে—আর দেখবার সময় চট্‌পট্‌ দেখিয়ে যাও,—তাহলে দেখবে যেন চোখের সামনেই দেখতে দেখতে গাছ গজিয়ে বেড়ে উঠছে আর ফুল ফুটছে!

ভুঁইফোঁড়

কেঁচোরা যে মাটি ফুঁড়ে চলে তা তোমরা সকলেই জান, কিন্তু কেমন করে চলে জান কি? কেঁচোর শরীরটা একটা লম্বা ফাঁপা চোঙের মতো, তার দুইদিকেই ফুটো। একদিক দিয়ে কেঁচো মাটি গিলতে থাকে, আর-একদিক দিয়ে সেই মাটি সরু সুতোর মতো হয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে যায়। এমনি অদ্ভুতরকম করে মাটি খেয়ে খেয়ে আর সরিয়ে সরিয়ে কেঁচোরা মাটির মধ্যে ঢোকে।

কেঁচোর বিদ্যেটাকে আজকাল মানুষও শিখে নিয়েছে! মানুষে ভারি ভারি কেঁচো-কল বানিয়ে, তা দিয়ে মাটির মধ্যে বড় বড় সুড়ঙ্গ কেটে ফেলে। ইউরোপ আমেরিকার অনেক সহরের তলায় মাটির নীচে যে সমস্ত রেল রাস্তার সুড়ঙ্গ থাকে, সেগুলোর অধিকাংশই কেঁচো-কল দিয়ে কাটান হয়।

কেঁচো-কল কিরকম জান? প্রকাণ্ড মজবুত লোহা-বাঁধান নলের মতো জিনিস, তার মধ্যে ভারি ভারি কলকব্জা। নলের মাথাটা কলের ধাক্কায় ক্রমাগত জমাট মাটির

মধ্যে ঢুঁ মেরে এগিয়ে চলতে চায়। মাটি আর সরবার পথ পায় না, কাজেই সে হাঁ-করা চোঙার ভিতর দিয়ে নলের মধ্যে ঢুকে কলের পিছন দিকে বেরিয়ে এসে জমতে থাকে। এমনি করে কেঁচো-কল এগিয়ে চলে আর আপনি আপনি সুড়ঙ্গ কাটা হয়ে যায়। কলের সঙ্গে সঙ্গে লোকজন সব চলতে থাকে, তারা ক্রমাগতই মাটি সরায়, রেল বসায়, আর সুড়ঙ্গের ভিতরটাকে মজবুত লোহায় মোড়া পাকা গাঁথুনি দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়। বড় বড় এক একটা কেঁচো-কল এক-এক দমে পাঁচ-ছয় হাত এগিয়ে যায়, তারপর আবার কলকব্জা গুটিয়ে দম নিতে থাকে। এমনি করে নরম মাটিতে সারাদিনে হয়ত একশ হাত সুড়ঙ্গ কাটে।

লণ্ডন সহরের পঁচিশ ত্রিশ বা চল্লিশ হাত নীচেকার মাটি খুবই নরম। কেঁচো-কলের ঠেলায় পড়লে সে মাটি কচ্‌কচ্‌ করে কেটে যায়। কিন্তু মাটি যদি ইঁটের মতন শক্ত হয়—যদি পাথরের মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটা দরকার হয়—তাহলে আর কেঁচো-কলের শক্তিতে কুলায় না। তখন অন্যরকম ভুঁইফোঁড় কলের ব্যবস্থা করতে হয়। মাটি কাটার চাইতে পাথর কাটার হাঙ্গামা অনেক বেশি। কতরকম সাংঘাতিক কল দিয়ে পাথরকে কেটেকুটে খুঁড়েফুঁড়ে খুঁচিয়ে পিটিয়ে তবুও যখন পারা যায় না,—যখন যন্ত্রের মুখ ক্রমাগতই ভোঁতা হয়ে যায়, কলের ফলা বারেবারেই ভাঙতে থাকে, সারাদিন পরিশ্রমের পর সুড়ঙ্গ পাঁচ হাত এগোয় কিনা সন্দেহ—তখন বোমাবারুদ ফুটিয়ে, পাথর উড়িয়ে পথ করতে হয়। এমন পরিশ্রমের কাজ খুব কমই আছে। এক একটা ছোটখাট পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ বসাতে কত সময়ে বছরের পর বছর কেটে যায়।

লণ্ডনের যে সুড়ঙ্গ-রেল, তাকে সেদেশে ‘টিউব’ (Tube) বলে। সহরের মাঝে মাঝে টিউব স্টেশন থাকে, সেখানে ঢুকে টিকিটঘরের জানালা দিয়ে টিকিট কিনতে হয়, অথবা টিকিট-কলে এক পেনি বা দু পেনি ফেলে দিয়েও টিকিট নেওয়া যায়। তারপর একটা লিফ্‌ট বা চল্‌তিঘরে ঢুকতে হয়, সেখানে টিকিট দেখে। চল্‌তিঘর বোঝাই হলেই লোহার দরজা বন্ধ করে দেয় আর ঘরশুদ্ধ সবাই একটা খাড়া পাতকুয়ার মতো সুড়ঙ্গ বেয়ে মাটির মধ্যে অন্ধকারে নামতে থাকে। পাঁচ তলা বা সাত তলা বাড়ির সমান নীচে নামলে পর পাতকুয়ার তলায় স্টেশনের প্লাটফরম পাওয়া যায়। সেখানে চারিদিকে বিদ্যুতের আলো। দু-মিনিট পরে পরে একটা করে ট্রেন আসে, আর আধ মিনিট করে থামে। এক একটা ট্রেনে লম্বা লম্বা পাঁচ-সাতটা গাড়ি, প্রত্যেক গাড়ির সামনে পিছনে লোহার ফটক। ফটকের পাশে লোক বসে থাকে, তারা ‘আর্লস্‌ কোর্ট’ ‘পিক্যাডিলি’ ‘হোবর্ণ’ বলে সব স্টেশনের নাম ডাকে আর ফটক খুলে দেয় আর লোকেরা সব হুড়্‌হুড়্‌ করে ওঠে আর নামে।

ট্রেনের বন্দোবস্ত এমন আশ্চর্য, কোথাও বিপদের ভয় নেই। সামনে যদি কোথাও ট্রেন আটকিয়ে থাকে, তাহলে পিছনের ট্রেন আপনা থেকেই থেমে পড়বে। ট্রেনের ড্রাইভার বা চালক যদি হঠাৎ মরেও যায়, তবুও ট্রেন স্টেশনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। পাতালপুরীর ট্রেন, সেখানে বাতাস চলবার ব্যবস্থা খুব ভাল করেই করতে হয়। বড় বড় দমকলের হাওয়া দিয়ে সমস্ত টিউবটাকে সারাক্ষণ ভরিয়ে রাখতে হয়। ট্রেনগুলি সব বিদ্যুতে চলে, তাতে আগুনও জ্বলে না, ধোঁয়াও ছাড়ে না।

অনেক সময় নদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ বসাবার দরকার হয়। নদী যদি খুব বড় আর খুব গভীর হয়, তাহলে তার তলা দিয়ে মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ নেওয়া এক ভীষণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এ কাজটিকে সহজ করার জন্য এক চমৎকার

কৌশল খাটান হয়। আগে ডাঙার উপর সুড়ঙ্গ বানিয়ে, তারপর সেই সুড়ঙ্গ ভাসিয়ে নদীর মধ্যে ঠিক জায়গায় নিয়ে ডুবিয়ে দেয়। তাতে হাঙ্গামও কমে, খরচও বাঁচে, কাজও হয় খুব তাড়াতাড়ি।

বড় বড় সহরের বড় বড় কান্ড। ঘোড়া মোটর রেল ট্রাম ত সারাদিনই লোকে ভর্তি, তার উপর ডাক পার্সেল মাল মোটেরও অন্ত নাই। রাস্তার উপরেও যেমন, নীচেও তেমন—উপরেই বরং হৈচৈ, মাটির নীচে সব ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়ম বাঁধা। এক আমেরিকার শিকাগো সহরেই সুড়ঙ্গের রেলগাড়িতে প্রতিদিন সাড়ে সাত লক্ষ মণ মাল পারাপার করে। সেখানকার বড় বড় দোকানের আর গুদামখানার নীচের তলায় সুড়ঙ্গ থাকে, একেবারে মাটির নীচে রেলের লাইন পর্যন্ত। তারা মালপত্র সব সেখান দিয়ে সহরের তলায় তলায় চালান করে।

কথা হচ্ছে, কলকাতায় এইরকম ভুঁইফোঁড় সুড়ঙ্গের রেল বসান হবে। তা যদি হয়, তখন আর বর্ণনা দেবার দরকার হবে না, টিকেট কিনে চড়ে দেখলেই পারবে,—আর মনে করবে, এ আর একটা আশ্চর্য কি? এখন কলকাতার সহরে মোটরগাড়ি দেখলে কেউ ফিরেও তাকায় না; কিন্তু আমার বেশ মনে পড়ছে, এক সময়ে সামান্য একটা বাইসাইকেল দেখবার জন্য আমরা কিরকম উৎসাহ করে দৌড়ে আসতাম।

মামার খেলা

মামা বললেন, "আয়, একটা নূতন খেলা খেলবি আয়।" শুনে সবাই দৌড়ে এসে ঘিরে বসল,—"কি খেলা, মামা?"

মামা বললেন, "এ খেলার নিয়ম খুব সহজ, কিন্তু খেলতে হলে খুব হুঁশিয়ার হওয়া চাই। নিয়ম হচ্ছে এই যে, সবাই যেমন ইচ্ছা কথা বলতে পারবে, কিন্তু এক একটা অক্ষর বাদ দিয়ে।" সবাই বললে, "সে আবার কিরকম?"

মামা—এই মনে কর, যেন 'ক' বলব না—এমন কোন কথাই বলব না, যার মধ্যে কোথাও 'ক' আছে। যেমন—কলা, কৃপণ, হাল্কা, বাক্স এসব কিছুই বলতে পারব না। পটলা অমনি চট্ করে বলে উঠল, "এ আর মুস্কিল কিসের? ওসব না বললেই হল!"

মামা বললেন, "না বললে ত হলই, কিন্তু না বলে পারিস কিনা একবার দেখ ত।"

পটলা—আচ্ছা বেশ,—এই দেখ, আমি 'ক' বলব না—

মামা—আচ্ছা আয় দেখি, আমার সঙ্গে গল্প কর আমিও 'ক' বলব না। এই খেলা আরম্ভ হচ্ছে,—ওয়ান টু থ্রি। —হ্যাঁরে পটলা, তুই এখন বোধোদয় পড়িস্?

পটলা—বোধোদয়! সে ত কোন কালে—ঐ যা! 'ক' হয়ে গেল। আচ্ছা দাঁড়াও, আবার বলছি। বোধোদয় আমি অনেকদিন হল—

হারু, বিশু, কালু—অ্যাঁ! 'অনেক' বললে যে!

পটলা—ও তাই ত! আচ্ছা বলছি—বোধোদয় আমার বহুৎ দিন হল শেষ হয়েছে —এখন চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ পড়ছি।

মামা—বেশ বেশ, খুব বলেছিস। পড়াশুনো বেশ চলছে ত? না রোজ মাস্টার মশাই মার লাগান?

পটলা—ইস্! তা বৈ—বাস্ রে, বড্ড সামলে গেছি। না মারবেন কেন?—দুত্তরি! এ ছাই খেলা।

হারু—আমি খেলব মামা—আমি 'ল' বলব না।

মামা—বলবিনে? আচ্ছা আমি এক্ষুনি বলাচ্ছি তোকে। আমিও 'ল' বাদ দিলাম—ওয়ান টু থ্রি। হ্যাঁরে হারু, তুই মাথা মুড়েছিস কেন?

হারু—ওটা—ওটা নাপিতে কামিয়ে দিয়েছে।

মামা—নাপিত কামড়িয়ে দিয়েছে কেন?

হারু—না, কামড়িয়ে নয়—কামিয়ে।

মামা—ও, কামিয়ে? কি দিয়ে? কাস্তে দিয়ে?

হারু—না, ক্ষুর দিয়ে—

মামা—বেশ, বেশ। তা কিরকম করে কামায় একটু বুঝিয়ে দে ত, সবাই শুনুক।

হারু—এই একটা বাটির মধ্যে খানিকটা—ঐ যা! দাঁড়াও বলছি—খানিকটা Water দিয়ে তারপর একটা চামড়ার উপর ক্ষুর ঘষে ঘষে ধার দিয়ে, কচ্‌কচ্ করে—হুঁ—কচ্‌কচ্ করে—

পটলা—কচ্‌কচ্ করে চালিয়ে দিল।

বিশু—বুলিয়ে গেল। না, তাহলেও হয় না—

হারু—কচ্‌কচ্ করে সব সাবাড় করে দেয়।

মামা—বেশ, বেশ, এই ত চমৎকার হচ্ছে। হুঁশিয়ার থাকা চাই আর চট্‌পট্ কথা জোগান চাই। আচ্ছা, তোর বড়দা আসবে কবে?

হারু—(মাথা চুলকাইয়া)এই—আজকের দিনের পরের দিন।

মামা—দুপুরের ট্রেনে বুঝি?

হারু—না, বিকেল—ঐ যা! 'ল' হয়ে গেল।

কালু—আমি খেলব। আমি 'য' বলব না!

মামা—তার চেয়ে বল না, হয়ে ময়ে 'ক্ষ' বলব না? সব গোলমাল চুকে যায়।

কালু—তাহলে কোনটা বলব না বলে দাও।

মামা—আচ্ছা, 'ন' বলিসনে। আয় দেখি—ওয়ান টু থ্রি—খেলাটা বুঝতে পেরেছিস ত?

কালু—হ্যাঁ।

মামা—কিরকম বুঝেছিস বল ত—

কালু—খুব ভাল।

মামা—(ভ্যাংচাইয়া) খুব ভাল। তুই কথা বলতে শিখেছিস কবে থেকে?

কালু—ছেলেবেলা।

মামা—আর এই বুড়োবেলায় বুঝি বোবামি শিখেছিস?

কালু—দুৎ!

মামা—এটা দেখি আচ্ছা ঢ্যাঁটা—মুখ বুজেই থাকবে। ওরে, একটু কথা-টথা বল, চুপ করে থাকলে কি খেলা হয়?

কালু—(অনেক ভাবিয়া) মামা, তুমি কি খাও?

মামা—তোমার মাথা খাই। গাধা কোথাকার! বলি ঝগড়ার সময় কি তুই ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকিস্?

কালু—উঁহু।

মামা—কি করিস তাহলে?

কালু—ঝগড়া করি।

মামা—(চটিয়া) ঝগড়াটা কিরকম শুনি—(জিভ কাটিয়া) হ্যাঁ, কিরকম বল ত।

অমনি সকলের তুমুল চীৎকার—"'ন' বলেছে—মামা 'ন' বলেছে—মামা কালুর সঙ্গে হেরে গিয়েছে।"

মামা বললেন, "যা! তোদের আর খেলাটেলা কিছু শেখাব না—তোরা বেজায় ফচ্‌কে হয়েছিস।"

ডাকের কথা

মাস্টারমশাই ইতিহাস পড়াতে পড়াতে বললেন, "শের সা ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেছিলেন।" একটি ছেলে অমনি জিজ্ঞাসা করল, "তার আগে কি ঘোড়ায় ডাকত না?" মাস্টারমশাই হো-হো করে হেসে উঠলেন আর বললেন, "ঘোড়ায় ডাকত বটে, কিন্তু ডাক বইত না।" তখন ছেলেটি বুঝতে পারল যে 'ডাক' মানে এখানে গলার 'ডাক' নয়,—এ হচ্ছে চিঠির ডাকের কথা। এখনও অনেক দেশে ঘোড়ার ডাক চলছে; কিন্তু প্রায় সব দেশেই তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়েছে।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে যত পায় তত চায়। রেলের সৃষ্টি হওয়ার পর আমরা শত শত মাইল দূরের চিঠিও একদিনেই পেয়ে যাই; কিন্তু সেখানে যদি একদিনের দেরি হয়, তাহলেই আমরা অনেক সময় বিরক্ত হই।

শুধু যদি রেলে আর জাহাজে করেই ডাক নেওয়া হত তাহলে ত আর কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু, তা ত আর হবার যো নাই। সব জায়গায় রেলও চলে না; জাহাজও সব জায়গায় যায় না। সেসব জায়গায় যে কতরকমে ডাক যায়, তা আর কি বলব! মানুষে ত পিঠে করে ডাক নিয়ে যায়ই—তাকে 'রানার' বলে—তাছাড়া, ঘোড়ার পিঠেও ডাক যায়। এ ছাড়া কতরকমের গাড়ি করে যে ডাক যায় তাই বা কি বলব! ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, উটের গাড়ি, মানুষে-টানা গাড়ি, ঠেলা গাড়ি;—আরো কতরকমের গাড়ি! মোটর গাড়িও হয়েছে আজকাল। গাড়ি ছাড়া নৌকা করেও ডাক যায়;—ডিঙি, ডোঙা, পানসি, সাম্পান, বজরা—আরো কতরকমের। যেখানে নৌকা চলে না অথচ জল পার হতে হয়, কিংবা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে হয়, সেখানে অনেক সময় দড়ি কিংবা তারে ডাকের থলি ঝুলিয়ে পার করে। যে-পারে থলিটা পাঠাতে হবে, সে-পারে একটু নিচু জায়গায় দড়ি কিংবা তার বাঁধে; এপারে বেশ উঁচু জায়গায় বাঁধে। থলিটাতে একটা বড় কড়া লাগিয়ে দিয়ে দড়ির ভিতরে সেই কড়া পরিয়ে দেয়। তারপর, দড়িটা টান করে ধরলে থলিটা আপনা থেকেই সড়্‌সড়্‌ করে গড়িয়ে ও-পারে চলে যায়।

যেসব দেশে মোটেই রেলগাড়ি চলে না, সেখানেই বড় মুস্কিল। তুর্কিস্থানে রেল নাই; সেখানে শত শত মাইল পথে কেবল ঘোড়ার ডাকই চলে। দেশের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যদি কোন চিঠি পাঠাতে হয়, তাহলে প্রায় দেড় মাস সময় লাগে! তোমরা হয়ত ভাবছ, 'এমন দেশও আছে এখন?' কিন্তু, এ কথা একবার ভেবে দেখ

না কেন যে, এর চেয়েও খারাপ অবস্থা আছে অনেক দেশের—ডাকের বন্দোবস্তই নাই সেসব জায়গায়।

এ ত গেল একদিকের কথা। আরেকদিকে দেখ, কত তাড়াতাড়ি ডাক পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে আজকাল! রেলে ডাক পাঠিয়েও সন্তুষ্ট নয়;—এখন এরোপ্লেনে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে অনেক দেশে। তাতে এত তাড়াতাড়ি ডাক যাবে যে এখনকার সঙ্গে তুলনাই হয় না। রেলগাড়ি খুব তাড়াতাড়ি চললেও গড়পড়তা ঘণ্টায় ৫০/৬০ মাইলের বেশি প্রায় যায় না। কিন্তু এরোপ্লেন অনায়াসেই ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশি যায়। তাছাড়া, এরোপ্লেন একেবারে সোজা রাস্তা ধরে চলে—তার জন্য আর রাস্তা তৈরি করতে হয় না;—কোন বাধাই নাই তার। আমেরিকাতে আজকাল নিয়মমত এরোপ্লেনে ডাক যায়। ভারতবর্ষের এক কোণা থেকে আরেক কোণায় ডাক যেতে যত সময় লাগে কয়েক বৎসর পর হয়ত সেই সময়ের মধ্যেই বিলাতের ডাক এদেশে এরোপ্লেনে পেঁছে যাবে।

কাঠের কথা

কেউ কেউ হয়ত বলবে, "দূর ছাই! কাঠের কথা আবার শুনব কি? ভারি ত জিনিস, তাই নিয়ে আবার কথা!" তা বলতে পার কিন্তু কাঠ যে মানুষের কাজের পক্ষে কত বড় দরকারী জিনিস, তা একবার ভেবে দেখেছ কি? এখন না হয় সভ্য মানুষে কয়লা, কেরোসিন, গ্যাস বা ইলেকট্রিক চুল্লির ব্যবহার শিখেছে; কিন্তু তার আগে ত জ্বালানি কাঠ না হলে মানুষের রান্নাবান্না কলকারখানা কিছুই চলত না, শীতের দেশে মানুষের বেঁচে থাকাই দায় হত। এই ত কিছুকাল আগেও কাঠের জাহাজ না হলে মানুষে সমুদ্রে যেতে পারত না, কাঠের কড়ি বরগা থাম না হলে তার ঘর বাড়ি তৈরি হত না।

বলতে পার, এখন ত এ সবের জন্য কাঠের ব্যবহার কমে আসছে। তা সত্যি! এমনকি, ঘরের দরজা জানালা আসবাবপত্র পর্যন্ত যে ক্রমে কাঠের বদলে অন্য জিনিস দিয়ে তৈরি হতে থাকবে তাতেও কোন সন্দেহ নাই। আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই হয়ত দেখবে, ঘরে ঘরে নানারকম ঢালাই-করা মেটে পাথরের আসবাবপত্র! কিন্তু তবুও দেখা যায় যে খুব 'সভ্য' জাতিদের মধ্যেও কাঠের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলছে, কমবার লক্ষণ একটুও দেখা যায় না। প্রতি বৎসরে এত কোটি মণ কাঠ মানুষে খরচ করে এবং তার জন্য এত অসংখ্য গাছ কাটতে হয় যে অনেকে আশঙ্কা করেন, হয়ত বেহিসাবী যথেচ্ছ গাছ কাটতে কাটতে কোন্ দিন পৃথিবীতে কাঠের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে! এরকম যে সত্যি সত্যিই হতে পারে, তার প্রমাণ নানা দেশে পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক সময়ে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন ছিল আর তাতে এত অসংখ্য গাছ ছিল যে লোকে বলত এ দেশের কাঠ অফুরন্ত—এরা সমস্ত পৃথিবীময় কাঠ চালান দিয়েও কোনদিন এত গাছ কেটে শেষ করতে পারবে না। কিন্তু সে দেশের লোকে এমন বে-আন্দাজ ভাবে এর মধ্যে বন জঙ্গল সব কেটে প্রায় উজাড় করে ফেলেছে যে এখন তারা নিজেরাই অন্য দেশ থেকে কাঠ আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে।

প্রতিদিন জাহাজ বোঝাই করা লক্ষ লক্ষ মণ কাঠ সাগর পার হয়ে নানা দেশ

হতে নানা দেশে চলেছে। এত কাঠ লাগেই বা কিসে, আর আসেই বা কোথা থেকে? কানাডা রুশিয়া নরওয়ে ভারতবর্ষ অস্ট্রেলিয়া—কত জায়গা থেকে কাঠ চলেছে ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় বন্দরের দিকে। যেখানেই নূতন রেলের লাইন হচ্ছে সেখানেই লাইনের নীচে দিবার জন্য ভারি ভারি কাঠের 'স্লিপার' চাই—যেখানেই মাটির নীচে খনি খোঁড়ার কাজ চলছে সেখানেই খনির দেয়ালে ছাদে ঠেকা দিবার জন্য বড় বড় কাঠের গুঁড়ি কাঠের থাম দরকার হচ্ছে। ইউরোপের বড় বড় সহরে রাস্তা বাঁধাবার জন্য কত অসংখ্য কাঠ ইঁটের মতো চৌকো করে কেটে বসান হচ্ছে।

কিন্তু কাঠকে কাজে লাগাবার জন্য আজকাল এর চাইতেও অনেক অদ্ভুত উপায় বের করা হয়েছে। কাঠ থেকে যে কাগজ তৈরি হয়, তা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। যত খবরের কাগজ দেখ সে সমস্তই কাঠের কাগজে ছাপা। কেবল কাগজ তৈরির জন্যই প্রতি বৎসর প্রায় দশ কোটি মণ কাঠের দরকার হয়। কাঠওয়ালারা কাঠকে পিটিয়ে থেঁৎলিয়ে সিদ্ধ করে একটা অদ্ভুত জিনিস বানায়, তার নাম 'উড্‌পাল্প্‌' (Wood-pulp)। বাংলায় 'কাঠের আমসত্ত' বললে বর্ণনাটা নেহাৎ মন্দ হয় না। কাগজওয়ালারা নানা দেশ থেকে এই অপরূপ আমসত্ত কিনে এনে তা দিয়ে কাগজ বানায়। আগে এইরকমে কেবল সাধারণ সস্তা এবং খেলো কাগজই তৈরি হত কিন্তু আজকাল কাঠকে নানারকম প্রক্রিয়ায় ধুয়ে এমন পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ করা হচ্ছে যে তা থেকে খুব উঁচু দরের ভাল কাগজ পর্যন্ত তৈরি হতে পারে।

কাঠের মধ্যে প্রধান জিনিসটি হচ্ছে সেলুলোস্‌ (Cellulose); কাঠকে বিশুদ্ধ করা মানে এই জিনিসটিকে খাঁটি অবস্থায় বের করা। পরিষ্কার সাদা তুলো দেখেছ ত? সেই তুলোও সেলুলোস্‌ ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি যে ধুতি পরে আছ সেও হচ্ছে সেলুলোসের ধুতি। আর এই যে 'সন্দেশ' পড়ছ এটাও সেলুলোসের সন্দেশ—তার সঙ্গে খানিকটা ভেজাল জিনিস মেশান আর তার উপরে কালির ছোপ। কাঠ থেকে যে সেলুলোস্‌ বেরোয় তাতে তুলোর মতো আঁশ থাকে না কিন্তু তা থেকে খুব সস্তায় অনেক আশ্চর্য জিনিস তৈরি হচ্ছে। সেলুলোস্‌কে রাসায়নিক উপায়ে বদলিয়ে একরকম আঠাল জিনিস তৈরি হয়, তা থেকে টেনে সুতোর মতো সেলুলোসের আঁশ বার করা যায়। এই উপায়ে ইউরোপে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ মণ 'নকল রেশম' তৈরি হয়। তার চেহারা অনেক সময়ে আসল রেশমের চাইতেও সুন্দর হয়। এই 'রেশম' দেশ বিদেশে চালান দেওয়া হয়—আর কত সৌখিন লোকে সেই রেশমের পোশাক পরে বেড়ায়। তারা জানেও না তারা কাঠের পোশাক পরেছে!

এই সেলুলোস্‌ থেকে নাকি খুব সস্তায় খাঁটি 'স্পিরিট্‌', অর্থাৎ আল্‌কোহল (Alcohol) বা সুরাসার প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈরি হতে পারবে। তখন মানুষের কলকারখানা এঞ্জিন মোটর জাহাজ সব নাকি কাঠের স্পিরিট জ্বালিয়ে চালান হবে। অনেক হাজাররকম ওষুধপত্র আরক প্রভৃতি তৈরি করবার কাজে এই সুরাসার না হলে চলে না; রাসায়নিক কারখানায় এমন দরকারী জিনিস খুব কমই আছে। সুতরাং কাঠের কুচি আর করাতের গুঁড়ো থেকে যদি এমন জিনিসটাকে সস্তায় পাওয়া যায় তবে তাতে যে কতদিকে মানুষের কতরকম সুবিধা হবে সে আর বলে শেষ করা যায় না। শোনা যায়, শীঘ্র নাকি বাজারে কাঠের চিনি বেরোবার সম্ভাবনা আছে। নকল চিনি নয়, সত্যিকারের চিনি।

এতক্ষণ আমরা কাঠের গুণ ব্যাখ্যা করেছি, এখন ত জীবনচরিতের একটু পরিচয় নেওয়া যাক। পৃথিবীর নানা দেশে যত কাঠ আমদানী হয় তার মধ্যে কানাডার কাঠই

সব চাইতে বেশি। সে দেশে শীতকালের গোড়াতেই গাছ কাটা আরম্ভ হয়। তারপর যখন বরফ পড়ে পথঘাট সব পিছল হয় তখন সেই পিছল পথের উপর দিয়ে গাছের গুঁড়িগুলোকে টেনে নিয়ে নদীর ধারে কিংবা রেলের লাইনে নিয়ে হাজির করে। যে বৎসর খুব তাড়াতাড়ি শীত পড়ে যায় কিংবা খুব অতিরিক্ত বরফ পড়ে, সে বৎসর তাদের ভারি কষ্ট। একে শীতের কষ্ট, তার উপর আবার নরম বরফের মধ্যে দিয়ে কাঠ টানবার কষ্ট। কাঠ নেবার বন্দোবস্ত এক-এক জায়গায় এক-একরকম, পথ ঘাটের অবস্থা বুঝে কোথাও ঘোড়ায়-টানা বা গরুতে-টানা গাড়িতে করে কাঠ নেয়; কোথাও গাছের গুঁড়িগুলো ভারি ভারি মজবুত তক্তার উপর চাপিয়ে সেই তক্তা হিড়্‌হিড়্ করে টেনে নিয়ে যায়; কোথাও গুঁড়িগুলোকে একটার পর একটা মালার মতো সাজিয়ে বেঁধে, সেই কাঠের মালা টেনে নেওয়া হয়। সঙ্গে লোক থাকে, তারা কেবল দেখে, যেন কোনটা কিছুতে আটকিয়ে না যায়। অনেক জায়গায় কাঠ নেবার জন্য রীতিমত রেলের লাইন পাতা হয়; আবার কোন কোন জায়গায় পিছল বরফের উপর বিনা লাইনেই এঞ্জিন চলে! সে এঞ্জিনের সামনে চাকা নাই, 'স্লেজ্' গাড়ির মতো দুদিকে দুটো বাঁকান লোহার ধনুক-দণ্ড।

এমনি করে তারা জঙ্গলের গাছ কেটে এনে রেলের লাইন বা নদীর ধারে এসে হাজির হয়। তারপর গাছের গুঁড়িগুলোকে কারখানায় নিয়ে কেটে চিরে তক্তা বানিয়ে চালান দিতে হবে। নদীতে যদি বেশ স্রোত থাকে তাহলে এমন জায়গায় কারখানা বসান হয় যে, কাঠগুলোকে ভাসিয়ে দিলে তারা আপনা-আপনি গিয়ে কারখানায় হাজির হবে। সেখানে কারখানার লোকেরা তাদের ঠেকিয়ে বড় বড় লগি দিয়ে কারখানার ভিতরে নিয়ে পুরবে। কিন্তু সব জায়গায় সেরকম সুবিধামত নদী পাওয়া যায় না। হয়ত কোন নদীতে তেমন স্রোত নেই, কিংবা তাতে ওরকম কাঠ ছেড়ে দেবার হুকুম নেই; সেখানে মস্ত মস্ত কাঠের ভেলা বানিয়ে সেই ভেলাগুলোকে জাহাজে টেনে কারখানায় নিতে হয়।

স্রোতে কাঠ ভাসিয়ে দেওয়া যে সব সময়ে বড় সহজ কাজ, তা মনে কর না। অনেক সময়ে মাঝ পথে নদীর বাঁকে কাঠে কাঠে লেগে এমন জমাট বেঁধে যায় যে আবার রীতিমত হাঙ্গামা করে তাদের জট ছাড়িয়ে না দিলে কাঠ আর চলতে পারে না। এ কাজে বিপদ খুবই; অনেক সময়ে হঠাৎ কাঠের জমাট খুলে গিয়ে এমন হুড়্‌হুড়্ করে ভেসে আসে যে তার সামনে পড়ে অনেক মানুষের প্রাণ যায়। কারখানায় এলে পর সেখানকার লোকেরা কাঠগুলোকে এক-এক করে কারখানার মুখের মধ্যে পুরে দেয়, আর সেখানে করাতকলে কাঠগুলো আপনা-আপনি কেটে চিরে তক্তা হয়ে বেরিয়ে আসে। একদিকে ক্রমাগত গাছের গুঁড়ি ঢুকছে, আর-একদিকে ক্রমাগত কাটা তক্তা বেরিয়ে আসছে।

হাওয়ার ডাক

একটা সরু চোঙার মধ্যে ঢিলাভাবে একটা ছিপি বসাইয়া চোঙার মধ্যে ফুঁ দিলে ছিপিটা হাওয়ার ঠেলায় ছুটিয়া বাহির হয়। যদি মুখে ফুঁ না দিয়া পাম্প-কলের দমকা হাওয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বেশ একটু ভারি জিনিসকেও অনেক দূর পর্যন্ত

ঠেলিয়া দেওয়া যায়। বিলাতের কোন কোন বড় দোকানে এই উপায়ে ছোটখাট জিনিস দোকানের নানা স্থানে পাঠান হয়। খুচরা টাকাপয়সা দোকান বিভাগ হইতে আফিস-বিভাগে পাঠাইতে হইলে সেগুলি একটি সরু চোঙার মধ্যে ভরিয়া, সেই চোঙাটিকে একটা লম্বা নলের মুখে পুরিয়া দেয়। তারপর একটা হাতল চাপিয়া দিলেই নলের মধ্যে দম্‌কা বাতাস ঢুকিয়া চোঙাটাকে একেবারে আফিস পর্যন্ত ঠেলিয়া দেয়। আফিস হইতে দোকানের প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে এইরকম নলের যোগ থাকে। কোন গোলমাল হাঙ্গামা নাই, লোকজনের ছুটাছুটি নাই,—মুহূর্তের মধ্যে কাজ শেষ।

প্রায় কুড়ি বৎসর আগে একজন ফরাসি এঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন যে, এইরকম নলের সাহায্যে বড় বড় সহরের নানা স্থানে ডাক চালাচালি করিতে পারিলে খুব সুবিধা হয় এবং তাহাতে টেলিগ্রাফের মতো তাড়াতাড়ি কাজ হওয়া সম্ভব। আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে এইরূপ হাওয়ার ডাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সহরের মধ্যখানে একটা বড় আফিস, তাহার চারিদিকে সহরের নানা স্থান পর্যন্ত নলের শাখা; কোন কোন নল তিন চার মাইল পর্যন্ত লম্বা হয়। মনে কর, আমরা প্যারিস সহরে আছি; তোমার যদি আমার কাছে কোন জরুরী চিঠি পাঠাইবার দরকার হয় তাহা হইলে প্রথমে তোমাকে ডাকঘরে গিয়া একরকম পাৎলা পোস্টকার্ড কিনিতে হইবে। এই কার্ডের দাম অবশ্য সাধারণ পোস্টকার্ডের চাইতে কিছু বেশি; কিন্তু টেলিগ্রাফ করিতে যে মাশুল লাগে, সে হিসাবে নিতান্তই সামান্য। সেই কার্ডে চিঠি লিখিয়া নলঘরের বাক্সের মধ্যে চিঠি পোস্ট করিতে হয়। অধিকাংশ স্থানে মেয়েরাই সেখানকার কাজ করে। তাহাদের একজন আসিয়া তোমার চিঠিখানা লইয়া সেটিকে একটি চোঙার মধ্যে পুরিয়া দিবে। চোঙাটি রবার ও বনাত দিয়া মোড়া এবং এমনভাবে তৈরি যে সেটাকে হাওয়ার নলের ভিতর ঢুকাইয়া দিলে চোঙার মুখ ও নলের মাঝে একটুকুও ফাঁক থাকে না—ফাঁক থাকিলে হাওয়া বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে হাওয়ার জোর কমিয়া যায়। চোঙাটিকে নলের মধ্যে ভরিয়া নলের মুখ বন্ধ করিয়া একটা হাতল ঘুরাইয়া দিলেই পাম্পকলের হাওয়ায় তাহাকে বড় আফিসে পৌছাইয়া দিবে। সেখানকার লোকেরা আবার সেটাকে অন্য একটা নলের মধ্যে পুরিয়া, আমার বাড়ি যে পোস্টাফিসের এলাকায় সেই পোস্টাফিসে চালান করিয়া দিবে। তারপর যেমন করিয়া টেলিগ্রাফ বিলি হয় তেমনি করিয়া সেই চিঠি আমার বাড়িতে বিলি করা হইবে। তোমার নিজের হাতের লেখা চিঠি টেলিগ্রাফের মতন তাড়াতাড়ি এবং তাহার চাইতে অনেক সস্তায় আমার বাড়িতে আসিয়া হাজির হইবে।

কলকব্জা থাকিলেই তাহা বিগ্‌ড়াইবার সম্ভাবনা থাকে; নলের দৈবাৎ যদি কোথাও চোঙা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? সেইরূপ অবস্থায় মাটি খুঁড়িয়া নল পরীক্ষা করিতে হয় এবং দরকার হইলে নল মেরামত করিয়া দোষ সারাইতে হয়। কিন্তু দুই মাইল বা চার মাইল লম্বা নল, তাহার কোন্ জায়গাটিতে মাটি খুঁড়িতে হইবে তাহা বুঝিবে কিরূপে? তাহা বাহির করিবার একটা চমৎকার উপায় আছে। এ সকল ডাকঘরে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে, চোঙা চলিতে চলিতে কোথাও আট্‌কাইয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ টের পাওয়া যায়—কোথাও কোথাও তখনই একটা ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। তখন পাম্প্ কলের হাওয়া বন্ধ করিয়া নলের মুখের কাছে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করা হয়। খানিকক্ষণ পরে সেই আওয়াজ যখন চোঙায় লাগিয়া ফিরিয়া আসে তখন নলের মুখে একটা প্রতিধ্বনি শোনা যায়। চোঙা যত দূরে থাকে, প্রতিধ্বনি আসিতে ততই বেশি দেরী হয়। বন্দুকের শব্দ ও তাহার প্রতিধ্বনি, এই দুয়ের

মধ্যে কতটুকু সময়ের তফাৎ হইতেছে, তাহা দেখিলেই হিসাব করিয়া বলা যায় যে কতখানি দূরে চোঙা আট্‌কাইয়াছে। তা বলিয়া মনে করিও না যে যখন-তখন বুঝি এরূপ ভাবে চোঙা আট্‌কাইয়া যায়। ফিলাডেলফিয়ার সহরে প্রথম দু-তিন বৎসরের মধ্যে কেবল একবারমাত্র এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন ঐরূপ প্রতিধ্বনির সাহায্যে হিসাব করিয়া যে জায়গায় খুঁড়িতে বলা হয়, তাহার দু-এক হাতের মধ্যেই চোঙাটাকে পাওয়া যায়। দেখা গেল যে, মাটি বসিয়া যাওয়াতে নলটা এক জায়গায় জখম হইয়াছে এবং সেইখানে চোঙা আট্‌কাইয়া রহিয়াছে।

চিঠি যখন নলের ভিতর দিয়া ভীষণ বেগে ছুটিয়া যায় তখন কেবল যে তাহার পিছন হইতে হাওয়ার ধাক্কা দেওয়া হয় তাহা নহে। কোন জিনিস ছুটিতে গেলেই সম্মুখের বাতাস তাহাকে বাধা দিয়া তাহার বেগ কমাইয়া দেয়। এইজন্য নলের সম্মুখ দিকেও একরকম পাম্প্‌কল যোগ করিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে সম্মুখের বাতাসকে টানিয়া বাহির করিয়া দেয় এবং সেই টানে চলন্ত চোঙা আরও জোরে চলিতে থাকে। আজকাল আমেরিকার কোন কোন সহরে এই উপায়ে কেবল চিঠি নয়, ছোটখাট পার্সেল পর্যন্ত চালান দেওয়া হইতেছে। সেখানে সহরের রাস্তার নীচে খুব বড় বড় নল বসান থাকে, তাহার ভিতর প্রায় একমণ ওজনের একটি লোহার চোঙাকে খুব দ্রুত ডাক গাড়ির চাইতেও অনেক বেশি বেগে ছুটাইয়া দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত এই সকল হাওয়ার ডাক কেবল সহরের মধ্যেই কাজ করিতেছে, কিন্তু কালে এই উপায়ে এক সহর হইতে দূরের অন্য সহর পর্যন্ত ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। কয়েক মাইল পর পর এক একটি পাম্প্‌ কলের স্টেশন বসাইয়া হাওয়ার নলে অনেক দূর পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ডাক পাঠান যাইতে পারে।

হেঁয়ালি নাট্য

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে 'শ্যারাড্‌' (Charade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা sum) অথবা Carpet (Car বা cur ও pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন্ কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হল। যদি কোন কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তাহলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড্‌' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে কর 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য—'বই'। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ান রয়েছে দেখে বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে বলছে "তোমার ও পোড়া বইগুলো একটু রাখ দেখি। চল একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই।" লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, "আচ্ছা, তোমরা এগোও,

আমি এইটা শেষ করেই আসছি।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—'ঠক্'। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, "চোর বাট্‌পাড় ঠক্ জোচ্চোর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেবার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।" বইওয়ালা বলে, "সে কি মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন?" ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটা বহুকালের পুরোন পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম। লোকটি বইখানা কিনে বলল, "বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও ত।" বইওয়ালা "দিচ্ছি" বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, "এই নিন মশাই।" বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য—'বৈঠক'। নরুবাবুর বৈঠকে বসে বন্ধুরা বলাবলি করছে, "আরে, অমুক কি আমাদের বৈঠক একেবারে ছেড়ে দিল নাকি?" একজন বললে, "না, সে আজ আসবে বলেছে।" এমন সময় বই হাতে সেই লোকটির প্রবেশ। সকলের মহা উৎসাহ। একজন বললে, "এত দেরী হল যে?" "আর ভাই, পথে একটা কেতাব কিনতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল"—বলেই বইয়ের ব্যাখ্যা আর প্রশংসা। সকলে দেখতে চাইল, —আর কাগজের মোড়ক খুলতেই বেরোল কতগুলো ছেঁড়া নোংরা বটতলার বই। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত—সকলের হাস্যকৌতুক—ইত্যাদি।

হেঁয়ালি অভিনয় করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়।—

(১) যে দৃশ্যে যে কথার অভিনয় হচ্ছে তাতে অন্তত একবার সেই কথাটা বলা দরকার। তা বলে বারবার বেশি স্পষ্ট করে বলাটাও ঠিক নয়।

(২) যে কথাটার অভিনয় হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু অন্য কথা আর অবান্তর অভিনয়ও কিছু কিছু থাকা দরকার। না হলে কথাটা নেহাৎ সহজে ধরা পড়ে যেতে পারে।

(৩) দৃশ্যগুলি বেশি বড় না হয়। ছোট ছোট তিনটি দৃশ্য হলেই ভাল।

হেঁয়ালি নাট্যের উপযোগী কথা বাংলায় অনেক আছে; যেমন—'জলপান' 'বন্ধন' (বন+ধন) 'কারখানা' 'আকবর' (আক+বর) 'বৈকাল' 'যমালয়' (জমা+লয়) ইত্যাদি।

আর-একরকম হেঁয়ালি অভিনয় আছে, তাকে বলে Dumb charade অর্থাৎ বোবা শ্যারাড্। সে খেলায় কথা বলে না, শুধু বায়োস্কোপের মতো হাত-পা নেড়ে কথাগুলোর অভিনয় করে।

আহ্লাদী মিনার

মানুষ যখন ঘরবাড়ি তৈরি করে, তখন যত্ন করে মাটাম ধরে দেখে, বাড়ির দেয়ালটেয়াল সব ঠিক খাড়া ভাবে গাঁথা হচ্ছে কিনা। তুমি যদি কাৎ করে তোমার বাড়ি বানাও, তবে লোকে হয় তোমাকে পাগল বলবে, নাহয় ভাববে লোকটা আনাড়ি। অনেক পুরনো বাড়ি আছে যার দেয়ালগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে, বাড়ি আর এখন খাড়া নেই,—

একদিকে হেলে পড়েছে। বেশি কাৎ হয়ে গেলে সে বাড়ি ভেঙে ফেলতে হয়; তা না হলে সেটা কোন্ দিন আপনা থেকে ঘাড়ের উপর ভেঙে পড়তে পারে।

কিন্তু ইটালির পিসা সহরে একটি প্রকাণ্ড মিনার বা স্তম্ভ আছে, সেটা এমন কাৎভাবে তৈরি যে দেখলে মনে হয়,—এই বুঝি হুড়্মুড়্ করে সব আছাড় খেয়ে পড়ল। অথচ ৮০০ বৎসর ধরে সে এইরকম আহ্লাদীর মতো হেলেই আছে—তার পড়বার কোন মতলব আছে বলে মনে হয় না। মিনারের আশেপাশে তার সমবয়সী কত যে বাড়ি ভেঙেচুরে লোপ পেয়ে গেছে, তার আর সংখ্যা নাই। ভেনিস সহরের লোকেরা একটা চমৎকার স্তম্ভ বানিয়েছিল; তাই দেখে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই পিসার লোকেরা এই স্তম্ভটি বানায়। ভেনিসের স্তম্ভটি কয়েক বৎসর হল ভেঙে পড়ে গেছে কিন্তু এটি এখনও বেশ চমৎকার অবস্থায় আছে—ভাঙবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এই হেলান মিনারটির উপর থেকে মাটাম ঝোলালে দেখা যায় যে, তার চূড়োটা প্রায় ১৩ ফুট হেলে পড়েছে! এমন অদ্ভুত বাঁকা স্তম্ভ বা দালান পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

মিনারটি যখন তৈরি করতে আরম্ভ করা হয়, তখন অবশ্য তাকে খাড়া করে বানাবারই কথা ছিল; কিন্তু খানিকটা তৈরি হবার পর একদিকের মাটি বসে যাওয়ায় খাড়া দালান কাৎ হয়ে পড়ল। তখন কেউ কেউ বললেন, "এখানে দালান তোলা চলবে না—ভাল জমি দেখে আবার নতুন করে তৈরি করতে হবে।" কিন্তু অনেক আলোচনার পর শেষটায় স্থির হল যে, ঐরকম ট্যারচা ভাবেই স্তম্ভ তৈরি করা হবে। হরেকরকম খাড়া মিনার ত সব দেশেই আছে; কিন্তু পিসার এমন একটি স্তম্ভ হবে যেমনটি আর কোথাও নাই।" বড় বড় রাজমিস্ত্রী সর্দারেরা বলল, "হাঁ, ঐরকম কাৎ করেই আমরা মিনার স্তম্ভ বানিয়ে দেব।" এমন কায়দায় আগাগোড়া হিসাব করে মিনার গাঁথা হয়েছে যে তার সমস্তটা ভার স্তম্ভের ভিতর দিকেই পড়েছে। মিনারটা দেখতে যতই পড় পড় গোছের মনে হোক না কেন, বাস্তবিক পড়বার দিকে তার কোন ঝুঁকি নাই।

মিনারটি দেখতেও অতি সুন্দর,—তার আগাগোড়া মার্বেল পাথরে ঢাকা। প্রতি বৎসর নানা দূর দেশ থেকে বহু লোকে এই স্তম্ভ দেখবার জন্য পিসা সহরে যায়। পিসা সহরটি আরও নানা কারণে প্রসিদ্ধ। এই সহরে বিজ্ঞানবীর মহাপণ্ডিত গ্যালিলিওর জন্ম হয়। সে প্রায় ৩০০ বৎসর আগেকার কথা। এই গ্যালিলিওই বলেছিলেন যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এবং তার জন্য সেকালের মূর্খ পাদ্রিদের হাতে তাঁকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল।

এই হেলান মিনারের উপর থেকে গ্যালিলিও 'ভারি জিনিসের পতন' সম্বন্ধে কতগুলি পরীক্ষা করেন। এখনও বিজ্ঞানের বইয়ে সেই সমস্ত পরীক্ষার কথা আলোচনা করা হয়। সে সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, যে জিনিস যত ভারি, শূন্যে ছেড়ে দিলে সে জিনিস তত তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে। ২০০০ বৎসর আগে মহাপণ্ডিত আরিস্টট্ল্ এ কথা বলে গিয়েছিলেন, সুতরাং সকলেই তা বিশ্বাস করত। তিনি বলেছিলেন যে একটা লোহার গোলা যদি আর একটার চাইতে দশ গুণ ভারি হয়, তাহলে দুটোকে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে একটা আর একটার চাইতে দশ গুণ তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়বে। গ্যালিলিও বললেন "তা কখনই হতে পারে না। দুটোই একসঙ্গে সমান বেগে পড়বে।" গ্যালিলিওর কথা শুনে পণ্ডিতেরা ক্ষেপে গেলেন। তাঁরা বললেন, "লোকটার আস্পর্ধা দেখ! আরিস্টট্লের মতো অত বড় পণ্ডিতের উপর আবার

টিপ্পনী কাটতে চায়।" গ্যালিলিও বললেন, "অত রাগারাগিতে দরকার কি? এস, আমি পরীক্ষা করে দেখাচ্ছি। আমার কথা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে না পারলে তখন তোমরা যা ইচ্ছা তাই বল।"

তারপর একদিন গ্যালিলিও পরীক্ষা দেখাবার জন্য পিসা বিদ্যালয়ের যত অধ্যাপক আর যত ছাত্র সকলের সাক্ষাতে এই আহ্লাদী মিনারের সাততলার উপর উঠলেন। সেখানে উঠে তিনি দু হাতে দুটো লোহার গোলা নিলেন—একটার ওজন আধ সের আর একটার পাঁচ সের। গোলা দুটিকে তিনি ঠিক একসঙ্গে ছেড়ে দিলেন আর সকলের সামনে ঠিক একসঙ্গে তারা মাটিতে পড়ল। গ্যালিলিও আবার বললেন, "তোমরা যে কেউ এসে পরীক্ষা করে দেখতে পার—দুটো গোলা দুরকম ওজনের হলেও ঠিক একসঙ্গে মাটিতে পড়বে।" কিন্তু মানুষের কতরকমই দুর্বুদ্ধি হয়। পণ্ডিতেরা বললেন, "এ হতভাগার কথা আমরা কেউ শুনব না। মহাপণ্ডিত আরিস্টট্‌ল্‌ যা বলেছেন তার উপর আর কথা নেই।" পিসা সহরময় ঘোর আন্দোলন আরম্ভ হল। গ্যালিলিওর বক্তৃতায় আর তেমন ছাত্রই হয় না; যারা যায় তারাও খালি গোলমাল বাধায়, দুয়ো দুয়ো করে, আর ঠাট্টা করে হাততালি দেয়।

লোকের উৎপাতে শেষটায় গ্যালিলিওকে তাঁর জন্মস্থান ছাড়তে হল। একটা সত্য কথা বলবার জন্য মানুষের কি শাস্তি! যা হোক, পরে তার জন্য গ্যালিলিওর সম্মান ত বাড়লই সঙ্গে সঙ্গে পিসার প্রসিদ্ধ মিনারটিও আরও প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল।

আদ্যিকালের গাড়ি

আমার বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় রাস্তায় কেউ সাইকেল চড়ে গেল, আমরা ছুটোছুটি করে দেখতে যেতাম, আর মনে করতাম ভারি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি। এখন কলকাতার রাস্তা দিয়ে সাইকেল, মোটর সাইকেল, নানারকম মোটর গাড়ি, ইলেকট্রিক ট্রাম এইসব কত যে যাচ্ছে তার ঠিকানাই নাই। এইসব দেখে দেখে এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে; এমনকি মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে গেলেও লোকে আর তেমন ব্যস্ত হয়ে ফিরে তাকায় না।

দু-চারশ বছর আগেকার একটা মানুষকে যদি হঠাৎ আজকালকার কোন বড় সহরের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে যে কিরকম আশ্চর্য হয়ে যাবে তা সহজেই বুঝতে পার; কিন্তু আমাদের মতো একালের কোন সহুরে মানুষ যদি হঠাৎ সেই সময়কার সহরের মধ্যে গিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাছেও সেটা কম অদ্ভুত ঠেকবে না। অন্য সহরের কথা ছেড়েই দিলাম, এত যে বড় লণ্ডন সহর, কয়েকশত বছর আগে তার যেরকম দুরবস্থা ছিল তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। সহরের রাস্তাগুলো ছিল উঁচু নীচু, রাত্রে বাতি জ্বলে না, গাড়ি ঘোড়ার চল নাই, চোর ডাকাতের ভয়ে লোকে সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বেরোতে সাহস পায় না। সে সময় সহরে দু-দশ জন বড়লোক ছাড়া কারও গাড়ি চড়বার উপায় ছিল না।

প্রথম যারা কতগুলো ভাঙাচোরা গাড়ি জোগাড় করে সাধারণ লোকেদের জন্য ঠিকে গাড়ির ব্যবসা চালাবার চেষ্টা করেছিল, সহরের লোকেরা ত তাদের উপর চটেই

গেল। টেমস নদীর মাঝিরা পর্যন্ত বলতে লাগল যে সাধারণ লোকেরা যদি গাড়ি চড়বার সুবিধা পায়, তাহলে সবাই গাড়ি চড়তে চাইবে,—কেউ আর নদী দিয়ে নৌকো করে যাতায়াত করতে চাইবে না, মাঝিদের ব্যবসা মাটি হবে। এমনকি ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস স্বয়ং হুকুম দিলেন যে এরকম গাড়ি যেন আর বেশি তৈরি না হয়. কারণ তাহলে সহরের রাস্তাগুলো একেবারে মাটি হবে। রাস্তাটা যে মেরামত করে ভাল করা উচিত, সে খেয়াল কারও মাথায় এল না। যা হোক, রাজার নিষেধ এবং মূর্খদের গোলমাল সত্ত্বেও ঠিকে গাড়ির সুবিধা বুঝতে লোকের খুব বেশি দিন সময় লাগেনি।

'ঠিকে গাড়ি' বলতে যদি আজকালকার গাড়ির মতো কিছু একটা বুঝে নাও, তাহলে নিতান্তই ভুল বুঝবে। কত অদ্ভুতরকমের গাড়ি যে সে সময় দেখা যেত তা চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝান শক্ত। গাড়ির ভিতরে, বাইরে, ছাতে এবং পিছনে যত লোক ঠাসা যায়, এক একটা গাড়িতে তত লোক চড়ত। গাড়িতে চড়বার জন্য রীতিমত মই লাগাতে হত। গাড়িতে স্প্রিং ট্রিং কিছুই থাকত না, খালি একটা কাঠের ফ্রেমের উপর কয়েকটা কাঠের খোপ বসিয়ে পেরেক আর চামড়া দিয়ে এঁটে দেওয়া হত। নিতান্ত গরীব যারা, অথবা যারা সহরের বাইরে থাকত তাদের পক্ষে এরকম গাড়িও অনেক সময় জুটত না, তাদের জন্য আজকালকার গরুর গাড়ির মতো একরকম গাড়ি তৈরি হত তার উপরে তাঁবুর মতো ছাউনী দেওয়া; আর ভিতরে প্রায় ৩০/৪০ জন লোককে পুরে দেওয়া যায়, এইরকম বড় করে গাড়ি তৈরি হত। আট দশটা ঘোড়ায় অত্যন্ত ঢিমে তেতালা চালে সেই গাড়ি সহর থেকে সহরে টেনে নিয়ে যেত। আজকাল যেরকমের গাড়িকে বাস্ (Bus) বলে, একশ বছর আগে তার সৃষ্টিই হয়নি।

বাইসাইকেল জিনিসটা নিতান্তই আজকালকার। প্রথম যারা বাইসাইকেল তৈরি করেছিল, তাদের এক একটা গাড়ির যে কি অদ্ভুত চেহারা হত যে দেখলে আমাদের হাসি পায়। কোনটা অসম্ভবরকম উঁচু, কোনটায় চড়তে হলে সোয়ারকে হাতল ধরে ঝুলে থাকতে হয়; কোনটার আবার এমনি বন্দোবস্ত যে কল চালাতে হলে সোয়ারকেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয়। এইরকম খানিকক্ষণ দৌড়লে গাড়ি যখন বেশ জোরে চলতে থাকে তখন সে তার পা দুটো গুটিয়ে নেয় আর সাইকেলটা আপনি আপনি খানিক দূর পর্যন্ত গড়গড় করে চলে যায়। গাড়ির বেগ যেই কমে আসে, অমনি আবার পা ঝুলিয়ে ছুটতে হয়। এই সমস্ত অদ্ভুত সাইকেলের কোনটারই বিশেষ চল হয়নি। চল হবেই বা কেন? যদি একটু আরাম করে বসে গাড়ি চড়তে না পারলাম, তাহলে গাড়ি চড়ে লাভ কি?

প্রথম যখন রেলগাড়ি চলতে আরম্ভ করে তখন নিয়ম ছিল যে গাড়ির আগে আগে একজন ঘোড়সোয়ার নিশান নিয়ে ছুটবে আর চেঁচিয়ে সকলকে সাবধান করে দেবে। সে রেলগাড়ি যে কেমন চলত তা এর থেকেই বুঝতে পারছ। সে সময় থার্ড-ক্লাস গাড়িগুলোর চালচুলো কিছুই থাকত না। একটা মস্ত কাঠের তক্তাকে বাকসের মতো চারিদিকে ঘেরাও করে, তার মধ্যে কতগুলো বেঞ্চি রেখে দেওয়া হত; লোকেরা তার মধ্যেই ঠাসাঠাসি করে কোনরকমে দাঁড়িয়ে বসে জায়গা করে নিত।

খুব সৌখিন লোকেরা নিজেদের গাড়ি শুদ্ধ ট্রেনে গিয়ে চাপতেন। ষাট বৎসর আগে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ যখন ইংলণ্ডে যান তখন তাঁর জন্যও এইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একখানা চমৎকার ল্যাণ্ডো গাড়ি একটা খোলা রেলগাড়ির উপর

চাপিয়ে সেই ল্যান্ডোতে করে তাঁকে লণ্ডনে আনা হয়েছিল।

রেলগাড়ি চলবার সঙ্গে সঙ্গেই মোটর গাড়ি চালাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সে সব গাড়ি স্টিমে চালান হত আর তার চেহারা আজকালকার কোনরকম মোটর গাড়ির মত একেবারেই নয়।

নকল আওয়াজ

তোমরা অনেকে 'হরবোলা' দেখেছ। হরবোলা নানারকম শব্দের নকল করে—পাখির ডাক, গরু, ছাগল, ভেড়ার ডাক, বাঘের ডাক, ঘোড়ার ডাক;—এরকম নানা আওয়াজের অবিকল নকল করে দেখিয়ে তারা পয়সা উপার্জন করে। হরবোলা নামে একরকম পাখি আছে, সেও নানারকম আওয়াজের নকল করতে অতি সহজেই শেখে।

'হরবোলা' ছাড়াও একদল লোক আছে যারা নানারকম শব্দের নকল করে। তারা কিন্তু মুখে আওয়াজ করে না, কোন জন্তু কিংবা পাখির শব্দও নকল করে না, তাদের কাজই হচ্ছে অভিনয়ের সময় আড়াল থেকে নানারকম শব্দের নকল করে অভিনয়টাকে সত্যি ঘটনার মতো দেখাতে চেষ্টা করা। ঝড়-বৃষ্টির শব্দ, বাজপড়ার শব্দ, রেলের শব্দ, ঘোড়ার শব্দ, পায়ের শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ, বাঘ সিংহের ডাক,—এইসবের আশ্চর্য রকম নকল এরা করতে পারে। অনেক মাথা খাটিয়ে সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে এরা কত-রকমের শব্দ নকল করে।

দূরে হুড়মুড় করে একটা গাছ ভেঙে পড়ল!—শব্দটা এল আড়াল থেকে। অভিনয়ের মঞ্চের পেছন থেকে একটি লোক সেই আওয়াজটা করছে। তার যন্ত্রে একটা হাতল ঘোরাচ্ছে আর কতগুলো কাঠের ডাণ্ডা খট্‌খট্‌ করে একটা বড় কাঠের গায়ে গিয়ে লাগছে;—তাতেই মড়্‌মড়্‌ গাছ ভাঙার শব্দের অবিকল নকল হচ্ছে।

উঃ, কি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে! ঐ শোন তার শব্দ! পট্‌—পট্‌—পট্‌—পট্‌—জলের ফোঁটা পড়ছে! কেমন করে ঐ শব্দ হচ্ছে জান?—প্রকাণ্ড একটা ঢাকের মতো জিনিসের মধ্যে কয়েকটা মটরদানা ভরে সেটাকে একটি লোক আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে। মধ্যে একটি পর্দা দেওয়া আছে, ঢাকটা ঘোরালেই সেই পর্দার উপর মটরদানাগুলো পট্‌ পট্‌ করে ঠিক্‌রে গিয়ে লাগে আর বৃষ্টির ফোঁটার আওয়াজের মতো শোনায়।

কড়্‌কড়্‌ শব্দে বাজ পড়ছে! উঃ, কি ভয়ানক শব্দ! প্রাণটা হাতে নিয়ে যেতে হবে! কিন্তু গোড়ায়ই গোলমাল;—আওয়াজটাই নকল। দুটি লোক আড়ালে থেকে একটা প্রকাণ্ড চৌকোণা ঢাকের উপর মস্ত বড় দুটো কাঠের হাতুড়ি পিটছে আর ঐরকম বাজ পড়া আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!

দুম্‌ করে বন্দুকের আওয়াজ হল,—ঝুপ্‌ করে একজন লোক পড়ে গেল আর দুজন লোকে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এল। যে গুলি করেছে সে কি নিষ্ঠুর! মানুষ খুন করতে কি তার একটুও বাধে না? আসলে কিন্তু ব্যাপারটা কিছুই নয়। বন্দুকও নাই, গুলিও করেনি কেউ, চোটও লাগেনি কারো! আওয়াজটা যে শোনা গিয়েছিল সেটা আড়াল থেকেই এসেছিল। একজন লোক একটা চামড়ার গদির উপর জোরে একটা মোটা বেতের বাড়ি মারতেই ঠিক বন্দুকের আওয়াজ বেরিয়েছিল, আসলে সব

ফাঁকি!

বন্দুকের গুলিতে একজন ত চিৎপটাং! যিনি গুলি মারলেন তিনিও বেগতিক দেখে ঘোড়ায় চেপে চম্পট দিলেন। কি করে জানলে ঘোড়ায় চড়ে পালালেন তিনি? —ঐ শোন ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। এ-ও কি ভুল হতে পারে কখনও? কিন্তু, এ-ও যে ভুল! ঘোড়া-টোড়া কিছুই নাই; শুধু একটি লোক আড়াল থেকে ঐরকম আওয়াজ করছে। তার যন্ত্রপাতিও কিছু নাই;—কেবল দুখানা খুরের আকারের কাঠে দুখানা নাল লাগিয়ে নিয়ে সে দুটোকে একটা পাথরের উপর ঠক্ ঠক্ করে তালে তালে ঠুকছে!

এইরকমের আরো কত আওয়াজ যে কতরকমে এরা নকল করে, তা আর কি বলব! যে ঘরে এইসব আওয়াজের যন্ত্রপাতি থাকে, সেটাকে রীতিমত একটা কারখানা-ঘরের মতো দেখায়। চারিদিকেই নানারকম কল-কব্জা;—কোনটা হাতে চালায়, কোনটা বিদ্যুতের সাহায্যে চলে, কোনটা আবার চাবিতেও চলে। যারা এসব যন্ত্র ভেবে ভেবে বার করে, তারা বেশ রোজগার করে থাকে।

আশ্চর্য প্রহরী

বড় বড় রাজা রাজড়া বা লাট বেলাট যখন সমারোহ করে বেড়াতে বেরোন তখন তাঁদের সঙ্গে কতগুলি 'বডি-গার্ড' বা 'শরীররক্ষক' ঘোড়ায় চড়ে যায়। তারা যখন নিশান উড়িয়ে বাহার দিয়ে চলে, তখন দেখতে বেশ জমকাল দেখায়; কিন্তু অনেক সময়েই দেখা যায়, এ ছাড়া তাদের আর বিশেষ কিছু কাজ করবার থাকে না। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু কারও শরীর রক্ষা করবার জন্য তাদের ডাক পড়ে না।

আমাদের শরীরে কোথায় কি হচ্ছে তাই নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা বলেন, তুমি আমি রাম শ্যাম সকলের সঙ্গেই—এরকম দু-দশটা নয়, একেবারে লাখে লাখে—'বডি-গার্ড' ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনরাত তারা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দিনরাত ছুটোছুটি করে পাহারা দিচ্ছে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য দিনরাত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। শত্রু ধরবার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? এত শত্রুই বা কোথায়? শত্রু চারিদিকেই। আকাশে বাতাসে রোগের বীজ সব কিল্‌বিল্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে, গলা দিয়ে একেবারে ফুস্‌ফুসের ভিতর পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে, আর কতরকম জ্বরজারি সর্দিকাশির হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। জলের সঙ্গে, দুধের সঙ্গে, নানা-রকম খাবারের সঙ্গে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগের বীজ শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কোথাও একটু ঘা হলে বা কেটে গেলে সেই ফাঁক দিয়ে কত সাংঘাতিক ব্যারামের বীজ অনায়াসে ভিতরে ঢুকে অনর্থ বাধাবার চেষ্টা করছে। যদি বাঁচতে হয় তাহলে এই সমস্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা দরকার। তাই, ধূলিকণার চাইতেও সূক্ষ্ম যে শত্রু, যাকে দেখতে হলে অণুবীক্ষণ লাগাতে হয়, তার সঙ্গে সারাদিন লড়াই করবার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্যরকম সূক্ষ্ম ব্যবস্থা করা রয়েছে।

আমাদের শরীরটা এমনভাবে তৈরি যে তার যেখানেই কাটো সেখানেই রক্ত বেরোয়। কোথাও একটা ছুঁচের সমান সরু জায়গা খুঁজে পাবে না যার মধ্যে খোঁচা

দিলে রক্ত গড়ায় না। শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্তটা ক্রমাগত শরীরময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। তাও এলোমেলোভাবে ছুটবার হুকুম নাই; ঠিক তালে তালে, সারাদিন সারা বছর সারা জীবন তাকে পথ ধরে ধরে চলতে হয়—এক মুহূর্ত বিশ্রাম করবার উপায় নাই। এইভাবে সর্বদা তাকে চালাবার জন্য শরীরের মধ্যে আশ্চর্য 'পাম্পকল' বসান আছে। বুকের মাঝখানে যে জায়গাটা সর্বদা ধুক্‌ধুক্‌ করে, যাকে আমরা 'হার্ট' বা হৃৎপিণ্ড বলি, সেইটে হচ্ছে আমাদের পাম্পকল।

ঘরে ঘরে কলের জল পেতে হলে তার জন্য সহরের এক-এক জায়গায় স্টেশন করে প্রকাণ্ড কলকারখানা বসাতে হয়; সেই স্টেশনের সঙ্গে বড় বড় 'পাইপ' জুড়ে সহরময় জল চালাবার ব্যবস্থা করতে হয়; তারপর সেই মোটা পাইপের গায়ে সরু মোটা মাঝারি নানারকম নল লাগিয়ে ঘরে ঘরে জল আনতে হয়। শরীরের রক্ত চলবার ব্যবস্থাটাও অনেকটা এইরকমের। হৃৎপিণ্ডটা হল আমাদের কলের স্টেশন। শরীরের মোটা মোটা শিরাগুলি সেই স্টেশন থেকে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—ঠিক যেন রাস্তার নীচে জলের পাইপ! তাদের গা থেকে আবার সরু সরু নলের মতো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা বেরিয়ে সমস্ত শরীর ছেয়ে ফেলেছে—সুতোর মতো সরু, চুলের মতো সরু, তার চাইতেও আরও অনেক সরু। বুকের ধুক্‌ধুকানির তালে তালে শরীরের রক্ত শিরার ভিতর দিয়ে চলতে থাকে। চলতে চলতে যায় কোথায়? আর কোথাও যাবার যো নাই, বার বার সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই ফিরে আসতে হয়।

আমরা যতক্ষণ বেঁচে থাকি ততক্ষণ শরীরটা ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকে। যত বেশি কাজ করি, যত বেশি চিন্তা করি, যত বেশি কথা বলি, যতই নড়িচড়ি, চলি ফিরি, শরীর ততই বেশি বেশি ক্ষয় হতে থাকে। কয়লা না পোড়ালে যেমন এঞ্জিন চলে না তেমনি শরীরকে ক্ষয় না করলে শরীরের কাজ হয় না। কিন্তু কেবলই যদি ক্ষয় হতে থাকে তাহলে শরীর টিঁক্‌বে কি করে? সেজন্য শরীরকে রোজ নিয়মিত খাবার যোগাতে হয়। সেই খাওয়া হজম হলে শরীরের রক্ত তাকে নানা কৌশলে চারিদিকে বয়ে নিয়ে সবরকমের ক্ষয় দূর করে। শরীর শুধু যে ক্ষয় হয় তা নয়; কয়লা পুড়লে যেমন ধোঁয়া বেরয়, ঝুল জমে আর ছাই পড়ে থাকে তেমনি শরীরের ক্ষয়ের দরুণ নানারকমের দূষিত আবর্জনা শরীরের সর্বত্র জমে উঠতে থাকে। সেই আবর্জনা দূর করাও রক্তের কাজ। হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে যে পরিষ্কার টাট্‌কা লাল রক্ত বেরিয়ে আসে সেই রক্ত যেখানে যায় সেখানকার ময়লা সাফ করতে করতে শেষটায় নিজেই ক্রমে ময়লা হয়ে পড়ে। সেই ময়লা দূষিত রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ফিরে এসে ফুস্‌ফুসের তাজা বাতাস খেয়ে টক্‌টকে তাজা হয়ে ওঠে।

এক ফোঁটা রক্ত যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তাহলে দেখতে দেখাবে কালো কালো চ্যাপ্টা মতো। ঐ গোল গোল জিনিসগুলির আসল রং লাল। ঐগুলির জন্য রক্তের রং লাল দেখায়—তা না হলে রক্তের কোনও রং নাই। এই লাল দানা বা 'কণিকা'গুলি এক একটা এত ছোট যে এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে ওরকম লাখে লাখে কণিকা ভেসে বেড়ায়। এই লাল জিনিসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে সাদা মতন কি দেখা যাচ্ছে; সেইগুলিই হচ্ছে শরীরের প্রহরী বা 'বডি-গার্ড'। লাল দানাগুলি কেবল কুলি আর ধাঙরের কাজ করে বেড়ায়। শরীরের ময়লা সাফ করা, শরীরকে ধুয়ে মুছে বাতাস খাইয়ে তাজা রাখা, এ সবই হচ্ছে ঐ লাল কণিকাদের কাজ। কিন্তু শত্রুর সঙ্গে যখন লড়াই করতে হয় তখন ডাক পড়ে ঐ সাদা প্রহরীদের।

যেমনি শরীরে রোগের বীজ ঢোকে অমনি চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। আর

প্রহরীরা দলে দলে রক্তের স্রোতে ভেসে এসে রোগের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয়। টপাটপ্ রোগের বীজ খেয়ে ফেলতে থাকে। লড়াই যখন সঙ্গীন হয় তখন দলে দলে প্রহরী মরতে থাকে, আবার নূতন প্রহরীর দল দ্বিগুণ উৎসাহে লড়তে আসে। এরকম ছোট ছোট লড়াই শরীরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। মানুষের রোগ যখন সাংঘাতিক হয়, যখন প্রহরীরা কিছুতেই আর রোগের বীজগুলোর সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠে না তখন মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়। যখন রোগের বীজ ক্রমশই শরীরটাকে দখল করতে থাকে তখন শরীরময় হৈচৈ পড়ে যায়,—'আরো প্রহরী পাঠাও, আরো প্রহরী পাঠাও।' শরীরের কারখানায় তখন লাখে লাখে শ্বেত কণিকা হতে থাকে। শরীরের মরণ-বাঁচন অনেকটা তাদেরই হাতে।

মনে কর তোমার হাতে এক জায়গায় একটুখানি কেটে গেছে; যেখানে কাটে সেখান দিয়ে ত রক্ত বেরোবেই কিন্তু ক্রমাগতই যদি রক্ত বের হতে থাকে, তাহলে সে ত বড় মারাত্মক কথা—তাই শরীর প্রথমেই চেষ্টা করে রক্ত থামাতে। রক্ত থামাবার উপায়টিও বড় চমৎকার; রক্তটা বাইরে এসে আপনা থেকেই কাটা ঘায়ের মুখে ছিপির মতো জমাট বেঁধে যায়। তখন সেই জায়গাটা যদি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখ তাহলে দেখবে হাজার হাজার লাল কণিকা তার মধ্যে তাল পাকিয়ে মরে আছে। সাদা প্রহরীরাও ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে না; তারা সব ছুটে এসে মরা লাল কণিকাগুলিকে খেয়ে খেয়ে সাফ করতে থাকে, আর কাটা চামড়ার জায়গায় নূতন চামড়া গজাবার ব্যবস্থা করতে থাকে। কাটা ঘায়ের মুখটি হচ্ছে রোগের বীজ ঢুকবার খোলাপথ; যদি তেমন তেমন বীজ সেখান দিয়ে ঢুকতে পারে, তাহলেই শীঘ্র শীঘ্র ঘা শুকাবার পক্ষে মুস্কিল হয়, সামান্য একটা ঘা পেকে বা পচে উঠে বিষম কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। তখন প্রহরীদের খাটুনিও খুব বেড়ে যায়। ঘা পাকলে তা থেকে যে পুঁজ বেরোয় তার মধ্যে দেখা যায় অসংখ্য শ্বেতকণিকা মরে আছে, আর তার মধ্যে রোগের বীজাণু কিল্‌বিল্ করছে।

আকাশবাণীর কল

একজন বক্তা, তার তিন লক্ষ শ্রোতা! একজন কথা বলছে, বক্তৃতা করছে গান গাইছে বাজনা বাজাচ্ছে আর তিন লক্ষ লোক তার প্রত্যেকটি সুর পরিষ্কার করে শুনতে পাচ্ছে! কথাটা শুনতে কেমন অসম্ভব শোনায় না? কিন্তু আমেরিকার বড় বড় সহরে এরকম আজকাল প্রতিদিনই ঘটছে। আরো আশ্চর্য এই যে, এই তিন লক্ষ লোক, যারা সকলে মিলে বক্তৃতা শুনছে তারা সব এক জায়গায় বসে থাকে না; কেউ দুই মাইল চার মাইল, কেউ বিশ মাইল, পঁচিশ মাইল দূরে, যে যার ঘরে আরাম করে বসে বক্তৃতা শোনে। এমনকি দেড়শ দুশ মাইল দূর থেকেও লোকের বক্তৃতা শুনবার কোনও বাধা নাই। দু বছর আগেও এরকম হওয়া সম্ভব বলে লোকে মনে করতে পারত না। কিন্তু আজকাল বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে এসব সম্ভব এবং সহজ হয়েছে।

তুমি যখন কথা বল তখন তোমার গলার আওয়াজ চারিদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যতদূর পর্যন্ত সে আওয়াজ যায় ততদূর পর্যন্ত বাতাসে নানারকম ঢেউ খেলিয়ে যায়। মোটা গলার বড় বড় ঢেউ, সরু গলার ছোট ছোট ঢেউ। চেঁচিয়ে বললে

বাতাসে জোরে জোরে ঢেউয়ের ধাক্কা লাগে, আস্তে বললে সে ঢেউ বাতাস ঠেলে বেশি দূর এগোতেই পারে না। কিন্তু যেমন করেই কথা বল আর যত জোরেই বল, খানিক দূর পর্যন্ত গিয়ে সে ঢেউ আপনি মিলিয়ে যাবে। তারপরে আর তোমার আওয়াজ পৌঁছবে না।

যে কলের সাহায্যে গলার আওয়াজকে, অথবা অন্য যে কোনওরকম শব্দকে অনেক দূর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া যায় তার নাম 'টেলিফোন'। আজকাল অনেক বড় বড় সহরে টেলিফোন কল দেখতে পাওয়া যায়। লোকে একটা হাতলের মতন জিনিস কানে লাগিয়ে তার চোঙের ভিতর কথা বলে, আর অনেক দূরের লোক সেইরকম আর একটা কল কানে দিয়ে সে কথা শুনতে পায়। দুজনের মধ্যে খালি সরু তারের যোগ। সেই তারের ভিতর দিয়ে সারাক্ষণ বিদ্যুৎ চলে, আর সেই বিদ্যুতের স্রোত শব্দের ঢেউগুলোকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পৌঁছে দেয়, এই উপায়ে অনেক মাইল পর্যন্ত শব্দ পাঠান সম্ভব হয়।

কিন্তু গোড়ায় যে টেলিফোনের কথা বলা হয়েছে, যাতে তিন লক্ষ লোক একসঙ্গে টেলিফোনের আওয়াজ শুনতে পায়, তাতে তার-টার কিছুরই দরকার হয় না। তা যদি দরকার হত, তাহলে ভেবে দেখ কত লক্ষ মাইল তার বসাতে হত আর তার জন্য কত হাজার হাজার টাকা খরচ করতে হত। তার বদলে এখন কেবল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ করলেই তুমি তোমার ঘরে বসে বহু দূরের কথা ও গান-বাজনা অনায়াসে শুনতে পার।

আমেরিকায় এই সমস্ত টেলিফোনের কল তৈরি করা আজকাল একটা মস্ত ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা কল তৈরি করে তারা সহরের একটা কোনও জায়গায় গান বাজনা ও বক্তৃতার স্টেশন বসায়। সেখানে বড় বড় কল থাকে, সেই কলে চোঙের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তারা বক্তৃতা করে, গায়কেরা গান গায়। বাতাসে যেমন সর্বদাই শব্দের ঢেউ খেলছে; আকাশেও তেমনি আলোর তরঙ্গ, বিদ্যুতের তবঙ্গ সর্বদাই খেলে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের কলগুলির কাজ হচ্ছে সমস্ত কথা ও সুরগুলিকে ধরে তা থেকে বিদ্যুতের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাকে আকাশময় ছড়িয়ে দেওয়া। বিদ্যুতের ঢেউগুলি শব্দের বাহন হয়ে চারিদিকে হাজার হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ে। সে শব্দ কানে শোনা যায় না, কারণ সে আর বাতাসের ঢেউ নয়, সে এখন বিদ্যুতের তরঙ্গ। সেই বিদ্যুতের তরঙ্গ যখন তোমার বাড়িতে তোমার টেলিফোনের যন্ত্রে এসে আঘাত করে তখন সে আবার শব্দের ঢেউ হয়ে তোমার কানের ভিতরে কথা ও সুরের সৃষ্টি করে। স্টেশনের যন্ত্রের সামনে যে কথা ও যেমন সুর শোনান হয় ঠিক সেই কথা তেমনি সুরে অতি পরিষ্কারভাবে তুমি ঘরে বসেই শুনতে পারবে।

প্রতিদিন কোন্ সময়ে কি হবে তা সব আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া থাকে। যেমন মনে কর বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, সকাল বেলা আটটা থেকে নটা পর্যন্ত খবর শোনান হবে। সেই সময়ে যদি টেলিফোনে কান দিয়ে থাক তাহলে শুনতে পাবে যে একজন লোক পরিষ্কার গলায় সেদিনকার সব খবর শোনাচ্ছে। তার আগের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যত দেশ থেকে যতরকমের খবর এসেছে, একে একে সব বলে যাচ্ছে। কোথায় যুদ্ধবিগ্রহ হল, কোথায় বড় বড় মন্ত্রিসভায় কি কি পরামর্শ স্থির হল, কোথায় কতরকমের কি দুর্ঘটনা ঘটল, এই সমস্ত খবর বলছে; তারপর ক্রিকেট, ফুটবল, ঘোড়দৌড় আর নানারকম খেলা ও আমোদের কথা বলছে; তারপর হয়ত নানারকম জিনিসের বাজার দর আর নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলছে। সকলের শেষে

সেদিন কখন কি কি হবে তাও জানিয়ে দিচ্ছে--যেমন "আজ তিনটের সময় ঘোড়দৌড়ের ফল বলা হবে," "পাঁচটার সময় অমুক বিষয়ে অমুক বক্তৃতা করবেন," "সাতটা থেকে আটটা অমুক অমুক গাইয়ের গান শোনান হবে, তারপর এক ঘণ্টা নাচের বাজনা হবে," "নটার সময় ছোট ছেলেদের জন্য গল্প শোনান হবে।" আমেরিকায় এরই মধ্যে নানা সহরে সবশুদ্ধ কয়েক হাজার স্টেশন বসান হয়েছে। সেইসব স্টেশনের শ্রোতাদের সংখ্যা যে কত, তা এ থেকেই বুঝতে পারবে যে এক নিউইয়র্ক সহরেই তিন লক্ষের বেশি শ্রোতা প্রতিদিন বিনা তারে টেলিফোন শোনে।

অনেকগুলো স্টেশন মিলে যখন একসঙ্গে আকাশে ঢেউ ছড়াতে থাকে তখন অনেক লোকের একসঙ্গে কথা বলার মতো একটা ভয়ানক গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে; সেইজন্য স্টেশনওয়ালারা নিজেদের মধ্যে একরকম বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যে এক এক স্টেশন থেকে খালি এক-একরকম ঢেউ ছাড়া হবে। আকাশে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ ওঠে তাকে স্টেশনওয়ালাদের ইচ্ছামত ছোট বা বড় করা যায়। যেমন একটা স্টেশন থেকে যদি একশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়া হয় তাহলে তার পাশের স্টেশন থেকে নব্বুই হাত কি একশ দশ হাত লম্বা ঢেউ ছাড়তে পারে, কিন্তু একশ হাত ঢেউ ছাড়বার হুকুম তাদের নেই। শ্রোতারা যে টেলিফোনের কল ব্যবহার করে তাতে এমন বন্দোবস্ত থাকে যে সে কল খালি একরকম বিদ্যুতের ঢেউয়েতেই সাড়া দিবে। বেহালার কানে মোচড় দিয়ে যেমন তারের সুর অনেকটা নামান বা চড়ান যায় তেমনি টেলিফোনের শব্দ ধরবার যন্ত্রটিকেও নানারকম ঢেউয়ের তালে চড়িয়ে বা নামিয়ে বাঁধা যায়। মনে কর তোমার টেলিফোনের কল এখন যেভাবে বাঁধা আছে তাতে একশ হাত ঢেউওয়ালা স্টেশনের শব্দ শোনা যেতে পারে। কিন্তু তুমি বিজ্ঞাপনে দেখলে, আজ সন্ধ্যার সময় নব্বুই হাত ঢেউয়ের স্টেশনেতে খুব বড় কোনও ওস্তাদ গান করবে; তুমি ইচ্ছা করলে তোমার কলের বাঁধন বদলিয়ে তাতে নব্বুই হাত তরঙ্গ ধরে সেই স্টেশনের গান শুনতে পার। যারা এইসব টেলিফোনের কল ব্যবহার করে কেবল তাদের জন্য এর মধ্যেই নানারকম খবরের কাগজ আর মাসিকপত্র বের হতে আরম্ভ করেছে। তাতে কোথায় কোন্ নূতন স্টেশন হচ্ছে, কখন কোথায় কি হবে, টেলিফোন কলের কি কি নতুন উন্নতি হচ্ছে, এই সমস্ত খবর থাকে। তাছাড়া কলওয়ালাদের নানারকম বিজ্ঞাপন থাকে; আর টেলিফোনের কল সম্বন্ধে আর তার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ থাকে।

সাধারণত যেসব টেলিফোনের কল ব্যবহার হয়, তাতে কানের উপর চাক্তির মতো বা চোঙার মতো টেলিফোনের মুখ বসিয়ে আওয়াজ শুনতে হয়। যতজন শ্রোতা ততগুলো চোঙা বা চাক্তি দরকার। কিন্তু আর একটু বেশি টাকা খরচ করলে আর একরকমের টেলিফোনের কল পাওয়া যায় যাতে গ্রামোফোনের চোঙার মতো একটা মস্ত চোঙার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার আওয়াজ বেরোতে থাকে। পাঁচ সাতজন বা বিশ পঞ্চাশজন লোকে একসঙ্গে বসে সেই আওয়াজ শুনতে পারে।

বিনা তারের টেলিফোন হওয়াতে মানুষের যে কতদিকে কতরকম সুবিধা হচ্ছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। ছোট্টখাট্ট টেলিফোনের কলটি তোমার পকেটে করে সঙ্গে নিয়ে যাও, পথের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা একটা বাতি বা থাম কিংবা টেলিগ্রাফ পোস্টের গায়ে তার ঠেকিয়ে নিলেই কতরকম আওয়াজ শুনতে পারবে। যদি নিজের বাড়িতে কিংবা আপিসে একটি ছোটখাট ঢেউ পাঠাবার স্টেশন বসাও তাহলে বাড়ির লোকে বা আপিসের লোকে যখন ইচ্ছা তোমায় খবর পাঠাতে পারবে। তুমি নিশ্চিন্তে

থাকতে পার যে, যেখানেই থাক না কেন, হঠাৎ বিশেষ কোনও দরকার পড়লে কিংবা কোনও বিপদ-আপদ ঘটলে তখনি তোমার কাছে তার খবর পেঁছাতে পারবে।

এমনি করে "যে গান কানে যায় না শোনা," যে গান আকাশের তরঙ্গে চড়ে বিদ্যুতের মতো বেগে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেই সশব্দ গানকে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ আবার তাকে কলের মধ্যে ধরে আকাশের ভাষা ও আকাশের সুর শুনছে। আমাদের দেশে গল্পে ও পুরাণে যে আকাশবাণীর কথা শুনতে পাই,—এও যেন সেই আকাশবাণীর মতো কোথাও কোন আওয়াজ নাই, জনমানুষের সাড়া নাই, অথচ কলের মধ্যে কান দিলেই শুনি আকাশময় কত কণ্ঠের কত ভাষা, কত বিচিত্র গান আর কত যন্ত্রের সুর!

যদি অন্যরকম হত

এই পৃথিবীটাকে জন্মে অবধি আমরা যেমন দেখে আসছি সে যে বরাবর ঠিক সেরকম ছিল না তা তোমরা সবাই জান। এখন সে যেমনটি আছে চিরকাল তেমনটিও থাকবে না। আমরা এখন তার যেরকম চেহারা দেখছি সেরকম না হয়ে যদি সে অন্যরকম হত, যদি তার শনির মতো আংটি থাকত কিংবা বৃহস্পতির মতো দশ বারোটা চাঁদ থাকত তাহলে আরও কত অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেতাম। চাঁদ যেমন বারো মাসে তার একই পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে থাকে, ও পিঠে কি আছে তা আমাদের দেখতে দেয় না বুধগ্রহ ঠিক তেমনি করে সারা বছর সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবী যদি তেমনি করে কেবল একটা দিকই সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে রাখত—তাহলে ব্যাপারটা কি হত একবার ভাব দেখি। একদিকে চিরকালই রোদ, চিরকালই গরম, একটু জুড়োবার অবসর নাই, সব মরুভূমি, সব ফেটে চৌচির! আর-একদিকে কেবলই রাত, কেবলই ঠাণ্ডা আর কেবলই বরফ! জীব-জন্তুর সাধ্য কি যে তেমন ঠাণ্ডায় বা তেমন গরমে পাঁচ মিনিটও বেঁচে থাকে। এই দুইয়ের মাঝখানে যেখানে বার মাস কেবলই সন্ধ্যা, যেখানে সূর্য অস্তও যায় না, উদয়ও হতে চায় না, কেবল আকাশের সীমান্তের কাছে উঁকিঝুঁকি মারে সেখানে হয়ত কষ্টেসৃষ্টে জীব-জন্তুরা টিঁকে থাকতে পারে, গাছপালা যদি থাকে তবে তাও ওই সন্ধ্যের দেশটুকুতেই থাকবে।

এক জায়গায় মাটি যদি গরম হয় আর তার কাছেই আশেপাশে যদি তার চাইতেও ঠাণ্ডা জায়গা কোথাও থাকে তাহলে গরম জায়গার হাওয়া হালকা হয়ে উপরদিকে উঠতে থাকে, আর চারিদিকের ঠাণ্ডা বাতাস এসে সেই জায়গা দখল করতে থাকে। এমনি করে ছোট বড় ঝড়ের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর একটা দিক যদি আগুনের মতো গরম আর একদিক বরফের চাইতেও ঠাণ্ডা হত তাহলে সারা বছর ধরে যে ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি হত, তার কাছে এই পৃথিবীর বড় বড় তুফানগুলো নিতান্তই ছেলেখেলা। সুতরাং পৃথিবীর যে এখনও চাঁদের মতো বা বুধগ্রহের মতো দশা হয়নি সেটা আমাদের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীর দিনগুলো ক্রমেই লম্বা হয়ে আসছে। এখন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন হয় কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছর পরে দিনগুলো বাড়তে বাড়তে ক্রমে ক্রমে ৩৬৫ গুণ লম্বা

হয়ে আসবে অর্থাৎ এক বছরে পৃথিবীর একদিন হবে তখন উপরে যেরকম বর্ণনা করা হয়েছে পৃথিবীর ঠিক সেইরকম দশা হয়ে আসবে।

যদি বাতাস না থাকত তাহলে পৃথিবীর কি অবস্থা হত? জীব-জন্তু সব যে মরে যেত সে ত সহজেই বোঝা যায় কিন্তু পৃথিবীর চেহারাটা হত কিরকম? গাছপালা না হওয়ার দরুণ চেহারার যে পরিবর্তন হত সেটা একরকম কল্পনা করে নেওয়া যায়—কিন্তু তাছাড়াও আরো অনেক অদ্ভুত পরিবর্তন হত। বাতাস না থাকলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বা হাওয়ার চলাচল এ সব কিছুই থাকত না। পাহাড় ধসে পড়লেও তার শব্দ শোনা যেত না। যে জলের উপর সর্বদা চঞ্চল ঢেউ খেলতে থাকে সেই জল আশ্চর্যরকম স্থির হয়ে থাকত আর তার মধ্যে সব জিনিসের ছায়া পড়ত একেবারে আয়নার মতো পরিষ্কার। কিন্তু তাও বেশি দিন হবার যো থাকত না। বাতাসের চাপ না থাকলে জল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়; সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সব জল বাষ্প হয়ে আকাশময় ছড়িয়ে পড়ত। পৃথিবীর সাধ্য থাকত না যে সেই জলকে মেঘের আকারে বা কুয়াশার আকারে আটকিয়ে রাখে। সেই বাতাসহীন পৃথিবীর উপর যখন রোদ এসে পড়ত তখন দেখতে দেখতে পৃথিবী গরম হয়ে উঠত, আবার রোদ পড়লেই গরম মাটি চট্‌পট্‌ জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

আর একটা কাণ্ড হত এই যে, পৃথিবীর চারিদিকের সমস্ত ধুলো আর বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াতে পারত না; সব এসে পৃথিবীর গায়ের উপর জমে থাকত। ধুলো অতি সামান্য জিনিস কিন্তু ঐ ধুলোটুকু না থাকার দরুণ সমস্ত আকাশের চেহারা একেবারে বদলিয়ে যেত। আমাদের এই আকাশে যখন সূর্য ওঠে তখন সমস্ত আকাশ আলো হয়ে যায়। আকাশের যেখানেই তাকাও সেখানেই আলো। রাত্তিরের তারাগুলো সে আলোয় কোথায় যে চাপা পড়ে যায় তাদের আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। অমন যে ঝক্‌ঝকে চাঁদ সেও আলোর তেজে ফ্যাক্‌শা হয়ে যায়। কিন্তু ধুলো যদি না থাকত তাহলে এসব কিছুই হওয়া সম্ভব হত না। যেখানে সূর্য থাকত শুধু সেইটুকুই ঝক্‌ঝকে আলো আর তার চারিদিকেই ঘুট্‌ঘুটে কালো আকাশ, সেই আকাশের গায়ে দিন দুপুরে তারাগুলো সব ফুটে থাকত। আর সূর্যের চেহারাও আশ্চর্যরকম বদলিয়ে যেত। সূর্যের চারিদিকে যে আগুনের খোলস আর আলোর কিরীট থাকে, পূর্ণগ্রহণের সময় ছাড়া যা এখন চোখে দেখবার উপায় নাই, সেসব তখন শুধু চোখেই যখন-তখন দেখা যেত। একটা ঝক্‌ঝকে গোল পিণ্ড, তার গা থেকে আগুনের শিখাগুলো লক্‌লকে জিব বার করে লাফাচ্ছে আর তার চারদিকে অতি সুন্দর স্নিগ্ধ সবুজ আলো রঙের খেলা দেখিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

যা হোক, এ সমস্তই কল্পনার কথা। আসল কথা এই যে, পৃথিবী যেমন আছে আরও বহুকাল সে তেমনি থাকবে এবং সেটা তোমার পক্ষেও ভাল, আমার পক্ষেও ভাল—আমাদের হাজার হাজার বছর পরে যারা জন্মাবে তাদের পক্ষেও ভাল।

জলস্তম্ভ

স্রোতের জলে যে-জিনিস ভাসে, স্রোত যেদিকে যায় সে-ও সেইদিকে ভেসে চলে। জলের মধ্যে যদি দুটো স্রোত পাশাপাশি দুই দিকে চলতে থাকে তাহলে দুটো উল্টো টানের মাঝে পড়ে একটি ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিপাকের মধ্যে যা-কিছু এসে পড়ে সবই পাকের সঙ্গে চক্রের মতো ঘুরতে থাকে।

জলে যেমন, বাতাসেও তেমনি। যদি একসঙ্গে দুটো বাতাসের স্রোত পাশাপাশি দুই মুখে চলতে থাকে তাহলেই বাতাসের মধ্যে একটি ঘোরপাক তৈরি হয়। খড়কুটো ধুলোবালি ধোঁয়া, যা কিছু সেই ঘোরপাকের মধ্যে পড়ে সব চরকিবাজির মতো ঘুরতে থাকে। যদি দুই মুখেই বাতাসের বেশ জোর থাকে তাহলে সেই ঘোরপাক থেকে সাংঘাতিক ঘূর্ণিবায়ুর জন্ম হতে পারে। যেদিকে বাতাসের জোর বেশি, ঘূর্ণিবায়ু ঘোরপাক খেতে খেতে সেইদিকে ছুটে চলে। ছোটখাট ঘূর্ণিবায়ু তোমরা বোধ হয় সকলেই দেখেছ। হঠাৎ কোথা থেকে বাতাস উঠল আর সেই সঙ্গে খানিকটা ধুলো আর কাগজ আর শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে উড়তে লাগল। এইরকম তামাসা অনেক সময়েই দেখা যায়। কিন্তু এই ঘূর্ণি বায়ুই যখন আবার খুব বড় আকার নিয়ে দেখা দেয় তখন তার চেহারা অতি সাংঘাতিক হয়।

ঘূর্ণিপাকের চক্র যখন নিচের দিকে নামতে থাকে তখন যদি সেই ঘুরন্ত বাতাসের চেহারাটা দেখতে পেতাম তাহলে দেখতাম ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড চুড়োওয়ালা টুপি উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। জলে যে ঘূর্ণিপাক হয়, তার মাঝখানটায় যেরকম গর্ত হয় তেমনি এরও মাঝখানটা ফাঁপা। টুপির চুড়োটা যতই লম্বা হতে হতে মাটির কাছ পর্যন্ত নামে ততই নিচের সমস্ত হাল্কা জিনিসকে ঐ ফাঁপা জায়গাটুকুর মধ্যে শুষে নিতে থাকে।

'হাল্কা জিনিস' বললাম বটে, কিন্তু তেমন তেমন ঘূর্ণিবায়ু হলে তার কাছে প্রায় সব জিনিসই হাল্কা হয়ে যায়। খাটবিছানা বাড়ির চালা, এসব ত উড়ে যায়ই, পাঁচ-সাতজন মানুষ শুদ্ধ আস্ত মোটর গাড়ি পর্যন্ত শুকনো পাতার মতো ঘোরপাক খেয়ে শূন্যে উঠে পড়ে।

অনেক সময়ে বাতাসের জল জমে ঘূর্ণিবায়ুর থলিটির মধ্যে জড় হতে থাকে। কিন্তু সে জল বৃষ্টি হয়ে নামতে পারে না, একেবারে হাজার হাজার মণ জল অন্ধকার মেঘের মতো আকাশে ঝুলে ঘুরপাক খেতে থাকে। বড় বড় বিল বা নদী কিংবা সমুদ্রের উপরেই সাধারণত এইরকম হয়। তখন কেবল যে উপরের বাতাস কালো থলির মতো হয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে তা নয়; নিচের জলও চুড়োর মতো উঁচু হয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরদিকে উড়তে থাকে। নিচেকার চুড়োটি যখন উপরের ঘুরন্ত মেঘের সঙ্গে মিলে যায় তখনই বড় বড় থামের মতো জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। তখন দেখতে মনে হয়, যেন জল থেকে আকাশ পর্যন্ত এক একটা প্রকাণ্ড থাম জলের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

নৌকোই বল আর জাহাজই বল, সে যত বড় আর যত মজবুতই হোক না কেন, জলস্তম্ভের মধ্যে পড়লে আর রক্ষা নাই। জাহাজের কাছে জলস্তম্ভ উপস্থিত হলে তার ঘূর্ণিটান এড়িয়ে চলা জাহাজের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে ঘূর্ণিজলের স্তম্ভ তেমনি করে জাহাজকে টেনে নেয়। স্তম্ভের ভিতরে ঢুকলে জাহাজের লোকদের আর কিছু করবার উপায় থাকে না। জাহাজ বন্‌বন্ করে ঘুরতে থাকে—অনেক সময় জল ছেড়ে শূন্যে উঠে যায়—চারিদিকে ভোঁ-ভোঁ শব্দে কানে তালা লেগে যায়, অন্ধকারে আর জলের ঝাপটায় কিছু দেখবার সাধ্য থাকে না।

তারপর স্তম্ভ যখন ভীষণ শব্দে ফেটে যায় তখন হচ্ছে আসল বিপদ। একেবারে হাজার মণ জল বাজ পড়ার মতো আওয়াজ করে মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজ-টাহাজ সব চুরমার করে দেয়। সমুদ্রের জল তার ধাক্কায় বহুদূর অবধি তোলপাড় হয়ে ওঠে। বহুদূরের জাহাজ পর্যন্ত তার সাংঘাতিক ঢেউয়ে টল্‌মল্ করতে থাকে।

কিছুদিন আগে আমেরিকার এক সাহেব কয়েকজন বন্ধুর সংগে এক প্রকাণ্ড মোটরে চড়ে একটা বিলের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন আকাশ থেকে একটা কালো মেঘের মতো কি যেন ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নেমে আসল, আর বিলের উপর থেকে খানিকটা জল ছিট্‌কে উঠে তার সংগে মিলে একটা স্তম্ভের মতো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে স্তম্ভটা বিলের উপর দিয়ে তেড়ে এসে মোটর-গাড়ির উপর পড়ে, গাড়িটাকে সোঁ করে শূন্যে তুলে, পাহাড়ের উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাড়ির আরোহীরা কেউ মরল, কেউ সাংঘাতিক জখম হল আর প্রকাণ্ড গাড়িখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

যদি সর্বদাই যখন তখন এরকম বড় বড় জলস্তম্ভ দেখা দিত তাহলে সেটা খুবই ভয়ের কথা হত; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এরকম সচরাচর দেখা যায় না। তেমন বড় জলস্তম্ভ অতি অল্পই দেখা যায় আর তাও থাকে অতি অল্প সময়।

বুমেরাং

এই পৃথিবীতে যারা সভ্য জাতি বলে পরিচিত তাদের সভ্যতার মোটামুটি পরিচয় হচ্ছে এই যে, তারা চাষবাস করতে জানে, আগুনের এবং নানারকম ধাতুর ব্যবহার জানে, নানারকম জিনিসকে নিজের কাজে লাগাতে জানে, পাকা ঘর দালান গড়তে জানে, আর মনটাকে নানারকম জ্ঞানের সন্ধানে নিযুক্ত করতে জানে। এসব যারা জানে না তাদের আমরা বলি অসভ্য জাত। এই হিসাবে, পৃথিবীর সব চাইতে অসভ্য জাতিদের নাম করতে হলে অস্ট্রেলিয়ার আদিম বর্বর জাতির কথা উল্লেখ করতে হয়। তারা কাপড় বানাতে জানে না, ধাতুর ব্যবহার ত দূরের কথা, সামান্য মেটে বাসন পর্যন্ত তৈরি করতে জানে না, চাষবাসের কোনও খবরই রাখে না; কাঁচা মাংস আর বুনো গাছের ফল বা শিকড় খেয়ে ঘুরে বেড়ায়। সামান্য লতাপাতার ছাউনি ছাড়া আর কোনওরকম ঘরবাড়ির খবর তারা রাখে না; এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে বললে

মাথায় তাদের গোল বেধে যায়।

এমন যে অসভ্য জাত, তারাও কিন্তু একটি বিদ্যায় এমন ওস্তাদ যে, সে বিদ্যা পৃথিবীর অতিবড় সভ্য জাতিরাও আজ পর্যন্ত শিখে উঠতে পারেনি। সে বিদ্যাটি হচ্ছে বুমেরাং অস্ত্রের ব্যবহার। অস্ত্র বললাম বটে, কিন্তু তা বলে খুব একটা জটিল বা মারাত্মক কিছু মনে করে বস না। বুমেরাং জিনিসটি হচ্ছে এক টুকরা বাঁকান কাঠ মাত্র। সেই কাঠের একপিঠ সমান আর-একপিঠ গোল মতো উঁচু করা, অনেকটা হকি খেলার লাঠির মতো। যে পিঠটাকে সমান বললাম তাও একেবারে সমান নয়। ভাল করে দেখলে দেখা যায়, সেটাও কেমন একটু ঢেউ খেলান মতন, কোথাও সামান্য উঁচু কোথাও সামান্য নীচু। বুমেরাঙের চেহারা নানারকম হয়।

এখন বুমেরাঙের ব্যবহারের কথা বলি। এই অস্ত্রের সাহায্যে সে দেশী লোকেরা তাদের প্রতিদিনের শিকার সংগ্রহ করে। লড়াইয়ের সময়েও এই অস্ত্রই তাদের প্রধান সম্বল। ওস্তাদ লোকেরা যখন এই অস্ত্র ছুঁড়ে মারে তখন অস্ত্রের চালচলন এমন অদ্ভুতরকমের হয় যে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। অস্ত্র ছুঁড়ে মারলে তা কখনও সোজাসুজি সামনের দিকে ছুটে যায় না। খানিক দূর গিয়েই নানারকম উল্টোবাজি খেতে থাকে, গোঁৎ খেতে খেতে আকাশে উঠে যায়, আবার অনেক সময়ে সোঁ করে ওস্তাদের কাছেই পালটে ফিরে আসে। প্রকাণ্ড গাছের আড়ালে শত্রু বা শিকার লুকিয়ে আছে, ওস্তাদ শিকারী গাছের আরেক দিকে থেকেই এমন কায়দায় বুমেরাং ছুঁড়ল যে, সে অস্ত্র গাছ এড়িয়ে প্রকাণ্ড চক্র দিয়ে ঘুরে শত্রু বা শিকারের গায়ে গিয়ে পড়ল।

যুদ্ধের জন্য, শিকারের জন্য বা তামাসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বুমেরাং তৈরি হয়। যুদ্ধে যেসব অস্ত্রের ব্যবহার হয় সেগুলি ছুঁড়ে মারলে আর ফিরে আসে না। শিকারের বুমেরাংগুলি এমনভাবে তৈরি যে দৈবাৎ যদি শিকার ফস্‌কে যায় তাহলে অস্ত্র আপনি শিকারীর কাছে ফিরে আসে। তামাসার বুমেরাংগুলি এমনভাবে বানায় যে ছুঁড়লে পর খুব সুন্দর বা খুব অদ্ভুতভাবে নানারকম কায়দা খেলিয়ে অস্ত্র আপনার ও ওস্তাদের বাহাদুরী দেখায়।

আশ্চর্য এই যে, এইসব অস্ত্র কেন যে ঐরকমভাবে চলে, তার সঠিক হিসাব আর নিয়মকানুন বার করতে গিয়ে মহা মহা পণ্ডিতেরাও অনেক সময় হার মেনে যান; অথচ পৃথিবীর অসভ্যতম জাতির কারিকরেরা সারা বছর ধরে এইসব অস্ত্র নিখুঁৎভাবে গণ্ডায় গণ্ডায় তৈরি করছে আর অসভ্য ওস্তাদেরা তার অব্যর্থ ব্যবহার দেখিয়ে সভ্য মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে। কেমন করে তাদের মগজে এমন বিদ্যা প্রবেশ করল, কোথা থেকে এমন অস্ত্রের সন্ধান পেয়ে এমন করে শিখল, তার উত্তর কেউ জানে না।

ছাপাখানার কথা

ছেলেবেলায় একটা ছাপাখানা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম একটা লোহার কল রয়েছে, সেটাকে তারা 'প্রেস' বলে। তার পাশে একটা কালি-মাখান টেবিল আর অন্য একটা

টেবিলে একতাড়া কাগজ। প্রেসের সামনের দিকে একটা লোহার তক্তার উপর অনেকগুলো উঁচু উঁচু অক্ষর বসান রয়েছে। একটা ছেলে একটা মোটা 'রুল' দিয়ে টেবিলের কালি নিয়ে সেই অক্ষরগুলোতে মাখাচ্ছে। আর একজন লোক সেই তক্তার সঙ্গে আঁটা একটা ফ্রেমের উপর কাগজ বসিয়ে, কাগজ শুদ্ধ ফ্রেমটাকে মুড়ে সেই অক্ষরগুলোর উপর ফেলে দিচ্ছে। তারপর একটা হাতল ঘুরিয়ে সেইগুলোকে একেবারে প্রেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আর-একটা প্রকাণ্ড হাতল টেনে দিচ্ছে। তারপর হাতল ছেড়ে দেওয়া তক্তা টেনে বার করা, কাগজ খুলে নেওয়া, আবার কালি দেওয়া, কাগজ দেওয়া ইত্যাদি। এইরকম ক্রমাগত চলছে আর প্রত্যেকবার এক-একখানা ছাপা হচ্ছে; এমনি করে ঘণ্টায় ২০০/৩০০ করে ছাপা হয়। ব্যাপারটা আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু এ সব প্রেস এখন আমাদের দেশেও নিতান্ত 'সেকেলে' হয়ে গেছে।

আজকালকার কোন বড় ছাপাখানায় যদি যাও, প্রেসের রকমারি দেখে অবাক হয়ে যাবে। তার অধিকাংশ কলে চলে, আগাগোড়াই তার কলে কাজ হয়। প্রথম যে কলের প্রেস দেখেছিলাম সেকথা আমার এখনও মনে আছে। প্রেসটাকে দর্জির সেলাই কলের মতো পায়ে চালাতে হয়। সেটা যখন চলে তখন বোধহয় যেন একবার হাঁ করছে, একবার মুখ বুজছে। যে প্রেস চালায় সে ঐ হাঁ-করা প্রেসের মধ্যে তার কাগজ বসিয়ে দেয়, আর প্রেসটা সেই কাগজের উপর অক্ষরের 'টাইপ' দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয়—তাতেই ছাপা হয়ে যায়! কালির জন্য ভাবতে হয় না; প্রেসের মাথায় কতগুলো রুল বসান আছে, সেগুলো কালি মেখে তৈরি হয়ে থাকে, যেই প্রেসটা হাঁ করে, আর প্রেসম্যান তার কাগজ বদলিয়ে দেয় অমনি রুলগুলো সুরুৎ করে সেই উঁচু উঁচু অক্ষরগুলোর উপর কালি মাখিয়ে পালায়! পায়ে না চালিয়ে প্রেসের সঙ্গে মোটর জুড়ে দিলে মোটরেই প্রেস চালাতে পারে।

কিন্তু পড়বার বই বা মাসিক কাগজপত্র ছাপবার জন্য যেসব বড় বড় প্রেস থাকে, সেগুলো আরও কট্‌মটে। তাতে একটা প্রকাণ্ড লোহার চোঙা থাকে, তার গায়ে কাগজ ঠেলে দিলে সে আপনি কাগজ টেনে নেয়। একটা লোহার টেবিল মতো থাকে, তার উপর টাইপ বসান; সেই টেবিলটা টাইপশুদ্ধ ছুটাছুটি করে। একবার রুলের তলা দিয়ে ছুটে কালি মেখে এসে আবার কাগজ-জড়ান 'চোঙার' নীচ দিয়ে গড়াতে গিয়ে চোঙাটাকে চেপে ঘুরিয়ে কাগজের গায়ে ছাপ মেরে দেয়। ছাপা হয়ে গেলে কাগজটাকে হাতে করে সরিয়ে নিতে হয় না—প্রেসটা আপনি তাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে দেয়। এমনি করে ঘণ্টায় ২০০০/৩০০০ বেশ সহজেই ছাপা যায়।

কিন্তু ছাপাখানা কি ভয়ানক ব্যাপার হতে পারে তা যদি তুমি দেখতে চাও তবে খুব বড় খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে গিয়ে দেখ। সেখানে প্রেসের ঘরে ঢুকতেই মনে হবে যেন কানে তালা লেগে গেল। প্রেসের ভন্‌ভন্‌ শব্দে নিজের চেঁচানি নিজেই শুনতে পাবে না। কল এত তাড়াতাড়ি চলে যে, কখন কি করে ছাপা হচ্ছে কিছু বুঝবার যো নেই। এমন প্রেসও আছে, যাতে বারো পৃষ্ঠা খবরের কাগজ প্রতি ঘণ্টায় এক লাখ করে ছাপা হয়। যদি প্রেসটার ভিতর ভাল করে তাকিয়ে দেখ, দেখবে একদিকে একটা লোহার ডাণ্ডায় প্রায় ৪/৫ হাত চওড়া কাগজের ফিতে জড়ান—ফিতাটা লম্বায় হয়ত ২/৩ মাইল হবে। প্রেসের মধ্যে পর পর কতগুলো প্রকাণ্ড লোহার চোঙা ভয়ানক জোরে বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে—আর সেই সঙ্গে হুড়্‌হুড়্‌ করে কাগজের 'ফিতে' টেনে নিয়ে, তার উপর ছেপে যাচ্ছে। মাইলকে মাইল কাগজ চোখের সামনে দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিলাতে একটা বড় খবরের কাগজ (Daily Mail) ছাপতে প্রতি

সপ্তাহে ৩০০ মণ কালি আর দশ হাজার মাইল কাগজ খরচ হয়।

এতে একদিনে যা ছাপা হবে, দেড়শ বছর আগেকার কাঠের প্রেসে এক বছরেও তা পেরে উঠত না।

কাপড়ের কথা

ঐ যে জামাটা তুমি গায়ে দিয়েছ, ওর কাপড়টা তৈরি করতে লোককে কত হাঙ্গামা করতে হয়েছে, তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ? তুলার ক্ষেতে যখন তুলা হল, তখন কত লোকে এসে সেই সব তুলা গাছ থেকে তুলে নিয়ে এক জায়গায় জড় করল। কলে সেই তুলার বীচি পরিষ্কার করে তাকে গাঁটে বেঁধে ফেলল। তারপর সেই তুলা কত দেশবিদেশে ঘুরে, কাপড়ের কলে এসে হাজির হল।

আমি একদিন একটা কাপড়ের কল দেখতে গিয়েছিলাম। সেটা খুব বড় কল নয়—তার চেয়ে অনেক বড় কল আমাদের দেশে আছে। কিন্তু তারই সব কাণ্ড-কারখানা দেখলে অবাক হয়ে থাকতে হয়। প্রকাণ্ড এক তিনতলা বাড়ি,—তার ছাদে অনায়াসে একটা ফুটবল খেলার জায়গা হতে পারে। প্রথমেই গেলাম তিনতলায়। সেখানে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পে-চালান কপিকল আছে; তুলার চালান এলে প্রথমেই গাঁটগুলি কপিকলে করে তিনতলায় তোলা হয়। তারপর গাঁট খুলে তুলা কলে পরিষ্কার করা হয়। সেই কলে তুলাকে ঝেড়ে আছড়িয়ে দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে ধুলা, বালি, বীচি, খড়, কুটো সমস্ত বার করে ফেলে, তারপর সেই পরিষ্কার তুলায় চাপ দিয়ে—আর একটা কলে মোটা মোটা লেপের মতন তৈরি হয়। সেই 'লেপ'গুলি তারপর দোতলায় চালান করে। সেখানে সেই 'লেপ' থেকে সুতা কাটা হয়। সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রথমে অনেকগুলো কলে সেই 'লেপ' থেকে জাহাজ বাঁধা দড়ির মতো মোটা দড়ি তৈরি হয়। তারপর আর একটা কলে সেই দড়ি থেকে টেনে মোটা সুতা বার করা হয়। এমনি করে কলের পর কল—তাতে সুতা ক্রমেই খুব সরু হয়ে আসে। এ ঘরের কল-কারখানা বড়ই অদ্ভুত। চারিদিকে প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা কল সারি সারি সাজান, তার প্রত্যেকটাতে হাজার হাজার লম্বা 'নলি' (সুতা পাকাবার জন্য ছোট ছোট কাঠের 'লাটাই') বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে আর সুতা পাকান হচ্ছে। তাছাড়া কল-কব্জা যে কতরকম চলছে তার আর কথাই নাই। দেখলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়, কিন্তু কারখানার কোথাও একটু গোলমাল দেখতে পাবে না। যে যার কাজ করছে আর সব কল ঠিক চলছে। সুতা কাটা হয়ে গেলে, তৈরি সুতার 'নলি'গুলো আর একটা কলের কাছে নিয়ে যায়। এটা হচ্ছে কাপড়ের 'টানা' দেবার কল। 'টানা' কাকে বলে জান? কাপড়ে লম্বালম্বিভাবে যে-সুতা থাকে তাকে 'টানা' বলে, আর চওড়াভাবে যে সুতা থাকে তাকে 'পড়েন' বলে। এই টানা দেবার কল বড় আশ্চর্য। হাজার হাজার নলি থেকে সুতা টেনে একটা চিরুনির মতো জিনিসের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নিয়ে একটা রোলারে জড়ায়। কল চলতে চলতে যদি একটাও সুতা ছিঁড়ে যায়, অমনি আপনি-আপনি 'ঢং' করে ঘণ্টা বেজে ওঠে আর কল থেমে যায়। সেই সুতাটা জোড়া দিলে তবে কল চলবে। একসঙ্গে অনেক থান কাপড়ের টানা দেওয়া হয়ে থাকে।

টানার সুতায় রোলার ভর্তি হয়ে গেলে সেই রোলারটাকে একতালায় চালান করা হয়। সেখানে কলে সুতায় মাড় দেওয়া হয়। সুতায় মাড় মাখান, বেশি মাড় চেঁচে ফেলে দেওয়া বাতাস দিয়ে তাড়াতাড়ি সুতাকে শুখান,—এসবই কলে হয়। তারপর তাঁতে চড়াবার জন্য সেই সুতাকে গুছিয়ে ঠিক করে। একে বলে 'ব' তোলা। এ-কাজটা হয়ে গেলে তারপর কাপড় বোনা হয়। আগের সব কাজ যত সহজে কলে হয়, কাপড় বোনা তত সহজে হয় না। 'টানা'র সুতার টান যদি একটু বেশি হয়ে যায়, অমনি পট্ করে সুতা ছিঁড়ে যায়। তখনই তাঁত থামিয়ে সুতা জোড়া দিয়ে দিতে হয়।

তাঁত যখন চলে তখন বড় মজার দেখায়। টানার সুতা উঠছে আর নামছে, আর তার ফাঁকের ভিতর দিয়ে 'পড়েনে'র সুতার 'মাকু' ঠক্ ঠক্ করে ছুটে যাচ্ছে আর আসছে,—ঠিক যেন একটা ইঁদুর দৌড়াচ্ছে। কাপড় বোনা হয়ে গেলে, তাকে মেজে ঘসে মোলায়েম করে, সুন্দর করে ভাঁজ করে, ছাপ লাগিয়ে, তারপর তাকে বাজারে পাঠান হয়। মোলায়েম করার কলটি বড় মজার। দুটা ফাঁপা রোলার গায়ে গায়ে লাগান রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে কাপড়টা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফাঁপা রোলারের ভিতর ফুটন্ত জলের বাষ্প চালিয়ে দিয়ে রোলার দুটোকে খুব গরম করা হয়, তারপর আস্তে আস্তে সে দুটোকে ঘোরান হয়। তখন কাপড়টাও গরমে আর চাপে খুব মোলায়েম হয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর সেই কাপড় ভাঁজ করার কলে নিয়ে যায়। সেই কলের দুটো হাত আছে, তা দিয়ে কাপড়টাকে চটপট ভাঁজ করে ফেলে। তারপর প্যাক করার ঘরে সেই কাপড়ে ছাপ মেরে, তাকে বেঁধে, কাগজ মুড়ে বাজারে পাঠাবার জন্য তৈরি করে রাখে।

এ সব ত নিতান্ত সাধারণ কাপড়ের কথা হল। যদি রঙিন বা ছিটের কাপড় হয়, তবে তার জন্য ধোলাই করা, সুতায় রং দেওয়া, নক্শা তোলা, ইত্যাদি আরো নানারকম হাঙ্গামের দরকার হয়।

মজার খেলা

একবার একটা মজার দৌড় খেলা দেখিয়াছিলাম। কতগুলা লোককে বড় বড় ছালার মধ্যে গলা পর্যন্ত ভরিয়া মাঠের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—কে আগে যাইতে পারে। কয়েকজন অত্যন্ত সন্তর্পণে অদ্ভুত ভঙ্গিতে পেংগুইন পাখির মতো হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, আর কয়েকজন মাটিতে পড়িয়া একেবারে 'কুমড়ো গড়ান' গড়াইতেছে! মাঠশুদ্ধ লোক একেবারে হাসিয়া অস্থির! ফ্রান্সে একটি 'মোটা মানুষের সমিতি' আছে; অন্তত সাড়ে তিন মণ ওজন না হইলে তাহাতে ভর্তি হওয়া যায় না। তাহারা একবার মোটা লোকদের জন্য দৌড় খেলার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। যাহাদের ওজন পাঁচ মণের কম হইবে না—এমন অনেক লোকে তাহাতে দৌড়াইয়াছিল। সে দৌড় আমি দেখি নাই কিন্তু তাহার যে ফটো দেখিয়াছি, সে অতি চমৎকার—দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না।

বহুকাল আগে একটা বিলাতি পত্রিকায় এইরকম কতগুলি অদ্ভুত মজার খেলার কথা পড়িয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা ছিল খাওয়ার পাল্লা। কতগুলি রেকাবি

সম্মুখে লইয়া সকলে টেবিলের কাছে বসিয়াছে; ‘এক-দুই-তিন’ বলিতেই তাহাদের পাতে একেবারে উনান হইতে সাংঘাতিক গরম ‘চপ্’ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কাঁটা চামচ নাই, খাবারে হাতও লাগাইতে পারিবে না—এখন যে আগে খাইতে পারিবে তাহারই জিৎ! যে লোকটা জিতিয়াছিল সে প্রথমেই মাথা দিয়া ঢুঁ মারিয়া চপ্‌টাকে চ্যাপ্টাইয়া জুড়াইবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। মাথায় চুল আছে, তাই সহজে গরম লাগে না। আর একটা খেলাতে কোন ফল কিংবা অন্য কোন খাবার সুতায় বাঁধিয়া ঠিক নাকের সামনেই ঝুলাইয়া রাখা হয়। যে হাত না দিয়া সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া খাওয়া শেষ করিবে তাহার জিৎ। কাজটা শুনিতে বেশ সহজ, কিন্তু কাজে তেমন সহজ নয়। সুতাটা শূন্যে ঝুলিতেছে, মুখ ঠেকাইতে গেলে সেটা আরও দুলিতে থাকে।

একটা গল্প পড়িয়াছিলাম যে এক জায়গায় খেলা হইতেছিল, কে কত উৎকট মুখভঙ্গী করিতে পারে। একজনের উপর ভার ছিল, তিনি বিচার করিয়া বলিবেন, কাহার মুখের ভঙ্গী সকলের চাইতে বিশ্রী ও বিদ্‌ঘুটে। খেলার জায়গায় এক বেচারা তামাসা দেখিতেছিল, তাহার মুখখানা বাস্তবিকই কদাকার। বিচারক তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, “আমাদের মধ্যে ইনি ‘ফার্স্ট প্রাইজ’ পাইবার যোগ্য!” সে লোক আশ্চর্য হইয়া বলিল, “আমি ত এ খেলায় যোগ দিই নাই।” বিচারক গম্ভীরভাবে বলিলেন, “তাই নাকি? তা, আপনি কোন চেষ্টা না করিয়াই ফার্স্ট হইয়াছেন। আপনি থাকিতে প্রাইজ আর কেউ পাইতে পারে না!” লোকটি প্রাইজ পাইয়া খুসী হইবে কি দুঃখিত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিল না।

ঘরে বসিয়া অনেকজনে মিলিয়া খেলা যায় এমন দু-একটা খেলার কথা বলি। কতগুলা খেলা আছে তাহাতে বেশ চট্‌পটে এবং সতর্ক হওয়া দরকার। তার মধ্যে একটা খেলা এই—একজন লোক বেশ ধীরে ধীরে একটি গল্প বলিয়া বা পাঠ করিয়া যাইবে। সেই গল্পটি এমন হওয়া চাই যে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি বেখাপ্পা কথা থাকে। অর্থাৎ এক জায়গায় যেরকম বলা হইয়াছে, আর এক জায়গায় তার উল্টারকম কথা থাকিবে। যেমন, এক ভদ্রলোকের বর্ণনা দেওয়া গেল তার মাথা ভরা টাক, তারপরে আর এক জায়গায় হয়ত বলা হইল যে তিনি আয়নার সামনে বাহার করিয়া টেরি ফিরাইতেছেন। এইরকম গল্পের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

“রবিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা চতুর্থী। সন্ধ্যার আকাশ দেখিতে দেখিতে মেঘে ঢাকিয়া আসিল দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। গৃহহীন পিতৃমাতৃহীন যোগেশ-চন্দ্র আফিসের বেশে বিনা ছাতায় ভিজিতে ভিজিতে নির্জন পথ দিয়া চলিতেছেন—সঙ্গে ট্রামের পয়সাটি পর্যন্ত নাই। স্কুল কলেজ হইতে ছুটি পাইয়া ছাত্রগণ কোলাহল করিয়া ছুটিতেছে—যোগেশচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি ভিড় ঠেলিয়া চলিতে-ছেন, আর ভাবিতেছেন কতক্ষণে পৌঁছিব। একে শীতকাল, তার উপর গায়ে কেবল শত ছিন্ন পাতলা ফুটবলের সার্ট, যোগেশচন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় কে যেন ডাকিয়া উঠিল “অন্ধ নাচারকে ভিক্ষা দেও।” যোগেশচন্দ্র দেখিলেন এক হস্তপদহীন ভিখারী কাতরভাবে ভিক্ষা চাইতেছে। দেখিয়াই তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ভিখারীর হস্তে গুঁজিয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ভিজা জুতা ও ছাতা বারান্দায় রাখিয়া গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। পতন শব্দে তাঁহার বাপ মা ‘হায় হায়’ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন।”

ইহার মধ্যে কি কি ভুল আছে বাহির কর ত? খেলিবার সময় কতগুলা কাগজ পেন্সিল দিয়া সকলকে বসাইয়া দিবে এবং ধীরে ধীরে দুইবার গল্পটি পাঠ করিয়া শুনাইবে। তারপর দু-তিন মিনিট সময় দিবে, তাহার মধ্যে যে সবচাইতে বেশি ভুল ধরিতে পারিবে, সেই বাহাদুর। অনেকটা এই ধরনেরই আর একটা খেলা আছে, তাহাতে কথা মনে রাখার উপর হারজিত নির্ভর করে। একটা কোন জিনিসের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়া তারপর সকলকে বলিতে হয় সমস্ত বর্ণনাটা শুনিয়া আবার মন হইতে লিখিয়া দাও। যেমন একজন মানুষের কথা বলিলাম,—তাহার বয়স পঁচিশ হইবে, চোখে কালো চশমা, মাথার সামনের দিকে টাক, খোঁচা খোঁচা ভুরু ও ঝাঁটার মতো গোঁফ, দাড়ি কামান, মোটা বেঁটে চেহারা, হাতে একটা সবুজ ক্যাম্বিসের ব্যাগ, গলায় পশমের গলাবন্ধ, গায়ে কালো গরম কোট, তার পকেটে লাল রুমাল, হাতে একটা বাঁশের ছাতা, পায়ে প্রকাণ্ড বুট্ জুতা, কানে শোনেন কম, চলেন খোঁড়াইয়া—তার উপর গলার আওয়াজখানা ভিজা ঢাকের মতো। এখন এইটুকু ধীরে ধীরে দুবার পড়িয়া তারপর বেশ ভাবিয়া লিখ ত- দেখিবে একটুকু বর্ণনার মধ্যে হয়ত কিছু কিছু ভুল হইয়া যাইবে।

এইবার অন্যরকমের আর-একটি খেলার কথা বলি যাহা শুনিতে খুব সহজ শোনায় কিন্তু কাজে ভারি শক্ত। একখানা আয়নার সামনে একটা কাগজ—আয়নার ছায়া দেখিয়া কাগজে কিছু আঁকিবার অথবা লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখ। ভারি একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়। হাতটা যেন কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। অনেক লোককে দেখাইতে হইলে একটা বোর্ডের উপর বেশ বড় করিয়া একটা সহজ 'V' আঁকিয়া, সকলকে বল বোর্ডের দিকে না তাকাইয়া কেবল আয়নার ছায়া দেখিয়া তাহার উপর দাগ বুলাইতে! বিশেষত যাঁহারা খুব ভাল 'ড্রয়িং' জানেন বলিয়া প্রশংসা পান তাঁহাদের ধরিয়া এই সামান্য কাজে লাগাইয়া বেশ জব্দ করিতে পার।

এবারে আর একটা মজার কথা বলিয়া শেষ করিব। বারো আঙুল লম্বা দুখানি ঝাঁটার কাঠিকে মোড়াইয়া দুটি ইংরাজি V তৈয়ারি কর। তারপর আর-একটি লম্বা কাঠির উপর তাহাদের চড়াইয়া, একখানা সমান ব্লটিং বা অন্য কোন খস্‌খসে কাগজের উপর ধরিয়া রাখ। Λ -দুটি যেন ভিতরের দিকে হেলিয়া থাকে। হাতটাকে একেবারে আলগা রাখিও যেন কিছুর উপর ভর করিয়া না থাকে। তাহা হইলে দেখিবে আস্তে আস্তে ঝাঁটার কাঠি দুইটা কাছাকাছি আসিতেছে। তোমার হাত যতই কাঁপিবে, সে কাঁপুনি যতই সামান্য হোক না কেন, কাঠিটা ততই কাগজের ঘষায় ঘষায় ভিতরদিকে সরিতে থাকিবে।

আজব জীব

কি ভাই সন্দেশ, বড় যে দেখেও দেখছ না? আমায় চেন না বুঝি? তোমার ঘরের কাছেই আমায় কত দেখেছ তবু পরিচয় জান না? আচ্ছা তাহলে পরিচয় দেই।

আমায় এখন যেরকম দেখছ আগে কিন্তু সেরকম ছিলাম না। এখন কেমন দু পায়ে ভর দিয়ে চলে বেড়াই; তখন অন্য অন্য জন্তুরা যেমন চার পায়ে চলে আমিও

তেমনি করে চলতাম। তোমাদের এই ডাল ভাত মাছ মাংস এসব কিছুই খেতে পারতাম না। তখন আমার পায়ে একরকম ধাতুর তৈরি বেড়ি আটকান ছিল, হাতেও সেইরকম ছিল।

আমাদের বাসা তুমি দেখেছ—কেমন অদ্ভুত বল দেখি? খানিকটা কাঠ আর পোড়ামাটি, লোহা বালি আর মাটির গুঁড়ো, এইরকম সব জিনিস দিয়ে আমরা বাসা বানাই। বাসায় ঢুকবার আর বের হবার জন্যে, আলো আর বাতাস আসবার জন্যে বাড়ির গায়ে নানা জায়গায় ফাঁক থাকে, ইচ্ছা করলে সে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায়।

আমরা অনেকরকম জিনিস খাই। নানারকম ফলমূল শিকড়, এ সব ত খাই-ই, তার উপর আমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে নানারকমের ঘাসের বীজ। আমরা সেইসব যত্ন করে সংগ্রহ করে তা থেকে কতরকমের যে খাদ্য বানাই, শুনলে অবাক হবে। একরকম জন্তু আছে, আমরা তার দুধ খেতে খুব ভালোবাসি। তাই অনেক সময়ে সেইরকম জন্তু ধরে এনে আমাদের বাড়িতে বেঁধে রাখি। একরকম গাছ হয় দেখতে অনেকটা বাঁশের মতো, আমরা তার থেকে রস বার করে সেই রস জমিয়ে খেতে খুব ভালোবাসি।

আমরা কি পারি জান? কোন কোন ফলে লম্বা লম্বা আঁশ থাকে, সেই আঁশের জট ছাড়িয়ে আঁশগুলোকে পাকিয়ে তা থেকে আমরা নানারকম জাল বুনি। অন্যান্য আঁশাল জিনিস থেকেও এরকম জাল বোনা যায়। পোকার বাসা, জানোয়ারের লোম, কতরকম জিনিস থেকে যে আঁশ সংগ্রহ হয়, আমিও তার সব খবর জানি না। এই আমার গায়ে দেখ না কতরকম জালের টুকরা জোড়া দিয়া আমার মা কেমন সুন্দর গা ঢাকুনি বানিয়েছেন। এইরকম জালের মধ্যে চাপ চাপ আঁশ ভরে তার উপর শুতে যা আরাম!

আমাদের মধ্যে নানারকম অদ্ভুত প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। যারা আমাদের চাইতে বড় তাদের সঙ্গে দেখা হলে আমরা সামনের দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দুটো হাত একসঙ্গে ওঠাই ও নামাই—না হয় মাটি পর্যন্ত হাত নামিয়ে একেবারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। কেন করি তা আমি বলতে পারি না।

কি বললে? তবু চিনতে পারছ না? ভাবছ আমি কোথাকার অদ্ভুত জীব? তা নয় গো তা নয়। আমি আফ্রিকার হটেন্‌টট্‌ও নই, মালয় দেশের বনমানুষও নই, আমি নিতান্তই তোমাদের বাঙালির ঘরের ছেলে—সন্দেশের পাঠক। পরিচয়টা ভুল হয়েছে বলছ? আর একটিবার মন দিয়ে পড়ে দেখ, আগাগোড়া সমস্তই ঠিক বলা হয়েছে দেখতে পাবে।

বাল্য রচনা ও অন্যান্য

নদী

হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্‌কল্‌ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।
পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেই সব কিবা মনোলোভা।
কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কি সুন্দর কুহু গান গায় নিজ মনে।
কোথাও ময়ূরে দেখে পাখা প্রসারিয়া
বনধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া!
নদীতীরে কত লোক শ্রান্তি নাশ করে,
কত শত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।
দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে ধায়,
কভুও সে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়।

টিক্-টিক্-টিক্

টিক্-টিক্ চলে ঘড়ি টিক্-টিক্-টিক্,
একটা ইঁদুর এল সে সময়ে ঠিক্!
ঘড়ি দেখে এক লাফে তাহাতে চড়িল,
টং করে অমনি ঘড়ি বাজিয়া উঠিল।
অমনি ইঁদুর ভায়া লেজ গুটাইয়া,
ঘড়ির উপর থেকে পড়ে লাফাইয়া!
ছুটিয়া পালায়ে গেল, আর না আসিল,
টিক্-টিক্-টিক্ ঘড়ি চলিতে লাগিল!

শ্রীগোবিন্দ-কথা

আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ মানুষটি নই বাঁকা!
যা বলি তা ভেবেই বলি, কথায় নেইক ফাঁকা
এখানকার সব সাহেবসুবো, সবাই আমায় চেনে
দেখ্‌তে চাও ত দিতে পারি সার্টিফিকেট এনে
ভাগ্য আমায় দেয়নি বটে করতে বি-এ পাশ
তাই বলে কি সময় কাটাই কেটে ঘোড়ার ঘাস?
লোকে যে কয় বিদ্যে আমার 'কথামালা'ই শেষ
এর মধ্যে সত্যি কথা নেইক বিন্দুলেশ।
ওদের পাড়ার লাইব্রেরিতে কেতাব আছে যত
কেউ পড়েছে তন্নতন্ন করে আমার মতো?
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ এমনি পড়ার যম
পড়াশুনো নয়ক আমার কারুর চেয়ে কম।
কতকটা এই দেখেশিখে কতক পড়েশুনে
(আর) কতক হয়ত স্বাভাবিকী প্রতিভারই গুণে
উন্নতিটা করছি যেমন আশ্চর্য তা ভারি
নিজের মুখে সব কথা তার বলতে কি আর পারি?
বলে গেছেন চণ্ডীপতি কিংবা অন্য কেউ
"আকাশ জুড়ে মেঘের বাসা সাগরভরা ঢেউ
জীবনটাও তেমনি ঠাসা কেবল বিনা কাজে
যেদিক দিয়ে খরচ করি সেই খরচই বাজে!"
আমি অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ চলতে ফিরতে শুতে
জীবনটাকে হাঁকাই নেক মনের রথে জুতে।

হাইড্রোজেনের দুই বাবাজি অক্সিজেনের এক
নৃত্য করেন গলাগলি কাণ্ডখানা দেখ্‌
আহ্লাদেতে এক্‌সা হয়ে গলে হলেন জল
এই সুযোগে সুবোধ শিশু "শ্রীগোবিন্দ" বল্‌।

[অসমাপ্ত]

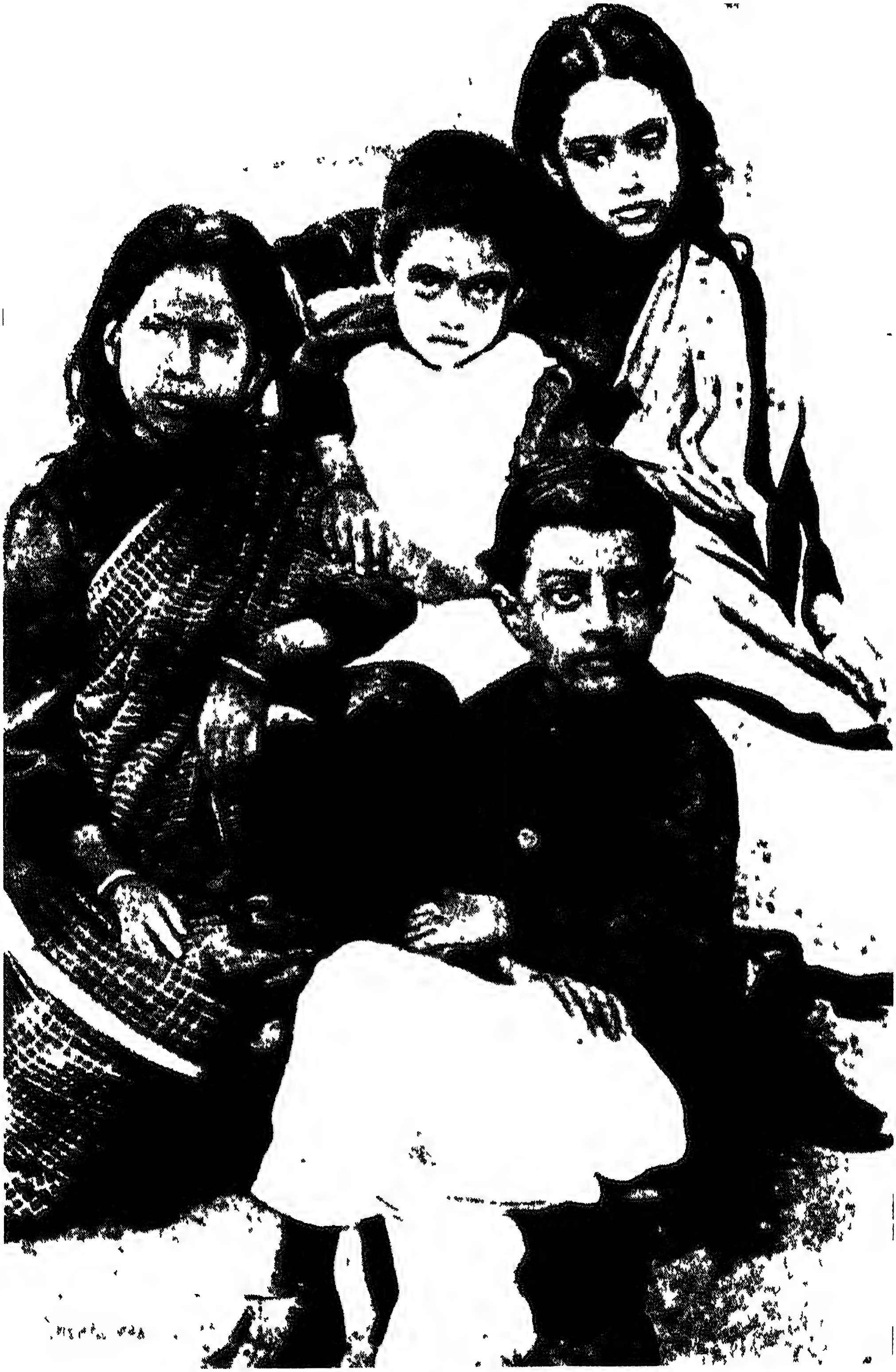

বাঁদিক থেকে ঃ সুরমা রায়, পুণ্যলতা চক্রবর্তী, সুখলতা রাও। মধ্যে উপবিষ্ট সুকুমার রায়।

মহাভারত

(আদিপর্ব)

কুরুকুলে পিতামহ ভীষ্মমহাশয়
ভুবন বিজয়ী বীর, শুন পরিচয়—
শান্তনু রাজার পুত্র নাম সত্যব্রত
জগতে সার্থক নাম সত্যে অনুরত।
স্বয়ং জননী গঙ্গা বর দিলা তাঁরে
নিজ ইচ্ছা বিনা বীর না মরে সংসারে।
বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে হায় শান্তনু রাজার
বিবাহের লাগি বুড়া করে আবদার
মৎস্যরাজকন্যা আছে নামে সত্যবতী
তারে দেখি শান্তনুর লুপ্ত হল মতি।
মৎস্যরাজ কহে, 'রাজা, কর অবধান—
'কিসের আশায় কহ করি কন্যাদান?
'সত্যব্রত জ্যেষ্ঠ সেই রাজ্য অধিকারী,
'আমার নাতিরা হবে তার আজ্ঞাচারী,
'রাজমাতা কভু নাহি হবে সত্যবতী,
'তেঁই এ বিবাহ-কথা অনুচিত অতি।'
ভগ্ন মনে হস্তিনায় ফিরিল শান্তনু
অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ তার তনু।
মন্ত্রিমুখে সত্যব্রত শুনি সব কথা
মৎস্যরাজপুরে গিয়া কহিল বারতা—
'রাজ্যে মম সাধ নাহি, করি অঙ্গীকার
'জন্মিলে তোমার নাতি রাজ্য হবে তার।'
রাজা কহে, 'সাধু তুমি, সত্য তব বাণী,
'তোমার সন্তান হতে তবু ভয় মানি।
'কে জানে ভবিষ্যকথা, দৈবগতিধারা—
'প্রতিবাদী হয় যদি রাজ্যলাভে তারা?'
সত্যব্রত কহে, 'শুন প্রতিজ্ঞা আমার,
'বংশ না রহিবে মম পৃথিবী মাঝার।
'সাক্ষী রহ চন্দ্র সূর্য লোকে লোকান্তরে
'এই জন্মে সত্যব্রত বিবাহ না করে।'
শুনিয়া অদ্ভুত বাণী ধন্য কহে লোকে
স্বর্গ হতে পুষ্পধারা ঝরিল পলকে।
সেই হতে সত্যব্রত খ্যাত চরাচরে
ভীষণ প্রতিজ্ঞাবলে ভীষ্ম নাম ধরে।
ঘুচিল সকল বাধা, আনন্দিত চিতে
সত্যবতী রাণী হয় হস্তিনাপুরীতে।
ক্রমে হলে বর্ষ গত শান্তনুর ঘরে
জন্ম নিল নব শিশু, সবে সমাদরে।
রাখিল বিচিত্রবীর্য নামটি তাহার
শান্তনু মরিল তারে দিয়া রাজ্যভার।
অকালে বিচিত্রবীর্য মুদিলেন আঁখি
পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র দুই পুত্র রাখি॥

হস্তিনায় চন্দ্রবংশ কুরুরাজকুল
রাজত্ব করেন সুখে বিক্রমে অতুল।
সেই কুলে জন্মি তবু দৈববশে হায়
অন্ধ বলি ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য নাহি পায়।
কনিষ্ঠ তাহার পাণ্ডু, রাজত্ব সে করে,
পাঁচটি সন্তান তার দেবতার বরে।
জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির ধীর শান্ত মন
'সাক্ষাৎ ধর্মের পুত্র' কহে সর্বজন।
দ্বিতীয় সে মহাবলী ভীম নাম ধরে,
পবন সমান তেজ পবনের বরে।
তৃতীয় অর্জুন বীর, ইন্দ্রের কৃপায়
রূপেগুণে শৌর্যেবীর্যে অতুল ধরায়।
এই তিন সহোদর কুন্তীর কুমার,
বিমাতা আছেন মাদ্রী দুই পুত্র তাঁর—
নকুল ও সহদেব সুজন সুশীল
এক সাথে পাঁচজনে বাড়ে তিল তিল।
অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র তার,
অভিমানী দুর্যোধন জ্যেষ্ঠ সবাকার।
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই নষ্ট হয় কিসে,
এই চিন্তা করে দুষ্ট জ্বলি হিংসাবিষে।
হেনকালে সর্বজনে ভাসাইয়া শোকে
মাদ্রীসহ পাণ্ডুরাজা যায় পরলোকে।

'পাণ্ডু গেল,' মনে মনে ভাবে দুর্যোধন,
'এইবারে যুধিষ্ঠির পাবে সিংহাসন!
'ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে গিয়া তারে মারি—
'ভীমের ভয়েতে কিছু করিতে না পারি।
'আমার কৌশলে পাকে ভীম যদি মরে
'অনায়াসে যুধিষ্ঠিরে মারি তারপরে।'
কুচক্র করিয়া তবে দুষ্ট দুর্যোধন
নদীতীরে উৎসবের করে আয়োজন—
একশত পাঁচ ভাই মিলি একসাথে
আমোদ আহ্লাদে ভোজে মহানন্দে মাতে।
হেন ফাঁকে দুর্যোধন পরম যতনে
বিষের মিষ্টান্ন দেয় ভীমের বদনে।
অচেতন হল ভীম বিষের নেশায়
সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট ধরিল তাহায়
গোপনে নদীর জলে দিল ভাসাইয়া
কেহ না জানিল কিছু উৎসবে মাতিয়া॥

এদিকে নদীর জলে ডুবিয়া অতল তলে
ভীমের অবশ দেহ, কেমনে জানে না কেহ,
কোথায় ঠেকিল শেষে বাসুকী নাগের দেশে।
ভীমের বিশাল চাপে নাগের বসতি কাঁপে
দেহভারে কত মরে, কত পলাইল ডরে,
কত নাগ দলে বলে ভীমেরে মারিতে চলে
দংশিয়া ভীমের গায় মহাবিষ ঢালে তায়।
অদ্ভুত ঘটিল তাহে ভীম চক্ষু মেলি চাহে
বিষে হয় বিষক্ষয় মুহূর্তে চেতনা হয়,
দেখে ভীম চারিপাশে নাগেরা ঘেরিয়া আসে।
দেখিয়া ভীষণ রাগে ধরি শত শত নাগে
চূর্ণ করে বাহুবলে, মহাভয়ে নাগ দলে
ছুটে যায় হাহাকারে বাসুকী রাজার দ্বারে।
বাসুকী কহেন, 'শোন আর ভয় নাহি কোন,
'তুমি তারে সুবচনে আন হেথা সযতনে।'
রাজার আদেশে তবে আবাব ফিরিয়া সবে
করে গিয়া নিবেদন বাসুকীর নিমন্ত্রণ!
শুনি ভীম কুতূহলে রাজার পুরীতে চলে,
সেথায় ভরিয়া প্রাণ, করিয়া অমৃত পান,
বিষের যাতনা আর কিছু না রহিল তার,
মহাঘুমে ভরপুর সব ক্লান্তি হল দূর।
তখন বাসুকী তারে স্নেহভরে বারে বারে
আশিস করিয়া তায় পাঠাইল হস্তিনায়।
সেথা ভাই চারিজনে আছে শোকাকুল মনে,
কুন্তীর নয়নজল ঝরে সেথা অবিরল,
মগন গভীর দুখে ফিরে সবে ম্লান মুখে।
হেন কালে হারানিধি সহসা মিলাল বিধি,
বিষাদ হইল দূর জাগিল হস্তিনাপুর,
উল্লসিত কলরবে আনন্দে মাতিল সবে॥

সূর্যের রাজ্য

সূর্য নানারকমে আমাদের পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করে। পৃথিবীর গতির একটা কেমন ঝোঁক আছে, সে যদি কোনরকম সুবিধা পাইত তবে নিশ্চয়ই ছুটিয়া পথছাড়া হইয়া কোথায় সরিয়া পড়িত। কিন্তু তাহা হইবার যো নাই; সূর্যের আকর্ষণীশক্তি তাহাকে বেশ মজবুত করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে এবং পৃথিবীও অগত্যা বাধ্য হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘোরপাক খাইতেছে। পৃথিবী ছাড়া আরও কতকগুলি প্রকাণ্ড গোলক সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। এইগুলিকে গ্রহ বলে। এই গ্রহগুলির মধ্যে আবার কয়েকটির সঙ্গী বা উপগ্রহ আছে। এই উপগ্রহগুলির কাজ গ্রহের চারিদিকে ঘোরা। যেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। এইসকল গ্রহ, উপগ্রহ এবং অনেক উল্কা ও ধূমকেতু ইত্যাদি লইয়া সূর্যের রাজ্য।

রাজ্যের কর্তা সূর্য; সুতরাং তাহার খবরটা আগে লওয়া আবশ্যক। আমরা এখান হইতে সূর্যকে একটা উজ্জ্বল গোল্লার মতো দেখি। আর সেটা যে নিতান্ত ঠাণ্ডা নয়, তাহাও বেশ বুঝিতে পারি। সূর্য এখান হইতে নয় কোটি মাইলেরও বেশি দূরে; কিন্তু এত বড় সংখ্যা আমাদের কল্পনায় আসে না। আলো এত দ্রুত চলে যে, এক সেকেণ্ডে সাতবার পৃথিবীর চারিদিকে পাক দিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তবু সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসিতে সাড়ে সাত মিনিট সময় লাগে! সূর্যটা যে খুবই মস্ত, তাহা না বলিলেও চলে। তের লক্ষটা পৃথিবী একত্র করিলে তবে সূর্যের সমান বড় একটা গোলক তৈয়ারি হইতে পারে।

আমরা সূর্যের যতটুকু দেখি, উহাই তাহার সমস্ত নহে। উহা ছাড়া তাহার চতুর্দিকে জ্বলন্ত বাষ্পের একটা আবরণ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে; কিন্তু সেটা তত উজ্জ্বল নহে বলিয়া সূর্যের প্রখর তেজে আমরা তাহার কিছুই দেখিতে পাই না। সূর্যের যখন পূর্ণ গ্রহণ হয়, অর্থাৎ চন্দ্র যখন সূর্যের ও আমাদের পৃথিবীর মাঝে আসিয়া সূর্যকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, তখন এই বাষ্পীয় আবরণ অতি চমৎকার দেখা যায়। এইজন্যে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা পূর্ণ গ্রহণ দেখিবার সুযোগ ছাড়েন না। আজকাল বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে দিবালোকেই এ সকল বিষয়ের চর্চা করা সম্ভব হইয়াছে। সূর্য যেরূপ প্রচণ্ড তেজে জ্বলিতেছে, তাহা আমাদের কল্পনা করা অসম্ভব। তাহার গরমের তুলনায় আমাদের কয়লার আগুন ত ঠাণ্ডা! সেখানে আগুনের ঝড় ঘূর্ণীপাকের মতো অনবরত ঘুরিতেছে। সেই ফুটন্ত সমুদ্র তোলপাড় করিয়া অবিশ্রান্ত অগ্নিপ্রবাহ চলিতেছে। জ্বলন্ত শিখা চারিদিকে রক্তজিহ্বার ন্যায় লাফাইয়া উঠিতেছে এবং দেখিতে দেখিতে শতসহস্র মাইল ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রধান গ্রহের সংখ্যা আটটি; চারিটি বড়, আর চারিটি ছোট। আমাদের পৃথিবী কনিষ্ঠ গ্রহের মধ্যে গণ্য। সূর্যের নিকটতম গ্রহের নাম বুধ, তাহার পর শুক্র, তাহার পরে পৃথিবী, তাহার পরে মঙ্গল—এই চারিটিই ছোট গ্রহ। ইহার মধ্যে পৃথিবীই

সর্বাপেক্ষা বড়; শুক্র প্রায় পৃথিবীর সমান, মঙ্গল পৃথিবীর আট ভাগের এক ভাগ এবং বুধ পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝামাঝি। মঙ্গল সকল সময় সূর্যের কাছে কাছেই ফিরে, সুতরাং তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া সচরাচর ঘটে না। শুক্র অথবা 'শুকতারা' যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিকে অথবা সূর্যাস্তের পর পশ্চিমদিকে ঝলমল করিতে থাকে তখন তাহার উজ্জ্বল জ্যোতির কাছে সকল গ্রহ নক্ষত্রই ম্লান বোধ হয়। শুধু চোখে মঙ্গল গ্রহকে একটা লালচে রঙের তারার মতো বোধ হয়। এই গ্রহের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানিবার আছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছে সাদা বরফ দেখা যায় এবং সেই বরফ গ্রীষ্মকালে কমে ও শীতকালে বাড়ে, সুতরাং মঙ্গলে জল আছে, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া এই গ্রহের গায়ে খুব সরু সোজা সোজা লম্বা লম্বা অনেক দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ান নাই; বরং ইহা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, ঐ লম্বা রাস্তার মতো জিনিসগুলি ইচ্ছাপূর্বক বুদ্ধি খাটাইয়া নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, মঙ্গলে বুদ্ধিমান জীব থাকা সম্ভব, হয়ত তাহারা জলের সুবন্দোবস্তের জন্য বড় বড় খাল কাটিয়াছেন, সেই খালের দুধারে গাছপালা হওয়ায় আমরা সেগুলিকে লম্বা লম্বা রেখার মতো দেখি। মঙ্গলের দুটি চাঁদ আছে, সেগুলি এতই ছোট যে, খুব বড় দূরবীক্ষণ ছাড়া তাহাদের দেখাই যায় না। ইহার একটি এত তাড়াতাড়ি মঙ্গলের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে যে, মঙ্গলের এক দিনে (সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টায়) তাহার দুইবার উদয় ও দুইবার অস্ত হয়। মঙ্গলের পর অনেকগুলি খুব ছোট ছোট গ্রহ আছে, সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। এই গ্রহগুলির পরেই বৃহস্পতি।

বৃহস্পতি ইহাদের মধ্যে প্রধান। ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে বারো শত পৃথিবীর সমান। এ পর্যন্ত ইহার সাতটি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সাধারণ দূরবীক্ষণে চারিটির বেশি দেখা যায় না। এই চারিটি চন্দ্রই আমাদের চাঁদের চাইতে বড়। বৃহস্পতি খুব বড় হইলেও এত তাড়াতাড়ি ঘুরে যে, প্রায় দশ ঘণ্টায় তাহার এক দিন হয়। এত তাড়াতাড়ি ঘোরার দরুণ তাহার মাঝখানটা বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং বৃহস্পতিকে গোল না দেখাইয়া কতকটা বাদামী ধরনের দেখায়। বৃহস্পতির গায়ে সকল সময়েই কাল মেঘের মতো টান দেখা যায়।

বৃহস্পতির পরেই শনি। ইহা আয়তনে বৃহস্পতির অর্ধেক। এই গ্রহের একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব এই যে, ইহার চারিদিকে একটা আংটির মতো কি দেখা যায়। "আংটি"টা বেশি পুরু নয়, কিন্তু খুব চওড়া। ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, আংটিটার মাঝে মাঝে ফাঁক আছে, যেন কয়েকটা আংটি পর পর একটার ভিতর আরেকটা সাজান রহিয়াছে। এ পর্যন্ত ইহার দশটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি আমাদের চন্দ্রের অপেক্ষাও বড়।

এ পর্যন্ত যে গ্রহগুলির কথা বলা হইল, ইহার সকলগুলিই শুধু চোখে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। সেইজন্য অতি পুরাতন-কাল হইতেই মানুষ ইহাদের কথা জানে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সার্ উইলিয়াম হার্শেল তাঁহার স্বহস্তনির্মিত দূরবীক্ষণের সাহায্যে এক নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। তাহার নাম রাখা হইল ইউরেনাস্। ইউরেনাস্ আয়তনে শনি অপেক্ষা ছোট এবং এ পর্যন্ত ইহার চারটি চন্দ্র আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইউরেনাসের আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, তাহার গতিবিধির মধ্যে একটা

কেমন গোলমাল আছে। গণনার যে সময়ে ইউরেনাসের যে স্থানে থাকিবার কথা, উহা ঠিক স্থানে থাকে না। ইহা হইতেই গণনা করিয়া দুইজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইউরেনাসের বাহিরে এক গ্রহ আছে, তাহারই আকর্ষণে ইহার চলাফিরার এরূপ ব্যতিক্রম হয়। তাঁহারা গণিতের সাহায্যে নির্দেশ করিলেন যে, অমুক দিন, অমুক স্থানে দূরবীক্ষণ দিয়া খুঁজিলে গ্রহটিকে পাওয়া যাইবে। এইরূপে নেপচুনের আবিষ্কার হইল। নেপচুনের আয়তন ইউরেনাসের মতো। ইহার একটি চাঁদ আছে।

এইসকল গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সূর্যরাজ্যে কতকগুলি ধূমকেতু ও উল্কারাশি আছে। এই ধূমকেতুগুলির চালচলন দেখিয়া বোধ হয় যে, ইহারা বাস্তবিক এ রাজ্যের লোক নয়। বাহির হইতে আসিয়াছিল, এই রাজ্যের ভিতর দিয়া যাইতে গিয়া কি করিয়া সূর্যের টানে ধরা পড়িয়াছে। প্রতি বৎসরই কত ধূমকেতু সূর্যের রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তাহারা অধিকাংশ সহজেই সূর্যের হাত এড়াইয়া যায়, খালি কখনও দু-এক বেচারা নিতান্ত বেগতিকে কোন গ্রহের কাছে গিয়া পড়ায় আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। তখন তাহারা বাধ্য হইয়া সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে।

সূর্য হইতে নেপচুনের দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্বের একত্রিশ গুণ এবং সেই সুদূর প্রদেশেই এ রাজ্যের সীমা।

একটি বর

একটি অন্ধ ভিখারি রোজ মন্দিরে পূজা করতে যায়। প্রতিদিন ভক্তিভরে পূজা শেষ করে মন্দিরের দরজায় প্রণাম করে সে ফিরে আসে; মন্দিরের পুরোহিত সেটা ভাল করে লক্ষ করে দেখেন।

এইভাবে কত বৎসর কেটে গেছে কেউ জানে না। একদিন পুরোহিত ভিখারিকে ডেকে বললেন, ‘‘দেখ হে! দেবতা তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি কোন একটা বর চাও। কিন্তু, মনে রেখো,—একটিমাত্র বর পাবে।”

ভিখারি বেচারা বড় মুস্কিলে পড়ল। কি যে চাইবে, কিছুতে আর ঠিক করতে পারে না। একবার ভাবল, দৃষ্টি ফিরে চাইবে; আবার ভাবল, টাকাকড়ি চাইবে; আবার ভাবল, আত্মীয়স্বজন ছেলেপিলে দীর্ঘ জীবন এইসব চাইবে· কিছুতেই আর ঠিক করতে পারে না। তখন সে বলল, “আচ্ছা, আমি কাল ভাল করে ভেবে এসে বর চাইব। এখন কিছুতে ঠিক করতে পারছি না, কি চাই।”

অনেক ভেবেচিন্তে সে মনে মনে একটা ঠিক করে নিল। তারপর মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে বলল, “পুরুত ঠাকুর! আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি;—আপনি আমার বড় উপকার করলেন। যে একটি বরের কথা বলেছেন সেটি এখন আমি চাইব; —মনে রাখবেন, একটিমাত্র বর আমি চাচ্ছি। আমি এই বর চাই যে মরবার আগে যেন আমার নাতিকে ছয়তলা বাড়ির মধ্যে বসে সোনার থালায় পায়স খেতে স্বচক্ষে দেখে যেতে পারি।”

এই এক বরে ভিখারি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল ধনজন পেল, ছেলেপিলে, নাতি-নাতনি পেল, দীর্ঘজীবন পেল।

ব্যাঙের সমুদ্র দেখা

(জাপানী গল্প)

গ্রামের ধারে কবেকার পুরান এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাং তার পরিবার নিয়ে থাকত। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল তুলতে এসে যেসব কথাবার্তা বলত কোলাব্যাং তার ছেলেদের সেইসব কথা বুঝিয়ে দিত—আর ছেলেরা ভাবত 'ইস্! বাবা কত জানে!'

একদিন সেই মেয়েরা সমুদ্রের কথা বলতে লাগল। ব্যাঙের ছানারা জিজ্ঞাসা করল—"হ্যাঁ বাবা! সমুদ্র কাকে বলে?" ব্যাং খানিক ভেবে বলল, "সমুদ্র? সে একরকম জন্তুর নাম।" তখন একটা ছানা বলল—"ওরা যে বলছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড় হয়, আর তার মধ্যে অনেক অনেক জল থাকে—আর লোকেরা সাঁতার কেটে তা পার হতে পারে না।" তখন কোলাব্যাং মুশকিলে পড়ল। সে গাছপালা দেখেছে, বাড়িঘর দেখেছে—মানুষ কুকুর ঘটি বাটি নানারকম জিনিসপত্র সব দেখেছে, আর ছেলেবেলায় অনেকরকম জিনিসের গল্প শুনেছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা ত কখন শোনেনি! তখন সে ভাবল সমুদ্রের কথা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।

পরদিন সকালে উঠেই কোলাব্যাং তার ছাতা পোঁট্‌লা নিয়ে বলল, "আমি সমুদ্রের সন্ধান করতে যাচ্ছি।" তার গিন্নী কত কাঁদল, ছেলেরা নানারকম সুর করে তাকে বারণ করল কিন্তু কোলাব্যাং বলল, "না, এতে আমার জ্ঞানলাভ হবে—তোমরা বাধা দিও না।" এই বলে সে পাতকুয়ো থেকে উঠে একটা মাঠের দিকে চলল। ব্যাং বাইরে এসেই দেখল মানুষ কুকুর গরু তারা কেউ তার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না—তাই দেখে সে ভাবল 'লাফিয়ে চললে সবাই আমায় বেকুব ভাববে।' এই ভেবে সে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগল। কিন্তু অমন করে চলে ত তার অভ্যাস নেই—খানিক দূর গিয়েই তার ভারি পরিশ্রম বোধ হল।

মাঠের ওপারে আর এক গ্রামের কাছে এক গর্তের মধ্যে মেটে ব্যাংদের বাসা ছিল। মেটে ব্যাঙেরাও সমুদ্রের কথা শুনেছে, তাই তাদের মধ্যে একজন বেরিয়েছে সমুদ্রটা দেখতে। মাঝপথে দুই ব্যাঙের দেখা হল। কোলাব্যাং বলল, "আমি ফাটল-কুয়োব কোলাব্যাং, যাচ্ছি সমুদ্রে।" মেটে ব্যাং বলল, "আমি মেঠো-মাটির ব্যাং, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে।" তখন তাদের ভারি ফুর্তি হল।

কিন্তু সমুদ্রে যাবার পথ ত তারা জানে না। মাঠের মধ্যে একটা মস্ত ঢিপি ছিল: মেটে ব্যাং বলল, "ওর উপরে উঠে দেখি ত কিছু দেখা যায় কিনা।"

এই বলে তারা অনেক কষ্টে সেই ঢিপির উপর চড়ে সেখান থেকে একটা গ্রাম দেখতে পেল। মেটে ব্যাং বলল, "আরে দূর ছাই! এরকম ত ঢের দেখেছি! আমার বাড়ির কাছেই ত অমন আছে।" কোলাব্যাং বলল, "তাই ত! আমিও ছেলেবেলা থেকে ওরকম কত দেখেছি। সব জায়গাই দেখছি একরকম। মিছামিছি আমরা হেঁটে মরলাম।"

তখন তারা ভারি বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কোলাব্যাং তার ছানাদের বলল, "সমুদ্র টমুদ্র কিছু নেই—ওসব মিছে কথা!"

স্বরলিপি

স্বরলিপি : অনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রীবিজয়া রায়

১

II মা মা -া | সা -া -া | মা মা -া | সা -া -া I
স খে র্ প্রা ০ ণ্ গ ড়ে র্ মা ০ ঠ্

I মা -া মা | মা পা -া | মা মা -া | মা -সা -া I
ছা ০ ত্র দু টি ০ ক রে ০ পা ০ ঠ্

I মা মা -া | মা -া পা | ধা -া -া | ধা ধা -া I
প ড়া য়্ না ই রে ম ০ ন্ স বা ই

I পা -া ধা | ধা পা -া | মা -া -া | -া -া -া I
হ ০ চ্ছে জ্বা লা ০ ত ০ ন ০ ০ ০

I মা মা -া | সা সা -া | মা মা -া | সা সা -া I
অ তি ০ ডেঁ পো ০ দু কা ন্ কা টা ০

I মা -া মা | মা পা -া | গা মা -া | মা সা -া I
ছা ০ ত্র দু টি ০ বে জা য়্ জ্যা টা ০

I মা -া মা | মা পা -া | ধা ধা -া | ধা ধা -া I
কা উ কে না হি ০ মা নে ০ স বা ই

I পা ধা -া | ধা পা -া | মা মা -া | -া -া -া I
ধ রো ০ ও দে র্ কা নে ০ ০ ০ ০

I মা মা -া | সা সা -া | মা মা -া | সা সা -া I
গু রু ০ ম শা ই টি কি ০ ওয়া লা ০

I মা -া মা | মা পা -া | মা মা -া | মা সা -া I
নি ০ ত্যি যা বে ন্ ঝি ঙে ০ টো লা ০

I মা মা -া | মা পা -া | ধা ধা -া | ধা ধা -া I
জ মি ০ দা রে র্ বা ড়ি ০ সে থা ০

I পা -া ধা | ধা পা -া | মা মা -া | -া -া -া II
আ ০ ড্ডা জ মে ০ ভা রি ০ ০ ০ ০

২.

II মা মা পা -া | মা মা পা পা | মা মা পা -া | মা মা সা -া I
সা ব ধা ন্ হ য়ে স বে অ ব ধা ন্ ক র রে ০

I ধা ধা ধা ধা | পা পা ধা -া | মা পা ধা -া | পা পা সা -া I
ও হে শি ষ্য গু ণ ধ র্ কো লা হ ল্ ছা ড় রে ০

I মা মা মা পা | গা গা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা -া I
কে না জা নে চ ণ্ডী বা বু ঝি ঙে টো লার্ জ মি দা র্

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
অ নু র ক্ত ভ ক্ত মো রা চ র ণে প্র ণ মি তা র্

I মা গা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা -া I
বি ক্র মে বি ক্র মা দি ত্য স র্ব শা স্ত্রে ধু র ন্ধ র্

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
সা ক্ষাৎ যে ন দা তা ক র্ণ দা ন ব্র তে ভ য় ঙ্ক র্

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা -া | মা মা সা -া I
খা চ্ছে দা চ্ছে ফু র্তি ক চ্ছে নি ত্য তা রি ক ল্যা ণে ০

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
চ ব্বিশ ঘ ণ্টা মার্ ছে আ ড্ডা বখ্ শি শা দি স ন্ধা নে ০

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা -া I
নি ত্য ন তুন্ হ চ্ছে হল্ লা লো কা র ণ্য মা রা ত্ম ক্

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
বা ত্থের্ ঘ টা খা ত্থের্ ঘ টা অ র্থের্ শ্রা দ্ধ অ ন র্থ ক্

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা -া I
এক্ জন্ ব ড্ড সা দা সি ধে ভেদ্ ক রে না আ ত্ম প র্

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
টা কার্ লো ভে   ব সে থা কে   য ত ব্যা টা   স্বা র্থ প র্

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা -া I
প ণ্ডিত্ ম শাই   ব্য স্ত ব ড্ড   চ ণ্ডী বা বুর্   ভি তা র্থ ০

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
অ ম্ল ু চি   ধ্বং স ক রি   ক চ্ছেন্ স বায়্   কৃ তা র্থ ০

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা -া I
বি প্রে জা হির্   ক চ্ছে স বাই   পো লাও কো র্মা   ভো জ নে ০

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
য ত রা জ্যের্   নি ষ্ক ম্মার্ দল্   বাড়্ ছে স বাই   ও জ নে ০

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা :া সা -া I
অ বি শ্রা ন্ত   হু জুক্ নি ত্য   মু হূ র্তে কো   শা ন্তি নেই ০

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া I
প ঞ্চ ব র্ষ   অ ন্ত হৈ ল   ক্ষা ন্ত দে বার্   নাম্ টি নেই ০

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা ।া I
ক স্মিন কা লে   শু নি নাই রে   এ মন্ কা ণ্ড   কার্ খা না ০

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা র্ধা ধা | পা পা সা -া I
খো সা মু দে   ভ ণ্ড গু লো   আ হ্লা দে তে   আট খা না ০

I মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা মা পা | মা মা সা -া I
পু ষ্প চ ন্দন্   বৃ ষ্টি হ বে   চ ণ্ডী বা বুর্   ম স্ত কে ০

I ধা ধা ধা ধা | পা পা পা ধা | মা পা ধা ধা | পা পা সা -া II
অ ক্ষয়্ পু ণ্য   স ঞ্চয়্ হ বে   চি ত্র গু প্তের   পু স্ত কে ০

৩.

II ধা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা গা -া গা | মা পা মা -া I
প ড়ি য়া কা লে র ফে রে মো রা ০ কি হ নু রে ০

I র্সা মা মা মা | মা মা মা গা | মা ধা ধা ধা | পা ধা পা -া I
কোথায়্ ভী ষ্ম কোথা দ্রো ণ কোথা ক র্ণ ভী মা র্জু ন্

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা গা গা গা | মা পা মা -া I
কো থায়্ গে লেন যা জ্ঞ ব ল্ক্য কো থায়্ বা সে ম নু রে ০

I ধা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা গা -া গা | মা পা মা -া I
প ড়ি য়া কা লে র ফে রে মো রা ০ কি হ নু রে ০

I র্সা মা মা মা | মা মা মা গা | মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা I
মা টির্ স ঙ্গে মিশ্ ছে স বি কেঁ চোর্ ম তো খা চ্ছে খা বি

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা গা গা গা | মা পা মা -া I
আ পিস্ খা টি ক' চ্ছে মা টি ন ধর্ পৃ ষ্ঠ ত নু রে ০

I ধা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা গা -া গা | মা পা মা -া I
প ড়ি য়া কা লে র ফে রে মো রা ০ কি হ নু রে ০

I র্সা মা মা মা | মা মা মা-গা | মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা I
ব্রা হ্ম ণের্ সে তে জ নে ই খা দ্যা খা দ্য ভে দ নে ই

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা পা -া গা | মা পা মা -া I
ম নের্ দুঃ খ কা রে ব লি মো রা ০ কি হ নু রে ০

I ধা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা গা -া গা | মা পা মা -া II
প ড়ি য়া কা লে র ফে রে মো রা ০ কি হ নু রে ০

৪.

II পা পা পা | -া পা -া I র্সা ধা পা | -া -া -া I
ও রে ও ০ চ ণ্ ডী চ র ণ্ ০ ০

I পা পা জ্ঞা | -া গা গা I জ্ঞা পা ধা | -া -া া I
তো মার্ কি ০ না ই রে ম র ণ্ ০ ০

I পা -া পা | পা পা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া | গা ঋা -া I
কো ন্ সা হ সে ০ চা ক র্ ডে কে ০

I ঋা -া ঋা | ঋা ঋা -ঋা I ন্া -ঋা ঋা | ঋা -া -া I
ভ ০ দ্র লো কে র্ কা ন্ ম লা ও ০

I ঋা ঋা ঋা | ঋা -ঋা ন্া I -ঋা ঋা ঋা | ঋা া -া I
তু মি স বা র্ হা ড়্ জ্বা লা ও ০ ০

I পা পা পা ধা , পা -া ঋা -া I র্সা সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা না I
ব লে কি না ঠা ০ ঙা ০ হু দাঁ স্ত পা ষ ণ্ড ভ ণ্ড

I ধা ধা না না , ধা -া পা া I ধা ধা না ধা | পা -া পা -া I
সয় তা নে রি পা ০ ঙা ০ তা রেই ব লে ঠা ০ ঙা ০

I গা ঋা গা ঋা | সা -া সা -া I র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা না I
তা রেই ব লে ঠা ০ ঙা ০ আ ঙা মা নে পাঠি য়ে তা রে

I ধা ধা না না | ধা -া পা -া I ধা ধা না ধা | পা া পা -া I
মা থায়্ মা রো ডা ০ ঙা ০ ত বেই হ বে ঠা ০ ঙা ০

I গা ঋা গা ঋা | সা -া সা -া I র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা না I
ত বেই হ বে ঠা ০ ঙা ০ লা গাও চাঁ টি অ তি খাঁ টি

I ধা ধা না না | ধা া পা -া I ধা ধা না ধা | পা া পা -া I
সা ড়ে পঁ চিশ গ ০ ঙা ০ ত বেই হ বে ঠা ০ ঙা ০

I গা গা গা রা | সা -া সা II
ত বেই হ বে ঠা ০ ঙা ০

লক্ষণের শক্তিশেল স্বরলিপি : অনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রীবিজয়া রায়

১

II সা সা | মা -া মা | মা -া মা -া I মা মা | মা -া রা | মা -পা পা -া I
আ সি ছে ০ রা ব ০ ণ ০ বা জে ঢ ০ ক্কো ঢো ০ ল ০

I পা পা | ণা -া ণা | ণা -া পা -া I মা মা | মা -া মা | মা -া সা -া I
ম হা ধূ ০ ম ধা ০ ম ০ ম হা হ ০ ট্ট গো ০ ল ০

I সা সা | মা মা মা | মা মা মা মা I
ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্

I সা সা | মা -া মা | মা -া মা -া I মা মা | মা -া রা | মা -পা পা -া I
শ ঙ্খ হু ০ লা হু ০ লি ০ সা না ই ০ নিঃ স্ব ০ ন ০

I পা পা | ণা -া ণা | ণা -া পা -া I মা মা | মা -া মা | মা -া সা -া I
কর্ তা ল ০ ঝং কা ০ র ০ অস্ ত্রে র ০ ঝ ন ০ ন ০

I সা সা | মা মা মা | মা মা মা মা I
ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্

I সা সা | মা -া মা | মা -া মা -া I মা মা | মা -া রা | মা -পা পা -া I
লা খো লা ০ খো সৈ ০ ন্য ০ চ লে সা ০ থে সা ০ থে ০

I পা পা | ণা -া ণা | ণা -া পা -া I মা মা | মা -া মা | মা -া সা -া I
উ ড়ি ছে ০ প তা ০ কা ০ স ম্মু খে ০ পশ্ চা ০ তে ০

I সা সা | মা মা মা | মা মা মা মা I
ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্

I সা সা | মা -া মা | মা -া মা -া I মা মা | মা -া রা | মা -পা পা -া I
বী র দ ০ র্পে স ০ বে ০ ক রে কো ০ লা হ ০ ল ০

I পা পা | ণা -া ণা | ণা -া পা -া I মা মা | মা -া মা | মা -া সা -া I
ম হা আস্ ০ ফা ল ০ নে ০ কাঁ পে ধ ০ রা ত ০ ল ০

I সা সা | মা মা মা | মা মা মা মা I
তু তঃ কিম্ ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্

I সা সা | মা -া মা | মা -া মা -া I মা মা মা -া ঋা | মা -পা পা -া I
তা হা দে ০ র রু ০ দ্র ০ দা প টে ০ র চো ০ টে ০

I পা পা | ণা -া ণা | ণা -া পা -া I মা মা | মা -া মা : মা -া সা -া I
ভ য়ে প্রা ০ ণ উ ০ ড়ে ০ পি লে চম্ ০ কে ও ০ ঠে ০

I সা সা | মা মা মা | মা মা মা মা I
তু তঃ কিম্ ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্

I সা সা | মা -া মা | মা -া মা -া I মা মা | মা -া ঋা | মা -পা পা -া I
আ জি দুর্ ০ দি নে ০ তে ০ না হি কা ০ রো র ০ ক্ষা ০

I পা পা | ণা -া ণা | ণা -া পা -া I মা মা : মা -া মা | মা -া সা -া I
দ লে ব ০ লে স ০ বে ০ পা বে আ ০ জি অ ০ ক্কা ০

২.

II সা সা মা | মা মা -া I গা পা -া | ধা -া মা I
য দি রা ব নে র্ ঘুঁ ষি ০ লা ০ গে

I পা -া পা | পা পা পা I মা মা -ধা | পা ধা -া I
গা য়্ ত বে তু ই ম রে ০ যা বি ০

I -া -া ধা | ধা ধা ধা I পা পা -র্সা | ণা র্সা -া I
০ ০ ত বে তু ই ম রে ০ যা বি ০

I -া -া -া | -া র্সা র্সা I র্সা র্সা ঋ্ঁা | জ্ঞা র্মা -া I
০ ০ ০ ০ ও রে পা লি য়ে যা রে ০

I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা -া -া I -া -া ধা | ধা ধা ণা I
পা লি য়ে যা ০ ০ ০ ০ তা না হ লে

I পা পা -র্সা | ণা র্সা -া I -া -া র্সা | র্সা র্সা -া I
ম রে ০ যা বি ০ ০ ০ ল গু ড়ে র্

I ণা ণা -র্রা | র্সা র্ঋা -া I -া -া র্রা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা I
গুঁ তো ০ খে য়ে ০ ০ ০ হু টাত্ এক্ দিন্

র্সা র্সা -র্মা | র্গা র্মা -া I -া -া -া | -া -া -া II
ম রে ০ যা বি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

৩.

II সা মা মা মা | মা া মা গা I মা -ধা ধা ধা | পা ধা পা পা I
ত বে রে রা ব ণ্ ব্যা টা তো র্ মু খে মার্ বো ঝাঁ টা

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা মা I মা মা জ্ঞা সা | মা মা পা গা I
তো রে এ খন্ রাখ্ বে কে টা এ বার্ তো রে বাঁ চায়্ কে টা

I মা -া -া -া | -া -া -া সা I সা মা মা মা | মা পা মা গা I
ব ল্ ০ ০ ০ ০ ০ তোর্ মু খে র দু পা টি দ স্ত

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা মা I
ভা ঙ্গি য়া ক রি ব অ স্ত এ খ নি হ বে প্রা ণা স্ত

I মা মা রা সা | মা মা পা গা I মা -া -া -া | -া -া -া -া I
আয় রে ব্যা টা য মের্ বা ড়ি চ ল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা মা মা | মা -া গা I মা -পা পা | পা -মা গা I
ও রে পা ষ ০ ণ্ড তো ০ র মু ০ ণ্ড

I মা -ধা ধা | ধা -া ধা I পা ণা ণা | -া মা মা I
খ ০ ণ্ড খ ০ ণ্ড ক রি ব ০ য ত

I পা -া পা | পা -া পা I মা মা মা | -া মা -া I
অ ০ স্থি হা ০ ড় হ বে চু র্ মা র্

I গা গা গা | গা গা -মা I রা মা মা | -া -া -া I
এ ম নি আ ছা ড়্ মা রি ব ০ ০ ০

I সা মা মা | মা মা -গা I মা পা পা | -া মা -গা I
ব্যা টা গু লি খো র্ বু দ্ধি নে ই তো র্

I মা ধা -া | ধা -া -া I পা -ণা ণা | -া -া -া I
নে হা ৎ তু ই ০ চ্যা ঙ ড়া ০ ০ ০

I ণা -া ণা | ণা ণা -া I পা -া পা | পা পা -া I
আ য়্ ত বে আ য়্ য ০ ষ্ঠি র ঘা য়্

I গা গা গা | গা গা -মা I রা -মা মা | -া -া -া I
ক রি ব তো রে ০ ল্যা ঙ ড়া ০ ০ ০

II সা মা মা মা | মা মা মা গা I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা I
রে খে দে তোর্ গ লা বা জি ও রে ব্যা টা ছুঁ চো পা জি

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা মা I মা মা রা সা ¦ মা মা পা গা I
অ স্তি ম স ম য়ে আ জি ই ষ্ট দে বে কর্ রে ন ম

I মা -া -া -া | -া -া -া -া I সা -মা মা মা | মা মা মা -গা I
স্কা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্ তু ই রে পা ষ ণ্ড ঘো র্

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা -া I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা -মা I
পা ল্লা য় প ড়ি লি মো র্ উ দ্ধা র না দে খি তো র্

I মা -া রা সা | মা মা পা গা I মা -া -া -া | -া -া -া -া I
মো র্ হা তে না পা বি নি স্তা ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

II সা মা মা | মা মা -গা I মা পা পা | পা মা -গা I
ও রে বে য়া দ ব্ ক হি লি যে স র্

I মা ধা ধা | ধা ধা ধা I পা ণা ণা | -া -া -া I
ক্ষ মা যো গ্য ন হে ক খ ন ০ ০ ০

I ণা -া ণা | ণা ণা -া I পা পা পা | পা পা -া I
তা র্ প্র তি শো ধ্ পা বি রে নি র্বো ধ্

I গা গা গা | গা গা মা I ঋা মা মা | -া -া -া I
পা ঠা ব শ ম ন স দ ন ০ ০ ০

II সা মা মা মা | মা মা মা গা I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা মা I
ও রে বা বা ই কী লা ঠি গে ল বু ঝি মা থা ফা টি

I মা মা ঋা সা | মা মা পা গা I মা মা -া -া | -া -া -া -া I
নি রেট্ গ দা ই কী স র্ব নে শে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা মা -া মা | মা মা মা গা I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা মা I
কাজ্ নে ই রে খোঁ চা খুঁ চি ছে ড়ে দে ভাই কেঁ দে বাঁ চি

I মা মা ঋা সা | মা মা পা গা I মা মা -া -া | -া -া -া -া II
সা ধের্ প্রাণ্ টি হা রা ব কি শে ষে ০ ০ ০ ০ ০ ০

৪.

II সা মা মা | মা মা গা I মা পা -া | পা মা গা I
আ মা র . স হি তে ল ড়া ই ক রি তে

I মা ধা ধা | ধা ধা ধা I ণা -ণা ণা | -া -া -া I
আ গ্র হ দে খি নি তা ন্ ত ০ ০ ০

I ণা ণা ণা | ণা ণা -া I পা পা পা | পা পা -া I
বু ঝে ছি এ বা র্ ও রে হ রা চা র্

I গা গা গা | গা গা মা I ঋা -মা মা | -া -া -া I
ডে কে ছে তো রে কৃ তা ন্ ত ০ ০ ০

I সা মা মা | মা -মা গা I মা -পা পা | পা মা -গা I
আ মি পা লো য়া ন্ স্যা ০ ণ্ডো স মা ন্

I মা ধা ধা | ধা ধা -া I পা পা -ণা | ণা -া -া I
তু ই ব্যা টা তা র্ জা নি স্ কি ০ ০

I ণা ণা -া | ণা ণা ণা I পা পা পা | -া পা -া I
কো থা য়্ লা গে বা কু রো পা ট্ কি ন্

I গা গা -া | গা গা -মা I রা রা -মা | মা -া -া I
কো থা য়্ রো জে দ্ ভে নি ০ স্কি ০ ০

I সা মা মা | মা -া গা I মা পা পা | পা -মা গা I
এ ই যে অ ০ স্ত্র দে খি ছ স্প ০ ষ্ট

I মা ধা ধা | ধা ধা -া I পা -ণা ণা | -া -া -া I
শো ভি ছে আ মা র্ হ ০ স্তে ০ ০ ০

I ণা ণা ণা | ণা ণা ণা I পা পা পা | পা পা পা I
ই হা রই প্র ভা বে য মা ল য় যা বে

I গা গা গা | গা গা মা I রা -মা মা | -া -া -া I
বা ন র কু ল স ম ০ স্তে ০ ০ ০

I সা মা মা | মা মা গা I মা -পা পা | পা মা গা I
অ যো দ্ধা র লো কে যো ০ দ্ধা হ য়ে ছে

I মা ধা ধা | ধা ধা ধা I পা ণা ণা | -া মা মা I
শু নে ম রি আ মি হা সি য়া ০ আ জি

I ণা ণা ণা | ণা -া ণা I পা পা পা | পা -া পা I
দে খা ব শ ০ ক্তি রা খি ব কী ০ র্ত্তি

I গা গা গা | গা গা হ্মা | ঋা মা মা | -া -া -া I
দ লে দ লে স বে না শি য়া ০ ০ ০

৫.

II হ্মা মা -া | ঋা -া সা | মা হ্মা -া | পা ধা -া I
অ বা ক্ ক ল্ লে রা ব ণ্ বু ড়ো ০

I ণা -া ণা | ণা ণা ণা | ণা -া ণা | ণা র্সা ণা I
য ০ ষ্ঠি র বা ড়ি সু ০ গ্রী বে মা রি

I ধা -ণা ধা | পা হ্মা -া | ঋা মা -া | পা ধা -া I
ক ল্ লে যে তা র্ মা থা ০ গুঁ ড়ো ০

I মা মা -া | ঋা -া সা | মা মা -া | পা ধা -া I
অ বা ক্ ক ল্ লে রা ব ণ্ বু ড়ো ০

I ণা ণা ণা | ণা ণা ণা | ণা -া ণা | ণা র্সা ণা I
অ তি ম হা তে জা সু ০ গ্রী ব রা জা

I ধা -ণা ধা | পা মা -া | ঋা মা -া | পা ধা -া I
অ ০ ঙ্গ দে রি ০ চা চা ০ খু ড়ো ০

I মা মা -া | ঋা -া সা | মা মা -া | পা ধা -া I
অ বা ক্ ক ল্ লে রা ব ণ্ বু ড়ো ০

I ণা ণা ণা | ণা ণা ণা | ণা ণা ণা | ণা র্সা ণা I
গ দা ঘু রা ই য়া দি ল উ ড়া ই য়া

I ধা -ণা ধা | পা মা -া | ঋা হ্মা -া | পা ধা -া I
ল ০ ম্ফ পে রি ০ ধ ড়া ০ চূ ড়ো ০

I হ্মা মা -া | ঋা -া সা | মা মা -া | পা ধা -া I
অ বা ক্ ক ল্ লে রা ব ণ্ বু ড়ো ০

I ণা -া ণা | ণা ণা ণা | ণা ণা ণা | ণা র্সা ণা I
ল ০ ক্ষ্ম গে মে রে বা ন র দ লে রে

I ধা ·ণা ধা | পা মা -া | রা মা -া | পা ধা -া I
ক ল্ লে ব্যা টা ০ তা ড়া ০ হু ড়ো ০

I মা মা -া | রা -া সা | মা মা -া | পা ধা -া I
অ বা ক্ ক ল্ লে রা ব ণ্ বু ড়ো ০

I ণা -া ণা | ণা ণা -া | ণা -া ণা | ণা র্সা ·ণা I
বু ০ দ্ধি বি পু ল্ যু ০ দ্ধে নি পু ণ্

I ধা ·ণা ধা | পা মা -া | রা মা -া | পা ধা -া I
কি ০ স্তু ব্যা টা ০ বে জা য়্ ভুঁ ড়ো ০

I মা মা -া | রা -া মা | মা মা -া | পা ধা -া II
অ বা ক্ ক ল্ লে রা ব ণ্ বু ড়ো ০

৬.

II সা সা মা মা | মা মা মা -গা | মা ধা ধা ধা | পা -ধা পা -া I
বল লেন্ যা হা জা ম্বু বা ন্ সা বাস্ গ ণ্যং কা র্ হে ০

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা পা ধা পধপা | মা -া গা -া I
আ নু পূর্ বিক্ ঘট্ লো যা হা শুন্ তে চ মৎ কা র্ হে ০

I সা মা মা মা | মা মা মা মগা | মা ধা ধা র্ধা | পা -ধা পা -া I
পড়্ লেন্ লক্ষ্মণ্ শক্ তি শেলে যেন ঝ ড়ে ক লা গা ছ্ রে ০

I মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা | মা পা ধা পধপা | মা -া গা -া I
খা বি খে তে লাগ্ লেন যে ন ডা ঙ্গায়্ বো য়াংল্ মা ছ্ রে ০

I সা মা মা মা | মা মা মা মগা | মা ধা ধা ধা | পা ধা পা পা I
অ নেক্ কষ্ টে রৈ ল বেঁচে আহা ক পাল্ জো রে মৈ ল না ওরে

I মা ধা ধা ধা পা ধা পা পা | মা পা ধা পধপা | মা গা গা -া I
স্বর্ গ হৈ তে কি ছু ত র্ পুষ্ প বৃ ষ্টি০০ হৈ ল না ০

I সা মা মা মা মা মা মা গা | মা ধা ধা -া | পা -ধা পা -া I
ভা গ্যে মো রা স বাই সে থা ছি লাম্ উ পস্ থি ত্ গো ০

I মা ধা ধা ধা পা ধা পা পা | মা পা ধা পধপা | মা -া গা -া II
তা নৈ লে তো ঘট্ তো আ জি হি তে বি প০০ রী ত্ গো ০

I গা গা পা পা | পা ধা পা ধা I র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া I
শোন্ রে ও রে হ নু মা ন্ হও রে ব্যা টা সা ব্ ধা ন্

I র্সা র্রা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্রা র্সনা I ধনা -া ধপা -া | -া -া -া -া I
আ গে হ তে প ষ্ট ব লে০ রা ০ খি০ ০ ০ ০ ০ ০

I গা গা পা পা | পা ধা পা ধা I র্সা র্সা র্সা -া | র্সা র্সা র্সা -া I
তু ই ব্যা টা জা নো য়া র্ নি ষ্ক র্মা র্ অ ব তা র্

I র্সা র্রা র্গা র্গা | র্রা -া র্সা র্সনা I ধনা -া ধপা -া | -া -া -া -া I
কা জে ক র্মে দি স্ ব ড়০ ফাঁ ০ কি০ ০

I গা -া পা পা | পা ধা পা ধা I র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
কা জ্ ক র্ম ছে ড়ে ছু ড়ে ঘু মোস্ খা লি প ড়ে প ড়ে

I র্সা র্রা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্সা র্সনা I ধনা -া ধপা -া | -া -া -া -া I
অ কা ত রে না কে দি য়ে০ তৈ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০

I গা -া পা পা | পা ধা পা -ধা I র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা -া I
শো ন্ রে আ দে শ মো র্ এ ই দ ণ্ডে আ জি তো র্

I র্সা র্রা র্গা র্গা র্রা র্রা র্সা র্সনা I ধনা -া ধপা -া | -া -া -া -া II
অ ষ্ট আ না জ রি মা না০ হৈ০ ০ ল ০ ০ ০ ০ ০

৮.

II মা মা -া | পা ধা -া | মা মা -া | মা সা -া I
রা ব ণ্ ব্যা টা য়্ মা রো ০ স বা ই

I মা মা -া | পা ধা -া | মা মা -া | -া মা -া I
রা ব ণ্ ব্যা টা য়্ মা রো ০ ০ তা র্

I মা মা -া | মা পা -া | পা -া -া | -া পা ধা I
মা থা য়্ ঢে লে ০ ঘো ০ ০ ল্ তা রে

I মা -া মা | মা মা -ধা | ধা -া -া | -া ধা -া I
উ ০ ল্টো গা ধা য়্ তো ০ ০ ল্ তা র্

I ধা ধা -া | ধা ধা -া | ধা -া ধা | ধা ধা -া I
কা নে র্ কা ছে ০ পি ট্ তে থা কো ০

I মা -া মা | পা ধা -পা | মা -া -া | -া -া -া I
চৌ ০ দ্দ হা জা র্ ঢো ০ ০ ল্ ০ ০

I মা -া মা | মা পা -া | পা পা -া | -া পা -ধা I
কা জ্ কি ব্যা টা র্ বেঁ চে ০ ০ তা র্

I মা -া মা | মা মা -ধা | ধা ধা -া | -া -া -া I
চু ল্ দা ড়ি গোঁ ফ্ চেঁ ছে ০ ০ ০ ০

I ধা -া ধা | ধা ধা -া | ধা ধা -া | ধা ধা -া I
ন ০ স্যি ঢো কা ও না কে ০ ব্যা টা ০

I মা মা -া | পা ধা -পা | মা মা -া | -া মা -া I
ম রু ক্ হেঁ চে ০ হেঁ চে ০ ০ তা র্

I মা মা মা | মা পা -া | পা পা -া | -া পা ধা I
গা লে দা ও চু ন্ কা লি ০ ০ তা রে

I মা -া মা | মা মা -ধা | ধা ধা -া | -া ধা -া I
চি ম্ টি কা টো ০ খা লি ০ ০ তা র্

I ধা -া ধা | ধা ধা -া | ধা ধা ধা | ধা -া -া I
চো ০ দ্দ পু রু ষ্ উ ড়ি য়ে দা ০ ও

I মা মা -া | পা ধা -পা | মা মা -া | -া মা মা I
পে ড়ে ০ গা লা ০ গা লি ০ ০ তা রে

I মা মা -া | মা পা -া | পা পা -া | -া -া -ধা I
না কা ল্ ক রো ০ আ রো ০ ০ ০ ০

I মা -া মা | মা মা -ধা | ধা ধা -া | -া -া -া I
যে ০ যে র ক ম্ পা রো ০ ০ ০ ০

I ধা ধা -া | ধা ধা -া | ধা ধা -া | ধা ধা -া I
রা ব ণ্ ব্যা টা য়্ মা রো ০ স বা ই

I মা মা -া | পা ধা -পা | মা মা -া | -া -া -া II
রা ব ণ্ ব্যা টা য়্ মা রো ০ ০ ০ ০

৯.

II মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
আজ্ কে মন্ ত্রী জাম্ বু বা নের্ বুদ্ ধি কে ন খুল্ ছে না ০

I মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
সং কট্ কা লে চট্ পট্ কে ন যুক্ তির্ ক থা বল্ ছে না ০

I মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
স র্ব ক র্মে অষ্ ট রম্ ভা হর্ দম্ প ড়ে নাক্ ডাক্ ছে ০

I মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
উল্ টে কি ছু বল্ তে গে লে বিট্কেল বিট্কেল্ গাল্ পাড়্ ছে ০

I মা মা মা পা |পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
মর্ ছে ল ক্ষণ্ জান্ ছে ত বু দেখ্ ছে চে য়ে নিশ্ চিন্ তে ০

I মা মা মা পা |পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
এম্ নি স্ব ভাব্ ছি ল না তার্ থাক্ তাম্ য খন্ কিষ্ কিন্ ধে ০

I মা মা মা পা |পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
হ্যাঙ্গ্ গাম্ দে খে হুট্ লে প রে নিন্ দুক্ লো কে বল্ বে কি ০

I মা মা মা পা |পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা া I
ভে বেই দে খ এম্ নি কর্ লে রাজ্ জ্যের কার্য চল্ বে কি ০

I মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা |ধা ধা ধা -া I
মুখ্ খু মো রা আক্ কেল্ শূ ন্য এক্ কে বা রেই বুদ্ ধি নেই ০

I মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া I
সূ ক্ষ্ম যুক্ তি বল্ তে কা রো ঠা কুর্ দা দার্ সা ধ্যি নেই ০

I মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা া I
বল্ ছি মো রা কি ছু নেই কো চট্ বার্ ক থা এর্ ম ধ্যে ০

I মা মা মা পা | পা পা পা ধা I মা মা মা ধা | ধা ধা ধা -া II
উ ঠে এক্ বার্ ব্য ব স্থা দাও প্র ণাম্ ক রি ঠ্যাং প দ্মে ০

১০.

II মা পা পা | মা ধা পা | মা পা পা | মা গা মা I
আ মা র ব চ ন শু ন বি ভী ষ ণ

I মা পা পা | পা পা পা | পা ধা ধা | না না পা I
ক র হ গ্র হ ণ সে না প তি পদ আহা

I পা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | না র্সা না | ধা না ধা I
সা জ স জ্জা ক র দি ব্য অ স্ত্র ধ র

I পা ধা ধা | পা পা পা | পা ধা না | না না গমা I
স ম রে স স্ব র এ ম হা বি পদ তুমি

I মা পা পা | মা ধা পা | মা পা পা | মা গা মা I
বি প দে নির্ ভী ক বীর্ যে অ লৌ কি ক

I মা পা পা | পা পা পা | পা ধা ধা | না না পা I
তো মা র অ ধি ক কে বা আ ছে আর্ আহা

I পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া | না -র্সা না | ধা না -ধা I
জ লে তে পা ষা ণ্ যা য়্ গো ভা সা ন্

I পা ধা ধা | পা পা -া | পা ধা না | না না -া I
মুশ্ কি লে আ সা ন্ প্র সা দে তো মা র্

I মা পা পা | মা ধা পা | মা পা পা | মা গা মা I
শু ন সর্ ব জ নে আ জি কে এ ক্ষ ণে

I মা পা পা | পা পা পা | পা ধা ধা | না না পা I
বী র বি ভী ষ ণে ক র সে না পতি আহা

I পা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | না র্সা না | ধা না ধা I
শ্রী রা মে র ত রে স ম্মু খে স ম রে

I পা ধা ধা | -পা পা পা | পা ধা না | না না না II
য দি যা য়্ ম রে কি বা তা হে ক্ষ তি

১১.

II র্া গা জ্ঞা -র্া | জ্ঞা মা গা -া | র্া -গা জ্ঞা -া | মা ধা পা -া I
বি ধি মো ০ র ভা লে ০ হা য়্ কি ০ লি খি ল ০

I মা গা মা -া পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া I
আ জ রা ০ ত্রে এ কি ০ বি প দ ০ ঘ টি ল ০

I মা গা মা -া | ণা ণা ধা -া | পা ধা ণা -র্সা | ণা ধা পা -া I
দু র্ম তি ০ সু গ্রী ব ০ চি র শ ০ ত্রু মো র ০

I মা গা মা -া | পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া I
ফে লি ল ০ আ মা রে ০ শ ঙ্ক টে ০ তে ঘো র ০

I রা গা সা -রা | সা মা গা -া | রা গা মা -া | মা ধা পা -া I
জা ম্বু বা ০ ন ব্যা টা ০ কু বু দ্ধি ০ র ঢেঁ কি ০

I মা গা মা -া | পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া I
তা র চ ০ ক্রে প ড়ি ০ উ দ্ধা র ০ না দে খি ০

I মা গা মা -া | ণা ণা ধা -া | পা ধা ণা -র্সা | ণা ধা পা -া I
আ সে য ০ দি কে হ ০ রা ত্রি দ্বি ০ প্র হ রে ০

I মা গা মা -া | পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া I
ঠে কা ব ০ কে ম নে ০ এ কা কী ০ তা হা রে ০

I রা গা সা -রা | সা মা গা -া | রা গা মা -া | মা ধা পা -া I
স্ব র্গ হ ০ তে ক হ ০ দে ব ং গ ০ ণ স বে ০

I মা গা মা -া | পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া I
আ জি এ ০ স ঙ্ক টে ০ কি উ পা ০ য় হ বে ০

I মা গা মা -া ণা ণা ধা -া পা ধা ণা -র্সা ণা ধা পা -া I
য ম হ ০ স্তে আ জি ০ না দে খি ০ নি স্তা র ০

I মা গা মা -া | পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া I
সু য়ু ক্তি ০ তা হা র ০ ক হ স ০ বি স্তা র ০

I ঋা গা সা -ঋা | সা মা গা -া | ঋা গা মা -া | মা ধা পা -া I
শু ন দে ০ বা সু র ০ গন্ ধর্ ব ০ কি ন্ন র ০

I মা গা মা -া | পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া I
মা ন ব ০ দা ন ব ০ রা ক্ষ স ০ বা ন র ০

I মা গা মা -া | ণা ণা ধা -া | পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা -া I
শু ন স ০ র্ব জ নে ০ মো র ম্ ০ ত্যু হ লে ০

I মা গা মা -া | পা পা পা -ধা | র্সা ণা ধা -া | পা মা গা -া II
শো ক স ০ ভা ক রো ০ তো ম রা ০ স ক লে ০

১২.

II মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা -ধা ধা -া I
দ য়া বা ন গু ণ বা ন ভা গ্য বান্ ম শা ই গো ০

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা ধা ধা -া I
তো মার্ প্রা ণে এক টু ও কি দ য়া মা য়া না ই গো ০

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা -ধা ধা -া I
তো মার্ তু ল্য খাঁ টি বন্ ধু আর্ কা হা রে পা ই গো ০

I মা মা মা পা | পা ধা মা পা I মা মা মা পা | পা -ধা ধা -া I
তু মি ভর্ সা না হি দি লে অ ন্য কো থা যা ই গো ০

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা -ধা ধা -া I
এ স ম য়ে তো মা ভি ন্ন কে আ ছে স হা য় গো ০

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা -ধা ধা -া I
কা র্যো দ্ধা র না হ লে তো না দে খি উ পা য়্ গো ০

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা -ধা ধা -া I
পথ্ ছে ড়ে দাও মু ক্ত ক ণ্ঠে তো মার্ ণ গু গা ই গো ০

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা -ধা ধা -া II
দ য়া বা ন গু ণ বা ন ভা গ্য বান্ ম শা ই গো ০

১৩.

II পা ধা পা পা | র্সা -া র্সা র্সা | র্রা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া I
য থ ন প রা ০ জ য় খ লু অ নি বা ০ র্য ০

I র্সা র্রা র্রা র্সা | -র্রা র্গা র্গা -া | র্রা -া র্সা র্সা -া | ধা -না ধা -পা I
ত খ ন যু ০ দ্ধ কি ০ বু ০ দ্ধি র ০ কা ০ র্য ০

I পা ধা পা র্সা | -া র্সা র্সা -া | র্রা র্সা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা -া I
ত বে তো মু ০ স্কি ল ০ উ পা য় কি ০ হ বে ০

I র্সা র্রা র্রা র্সা | -র্রা র্গা র্গা -া | র্রা র্রা র্সনা ধা | -না ধা পা -া I
সা ধ ক রে ০ কে ব ল্ প্রা ণ টা ০ হা ০ রা বে ০

I পা ধা পা র্সা | -া র্সা র্সা -া | র্রা র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সা -া I
আ মি ও তা ই ব লি ০ ল ড়া ০ য়ে কা জ না ই

I র্সা র্রা র্রা র্সা | -র্রা র্গা র্গা -া | র্রা র্সা -া র্সনা | ধা না ধা -পা I
কা জে তে ই ০ স্ত ফা ০ এ খ ০ নি ০ দা ও ভা ই

I পা -ধা পা র্সা | -া র্সা র্সা -া | র্রা -র্সা র্সা র্সা | -া র্সা র্সা -া I
হা য়্ কি ঘ ০ টি ল ০ হা য়্ কি ঘ ০ টি ল ০

I র্সা র্রা র্রা র্সা | -র্রা র্গা র্গা -া | র্রা র্সা র্সনা ধা | -না ধা পা -া II
এ ম ন সা ০ ধে র ০ চা কু রি ০ ঘু ০ চি ল ০

১৪.

II মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I
যম্ ব্যা টা যে দি ল ফাঁ কি তে রো আ না মাই নে বা কি

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I
দেখ্ না ব্যা টা ম লো না কি চু লে ধ রে দে না ঝাঁ কি

I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা I মা মা মা পা | পা ধা ধা পা II
বি পদ কা লে কা রে ডা কি যম্ ব্যা টা যে দি ল ফাঁ কি

গ্রন্থ-পরিচয়

নাটক

সুকুমার রায়ের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা এ-পর্যন্ত আটটি নাটকে সীমাবন্ধ। গল্প কবিতা বা অন্যবিধ রচনার তুলনায় এই সংখ্যা স্বল্পপরিমাণ বলা চলে। শ্রীলীলা মজুমদার লিখছেনঃ "যে বিশেষ ক্ষেত্রে সুকুমারের সবচাইতে বেশি সম্ভাবনা ছিল সেখানেই তাঁর হাত পাকার কাজ সবচেয়ে কম এগিয়েছিল।"

সুকুমার রায়ের নাটক রচনার সূত্রপাতের বিবরণ দিয়েছেন তাঁর ভগিনী পুণ্যলতা চক্রবর্তীঃ "বাবার লেখা 'কেনারাম ও বেচারাম' বলে একটা হাসির নাটক 'মুকুল' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, ভাইদের নিয়ে সেটা অভিনয় করে সবাইকে [দাদা] খুব আনন্দ দিল।...সেই থেকে ভাইবোনদের জন্মদিনের উৎসবগুলো দাদার হাসির গান ও অভিনয়ে জমকালো হয়ে উঠল। এতদিন ছোটদের জন্য যেসব নাটক ও গল্প বইয়ে কিংবা পত্রিকায় বেরোত, তাই নিয়ে অভিনয় হত, এবার দাদা নিজেই হাসির নাটক লিখতে আরম্ভ করল।"

সেই নাট্যচর্চার প্রথম ফসল 'রামধন বধ।' এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নাটকটি রচিত হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমসময়ে। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা থেকে নাটকের আখ্যানভাগ জানা যায়ঃ "রাম্‌সুডেন (রামধন) সাহেব মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার কাছে কোথায় লাগে। 'নেটিভ্‌ নিগার্‌' দেখলেই সে নাক সিঁটকোয়, পাড়ার ছেলেরাও তাকে দেখলেই চেঁচায়—'বন্দেমাতরম্‌।' আর সে রেগে তেড়ে মারতে আসে, বিদ্‌ঘুটে গালাগালি দেয়, পুলিশ ডাকে। এহেন 'সাহেব' কি করে ছেলেদের হাতে জব্দ হল, তারই গল্প। যেমন মজার অভিনয়, তেমনি মজার গান।"

এর পরে সুকুমারের 'ভাইবন্ধুদের অভিনয়ের জন্য' প্রতিষ্ঠিত হল ননসেন্স ক্লাব। পুণ্যলতার সাক্ষ্য থেকে আরও জানা যায়ঃ "দাদা নাটক লিখত, অভিনয় শেখাত, আর প্রধান পার্টটা সাধারণত সে নিজেই নিত।"

ঝালাপালা। রচনাকাল ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, ১৯১১। পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় ভূমিকাস্বরূপ লেখা আছেঃ

টাট্‌কা নূতন পালা। পালার নাম "ঝালাপালা"

বিজ্ঞাপন—এই নাটক নন্সেন্স ক্লাবের স্থাবর সম্পত্তি। যে কেহ এই নাটক উক্ত নন্সেন্স ক্লাবের বিনানুমতিতে আত্মসাৎ করিবে বা করিতে চেষ্টা করিবে অথবা এই নাটকের বা ইহার অংশ বিশেষের কোনওরূপ তর্জ্জমা, নকল বা কোনও প্রকার অনুকরণ করিবে, বা করিতে চেষ্টা করিবে, অথবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, কিম্বা অপর কাহাকেও উক্ত প্রকার দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত, উৎসাহিত বা সাহায্য করিবে, তাহারা

এবং সাহায্যকারী অন্তরঙ্গ ইয়ার বর্গকে, বিশেষ প্রকারে উত্তম মধ্যম অধম এবং বেদম দমাদম দেওয়ার বন্দোবস্ত উক্ত নন্সেন্স ক্লাব কর্তৃক অচিরাৎ করা হইবে।

ইতি

সং নঃ ক্লাঃ।

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর 'ঝালাপালা' সন্দেশ পত্রিকার ১৩৩১ সালের বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল। এই নাটকও ননসেন্স ক্লাবে অভিনয়ার্থে লিখিত। 'ঝালাপালা' নাটকের সমসাময়িক এই নাটকটির পূর্বনাম ছিল সম্ভবত 'অদ্ভুত রামায়ণ'। সীতা দেবী ১৯১১ সালের শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচর্যায় বলছেন ঃ "একদিন সুকুমার রায় তাঁহার 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উহা ২৪শে কি ২৬শে বৈশাখ হইয়া থাকিবে। এই রামায়ণ গানটি সকলে খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। 'অদ্ভুত রামায়ণে' একটি গান আছে, 'ওরে ভাই, তোরে তাই কানে কানে কই রে, ঐ আসে ঐ আসে ঐ ঐ ঐ রে।' আশ্রমের ছোট ছেলেরা ঐ গানটি শোনার পর সুকুমারবাবুরই নামকরণ করিয়া বসিল, 'ঐ আসে।' "

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটক সন্দেশ পত্রিকার ১৩৩১, ভাদ্র আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়।

ভাবুক সভা। প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২১ সংখ্যায় লেখক-অঙ্কিত চিত্র সহ প্রকাশিত হয়। লেখকের খুল্লতাত-ভগিনী পারুলবালা রায়চৌধুরীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, বিলেত থেকে ফিরে আসবার পরেই গিরিডিতে পূর্ণিমা সম্মিলনে সকলের অনুরোধক্রমে সুকুমার রায় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ভাবুকদাদা' অভিনয় করেন।

শব্দকল্পদ্রুম। পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে ঃ

শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম্।

নোটিস্

এই খাতা হারাইলে কাহারও নিস্তার নাই। আদায়
না করিয়া ছাড়িব না, না পাইলে গালি দিব।

Copyrights reserved
1915

১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মবাসরে সুকুমার রায় নাটকটি সসম্প্রদায় অভিনয় করেন ঃ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সীতা দেবীর স্মৃতি-কথিত 'ওরে ভাই তোরে তাই' এই নাটকের অন্তর্গত একটি গান; 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর পাণ্ডুলিপিতে এই গান নেই। 'শব্দকল্পদ্রুম' বহুকাল পরে 'অলকা' পত্রে প্রকাশিত হয়।

চলচিত্তচঞ্চরি। পূর্ববর্তী নাটকের সমকালীন; পাণ্ডুলিপিতে রচনাকালের উল্লেখ নেই। সাহিত্য-সমগ্র এই খণ্ডে নাটকটি মুদ্রিত হয়ে যাবার পর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। 'চলচিত্তচঞ্চরি'র সিগনেট প্রেস প্রকাশিত কপিতে নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের একটি গান বর্জিত হয়েছে; এখানে সেই গানটি উদ্ধৃত হল ঃ

দ্বিতীয় দৃশ্য
(সমীক্ষা মন্দির)

[ঈশানের সংগীত ও তৎসঙ্গে সকলের যোগদান]

কাহারে চাহিছে কারা
কে বা সে কেমন ধারা
কেন আসে কেন যায়
কেন ফিরে ফিরে চায়
কার লাগি সন্ধানে সারা।

এই নাটকটিও লেখকের মৃত্যুর পর বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

অন্য তিনটি নাটক সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৩২৭ ॥ জ্যৈষ্ঠ ঃ অবাক জলপান। ভাদ্র ঃ হিংসুটি। চৈত্র ঃ মামা গো।

শেষোক্ত নাটকটি কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। সিগনেট প্রেস প্রকাশিত 'ঝালাপালা' নাট্যগ্রন্থে (? ১৩৫১) প্রথমে ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, অবাক জলপান, হিংসুটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী বর্ধিত সংস্করণে (বৈশাখ ১৩৬৯) চলচিত্তচঞ্চরি, ভাবুক সভা ও শব্দকল্পদ্রুম অন্তর্ভুক্ত হয়। এই খণ্ডে মুদ্রিত অধিকাংশ নাটকগুলির পাঠের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি বা পত্রিকায় মুদ্রিত পাঠের সংগতি রক্ষার চেষ্টা হয়েছে।

জীবনী

এই পর্যায়ের রচনাগুলি 'সন্দেশ' পত্রে প্রকাশিত হয়, তারপর কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। বিষয়ানুরোধে কালানুক্রম রক্ষা করা হয়নি।

১৩২৩॥ ডেভিড লিভিংস্টোন; পাস্তুর, সক্রেটিস; ফ্লরেন্স নাইটিংগেল; অজানা দেশে।
১৩২৪॥ গ্যালিলিও; আর্কিমিডিস; কলম্বস; সামান্য ঘটনা; ডারুইন।
১৩২৫॥ খোঁড়া মুচির পাঠশালা; পণ্ডিতের খেলা; নোবেলের দান; জোয়ান।
১৩২৬॥ কার্নেগী। ১৩২৮॥ পিপাসার জল।

জীব-জন্তু

পুরনো 'সন্দেশ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে পুনরুদ্ধার করে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে 'জীব-জন্তু' নামে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয় (অক্টোবর, ১৯৭৪)। এ খণ্ডে রচনাগুলি বিষয়ানুক্রমিক সাজান হয়েছে।

১৩২১ ঃ গরিলা; সেকালের লড়াই। ১৩২২ ঃ রাক্ষুসে মাছ। ১৩২৩ ঃ ফড়িং; পেকারি; সেকালের বাঘ; অদ্ভুত কাঁকড়া; জানোয়ারওয়ালা; সেকালের বাদুড়; সিন্ধু ঈগল; জানোয়ারের প্রবাসযাত্রা। ১৩২৪ঃ ঘোড়ার জন্ম; প্রাচীনকালের শিকার; বিদ্যুৎ মৎস্য; তিমির খেয়াল; গোখুরো শিকার; পাখির বাসা; কুমিরের জাতভাই; সমুদ্রের ঘোড়া; গরিলার লড়াই; বর্মধারী জীব; ধনঞ্জয়; শামুক ঝিনুক। ১৩২৫ঃ মাছি; অদ্ভুত মাছ; জানোয়ারের ঘুম; তিমির ব্যবসা; জানোয়ার ইঞ্জিনিয়ার; প্লাটিন; নাকের বাহার; নিশাচর। ১৩২৬ঃ বেবুন; সিংহ শিকার; আলিপুরের বাগানে। ১৩২৭ঃ খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু। ১৩২৯ঃ লড়াইবাজ জানোয়ার। ১৩৩০ঃ মানুষমুখো।

বিবিধ

এই রচনাগুলি যথারীতি 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুকুমার রায়-কৃত স্বরচিত রচনার একটি তালিকা এবং সুপ্রভা রায়ের রক্ষিত পাণ্ডুলিপি বা তার কপি থেকে এই লেখাগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর এবং তারপরে সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় রায় পরিবারভুক্ত লেখকের নাম মুদ্রিত হত না, সেই কারণে সুকুমার রায়ের রচনার জন্য আমরা সম্পূর্ণত উপরোক্ত দুই উপকরণের উপর নির্ভর করেছি। পত্রিকায় প্রকাশকালে অধিকাংশ লেখাই চিত্রবহুল ছিল, তদনুযায়ী রচনার মধ্যে সেইসব ছবির উল্লেখ ছিল। আপাতত পুরনো পত্রিকার পীতপত্র থেকে সেইসব ছবির উদ্ধার সম্ভব নয়; প্রায় ছবিগুলিই তৎকালীন ইংরেজি পত্রপত্রিকা পুস্তক থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল; এইসব কারণে ছবিগুলি বর্জিত হল এবং রচনাগুলির সম্পাদনা একই কারণে প্রয়োজনীয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সম্পাদনার সময়ে যতদূর সম্ভব কম শব্দ বাদ দেবার জন্য সতর্কতা নিতে হয়েছে।

১৩২০ঃ সূক্ষ্ম হিসাব; শিকারী গাছ। **১৩২১ঃ** কাগজ; লুপ্ত সহর; ডুবুরি জাহাজ; পাতালপুরী; উঁচু বাড়ি; রাবণের চিতা। **১৩২২ ঃ** ডুবুরী। **১৩২৩ ঃ** ছাপাখানার কথা; কাপড়ের কথা; পার্লামেণ্টের ঘড়ি; রেলগাড়ির কথা; সূর্যের কথা; ডাকঘরের কথা; অসুরের দেশ; নীহারিকা; মাটির বাসন; ঘুড়ি ও ফানুস। **১৩২৪ ঃ** ক্লোরোফর্ম; মরুর দেশে; যুদ্ধের আলো; প্রলয়ের ভয়; ধুলোর কথা; আকাশ আলেয়া; আষাঢ়ে জ্যোতিষ; অলংকারের কথা; গাছের ডাকাতি; কয়লার কথা; জাহাজডুবি। **১৩২৫ ঃ** আশ্চর্য আলো; পিরামিড; দক্ষিণ দেশ; ভূমিকম্প; মানুষের কথা; মেঘবৃষ্টি; মজার খেলা; লাইব্রেরি; বেগের কথা; আগুন। **১৩২৬ ঃ** পৃথিবীর শেষ দশা; নৌকা; ব্যস্ত মানুষ; সমুদ্র বন্ধন; লোহা; শনির দেশে; কাঁচ; শরীরের মালমশলা; অতিকায় জাহাজ; আকাশপথের বিপদ; সেকালের কীর্তি। **১৩২৭ ঃ** চীনের পাঁচিল; চাঁদমারি; বায়োস্কোপ; ভুঁইফোঁড়; মামার খেলা; ডাকের কথা; কাঠের কথা; হাওয়ার ডাক। **১৩২৮ ঃ** হেঁয়ালি নাট্য; আহ্লাদী মিনার; আদ্যিকালের গাড়ি; নকল আওয়াজ। **১৩২৯ ঃ** আশ্চর্য প্রহরী; আকাশবাণীর কল; যদি অন্যরকম হত; জলস্তম্ভ। **১৩৩০ঃ** আজব জীব; বুমেরাং।

জীব জন্তু' পর্যায়ে 'মানুষমুখো' এবং 'বিবিধ' পর্যায়ের 'বুমেরাং' সুকুমার রায় 'উহ্যনাম পণ্ডিত' ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন; এই ছদ্মনামটি ননসেন্স ক্লাবের মুখপত্র 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' হস্তলিখিত পত্রিকায় সুকুমাব রায় ব্যবহার করতেন।

বাল্য রচনা ও অন্যান্য

নদী। কবিতাটি সুকুমার রায়ের আট বৎসর বয়সের রচনা এবং প্রথম মুদ্রিত কবিতা। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর উৎসাহে যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিশুদের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের পক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় 'মুকুল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার ২ ভাগ, সংখ্যা ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সংখ্যায় 'নদী' কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

টিক্-টিক্-টং। বিদেশী কবিতার ছায়াবলম্বী এই কবিতাটি 'মুকুল' পত্রিকার ৩ ভাগ, সংখ্যা ৩, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ২৪ ভাদ্র ১৩৬২, ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ সংখ্যায় কবিতাদুটি পুনর্মুদ্রিত করেন।

শ্রীগোবিন্দ-কথা। কবিতাটি শিরোনামবিহীন ও অসংস্কৃত অবস্থায় 'হিজিবিজি খাতা' থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মহাভারত। সুকুমার রায় মহাভারতের বালকপাঠ্য পদ্যানুবাদ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছিলেন। তার দুই অংশ 'সন্দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩৩১ সংখ্যায় যথাক্রমে 'ভীষ্ম' ও 'মহাভারত—আদিপর্ব' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল।
সূর্যের রাজ্য। মুকুল, আশ্বিন ১৩১৩। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত রচনাবলীর মধ্যে সুকুমার রায়ের প্রথম মুদ্রিত গদ্যরচনা।
একটি বর। সন্দেশ, শ্রাবণ ১২৩৮। গল্পটির একটি পাঠান্তর 'অন্ধের বর চাওয়া' শিরোনামে সন্দেশ, অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।
ব্যাঙের সমুদ্র দেখা। সন্দেশ, আষাঢ় ১৩২২।

স্বরলিপি। সুকুমার রায় সুরারোপিত 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের গানগুলির স্বরলিপি প্রথম সিগনেট সংস্করণ 'ঝালাপালা' পুস্তকে মুদ্রিত ছিল। সুকুমার রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুবিমল রায়ের সৌজন্যে এই সুরগুলির পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল; সেই সুর অনুসারে স্বরলিপি রচনা করেছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রীবিজয়া রায়। এই খণ্ডে স্বরলিপির প্রকাশনকার্যে বিশেষ সহায়তা করেছেন শ্রীসুভাষ চৌধুরী।

'সুকুমার সাহিত্যসমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যেই সুকুমার রায়ের সমগ্র রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে এমন পরিকল্পনা ছিল। রচনার সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি হেতু তৃতীয় খণ্ড পরিকল্পিত হয়েছে। এই খণ্ড প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার প্রধান কারণ এইটাই; তাছাড়া, তাঁর অপ্রকাশিত রচনার সন্ধান ও সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ ছিল।

বানানপদ্ধতিতে লেখক-অনুসৃত নীতি সম্ভবমত রক্ষা করা হয়েছে।

এই খণ্ডের প্রস্তুতি ও প্রকাশন কার্যে সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইঃ শ্রীকল্যাণী কার্লেকর, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতারকচন্দ্র লাহিড়ি, শ্রীঅভীককুমার সরকার, শ্রীবাদল বসু ও শ্রীসন্দীপ রায়।